বিদ্যাসাগর

(অর্থাৎ)

সমালোচনা-সংবলিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জী

শ্রীবিহারিলাল সরকার

সঙ্কলিত।

কলিকাতা ১২নং সিকদারবাগান-'বান্ধব-পুস্তকালয়-
সাধারণ পাঠাগার' হইতে তৎসহ-সম্পাদক

শ্রীবাণীনাথ নন্দী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ষ্টীম-মেসিন প্রেসে
শ্রীকেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত।

১৩০২ সাল, ৫ই আশ্বিন।

মূল্য ২৲ দুই টাকা

উৎসর্গ-পত্র।

যাঁহার সহায়তায় পবিত্র সাহিত্য-মন্দিরের এক প্রান্তে

প্রবেশ করিবার প্রকৃত পথ পাইয়াছিলাম,

সেই শ্রদ্ধাস্পদ সহৃদয় সুহৃদ্-সহায়

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মিত্রকে

এবং

যাঁহার সহৃদয়তায় কেদারনাথকে সুহৃদস্বরূপে পাইয়াছিলাম,

সেই প্রিয়তম মিত্র শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল বসুকে

দীনের এ সামান্য সাহিত্য-সম্বল

"বিদ্যাসাগর" উৎসৃষ্ট

হইল।

নিবেদন।

বিধি বিড়ম্বনায় "বিদ্যাসাগর" যথাসময়ে প্রকাশিত হয় নাই। তিন মাস শয্যাশায়ী ছিলাম। দৌর্ব্বল্য জন্য দুই মাস "বিদ্যাসাগর" সম্বন্ধে কোন কাজ করিতে পারি নাই। ইহা অবশ্য বিড়ম্বনার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহোদর শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়, সর্ব্বপ্রথম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী প্রকাশ করেন। তাঁহার নিকট আমার সর্ব্বাগ্রে কৃতজ্ঞতা-স্বীকার কর্ত্তব্য। "বিদ্যাসাগর"-প্রকাশে অনেকেই অনেক প্রকারে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। পুস্তকের অভ্যন্তরে তাঁহাদের নামোল্লেখ আছে। আমি তাঁহাদের নিকট চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ রহিলাম।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, আমাকে অনেক চিঠি-পত্র দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন-ঘটিত যে সমুদয় চিঠি-পত্র ছিল, সে সমুদয়ই পাইবার আশা পাইয়াছিলাম। আমার দুরদৃষ্টবশতঃ তাহার কতক হস্তান্তরিত হইয়া পড়ে। যাহা হউক, তিনি আমাকে যে সব দুর্লভ আবশ্যক চিঠি-পত্র দিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার নিকট আমি চির-ঋণী।

আমি বহু কষ্টে, বহু শ্রমে এবং অর্থব্যয়ে যে সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি, হয়ত তাহাদের কাহারও কাহারও উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারি নাই। আশা আছে, ভবিষ্যতে আমা

অপেক্ষা যোগ্যতর জীবনী-লেখকের হস্তে তাহাদের সদ্ব্যবহার হইবে। আমি যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা যদি কোন সময়, সাধারণের সম্পত্তিরূপে, সাধারণের হিতার্থে নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে, আমার সংগ্রহ-শ্রম সার্থক হইবে।

নানা কারণে, মূল ইংরেজী চিঠি-পত্র প্রকাশ করিতে পারিলাম না। মূলের সৌন্দর্য্য অনুবাদে রক্ষিত হয় না। তবে অনেকটা ভাবগ্রহ হইয়া থাকে। এই জন্য ইংরেজী চিঠি-পত্রাদির বাঙ্গালায় মর্ম্মানুবাদ দিয়াছি।

ইংরেজী চিঠি-পত্রাদির অনুবাদ সম্বন্ধে আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বসু, বি, এল, সোদরপ্রতিম শ্রীমান্ নারায়ণচন্দ্র ঘোষ, বি, এ, শ্রীমান্ কানাইলাল ঘোষ এবং আমার শ্রদ্ধাস্পদ সহকারী শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় অনেকটা সাহায্য করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব ডাইরেক্টর টনি সাহেব, অনুগ্রহপূর্ব্বক সংস্কৃত-কলেজের পুরাতন কাগজপত্র দেখিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। সংস্কৃত-কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়, তৎসম্বন্ধে সহায়তা করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত পত্রে তাহার প্রমাণ,—

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং। সংস্কৃত কলেজ, ৮.৮.৯২

সবিনয়নিবেদনমিদম্।

শ্রীযুক্ত ডিরেক্টর সাহেবের চিঠি আসিয়াছে। ৺বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে কলেজ হইতে যাহা অনুসন্ধান করেন, তাহা পাইতে পারেন। ইতি

ভবদীয়স্য

শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মা।

বিদ্যাসাগরকে হিন্দু যে চক্ষে দেখিয়া থাকে এবং হিন্দুর যে চক্ষে দেখা কর্ত্তব্য, বিদ্যাসাগরের কার্য্যালোচনায় তাহা বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। সে সম্বন্ধে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহার বিচার বিজ্ঞ পাঠকগণই করিবেন।

প্রার্থনা।

মানুষ অপূর্ণ। তাই মানুষের কাজ একেবারে ভ্রমবর্জ্জিত হয় না। আমি মূঢ়, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, "বিদ্যাসাগরকে" একেবারে ভ্রমশূন্য করিব। বিশেষতঃ ষোড়শ বর্ষাধিক কাল বাঙ্গালা ছাপাখানার সহিত কুটুম্বিতা করিয়াও যখন আমার এইরূপ স্পর্দ্ধিত প্রতিজ্ঞা, তখন আমার মূঢ়তা অপরিমেয় ও অমার্জ্জনীয়। কেবল ছাপাখানার দোহাই দিয়া আত্ম-নিষ্কৃতির প্রয়াস পাইলে, প্রত্যবায় হয়। ছাপাখানার ভ্রম অনেকাংশে অক্ষরগত। আমার ভ্রম বিষয়, ভাব ও ভাষা সংক্রান্ত। কেবল ভ্রম কেন, কোন কোন স্থানে ক্রটি ও সংশয় আছে। আমার সবিনয় নিবেদন, পাঠকবর্গ অনুগ্রহপূর্ব্বক অক্ষরগত ভ্রম স্বয়ং সংশোধন করিয়া লইবেন। আত্মকৃত যে ভ্রম-ক্রটি

বুদ্ধিগোচর হইয়াছে, তাহার যথাযোগ্য সংশোধন করিয়া লইতে সঙ্কুচিত নহি। আমার বুদ্ধিগোচর হয় নাই, এমন ভ্রমও থাকিতে পারে। দয়া করিয়া, কেহ তাহা দেখাইয়া দিলে, অকৃতজ্ঞতার কলঙ্কে কলুষিত হইব না।

ভ্রম।

"পঞ্চম অধ্যায়" দুইটী হইয়াছে। পাঠক! শেষেরটীকে "পঞ্চম (ক)" করিয়া লইবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্রের নাম "নারায়ণ" না হইয়া দুই এক স্থানে "নারায়ণচন্দ্র" হইয়াছে। ৪৮ পৃষ্ঠা ত্রয়োদশ ছত্রে "প্রহারের পরও" না হইয়া "প্রহারের সময়েও" হইবে। ৫১ পৃষ্ঠার চতুর্দ্দশ ছত্রে "বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে" না হইয়া "তাঁহাকে" হইয়াছে। সংস্কৃত সংকীর্ণ-প্রসার ও সাধারণে অপ্রচলিত। ৮০ পৃষ্ঠার দশম ছত্রে "সাধারণ" কথাটি পড়িয়া গিয়াছে। ১৮৩ পৃষ্ঠার নোটে পঞ্চম ছত্রে "১৮১০ খৃষ্টাব্দে" না হইয়া "১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে" হইবে। ৩০০ পৃষ্ঠার প্রথম ছত্রে "কুরুভূমি" কথাটী "কুশ-ভূমি" হইবে। "এডুকেশন কৌন্সিলে"র সেক্রেটারীর নাম মোয়েট সাহেব। কোন কোন স্থানে "মোনাট" হইয়াছে। ৪৯১ পৃষ্ঠার ষষ্ঠ ছত্রে "পাঁচ সহস্র" কথাটী "পঞ্চাশ সহস্র হইবে।



রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর ।

ত্রুটি।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সখ্য ছিল। উভয়ের পরিবারের মধ্যে পরস্পরের এরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল যে, সহসা ভিন্ন পরিবার বলিয়া, কেহ বুঝিতে পারিত না। ইহা অপেক্ষা আর বেশী বলিবার স্থান অবশ্য এখানে হইবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত, সঙ্কলিত ও অনুবাদিত পুস্তকের মধ্যে কথামালার কথা কিছু বলা হয় নাই। কথামালা সুকুমারমতি বালকের দিব্য মুখরোচক। যে সকল চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে এনগ্রেভার ও পেণ্টার শ্রীযুক্ত হরিদাস সেনের নাম উল্লিখিত হওয়া উচিত ছিল। অধিকাংশ চিত্র তাঁহারই অঙ্কিত। ধারাবাহিকরূপে বর্ষে বর্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনঘটিত কার্য্যাবলীর আলোচনা হইয়াছে। কোন কোন স্থানে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কলেজ-প্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লেখিত হইতে পারে। ভাবোচ্ছ্বাসিত হৃদয়াবেগে বিচিত্রকর্ম্মা বিদ্যাসাগরের একই প্রবৃত্তি-পরিচায়ক ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যালোচনায় দুই এক স্থানে মন্তব্য-ভাবে পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। একান্ত বিরক্তিকর বোধ হইলে, পাঠকগণ দয়া করিয়া, সে অংশ বাদ দিয়া পড়িবেন।

সংশয়।

৬৫১ পৃষ্ঠায় মদনমোহন শর্ম্মা-স্বাক্ষরিত একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রখানি প্রকৃত। কিন্তু নাম সম্বন্ধে সংশয় আছে। আমার অসুস্থাবস্থায় এই অংশ মুদ্রিত হইয়াছিল। নামটী মিলাইতে পারি নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ পত্রখানি অধুনা হস্তচ্যুত। ৫৮৩ পৃষ্ঠায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রহস্য-রসের পরিচয়স্থলে লাট-দরবার সম্বন্ধে যে কথা লিখিত হইয়াছে, তদ্বিবরণ মাদ্রাজের বারিষ্টার রামস্বামী রাজু বি, এ কর্ত্তৃক প্রণীত "শ্রীমৎপণ্ডিত রাজতরঙ্গিণী" নামক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। কেহ কেহ ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করেন। এমন কি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন কোন আত্মীয় ইহাকে কল্পিত বলিতেও কুণ্ঠিত নহেন।

শেষ কথা।

"জন্মভূমিতে" যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী প্রকাশ করি, তখন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনীর সঙ্গে এই সব বিষয় এই প্রথম প্রকাশিত হইল।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

একোনবিংশ অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়।

একবিংশ অধ্যায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

পঞ্চবিংশ অ্যাধয়।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রিংশ অধ্যায়।

একত্রিংশ অধ্যায়।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।



বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর।

অবতরণিকা।

দ্বিতীয় দাতা-কর্ণ এবং দয়ার সাগর অনাথ-বান্ধব বঙ্গের "বিদ্যাসাগর", ১৮৯১ খৃঃ অব্দে ২৯শে জুলাই বা ১২৯৮ সালে ১৩ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার রাত্রি ২টা ১৮ মিনিটে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য,—"বিদ্যাসাগর" বলিলে, ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেই বুঝায়। সেই বিশ্ব-বিশ্রুত "বিদ্যাসাগর," প্রায় তিন বৎসর হইল, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, চলিয়া গিয়াছেন। এ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে, সেই কর্ম্ম-শূর, আপন কর্ম্ম সাধন করিয়া, অপেক্ষাকৃত অল্পতর ভাগ্যহীন ব্যক্তিবর্গকে কর্ম্মের শিক্ষা-দীক্ষা দিয়া, স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। জীবমাত্রের এই অবস্থা। সেই আদ্যাশক্তি মূল প্রকৃতির এই ব্যবস্থা। অবোধ মায়াময় জীব আমরা, মায়া-মুগ্ধ হইয়া, এ সব তত্ত্ব বুঝিয়াও, বুঝিতে পারি না। এ অনিত্য সংসারে কেবল বিয়োগ-বিলাপেই অধীর হইয়া পড়ি। তাই বিদ্যাসাগরের স্মৃতিতে

এখনও বিয়োগ-বাড়বানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। যে যায়, সে ত আর আসে না। যায়; কিন্তু স্মৃতি যে জাগে! স্মৃতি ত নয়; সে যে জ্বালাময়ী জ্বালা! সে জ্বালা ভুলিব কিসে?

যাঁহার করুণায় শত শত নিরন্ন নিরাশ্রয়, অন্নাশ্রয় পাইত; যাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া, অগণিত অনাথ আতুর দীন হীন দুঃস্থ দরিদ্র অসহায়, আত্মীয়-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইত; যাঁহার অপার দয়া-দাক্ষিণ্যে কপর্দ্দকহীন অধমর্ণ, উত্তমর্ণের নিদারুণ নিপীড়ন হইতে রক্ষা পাইত; যাঁহার সহৃদয়তাগুণে মল-মূত্র-পূরিত পরিত্যক্ত রুগ্ন পথিক, গৃহে আনীত হইয়া যথাযোগ্য ঔষধ-পথ্য পাইত; যাঁহার জ্বলন্ত জীবন্ত দৃষ্টান্তে অতি-বড় কু-পুত্রও অতুল মাতৃভক্তি শিক্ষা পাইত; যাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়, অদম্য উদ্যম-উৎসাহ, অকুণ্ঠিত নির্ভীকতা, অলৌকিক শ্রমাকুণ্ঠিতা, অসীম কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, অমানুষিক সরলতা দেখিয়া বিদেশী প্রবাসী লোকেও সবিস্ময়ে সহস্র বার মস্তক অবনত করিত, সেই ক্ষণজন্মা ভাগ্যবান পুরুষ লোকান্তরিত! বল দেখি, তাঁর স্মৃতি পাসরি কিসে?

এখনও চারি দিকে কত কাঙালের পর্ণ-কুটীরে পূর্ণ হাহাকার! এখনও কত অনাথাশ্রমে আকুল প্রাণের মর্ম্ম-ভেদী গভীর চীৎকার! এ সব শুনিলে বুক ফাটিয়া যায়! সে সব কথা ভাবিলে চক্ষু ফাটিয়া রক্ত বাহির হয়! সেই করুণা-প্রতিম অনুপম করুণাময়ের কথা স্মরণ হইলে হৃদয়ের শোক-সাগর উথলিয়া উঠে।

বিদ্যা-বুদ্ধিতে "বিদ্যাসাগর" অপেক্ষা বড় অনেকেই

থাকিতে পারেন; কিন্তু দয়া-দাক্ষিণ্যে তাঁহা অপেক্ষা বড় অতি অল্প লোকই দেখিতে পাই। এমন নিরন্নের অন্নদাতা, ভয়ার্ত্তের ভয়ত্রাতা; বিপন্নের উদ্ধারকর্ত্তা এবং দীন-হীনের দয়াল পালক পিতা, এ কলিযুগে, এ সংসারে বড়ই বিরল। তিনি যে দয়ার অপূর্ব্ব অবতার! তিনি যে মূর্ত্তিমতী দয়ার পূর্ণ পুরুষাকার! এক হৃদয়-বলেই "বিদ্যাসাগর" বঙ্গের বিরাট পুরুষ।

এক জন বড় লোক হইলে, সমগ্র দেশ বা জাতি বড় বলিয়া সম্মানিত হয়। মার্কিন্ গ্রন্থকার দার্শনিক এমার্সন্ বড় লোকদের কথায় বলিয়াছেন,—

'The race goes with us on their credit."

এ কলুষময় কলিকালে, দানে পূর্ণ "সাত্ত্বিকতা" দুর্লভ। বিদ্যাসাগরের দানে কিন্তু সাত্ত্বিকতার পূর্ণ বিকাশ। তাঁহার "বিধবা-বিবাহ"-প্রচলন-প্রক্রিয়া হিন্দুর পক্ষে পাপবিদ্ধ তামসিকতা নিশ্চিতই; কিন্তু তাঁহার দয়া-প্রণোদিত দানের সাত্ত্বিকতা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। দানে বিদ্যাসাগর শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। শাস্ত্রেই আছে;—

"দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥"

——গীতা ১৭।২০।

দান করিতে হইবে, ইহা মনে করিয়া দেশ কাল পাত্র বিবেচনায়, অপকারীকেও যে দান করা যায়, তাহাকে সাত্ত্বিক দান কহে।

এরূপ সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন দানের পরিচয়, তদীয় জীবন-বৃত্তান্তে পুনঃপুনঃ পাইবেন। বিদ্যাসাগর দান করিতেন; জানিতেন কেবল দাতা ও গ্রহীতা। দানের পৌরুষ-প্রকাশে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তিনি দান করিতেন, নামের জন্য নহে। দরিদ্রের সেবা এবং রুগ্নের শুশ্রূষা, কেবলমাত্র তাঁহার অকাম-কল্পিত নিত্য ক্রিয়া ছিল। দেনার দায়ে ঋণী, জেলে যাইতে যাইতে পথে বিদ্যাসাগরকে দেখিয়া, বাষ্পাকুল লোচনে কাতর ভাবে তাঁহার পানে একবার তাকাইলে, চক্ষের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইত। কপর্দ্দক হস্তে না থাকিলেও, তদ্দণ্ডে তিনি ঋণ করিয়াই ঋণীর ঋণ পরিশোধ করিতেন।

এরূপ দান অবশ্য সংসারীর পক্ষে সকল সময় সর্ব্বথা অনুকরণীয় ও প্রবর্ত্তনীয় নয়। ইহাতে অনেক সময় বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। বিলাতী কবি গোল্ডস্মিথ্ কতকটা এইরূপ দানশীলতায় মধ্যে মধ্যে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অবশ্য কখন সেরূপ হইতে হয় নাই। হইলেও ইহা যে স্বাভাবিকী সহৃদয়তার পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ কি?

প্রাসাদ-বিহারী কোটিপতি হইতে "কর্ম্মটাড়ে"র পর্ণকুটীর-বাসী অসভ্য দীন হীন সাঁওতাল পর্য্যন্ত জানিত,—"বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর।" এই জন্যই তিনি, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান, শিখ, পারসীক, সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব জাতির সমান বরণীয় এবং মাননীয়। তাঁহার পাপবিদ্ধ তামসিক কার্য্যানুষ্ঠান, ভ্রান্ত-বিশ্বাস-বিজৃম্ভিত দয়ার ফল বুঝিয়া, হিন্দুও তাঁহার প্রতি

ভক্তিহীন হয় নাই। সে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর কোথায়! সে দান-বীর সর্ব্বজন-সমাদৃত বিদ্যাসাগর কোথায়!

যখন শোকের দারুণ শক্তি-শেল বুকের উপর, যখন যাতনার অগ্নিস্তূপ মর্ম্মের ভিতর, তখন "জন্মভূমি" পত্রিকায় এ অধম লেখকের উপর বিদ্যাসাগরের জীবনী লিখিবার ভার পড়িয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম, জ্বালা জুড়াইলে; সম্পূর্ণ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইব। জ্বালা জুড়াইল না; পাঠকগণ কিন্তু অধীর; কাজেই জীবনীর অসম্পূর্ণ উপকরণ লইয়াই 'জন্মভূমি"তে জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। যে কারণে জন্মভূমিতে জীবনী লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, সেই কারণে জীবনী পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম।

পুস্তকের উপকরণ সম্পূর্ণ না হউক, অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। সে বিরাট পুরুষের জীবনীর সম্পূর্ণ উপকরণ সংগ্রহ একরূপ সাধ্যাতীত। তবে ইহাতে যথা-জ্ঞাতব্য বিষয়ের অভাব যাহাতে না হয়, তাহার জন্য সাধ্যানুসারে প্রয়াস পাইয়াছি।

জীবনী লিখিব বটে; কিন্তু একেবারে নির্দ্দোষ হইবার সম্ভাবনা কম। কাঁহারও জীবনী লিখিতে হইলে, গুণাধিক্যের সঙ্গে দোষেরও সম্যক্ সমালোচনায় সমদর্শিতার সম্মান রক্ষা হয়। মৃত ব্যক্তির গুণ ভালবাসার জিনিষ; দোষ নিন্দার্হ। কবি সউদে বলিয়াছেন,—

"Their virtues love, their faults condemn."

বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুগুণান্বিত হইলেও দোষ-বিবর্জ্জিত

নহেন। সত্য, সে সব দোষ ভ্রান্ত-বিশ্বাস-মূলক ; তাহা হইলেও দোষ ত বটে ; কিন্তু এ সময়ে দোষের সম্যক্ সমালোচনা করা নানা কারণে এক রকম অসম্ভব। ডাক্তার জনসন্ বলিয়াছিলেন যে, "যাঁহার জীবনী লিখিতে হয়, কেবল তাঁহার চরিত্রের উজ্জ্বল ভাগই সমালোচনা করা উচিত নহে; তাহা হইলে তাঁহার অনুকরণ অসম্ভব হইয়া উঠে।" তাঁহারও কিন্তু সে সাহসে কুলায় নাই। তাঁহার সময়ে যে সব কবি ছিলেন, তাঁহাদের অনেকের অনেক কথা বলিতে তিনিও কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কথা এই ছিল ;—

"Walking upon ashes under which the fire was not extinguished."

"অনির্ব্বাপিত অভ্যন্তর ভস্ম-স্তূপে বিচরণ করিতেছি।"

সকল দোষক্রটীর সমালোচনা করা অসম্ভব হইলেও, আমরা বিদ্যাসাগরের কোন কোন ভ্রম-ক্রটির সমালোচনায় সাহসী হইয়াছি। যে ভ্রমক্রটির ভ্রমাত্মক অনুকরণে হিন্দু-সন্তানের মহতী ক্ষতি, তাহা প্রদর্শন না করিলে প্রত্যবায়-ভাগী হইতে হইবে। গুণ-রাশির সমালোচনা ত অবশ্য-কর্ত্তব্য। যেহেতু তাহা একান্ত অনুকরণীয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়াও, কি গুণে, সম্রাট্-মুকুট-লাঞ্ছন কীর্ত্তির অপূর্ব্ব জ্যোতিষ্মান্ শিরস্ত্রাণ মস্তকে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান কালে অনেকেই অবগত নহেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী-সমালোচনায় তাহা উদ্ঘাটিত হইবে। সেই

হেতু এ জীবনী বোধ হয় বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ লোক-সমূহের কথঞ্চিৎ উপকারক ও উপাদেয় হইতে পারিবে।

যে গুণসংঘাত জন্য লোকের জীবনী লেখা আবশ্যক হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সে গুণ অনেক ছিল। যে গুণ থাকিলে, মানুষ মানুষকে ভাল বাসিতে চাহে; এবং যে গুণ থাকিলে, মানুষ বাহ্য জগৎ ভুলিয়া, সেই গুণবানেরই সম্পূর্ণ সত্তায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া ফেলে, সে গুণও বিদ্যাসাগরের অনেক ছিল। যিনি এক উদ্ভাবনায় চিন্তা-রাজ্যের সহস্র পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন, তাঁহার জীবনী লেখা আবশ্যক হয়। পাঠক, বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনা-শক্তির পরিচয়ও পাইবেন। যিনি প্রতিভা-বলে প্রকৃতির উচ্চ স্তরে দণ্ডায়মান হইয়া, ইঙ্গিতে উন্নতির সহস্র পথের যে কোন পথ দেখাইয়া থাকেন, আর নিম্ন স্তরের লোকসমূহ তাঁহাকে ধরিবার জন্য স্তর বহিয়া উঠিতে চেষ্টা করে, তাঁহার জীবনীর প্রয়োজন আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী পাঠে এ কথার সার্থকতা সম্যকৃরূপে প্রতিপন্ন হইবে। প্রকৃত প্রতিভায় "চৌম্বক" আকর্ষণের অসীম শক্তি। মানুষ যেখানে যত দূরেই থাকুক, এ আকর্ষণ এড়াইবার যো নাই। যেখানে এরূপ একটী "চুম্বক" থাকিবে, সেইখানে কোটি জীব আকৃষ্ট হইবে।

"প্রতিভা" স্বর্গের দেবতা। প্রতিভা-পূজক সর্ব্বস্ব দিয়া প্রতিভার পূজা করিয়া থাকেন। চিন্তাশীল এমার্সন্ বলিয়াছেন,—"তুমি বল, ইংরেজ কাজের লোক,—জর্ম্মান্ সহৃদয়

অতিথি-সেবক ;—ভালেন্‌সিয়ার জলবায়ু অতি মনোরম,—সক্রেমেণ্টো পাহাড়ে প্রচুর সোণা পাওয়া যায় ; কথা ঠিক বটে ; কিন্তু আমি এ সব সুখশালী, ধনী এবং অতিথিসেবক লোকদিগকে দেখিতে বা নির্ম্মলজল-বায়ুর সেবন করিতে অথবা বহু ব্যয়ে স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে চাহি না। তবে প্রকৃত জ্ঞানশালী ও শক্তিমান ব্যক্তিবর্গের আবাস-ভূমি দেখাইয়া দিতে পারে, এমন যদি কোন চুম্বক-প্রস্তর প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া তাহা ক্রয় করি এবং অদ্যই পথে বাহির হইয়া পড়ি।"

প্রকৃত শক্তি-শালী এবং গৌরবান্বিত প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি সর্ব্বত্রই পূজনীয়। তাঁহারাই মানুষের আদর্শ। তাঁহারাই প্রকৃতির সূক্ষ্ম শক্তির পরিচায়ক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁহাদের শক্তি বিসর্পিত। তাঁহাদের সহবাসে মানুষ সন্তুষ্ট ও শক্তিসম্পন্ন হয়। ভাবে বা কার্য্যে মানুষ তাঁহাদেরই সঙ্গে থাকিতে চাহে। আমাদের সন্তান-সন্ততি বা নগর-গ্রামের নামকরণ, তাঁহাদেরই নামে হইয়া থাকে। ভাষায় তাঁহাদের নামের ভূরি ভূরি প্রয়োগ পাইবে। তাঁহাদের প্রতিকৃতি বা গ্রন্থাদি রূপ কার্য্যাবলী আমাদের ঘরে ঘরে দেখিবে। আমাদের নৈতিক কার্য্যে তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্য স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠে। তাঁহাদেরই অন্বেষণ, যুবার স্বপ্ন এবং বর্ষীয়ানের জাগরণ-কার্য্য। যত দূরেই থাকি না, তাঁহাদিগের কার্য্যকলাপ এবং সম্ভবপর হইলে, তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য মন স্বতই ব্যাকুল হইয়া উঠে।

এইরূপ প্রতিভাশালী ব্যক্তিরই জীবনী প্রয়োজনীয়। এই জন্যই এমার্সন্ বলিয়াছেন ;—

"The genius of humanity is the real subject whose biography is written in our annals."

প্রতিভাই মানবের প্রকৃত পদার্থ। প্রতিভাশালীর জীবনই ইতিহাসে লিখিত হইয়া থাকে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনে এমন প্রতিভারও বহু পরিচয়ই পাইবেন। এক একটী প্রতিভাশালী ব্যক্তি যেমন এক একটী বিভাগ অধিকার করিয়া থাকেন, তেমনই বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রকৃতির এক বিশাল বিভাগ লইয়া ব্যাপৃত ছিলেন। মনোবৃত্তির উচ্চক্রিয়ানিবন্ধন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ধ্যানমাত্রেই কল্পনায় অন্যসাধারণের অলক্ষ্যে প্রকৃতির সূক্ষ্ম তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া লন। এই জন্যই প্লেটো, সেক্সপিয়র, সুইনবর্ণ, গেটে প্রভৃতির এত প্রতিষ্ঠা। এই জন্যই ইঁহাদের জীবনী এত প্রয়োজনীয়। বিদ্যাসাগরে এ শক্তিরও অভাব ছিল না।

মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের কার্য্য-ফল অব্যর্থ। জ্ঞান ও ভাবের শক্তি চিরন্তন-ধ্রুব-সুখদায়িনী। এ শক্তির তেজ পরীক্ষা করিতে হইলে, শক্তিশালী পুরুষের জীবনী পড়িতে হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু কার্য্যেও এ শক্তির প্রমাণ আছে। বিখ্যাত-ইতিহাসবেত্তা স্যর ওয়ালটর র্যালের সম্বন্ধে ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের সচিব সিসিল বলিয়াছিলেন,—

"I know he can toil terribly."

ওয়ালটর ভয়ানক পরিশ্রম করিতে পারেন। এ কথা শুনিলে যেন বৈদ্যুতিক প্রভাবে সর্ব্বাঙ্গ আলোড়িত হইয়া উঠে। পাঠক! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন, সিসিলের এ কথা বিদ্যাসাগর মহাশয়েও খাটে কি না। বিখ্যাত বিলাতী ইতিহাস-লেখক ক্লারেন্‌ডন্ হামডেন্ সম্বন্ধে বলিয়াছেন ;—

"Who was of an industry and vigilance not to be tired out or wearied by the most laborious; and of parts not to be imposed on by the most subtle and sharp, and of a personal courage equal to his best parts."

হামডেন্ অকাতরে পরিশ্রম করিতেন ; তাঁহার সংপ্রবুদ্ধা তীক্ষ্ণদর্শিতা বিলক্ষণই ছিল। তিনি অতি পরিশ্রমেও কাতর ও ক্লান্ত হইতেন না। চতুর তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোকেও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিতেন না। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও উদ্যমশীলতা সমান ছিল।

ইংলণ্ডের প্রথম চার্লসের ভক্ত অনুচর ফকল্যাণ্ড সম্বন্ধেও ক্লারেন্‌ডন্ বলিয়াছেন ;—

"Who was so severe an adorer of truth, that he can as easily have given himself leave to steal, as to dissemble"

ফকল্যাণ্ড এমনই সুদৃঢ় সত্যপরায়ণ ছিলেন যে, চুরি করা

তাঁহার পক্ষে যেমন অসম্ভব, আত্মগোপন করাও তদ্রূপ অসম্ভব।

চীন দার্শনিক লু সম্বন্ধে চীন দার্শনিক মেনসয়াস্ বলিয়াছিলেন ;—

"লুর ব্যবহারের কথা শুনিলে অতি নির্ব্বোধেরও বোধের সঞ্চার হয় এবং অস্থির চিত্তেরও একাগ্রতা উপস্থিত হয়।"

বিদ্যাসাগর-জীবনে একাধারে এই হ্যামডেন্, ফকল্যাণ্ড এবং লুর চরিত্র সমাবেশিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী হইতেই এই সকলেরই শিক্ষা হয়। ইহাও জীবনীর নৈতিক সার। এই জন্যই কার্লাইল্ বলিয়াছেন ;—

"Not only in the common speech of men, but in all art too—which is or should be concentrated and conserved essence of what men speak and show—Biography is almost the one thing needful."

এই জন্যই বিদ্যাসাগরের জীবনী প্রয়োজনীয়। আধুনিক জীবনী-লিখন-প্রথাই বিদেশীয় অনুকরণ। বিদেশীয় শক্তিশালী বড়লোকমাত্রেই বিদ্যাসাগরের প্রীতিপাত্র ছিলেন ; অতএব বিদেশীয় শক্তিশালী ব্যক্তিদিগের সহিত তাঁহার তুলনা অযৌক্তিক নয়। কোন না কোন বিদেশীয় শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির কোন না কোন গুণ তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইত।

"বিদ্যাসাগর-চরিত" নামে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বরচিত অসম্পূর্ণ জীবনী তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাগুলি লইয়াই ইহা রচিত। নারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন,—"যদি তিনি তাঁহার ছাত্র-জীবনের ইতিহাস নিজে লিখিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার জীবন-চরিত সম্পূর্ণ করা সহজ হইত।" নিজের জীবনী নিজে লিখিলে জীবন-বিবরণ যে সম্পূর্ণ হয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এতদ্ব্যতীত জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তির ভাষা, মনোবৃত্তি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, রীতি, নীতি, প্রভৃতিরও অনেক আভাস পাইবার সুবিধা ও সুযোগ হয়। জনসনের জীবনী লিখিতে বসিয়া জীবনী-লেখক বসওয়েল্ বলিয়াছেন;—

"Had Dr. Johnson written his own life in conformity with the opinion which he has given, that every man's life may be best written by himself; had he employed in the preservation of his own history, that clearness of narration and elegance of language in which he has embalmed so many eminent persons, the world would probably have had the most perfect example of biography that was ever exhibited."

ডাক্তার জন্‌সন্ বলিতেন, "নিজের জীবনবৃত্তান্ত মানুষ নিজেই উত্তম লিখিতে পারেন।" তিনি যে বিশদ বর্ণনায় এবং সুন্দর রচনায়, বহুসংখ্যক কীর্ত্তিকুশল ব্যক্তির বিষয় লিপিবদ্ধ

করিয়া তাঁহাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি যদি স্বয়ং নিজের ইতিহাস লিখিতেন, তাহা হইলে জগৎ তাঁহার নিকটে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন জীবনীর অত্যুত্তম দৃষ্টান্ত লাভ করিতে পারিত।

কথাটা ঠিক বটে; কিন্তু আত্মকথার সূক্ষ্ম সমালোচনা হওয়া দুষ্কর। সে ভার বাহিরের লোককে লইতে হয়। আত্মদোষ উদ্ঘাটনে সাহস কয় জনের হইয়া থাকে? রুসোর "কনফেশন্" অর্থাৎ ত্রুটি স্বীকার, দুরন্ত দুঃসাহসিকতার কাজ। ভলটেয়ার ঠিকই বলিয়াছেন;—

'There is no man, who has not something hateful in him—no man who has not some of the wild beast in him. But there are few who will honestly tell us how they manage their wild beast."

মানুষের এমন দোষ ও ত্রুটি থাকিতে পারে যে, তাহা বন্ধুর নিকটও প্রকাশ করিতে দ্বিধা হয়। বিখ্যাত ফরাসী গ্রন্থকার শ্যামফোঁ বলিয়াছেন;—

"It seems to me impossible, in t'e actual state of society, for any man to exhibit his secret heart, the details of his character as known to himself, and above all, his weaknesses and his vices, to even his best friend."

জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের আত্মজীবনীতে সকল সন্দেহ দূর হয় না।

স্কট্, মুর্ এবং সাউদে আত্মজীবনী লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু নানাবিধ সঙ্কোচ উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহারা তাহা পরিত্যাগ করেন। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ সত্যপরায়ণ ছিলেন, তাহাতে তিনি, সর্ব্বস্থলে না হউক, অধিকাংশ স্থলেই যে অনেক সত্য-প্রকাশে অকুণ্ঠিত হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রথম অধ্যায়।

জন্মস্থান, পূর্ব্ব-বংশ, পিতৃ-পরিচয়, মাতৃ-পরিচয়, পিতামহ-মাহাত্ম্য, মাতৃ-ব্যাধি ও গর্ভ-লক্ষণে জ্যোতিষী।

মেদিনীপুর জেলার অন্তবর্ত্তী বীরসিংহ গ্রাম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মস্থান। পূর্ব্বে ইহা হুগলী জেলার অন্তর্ভুত ছিল। বঙ্গেশ্বর স্যর জর্জ কাম্বেলের সময় মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তাঁহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বীরসিংহ গ্রাম কলিকাতা হইতে ২৬ ছাব্বিশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। কলিকাতা হইতে জলপথে বীরসিংহ গ্রামে যাইতে হইলে গঙ্গা, রূপনারায়ণ নদী প্রভৃতি বহিয়া গিয়া ঘাটালে উপস্থিত হইতে হয়। ঘাটাল হইতে বীরসিংহ ২॥০ আড়াই ক্রোশ। *

বীরসিংহ গ্রাম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মস্থান বটে; কিন্তু তাঁহার পিতৃ-পিতামহ বা তৎপূর্ব্ব পুরুষদিগের জন্মস্থান নহে। তাঁহাদের জন্মস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত বনমালিপুর গ্রাম। এই গ্রাম তারকেশ্বরের পশ্চিমে ও জাহানাবাদ মহকুমার পূর্ব্বে ৪ চারি ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখন ইঁহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইঁহাদের অবস্থা-তুলনায় বিদ্যাসাগর মহা-

---

* আজ কাল হোরমিলার কোম্পানীর ষ্টীমারে চড়িয়া ঘাটাল যাইবার সুবিধা হইয়াছে। ষ্টীমারের সুযোগে এখন এক দিনে বীরসিংহ গ্রামে যাওয়া যায়। যখন ষ্টীমার চলিত না, তখন নৌকা করিয়া যাইতে ৪।৫ চারি পাঁচ দিন লাগিত। স্থলপথে যাইতে হইলে গঙ্গার পরপারে শালিখার বাঁধা রাস্তা দিয়া যাইতে হয়। দুই দিনে পৌঁছান যায়।

শয়ের জীবনীর গুরুত্ব সবিশেষরূপে উপলব্ধি হইবে। এতৎ-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত হইল; কেন না, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রমাণ।

"প্রপিতামহ-দেব ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের পাঁচ সন্তান। জ্যেষ্ঠ নৃসিংহরাম, মধ্যম গঙ্গাধর, তৃতীয় রামজয়, চতুর্থ পঞ্চানন, পঞ্চম রামচরণ। তৃতীয় রামজয় তর্কভূষণ আমার পিতামহ। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের দেহাত্যয়ের পর, জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম, সংসারে কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। সামান্য বিষয় উপলক্ষে, তাঁহাদের সহিত রামজয় তর্কভূষণের কথান্তর উপস্থিত হইয়া, ক্রমে বিলক্ষণ মনান্তর ঘটিয়া উঠিল। * * * তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া, এক কালে, দেশত্যাগী হইলেন।

"বীরসিংহগ্রামে উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত নামে এক অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। * * * রামজয় তর্কভূষণ এই উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা দুর্গা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। দুর্গা দেবীর গর্ভে তর্কভূষণ মহাশয়ের দুই পুত্র ও চারি কন্যা জন্মে। জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস, কনিষ্ঠ কালিদাস; জ্যেষ্ঠা মঙ্গলা, মধ্যমা কমলা, তৃতীয়া গোবিন্দমণি, চতুর্থী অন্নপূর্ণা। জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমার জনক।

"রামজয় তর্কভূষণ দেশত্যাগী হইলেন; দুর্গা দেবী, পুত্র-কন্যা লইয়া, বনমালিপুরের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই দুর্গা দেবীর লাঞ্ছনাভোগ ও তদীয় পুত্রকন্যাদের উপর কর্ত্তৃপক্ষের অযত্ন ও অনাদর, এত দূর পর্য্যন্ত

হইয়া উঠিল যে, দুর্গা দেবীকে, পুত্রদ্বয় ও কন্যাচতুষ্টয় লইয়া, পিত্রালয়ে যাইতে হইল। * * * কতিপয় দিবস অতি সমাদরে অতিবাহিত হইল। দুর্গাদেবীর পিতা, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়, অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; এজন্য সংসারের কর্ত্তৃত্ব তদীয় পুত্র রামসুন্দর বিদ্যাভূষণের হস্তে ছিল।

* * * * *

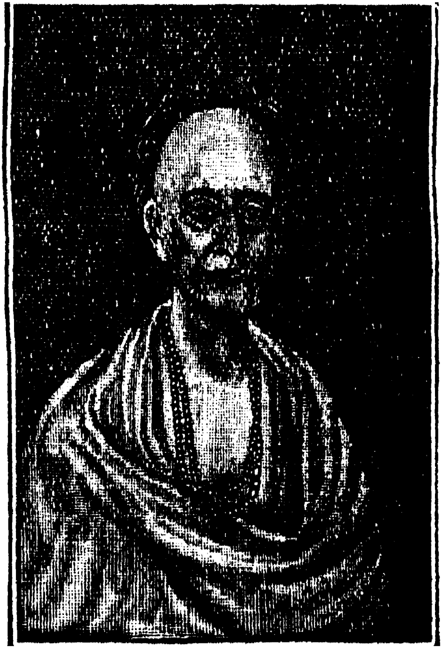
"কিছু দিনের মধ্যেই, পুত্রকন্যা লইয়া, পিত্রালয়ে কালযাপন করা দুর্গা দেবীর পক্ষে বিলক্ষণ অসুখের কারণ হইয়া উঠিল। তিনি ত্বরায় বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃভার্য্যা তাঁহার উপর অতিশয় বিরূপ। * * অবশেষে দুর্গা দেবীকে, পুত্রকন্যা লইয়া, পিত্রালয় হইতে বহির্গত হইতে হইল। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় সাতিশয় ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইলেন এবং স্বীয় বাটীর অনতিদূরে, এক কুটীর নির্ম্মিত করিয়া দিলেন। দুর্গা দেবী, পুত্রকন্যা লইয়া, সেই কুটীরে অবস্থিতি ও অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

"ঐ সময়ে, টেকুয়া ও চরকায় সূত কাটিয়া, সেই সূতা বেচিয়া, অনেক নিঃসহায় নিরুপায় স্ত্রীলোক আপনাদের গুজরান করিতেন। দুর্গা দেবী সেই বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। * * তাদৃশ স্বল্প আয় দ্বারা নিজের, দুই পুত্রের ও চারি কন্যার ভরণপোষণ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহার পিতা, সময়ে সময়ে, যথাসম্ভব সাহায্য করিতেন; তথাপি তাঁহাদের আহারাদি সর্ব্ববিষয়ে, ক্লেশের পরিসীমা ছিল না। এই সময়ে,

জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম ১৪।১৫ বৎসর। তিনি মাতৃদেবীর অনুমতি লইয়া, উপার্জ্জনের চেষ্টায়, কলিকাতা প্রস্থান করিলেন।

"সভারাম বাচস্পতি নামে আমাদের এক সন্নিহিত জ্ঞাতি কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জগমোহন ন্যায়ালঙ্কার, সুপ্রসিদ্ধ চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নের নিকট অধ্যয়ন করেন। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য ছিলেন; তাঁহার অনুগ্রহে ও সহায়তায়, কলিকাতায় বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়েন। ঠাকুরদাস, এই সন্নিহিত জ্ঞাতির আবাসে উপস্থিত হইয়া, আত্মপরিচয় দিলেন এবং কি জন্যে আসিয়াছেন, অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাহা ব্যক্ত করিয়া, আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের সময় ভাল, অকাতরে অন্নব্যয় করিতেন; এমন স্থলে, দুর্দশাপন্ন আসন্ন জ্ঞাতিসন্তানকে অন্ন দেওয়া দুরূহ ব্যাপার নহে। তিনি, সাতিশয় দয়া ও সবিশেষ সৌজন্য প্রদর্শনপূর্ব্বক, ঠাকুরদাসকে আশ্রয় প্রদান করিলেন।

ঠাকুরদাস, প্রথমতঃ বনমালিপুরে, তৎপরে বীরসিংহে, সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি, ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে, রীতিমত সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলন করিবেন, প্রথমতঃ এই ব্যবস্থা স্থির হইয়াছিল এবং তিনিও তাদৃশ অধ্যয়ন বিষয়ে, সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু, যে উদ্দেশে, তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সংস্কৃতপাঠে নিযুক্ত হইলে, তাহা সম্পন্ন হয় না। তিনি, সংস্কৃত পড়িবার জন্য,



বিদ্যাসাগরের পিতা

সবিশেষ ব্যগ্র ছিলেন, যথার্থ বটে; এবং সর্ব্বদাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতেন, যত কষ্ট, যত অসুবিধা হউক না কেন, সংস্কৃতপাঠে প্রাণপণে যত্ন করিব। কিন্তু, জননীকে ও ভাই ভগিনীগুলিকে কি অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছেন, যখন তাহা মনে হইত, তখন সে ব্যগ্রতা ও সে প্রতিজ্ঞা, তদীয় অন্তঃকরণ হইতে, একবারে অপসারিত হইত। যাহা হউক, অনেক বিবেচনার পর, অবশেষে ইহাই অবধারিত হইল, যাহাতে তিনি শীঘ্র উপার্জ্জনক্ষম হন, সেরূপ পড়া-শুনা করাই কর্ত্তব্য।

এই সময়ে, মোটামুটি ইঙ্গরেজী জানিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে, অনায়াসে কর্ম্ম হইত। এজন্য, সংস্কৃত না পড়িয়া, ইঙ্গরেজী পড়াই, তাঁহার পক্ষে, পরামর্শসিদ্ধ স্থির হইল। কিন্তু, সে সময়ে, ইঙ্গরেজী পড়া সহজ ব্যাপার ছিল না। তখন, এখনকার মত, প্রতি পল্লীতে ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় ছিল না। তাদৃশ বিদ্যালয় থাকিলেও, তাঁহার ন্যায় নিরুপায় দীন বালকের তথায় অধ্যয়নের সুবিধা ঘটিত না। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের পরিচিত এক ব্যক্তি কার্য্যোপযোগী ইঙ্গরেজী জানিতেন। তাঁহার অনুরোধে, ঐ ব্যক্তি ঠাকুরদাসকে ইঙ্গরেজী পড়াইতে সম্মত হইলেন। তিনি বিষয়কর্ম্ম করিতেন; সুতরাং, দিবাভাগে, তাঁহার পড়াইবার অবকাশ ছিল না। এজন্য, তিনি ঠাকুরদাসকে, সন্ধ্যার সময় তাঁহার নিকটে যাইতে বলিয়া দিলেন। তদনুসারে, ঠাকুরদাস, প্রত্যহ সন্ধ্যার পর, তাঁহার নিকটে গিয়া ইঙ্গরেজী পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

"ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে, সন্ধ্যার পরেই, উপরি লোকের আহারের কাণ্ড শেষ হইয়া যাইত। ঠাকুরদাস, ইঙ্গরেজী পড়ার অনুরোধে, সে সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না; যখন আসিতেন, তখন আর আহার পাইবার সম্ভাবনা থাকিত না; সুতরাং, তাঁহাকে রাত্রিতে অনাহারে থাকিতে হইত। এইরূপে নক্তন্তন আহারে বঞ্চিত হইয়া, তিনি, দিন দিন, শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। এক দিন তাঁহার শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এমন শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতেছ, কেন। তিনি, কি কারণে তাঁহার সেরূপ অবস্থা ঘটিতেছে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহার পরিচয় দিলেন। ঐ সময়ে সেই স্থানে শিক্ষকের আত্মীয় শূদ্র জাতীয় এক দয়ালু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং ঠাকুরদাসকে বলিলেন, যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে আর তোমার ওরূপ স্থানে থাকা কোনও মতে চলিতেছে না। যদি তুমি রাঁধিয়া খাইতে পার, তাহা হইলে, আমি তোমায় আমার বাসায় রাখিতে পারি। এই সদয় প্রস্তাব শুনিয়া, ঠাকুরদাস, যার পর নাই, আহ্লাদিত হইলেন এবং পর দিন অবধি, তাঁহার বাসায় গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

"এই সদাশয় দয়ালু মহাশয়ের দয়া ও সৌজন্য যেরূপ ছিল, আয় সেরূপ ছিল না। তিনি, দালালি করিয়া, সামান্যরূপ উপার্জ্জন করিতেন। যাহা হউক, এই ব্যক্তির আশ্রয়ে আসিয়া,

ঠাকুরদাসের নির্ব্বিঘ্নে, দুই বেলা আহার ও ইঙ্গরেজী পড়া চলিতে লাগিল। কিছু দিন পরে, ঠাকুরদাসের দুর্ভাগ্যক্রমে তদীয় আশ্রয়দাতার আয় বিলক্ষণ খর্ব্ব হইয়া গেল; সুতরাং, তাঁহার নিজের ও তাঁহার আশ্রিত ঠাকুরদাসের অতিশয় কষ্ট উপস্থিত হইল। তিনি, প্রতিদিন, প্রাতঃকালে, বহির্গত হইতেন এবং কিছু হস্তগত হইলে, কোনও দিন দেড় প্রহরের, কোনও দিন দুই প্রহরের, কোনও দিন আড়াই প্রহরের সময়, বাসায় আসিতেন; যাহা আনিতেন, তাহা দ্বারা, কোনও দিন বা কষ্টে, কোনও দিন বা সচ্ছন্দে, নিজের ও ঠাকুরদাসের আহার সম্পন্ন হইত। কোনও কোনও দিন, তিনি দিবাভাগে বাসায় আসিতেন না। সেই সেই দিন, ঠাকুরদাসকে, সমস্ত দিন, উপবাসী থাকিতে হইত।

"ঠাকুরদাসের সামান্যরূপ এক খানি পিতলের থালা ও একটি ছোট ঘটী ছিল। থালাখানিতে ভাত ও ঘটীটিতে জল খাইতেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, এক পয়সার সালপাত কিনিয়া রাখিলে, ১০। ১২ দিন ভাত খাওয়া চলিবেক, সুতরাং থালা না থাকিলে, কাজ আট্‌কাইবেক না; অতএব, থালাখানি বেচিয়া ফেলি; বেচিয়া যাহা পাইব, তাহা আপনার হাতে রাখিব। যে দিন, দিনের বেলায় আহারের যোগাড় না হইবেক, এক পয়সার কিছু কিনিয়া খাইব। এই স্থির করিয়া, তিনি সেই থালাখানি, নূতন বাজারে, কাঁসারিদের দোকানে বেচিতে গেলেন। কাঁসারিরা বলিল, আমরা অজানিত লোকের নিকট

হইতে পুরাণ বাসন কিনিতে পারিব না। পুরাণ বাসন কিনিয়া কখনও কখনও, বড় ফেসাতে পড়িতে হয়। অতএব আমরা তোমার থালা লইব না। এইরূপে কোনও দোকানদারই সেই থালা কিনিতে সম্মত হইল না। ঠাকুরদাস, বড় আশা করিয়া, থালা বেচিতে গিয়াছিলেন; এক্ষণে, সে আশায় বিসর্জ্জন দিয়া, বিষণ্ণ মনে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

"এক দিন, মধ্যাহ্ন সময়ে, ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, ঠাকুরদাস বাসা হইতে বহির্গত হইলেন এবং অন্যমনস্ক হইয়া, ক্ষুধার যাতনা ভুলিবার অভিপ্রায়ে, পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিয়া, তিনি অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত ফল পাইলেন। ক্ষুধার যাতনা ভুলিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, বড়বাজার হইতে ঠনঠনিয়া পর্য্যন্ত গিয়া, এত ক্লান্ত ও ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় এত অভিভূত হইলেন যে, আর তাঁহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই, তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন; দেখিলেন, এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী ঐ দোকানে বসিয়া মুড়ি মুড়কি বেচিতেছেন। তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, দাঁড়াইয়া আছ কেন। ঠাকুরদাস, তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া, পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি, সাদর ও সস্নেহ-বাক্যে, ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে সুধু জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া, কিছু মুড়কি ও জল দিলেন। ঠাকুরদাস, যেরূপ ব্যগ্র হইয়া, মুড়কিগুলি



বিদ্যাসাগরের জননী।

খাইলেন, তাহা এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই। তিনি বলিলেন, না, মা আজ আমি, এখন পর্য্যন্ত, কিছুই খাই নাই। তখন, সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর জল খাইওনা, একটু অপেক্ষা কর। এই বলিয়া নিকটবর্ত্তী গোয়ালার দোকান হইতে, সত্বর দই কিনিয়া আনিলেন, এবং আরও মুড়কি দিয়া, ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন; পরে, তাঁহার মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, জিদ করিয়া বলিয়া দিলেন, যে দিন তোমার এরূপ ঘটিবেক, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে। *

* * *

"যে যে দিন, দিবাভাগে আহারের যোগাড় না হইত, ঠাকুরদাস সেই সেই দিন, ঐ দয়াময়ীর আশ্বাসবাক্য অনুসারে তাঁহার দোকানে গিয়া, পেট ভরিয়া, ফলার করিয়া আসিতেন।

* * *

"কিছু দিন পরে ঠাকুরদাস, আশ্রয়দাতার সহায়তায়, মাসিক দুই টাকা বেতনে, কোনও স্থানে নিযুক্ত হইলেন। এই কর্ম্ম পাইয়া, তাঁহার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। পূর্ব্ববৎ আশ্রয়দাতার আশ্রয়ে থাকিয়া, আহারের ক্লেশ সহ্য করিয়াও, বেতনের দুইটি টাকা, যথানিয়মে, জননীর নিকট পাঠাইতে

* পিতা ঠাকুরদাসের মুখে এই উপাখ্যান শুনিয়া স্ত্রীজাতির উপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। স্ত্রীজাতির প্রতি তিনি চিরকাল ভক্তিমান।

লাগিলেন। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ও যার পর নাই পরিশ্রমী ছিলেন, এবং কখনও কোন ওজর না করিয়া সকল কর্ম্মই সুন্দর-রূপে সম্পন্ন করিতেন; এজন্য, ঠাকুরদাস যখন যাঁহার নিকট কর্ম্ম করিতেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন।

"দুই তিন বৎসরের পরেই, ঠাকুরদাস মাসিক পাঁচ টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার জননীর ও ভাই ভগিনীগুলির অপেক্ষাকৃত অনেক অংশে কষ্ট দূর হইল। এই সময়ে, পিতামহদেবও দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ বনমালিপুরে গিয়াছিলেন; তথায় স্ত্রী, পুত্র কন্যা দেখিতে না পাইয়া, বীরসিংহে আসিয়া পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইলেন। সাত আট বৎসরের পর, তাঁহার সমাগম-লাভে, সকলেই আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন। শ্বশুরালয়ে, বা শ্বশুরালয়ের সন্নিকটে, বাস করা তিনি অবমাননা জ্ঞান করিতেন; এজন্য কিছু দিন পরেই, পরিবার লইয়া, বনমালিপুরে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্গা দেবীর মুখে ভ্রাতাদের আচরণের পরিচয় পাইয়া, সে উদ্যম হইতে বিরত হইলেন, এবং নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক বীরসিংহে অবস্থিতি বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন। এইরূপে, বীরসিংহগ্রাম আমাদের বাস হইয়াছিল।

"বীরসিংহে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া, তর্কভূষণ মহাশয়, জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাসকে দেখিবার জন্য, কলিকাতা

প্রস্থান করিলেন। ঠাকুরদাসের আশ্রয়দাতার মুখে, তদীয় কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতির প্রভূত পরিচয় পাইয়া, তিনি যথেষ্ট আশীর্ব্বাদ ও সবিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। বড়বাজারের দয়েহাটায়, উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ ভাগবতচরণ সিংহ নামে এক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এই ব্যক্তির সহিত তর্কভূষণ মহাশয়ের বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। সিংহ মহাশয় অতিশয় দয়াশীল ও সদাশয় মনুষ্য ছিলেন, তর্কভূষণ মহাশয়ের মুখে তদীয় দেশত্যাগ অবধি যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, প্রস্তাব করিলেন, আপনি অতঃপর ঠাকুরদাসকে আমার বাটীতে রাখুন, আমি তাহার আহার প্রভৃতির ভার লইতেছি; সে যখন স্বয়ং পাক করিয়া খাইতে পারে, তখন আর তাহার কোনও অংশে অসুবিধা ঘটিবেক না।

"এই প্রস্তাব শুনিয়া, তর্কভূষণ মহাশয়, সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন; এবং ঠাকুরদাসকে সিংহ মহাশয়ের আশ্রয়ে রাখিয়া, স্বগৃহে প্রতিগমন করিলেন। এই অবধি, ঠাকুরদাসের আহারক্লেশের অবসান হইল। যথাসময়ে আবশ্যকমত, দুই বেলা আহার পাইয়া, তিনি পুনর্জন্ম জ্ঞান করিলেন। এই শুভঘটনা দ্বারা, তাঁহার যে কেবল আহারের ক্লেশ দূর হইল, এরূপ নহে; সিংহ মহাশয়ের সহায়তায়, মাসিক আট টাকা বেতনে এক স্থানে নিযুক্ত হইলেন। ঠাকুরদাসের আট টাকা মাহিয়ানা হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া, তদীয় জননী দুর্গা দেবীর আহ্লাদের সীমা রহিল না।

"এই সময়ে ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম তেইশ চব্বিশ বৎসর হইয়াছিল।* অতঃপর তাঁহার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, তর্কভূষণ মহাশয় গোঘাট-নিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয় কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত, তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই ভগবতী দেবীর গর্ভে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ভগবতী দেবী, শৈশবকালে মাতুলালয়ে প্রতি-পালিত হইয়াছিলেন।"

রামকান্ত তর্কবাগীশ শব-সাধনায় সিদ্ধ হইতে গিয়া উন্মাদ-গ্রস্ত হইয়া যান। এই জন্য পাতুলগ্রাম-নিবাসী তদীয় শ্বশুর পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তাঁহাকে সস্ত্রীক নিজ ভবনে আনিয়া রাখেন। বহুবিধ চিকিৎসাতে তর্কবাগীশ মহাশয় আরোগ্য লাভ করেন নাই। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি উন্মাদগ্রস্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী ভগবতী দেবী সেই জন্য মাতুলালয়েই প্রতিপালিত হন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের দুই কন্যা। ভগবতী দেবী কনিষ্ঠা। ভগবতী দেবীর জননীর নাম গঙ্গা দেবী। ইনি পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের চারি পুত্র ও আর একটী কন্যা ছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তেজস্বিতা, স্বাধীনতা-প্রিয়তা, সত্য-

* শুনিয়াছি, এই সময়ে ঠাকুরদাসের কনিষ্ঠ কালিদাস কলিকাতায় আসিয়া ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কার্য্যক্ষম হইলে, তাঁহাকে নিজ কার্য্যে রাখিয়া ঠাকুরদাস প্রথমে রেশম ও তৎপরে বাসনের ব্যবসায় করেন। কনিষ্ঠ দ্বারা কার্য্য সুন্দররূপে না চলায়, তিনি আবার ইচ্ছাপূর্ব্বক সত্বর স্বকর্ম্মে নিযুক্ত হন।

বাদিতা ও সরলতা চির-প্রসিদ্ধ। তিনি এই সব গুণ পিতা ও পিতামহের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ অসীম তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তিনি কাহারও মুখাপেক্ষা করিতেন না এবং পর-শ্রী-কাতর ব্যক্তিবর্গের ভ্রূভঙ্গীতে ভীত হইতেন না। তিনি এইরূপ স্বাধীন-প্রকৃতি লোক ছিলেন বলিয়া, তাঁহার শ্যালক ও তৎপক্ষীয় লোক তাঁহার বিপক্ষ ছিলেন। তাঁহার মতে "দেশে মানুষ ছিল না, সবই গরু।" তিনি যেমন সৎসাহসী, তেমনই নিরহঙ্কার ও সত্যবাদী ছিলেন। ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের একটু শ্লেষার্থক রসিকতার পরিচয় লউন। এক দিন তিনি গ্রামের পথ দিয়া যাইতেছিলেন। এক জন বলিল,—"ও পথ দিয়া যাইবেন না; বড় বিষ্ঠা।" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—"বিষ্ঠা কৈ? সবই তো গোবর, এ দেশে মানুষ কৈ, সবই তো গরু।" কথিত আছে, তিনি যখন গৃহ ত্যাগ করিয়া তীর্থপর্য্যটন করেন, তখন এক দিন রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখেন,—"তোমার পরিবার তোমার জন্মস্থান বনমালিপুর পরিত্যাগ করিয়া বীরসিংহ গ্রামে বাস করিতেছে। তাহাদের এখন কষ্টের একশেষ।" ইহার পর তিনি বীরসিংহে প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় পরিবারবর্গের ভার গ্রহণ করেন।

বীরসিংহ গ্রামের ভূস্বামী তাঁহাকে তাঁহার বাস্তুভিটার ভূমিটুকু নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর করিয়া দিতে চাহেন এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজনও তাঁহাকে তদ্‌গ্রহণার্থ অনুরোধ করেন। তেজস্বী রামজয়ের বিশ্বাস ছিল যে, নিষ্কর ভূমিতে বাস করিলে

ভূস্বামী তাঁহার পুণ্যাংশ গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার অহঙ্কার বাড়িবে। এই জন্য তিনি নিষ্কর ভূমি লইতে সম্মত হন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বরচিত চরিতে পিতামহ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"তিনি কখন পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, সদাচারপূত ও নৈমিত্তিক কর্ম্মে সবিশেষ অবহিত ছিলেন।"

রামজয়ের বিপুল হৃদয়-বলের ন্যায় শারীরিক বল ছিল। মনের বল থাকিলে, দেহের বল যেন আপনি আসিয়া পড়ে। দেহ-মনের এমনই নিত্য নিকট সম্বন্ধ।* বিদ্যাসাগর মহাশয়ে ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি; পিতামহ রামজয়ের কথা শুনিয়াছি। রামজয় সর্ব্বদাই লৌহদণ্ড হস্তে নির্ভীক চিত্তে ভ্রমণ করিতেন। এক সময় তিনি বীরসিংহ হইতে মেদিনীপুর যাইতেছিলেন, পথের মধ্যে এক ভল্লুক তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি ভল্লুককে দেখিয়াই এক বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হন। ভল্লুকও তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করে। ভল্লুক যেমন দুইটী হস্ত প্রসারণ করিয়া ধরিতে যাইল, তিনি অমনই তাহার দুইটী হাত ধরিয়া বৃক্ষে ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন।

* এ সম্বন্ধে অবশ্য দার্শনিকদের ভিতর মতভেদ আছে। সে সব কথা লইয়া বিচার করিবার স্থান নয়।

তখনই ভল্লুক মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। রামজয় তাহাকে মৃতপ্রায় দেখিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। ভল্লুক কিন্তু তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে নখরাঘাত করে। রামজয় তখন অনন্যোপায় হইয়া হস্তস্থিত লৌহদণ্ড-আঘাতে তাহার প্রাণ নাশ করেন। তাঁহাকে প্রায় মাসাধিক নখরাঘাতের ক্ষতজনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নখরাঘাতের চিহ্ন ছিল।

ঠাকুরদাস কার্য্যক্ষম হইলেই রামজয় পুনরায় তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হন। বিদ্যাসাগরের জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তিনি আবার ফিরিয়া আসেন। *

রামজয় যখন বীরসিংহ গ্রামে প্রত্যাগমন করেন, তখন তাঁহার পুত্রবধূ ভগবতী দেবী গর্ভবতী; কিন্তু উন্মাদগ্রস্তা। ভগবতী দেবী, ঈশ্বরচন্দ্রকে গর্ভে ধারণ করিয়া অবধি উন্মাদগ্রস্তা হন। ১০ দশ মাস কাল এই উন্মাদ-অবস্থাই ছিল। বিচিত্র ব্যাপার! ১০ দশ মাস কাল নানা চিকিৎসায় কোন ফলোদয় হয় নাই; কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রসব করিবার পরই ভগবতী দেবী রোগমুক্তা হন। তিনি আর কখন এরূপ রোগে আক্রান্ত হন নাই। চিরকালই তিনি অটুট উৎসাহে দীন-হীন কাঙালকে অন্ন-বস্ত্র বিতরণ করিতেন; স্বয়ং রন্ধন এবং পরিবেশনাদি করিয়া দিবা-নিশি অতিথি-অভ্যাগত জনকে

* কথিত আছে,—রামজয় কেদার পাহাড়ে স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁহার বংশে এক সুপুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইবে। সেই সুপুত্র এই বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বরচিত চরিতে ইহার উল্লেখ নাই।

ভোজন করাইতেন। বিদ্যাসাগরের জননীর মত দয়াদাক্ষিণ্য-বতী রমণী প্রায় দেখা যায় না। এই অন্নপূর্ণা স্বর্ণগর্ভা জননীর পরিচয় পাঠক পরে পাইবেন। এই করুণাময়ীরই করুণা-কণা পাইয়া, অতুল মাতৃভক্তিবলে বিদ্যাসাগর মহাশয় জগতে করুণাময় নাম রাখিয়া গিয়াছেন। ইংরেজি-শিক্ষিত যুবক! যদি জর্জ হার্বর্টের সেই বাণীর সার্থকতা দেখিতে চাও, একমাত্র জননীই শত শিক্ষকের সমান; দেখিতে পাইবে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী-জীবনেও—

"One good mother is worth a hundred School mwsters."

আজকাল অনেক জ্যোতিষ-ব্যবসায়ীর প্রতি লোকে নানা কারণে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। পূর্ব্বে জ্যোতিষীদের গণনার ফল প্রায়ই মিথ্যা হইত না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, তদানীন্তন জ্যোতিষী ভবানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন,—"ভগবতী দেবীর গর্ভে দয়ার অবতার জন্মগ্রহণ করিবেন। ইনি জন্মগ্রহণ করিলেই ভগবতী দেবীর রোগ সারিয়া যাইবে।" হইলও তাহাই। ভবানন্দের অব্যর্থ বাণী প্রত্যক্ষীভূত হইল। এই জন্যই হউক বা অন্য কারণে হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি চিরকালই ভক্তিমান্ ছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জন্ম, কোষ্ঠী-বিচার, পাঠশালার শিক্ষা, পাঠশালায় প্রতিভা, বাল্য চাপল্য, বাল্য প্রতিভা, কলিকাতায় আগমন, পীড়িত অবস্থায় প্রতিগমন, পুনরাগমন ও শিক্ষার ব্যবস্থা।

১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন বা ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দিবা দ্বিপ্রহরের সময় ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার পিতা ঠাকুরদাস বাড়ীতে ছিলেন না; কুমারগঞ্জের হাটে গিয়াছিলেন। কুমারগঞ্জ বীরসিংহ গ্রামের অৰ্দ্ধ ক্রোশ অন্তরে। হাট হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময় তাঁহার সহিত পিতা রামজয়ের পথে সাক্ষাৎ হয়। রামজয় বলিলেন,—"ঠাকুরদাস! আজ আমাদের এঁড়ে বাছুর হয়েছে।" রামজয়, পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্রকেই লক্ষ্য করিয়া রহস্যচ্ছলে, এই কথা বলিয়াছিলেন। এই রহস্যের ভিতর কিন্তু সদ্যোজাত শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রকৃত পূর্ব্বাভাস নিহিত ছিল! এঁড়ে গরু যেমন "একগুঁয়ে," শিশুও তেমনই "একগুঁয়ে" হইবে, দীর্ঘদর্শী প্রবীণ রামজয় বোধ হয় শিশুর ললাট-লক্ষণ বা হস্ত-রেখাদি দর্শনে বুঝিয়াছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মও "বৃষ রাশিতে"। "বৃষ রাশিতে" জন্মগ্রহণ করিলে, বৃষবৎ "একগুঁয়ে" অথবা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হয়;—

সম্মার্গবৃত্তোঽতিতরাং প্রসন্নঃ সত্যপ্রতিজ্ঞোঽতিবিশালকীর্ত্তিঃ।
প্রসন্নগাত্রোঽতিবিশালনেত্রো বৃষে স্থিতে রাত্রিপতৌ প্রসূতঃ॥
—ভোজ।

ঈশ্বরচন্দ্রের "একগুঁয়েমি"র পরিচয় তাঁহার জীবনে পরিলক্ষিত হইত। "একগুঁয়ে" লোক দ্বারা ভাল কাজ যেমন অতি ভালরূপে হয়, মন্দ কাজ তেমনই অতি মন্দরূপে হইয়া থাকে। "একগুঁয়েমি"র ফল দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা। এই জন্য ষ্টীফেন জিরার্ড, "একগুঁয়ে" কেরাণীকেই নিজের অধীনস্থ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি যে কাজ ধরিতেন, সে কাজ না করিয়া ছাড়িতেন না। ভাল মন্দ উভয় কাজেই ইহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

ঠাকুরদাস পিতার কথার প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাদের বাড়ীতে একটী "এঁড়ে" বাছুর হইয়াছে। সেই সময় তাঁহাদের একটী গাভীও পূর্ণগর্ভা ছিল। পিতা-পুত্রে সত্বর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। ঠাকুরদাস গোয়ালে গিয়া দেখিলেন, বাছুর হয় নাই। তখন পিতা রামজয়, তাঁহাকে সূতিকা-ঘরে লইয়া গিয়া সদ্যোজাত শিশুটীকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই সেই এঁড়ে"; এবং "এঁড়ে" বলিবার প্রকৃত রহস্যটুকুও উদ্ঘাটন করিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় অনুজ শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন,—"তীর্থক্ষেত্র হইতে সমাগত পিতামহ রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় নাড়ীচ্ছেদনের পূর্ব্বে আলতায় ভূমিষ্ঠ

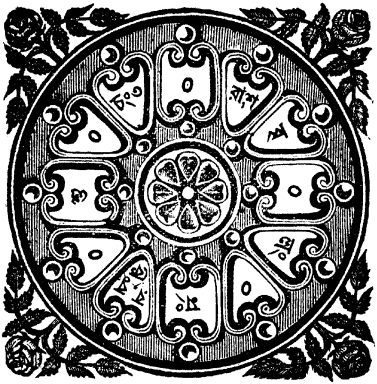
বালকের জিহ্বার নিম্নে কয়েকটী কথা লিখিয়া তাঁহার পত্নী দুর্গা দেবীকে বলেন, লেখার নিমিত্ত শিশুটী কিয়ৎক্ষণ মাতৃদুগ্ধ পান করিতে পায় নাই। বিশেষতঃ কোমল জিহ্বায় আমার কঠোর হস্ত দেওয়ায় এই বালক কিছুদিন তোতলা হইবে। আর এই বালক ক্ষণজন্মা, অদ্বিতীয় পুরুষ ও পরম দয়ালু হইবে এবং ইহার কীর্ত্তি দিগন্তব্যাপিনী হইবে।" বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন, তিনি এই সব কথা ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা, মাতামহী ও পিতামহীর মুখে শুনিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বরচিত চরিতে কিন্তু এ কথার উল্লেখ করেন নাই। অধিকন্তু আমাদের বন্ধু, "বিশ্বকোষ"-নামক বিবিধ-বিষয়ক পুস্তক-সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয় এ কথার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। উক্ত বন্ধুটী তাঁহার জীবনীর তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া "বিশ্বকোষে" মুদ্রিত করিবার জন্য তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন। তৎকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতা বিদ্যারত্ন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এ কথার উত্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন,—"ও সব কথা শুনিও না; ও সব অমূলক।" *

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মগ্রহণ করিবার কিয়ৎক্ষণ পরে গ্রহবিপ্র কেনারাম আচার্য্য তাঁহার ঠিকুজি প্রস্তুত করেন। আচার্য্য মহাশয় ঠিকুজি প্রস্তুত কালে, ফল বিচার করিয়া বিস্মিত

* আমাদের অপর কোন কোন আত্মীয়ের নিকটও ঐরূপ শুনিয়াছি। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ও ঐরূপ বলেন।

হন। তিনি বালকের ভবিষ্যৎ জীবন, শুভজনক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোষ্ঠীগণনায় এইরূপই নির্দ্ধারিত হয়। কোষ্ঠী গণনায় যে ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোষ্ঠী পর্য্যালোচনায় তাহা প্রতিপন্ন হয়। আমরা নিম্নে তৎপর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

শুভমস্তু—শকাব্দাঃ ১৭৪২। ৫। ১১। ১৫। ৪১ চৈত্র



৩	৩	১৫
২০	৪৩	৩৪
৫২	৭	৫২
৪৭	৩	১২

জাতাহঃ

১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন বেলা ১৫ দণ্ড ৪১ পল সময়ে ইঁহার জন্ম হয়। তৎকালে ধনুর্লগ্নের উদয় হইয়াছিল। ইঁহার জন্মলগ্নাবধি তৃতীয় স্থানে বৃহস্পতি, চতুর্থ স্থানে রাহু ও শনি, ষষ্ঠে চন্দ্র, অষ্টমে শুক্র, দশমে রবি, বুধ ও কেতু এবং একাদশ স্থানে মঙ্গল গ্রহ বিদ্যমান ছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মকালীন রবি, বুধ, শনি, রাহু ও কেতু এই পাঁচটী গ্রহ কেন্দ্রস্থানে ; বুধ স্বক্ষেত্রে এবং চন্দ্র ও বুধ গ্রহ তুঙ্গস্থানে ছিল। সামান্যরূপ বুধাদিত্য-যোগও ছিল।

একাদি গ্রহ স্বক্ষেত্রে থাকিলে কি ফল ?

কুলতুল্যঃ কুলশ্রেষ্ঠো বন্ধুমান্যো ধনী সুখী।
ক্রমান্নৃপসমো ভূপ একাদৌ স্বগৃহে স্থিতে॥

যাহার একটী গ্রহ স্বক্ষেত্রে থাকে, সেই ব্যক্তি কুলতুল্য হয়, দুইটী থাকিলে কুলশ্রেষ্ঠ, তিনটীতে বন্ধুমান্য, চারিটী হইলে ধনী, পাঁচটীতে সুখী, ছয়টীতে রাজতুল্য এবং সাতটী গ্রহই স্বক্ষেত্রে থাকিলে রাজা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটী গ্রহ স্বক্ষেত্রে ; এই জন্য তিনি কুলোচিত তেজস্বী ছিলেন। একাদিগ্রহ তুঙ্গগত হইলে কি ফল ?

উৎকৃষ্টাঃ স্ত্রীসুখিনঃ প্রকৃষ্টকার্য্যা রাজপ্রতিরূপকাশ্চ।
রাজান একদ্বিত্রিচতুর্ভির্জ্জায়ন্তেহতঃ পরং দিব্যাঃ॥

ইতি কূটস্থীয়ে। রঘুবংশ ৫সর্গ ১৩ শ্লোকে মল্লিনাথঃ।

যাঁহার একটী গ্রহ তুঙ্গী থাকে, তিনি উৎকৃষ্ট লোক, দুইটী থাকিলে স্ত্রীসুখী, তিনটী থাকিলে উৎকৃষ্ট কার্য্যকারী, চারিটী

থাকিলে রাজপ্রতিরূপ, পাঁচটী গ্রহ তুঙ্গী হইলে রাজা হয় এবং (নরাকারে অবতীর্ণ দেবতারই) ছয়টী গ্রহ তুঙ্গী হয়। সাতটী গ্রহ একেবারে তুঙ্গী হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দুইটী গ্রহ তুঙ্গী।

ধনবত্তাদিযোগঃ।

লগ্নাদতীব বসুমান্ বসুমান্ শশাঙ্কাৎ
সৌম্যগ্রহৈরুপচয়োপগতৈঃ সমস্তৈঃ।
দ্বাভ্যাং সমোহল্পবসুমাংশ্চ তদূনতায়া-
মন্যেষু সৎস্বপি ফলেষিদমুৎকটেন॥ দীপিকায়াম্।

জন্মকালে লগ্ন হইতে যদি সমস্ত শুভ গ্রহ উপচয়গত অর্থাৎ তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ স্থানগত হয়, তবে অত্যন্ত ধনবান্ হয়। ঐরূপ জন্মরাশি হইতেও যদি সমস্ত শুভ গ্রহ উপচয়গত হয়, তবে ধনবান্ হয়। দুইটী গ্রহ যদি লগ্নের বা রাশির উপচয়-গত হয়, তবে মধ্যমরূপ ধনবান্ হয় এবং তদপেক্ষা কম থাকিলে সামান্যরূপ ধনবান্ হয়। অন্যান্য ফল সকল অপেক্ষা ইহারই ফল অধিক হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোষ্ঠীতে লগ্ন হইতে বৃহস্পতি, চন্দ্র ও বুধ এবং জন্মরাশি হইতে শুক্র ও বুধ উপচয়গত।

বিনয়বিত্তাদীনামধমমধ্যমোত্তমাদিনিরূপণম্।

দীপিকায়াং ঐ ৬৫ শ্লোকঃ।

অধমসমবরিষ্ঠান্যর্ককেন্দ্রাদিসংস্থে
শশিনি বিনয়-বিত্ত-জ্ঞান-ধী-নৈপুণানি।

অহনি নিশি চ চন্দ্রে স্বাধিমিত্রাংশকে বা
সুরগুরু-সিতদৃষ্টে বিত্তবান্ স্যাৎ সুখী চ ॥

জন্মকালে চন্দ্র যদি রবির কেন্দ্র (স্বস্থান, চতুর্থ, সপ্তম, দশম) স্থানগত হয়, তবে বিনয়, ধন, জ্ঞান, বুদ্ধি ও নিপুণতা অধমরূপ হয়। চন্দ্র, রবির পণফর (দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম, একাদশ) স্থানে থাকিলে বিনয়াদি মধ্যম রূপ হয়। আর ঐ চন্দ্র যদি রবির আপোক্লিম (তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম, দ্বাদশ) স্থানগত হয়, তবে বিনয়াদি সমস্তই উত্তমরূপ হইয়া থাকে। অথবা চন্দ্র যদি স্বীয় অধিমিত্র গৃহে থাকিয়া বৃহস্পতি বা শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে ধনী ও সুখী হয়। এই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোষ্ঠীতে চন্দ্র রবির আপোক্লিম-গত; অতএব উহাঁর বিনয়াদি উৎকৃষ্টরূপ ছিল।

তুঙ্গগত চন্দ্রের ফল।

স্থিরগতিং সুমতিং কমনীয়তাং কুশলতাং হি নৃণামুপভোগতাম্।
বৃষগতো হিমগুর্শমাদিশেৎ সুকৃতিতঃ কৃতিতশ্চ সুখানি চ ॥

ঢুণ্ঢিরাজ।

জন্মকালে চন্দ্র, বৃষরাশিগত হইলে, জাত মানবের স্থির গতি, সদ্বুদ্ধি, সৌন্দর্য্য, নৈপুণ্য উপভোগ এবং স্বীয় পুণ্য ও কার্য্য হইতে সুখ হইয়া থাকে। ইহাঁর জন্মকালে বৃষ রাশিতে চন্দ্র ছিল।

তুঙ্গগত বুধের ফল। ঢুণ্ঢিরাজীয়-জাতকাভরণে—

রচনানুরক্তশ্চতুরো নরো লিখনকর্ম্মপরো হি বরোন্নতিঃ।
শশিসুতে যুবতৌ চ গতে সুখী সুনয়নানয়নাঞ্চলচেষ্টিতৈঃ ॥

জন্মকালে কন্যারাশিতে বুধ থাকিলে, জাত মানব সদ্‌বক্তা, চতুর, উত্তম লেখক, উন্নতিমান্‌ এবং সুন্দরী রমণীর নয়নাঞ্চল-চেষ্টাদি দ্বারা-সুখী হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মকালে কন্যারাশিতে বুধ আছে।

লগ্নাৎ কর্ম্মণি তুর্য্যে চ যদি স্যুঃ পাপখেটকাঃ।
স্বধর্ম্মে নিতরাং তস্য জায়তে চঞ্চলা মতিঃ॥

জাতকালঙ্কারটীকায়াম্‌।

জন্মলগ্নের চতুর্থ ও দশম স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে, মানবের স্বধর্ম্মে চঞ্চলা মতি হয়।

কামাতুরশ্চিত্তহরোঽঙ্গনানাং স্যাৎ সাধুমিত্রঃ সুতরাং পবিত্রঃ।
প্রসন্নমূর্ত্তিশ্চ নরো বৃষস্থে শীতদ্যুতৌ ভূমিসুতেন দৃষ্টে॥

ঢুণ্ঢিরাজ।

জন্মকালে বৃষরাশিস্থ চন্দ্রের উপর মঙ্গলের দৃষ্টি থাকিলে, জাত মনুষ্য কামাতুর, কামিনী-মনোরঞ্জন, সজ্জন-বন্ধু, অত্যন্ত পবিত্র এবং প্রসন্নমূর্ত্তি হয়।

ব্যয়েশে তদ্রিপুফগতে তত্র দৃষ্টে শুভৈগ্র হৈঃ।
দানবীরো ভবেন্নিত্যং সাধুকর্ম্মসু মানবঃ॥

শম্ভুহোরাপ্রকাশ।

যে ব্যক্তির জন্মকালে লগ্নের দ্বাদশ স্থানের অধিপতি গ্রহ, দ্বাদশের দ্বাদশগত হয়, আর ঐ দ্বাদশ স্থানে শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তবে সেই ব্যক্তি সৎকর্ম্মে দানবীর অর্থাৎ অত্যন্ত দাতা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লগ্নের দ্বাদশাধিপতি মঙ্গল

একাদশ স্থানে আছে এবং ঐ দ্বাদশ স্থানে বৃহস্পতি ও চন্দ্রের দৃষ্টি আছে। উত্তরকালে ইনি একজন প্রসিদ্ধ বদান্য হইয়াছিলেন।

(ইতি সংক্ষেপ)।

শুভগ্রহ সঙ্গে সঙ্গে। ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ব্বাভাস জন্ম-গ্রহণেই। ক্ষণজন্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় জন্মগ্রহণ করিলেন। পিতা ঠাকুরদাসের ভাগ্য-শ্রী সংবর্দ্ধিত হইল। ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটীরে একটু লক্ষ্মী-শ্রী দেখা দিল। পাড়ায় পাড়ায় রব উঠিল,—"বাঁড়ুয্যেদের বাড়ীতে পয়মন্ত ছেলে জন্মিয়াছে।" "পয়মন্তের" প্রতিপত্তি বিদ্যাসাগরের বাল্য কাল হইতে। বাল্য কাল হইতেই তিনি প্রতিবাসীর প্রীতিপাত্র।

পিতামহ রামজয়, জাত পৌত্রের নাম রাখিয়াছিলেন,—ঈশ্বর। পঞ্চম বৎসরে ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হয়। তখন বীরসিংহ গ্রামের অবস্থা তাদৃশ উন্নত ছিল না। গ্রাম্য-পাঠশালেই বালকদিগের বিদ্যারম্ভ হইত। পাঠশালার শিক্ষা সাঙ্গ হইলে, উহারই মধ্যে অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা টোলে সংস্কৃত শিক্ষার সূত্রপাত করিতেন। টোলেই বিদ্যার পর্য্যবসান। কেহ কেহ বা জমিদারী সেরেস্তাবিদ্যাও শিখিত।

সে সময় সনাতন সরকার গ্রামের গুরুমহাশয় ছিলেন। সরকার মহাশয় বড় প্রহারপটু ছিলেন বলিয়া, ঠাকুরদাস পুত্রের জন্য অন্য গুরুর অন্বেষণ করেন। কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামক এক কুলীন ব্রাহ্মণ তাঁহার মনোনীত হন। কালীকান্তের নিবাস

বীরসিংহ গ্রাম। তিনি কিন্তু ভদ্রেশ্বরের নিকট গোরুটী গ্রামে শ্বশুর-বাড়ীতে বাস করিতেন। কালীকান্ত স্বকৃত ভঙ্গ-কুলীন। কৌলীন্য-কল্যাণে তাঁহার অনেকগুলি বিবাহ হইয়াছিল। ঠাকুরদাস তাঁহাকে আনাইয়া নিজগ্রামে একটী পাঠশালা করিয়া দেন। বালক বিদ্যাসাগর ও গ্রামের অন্যান্য বালকেরা তাঁহার পাঠশালে পড়িত। তিনি যত্নসহকারে সকলকে শিক্ষা দিতেন। কালীকান্তের সৌজন্যে প্রতিবাসিমণ্ডলী তাঁহার প্রতি বড়ই অনুরক্ত ছিলেন।

পাঠশালেও প্রতিভার পরিচয়। বালক ঈশ্বরচন্দ্র তিন বৎসরে পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করেন। এই সময় তাঁহার হস্তাক্ষর বড় সুন্দর হইয়াছিল। তখন সর্ব্বত্র হস্তাক্ষর সমাদৃত হইত। হস্তাক্ষরই বিবাহের সর্ব্বোচ্চ সুপারিস্। গুরু কালীকান্ত, বালক বিদ্যাসাগরের বুদ্ধিমত্তা ও ধারণা দেখিয়া প্রায়ই বলিতেন,—"এ বালক ভবিষ্যতে বড় লোক হইবে।" এই সময় বালক বিদ্যাসাগর প্লীহা ও উদরাময় পীড়ায় আক্রান্ত হন। এই জন্য তাঁহাকে জননীর মাতুলালয় পাতুলগ্রামে যাইতে হয়। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধুও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। পাতুলগ্রামে ক্রমাগত ৬ ছয় মাস কাল চিকিৎসা হয়। খানাকুল-কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত কোঠরা-গ্রামবাসী * কবিরাজ রামলোচনের চিকিৎসাগুণে বালক বিদ্যাসাগর

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বরচিত জীবন-চরিতে "কোঠরা" স্থলে "কোটরী" মুদ্রিত হইয়াছে। "উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি" পত্রিকায় খানাকুল

সে যাত্রা রক্ষা পান। পাতুলগ্রামে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়া, তিনি বীরসিংহ গ্রামে পুনরাগমন করেন। পুনরায় কালীকান্তের উপর তাঁহার শিক্ষা-ভার সমর্পিত হয়। কালীকান্ত ঈশ্বরচন্দ্রকে বড়ই ভাল বাসিতেন। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে পাঠশালার চলিত অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন। রাত্রিকালে তাঁহাকে কোলে করিয়া লইয়া বাড়ীতে রাখিয়া আসিতেন। এই কালীকান্তের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরকালই ভক্তিমান্ ছিলেন।

বিদ্যাসাগর বালক-কালে বড় দুষ্ট ছিলেন। তাঁহার বালক-সুলভ অনেক "দুষ্টুমি"রই পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকেই তো বালক কালে দুষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু সকলের কথা তো আর স্মরণীয় হয় না; পরন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠায়ও স্থান পায় না। ভবিষ্যৎ জীবন যাঁহার উজ্জ্বলতম হয়, তাঁহার বাল্য জীবন জানিতে লোকের আগ্রহ হইয়া থাকে। তাঁহার বাল্য জীবনের "দুষ্টুমি" টুকু শুনিতে কেমন যেন মিষ্ট লাগে। ভগবান্ মানবা-বতারে লীলাচ্ছলে কৃষ্ণরূপে গোপ-গোপীদের ঘরে প্রবেশ করিয়া দুগ্ধদধির হাঁড়ি ভাঙিতেন; শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বাল্য কালে গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণদের নৈবেদ্য কাড়িয়া খাইতেন। এ সব কথা

...নগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি "পল্লীসমাজ"-নামক থানা-...কৃষ্ণনগরের ইতিহাসে প্রথমে ঐ ভ্রমের উল্লেখ করেন। কিন্তু তিনি ... ভ্রম শোধন করিতে, অন্য ভ্রমে নিপতিত হইয়াছিলেন। তিনি ...রাজ শ্রীধর সুধাকরের নাম লিখিয়াছিলেন।

কি শুনিলে রাগ হয়? কি যেন একটা অপূর্ব্ব ভাবেরই উদয় হয় না? সেক্সপিয়র বাল্য কালে দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে জুটিয়া হরিণ চুরি করিয়াছিলেন। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের জ্বালায় তাঁহার জননী জ্বালাতন হইতেন। কোথায় কিছু নাই, এক বার বালক ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ঘরের এক খানা সে-কেলে সাবেক ছবি দেখিয়া বড় ভাইকে বলিয়াছিলেন, "দাদা! ছবিখানিতে খা-কতক চাবুক লাগাইয়া দাও তো"। বড় ভাই শোনেন নাই। তখন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ আপনি সপাসপ্ চাবুক বসাইয়া দেন। এ কি কম "দুষ্টুমী!" বিলাতী পাদরী ডাক্তার পেলি বাল্য কালে বড় দুষ্ট ছিলেন। তখন তাঁহার জ্বালায় রাত্রি বেলায় পাড়ার লোক ঘুমাইতে পারিত না। এ সব কথা শুনিলে কি রাগ হয়? এমন অনেক প্রতিভাশালী প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তির বাল্য জীবনের বাল্য স্বভাবোচিত "দুষ্টুমি"র কথা শোনা যায়। সে সব শুনিতে তেমন হর্ষ না হউক; কেমন একটু বিস্ময় জন্মে। ছেলে দুষ্ট হইলে, অনেকেই অনেক সময় এই সব দৃষ্টান্তের স্মরণ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য বুক বাঁধিয়া থাকেন। এক সময় এক ব্যক্তি একটী পুত্রকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন,—"এ ছেলেটী ভবিষ্যতে বড় লোক হবে"। আগন্তুক বলিলেন, "মহাশয়! এ বড় দুষ্ট"। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"দেখ, ছেলে বেলায় আমিও অমনই দুষ্ট ছিলাম; পাড়ার লোকের বাগানের ফল পাড়িয়া চুপি চুপি খাইতাম; কেহ

কাপড় শুখাইতে দিয়াছে দেখিলে, তাহার উপর মল-মূত্র ত্যাগ করিয়া আসিতাম; লোকে আমার জালায় অস্থির হইত।”

বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ “বাল্য দুষ্টুমির” কথা নিজে স্বীকার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও “দুষ্টুমী”র দুই একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মথুর মণ্ডল নামে এক জন প্রতিবাসী ছিল। মথুর মণ্ডলের জননী ও স্ত্রী বালক বিদ্যাসাগরকে বড় ভালবাসিতেন। বালক বিদ্যাসাগর কিন্তু প্রায় প্রত্যহ পাঠশালায় যাইবার সময় মথুরের বাড়ীর দ্বারদেশে মলমূত্র ত্যাগ করিতেন। মথুরের-স্ত্রী ও মাতা দুই হস্তে তাহা মুক্ত করিতেন। বধূ কোন দিন বিরক্ত হইলে, শাশুড়ী বলিতেন, —“ইহাকে কিছু বলিও না। ইহার ঠাকুরদাদার মুখে শুনিয়াছি, এ ছেলে এক জন বড় লোক হইবে।” এক দিন বালক বিদ্যাসাগরের গলায় ধানের “সুঁড়া” আটকাইয়া গিয়াছিল। তাহাতে তিনি মৃতকল্প হন। পিতামহী অনেক কষ্টে সেই ‘সুঁড়া’ বাহির করিয়া দিলে, তিনি রক্ষা পান। দুষ্ট বালক প্রত্যহ ধান্য-ক্ষেত্রের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে ধানের শিষ তুলিয়া চিবাইয়া খাইত। এক দিন তাহারই উক্তরূপ ফল ফলিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেই বার্দ্ধক্যের শান্ত-দান্ত স্থির-ধীর মূর্ত্তি দেখিলে কেহ মনে করিতে পারিত না যে, বাল্যে তিনি এত দুষ্ট ছিলেন। বস্তুতই প্রায় দেখিতে পাই, অনেকেরই বাল্যের দুষ্ট-প্রকৃতি অধিক বয়সে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

পাঠশালের বিদ্যা সাঙ্গ হইলে, কালীকান্ত, ঠাকুরদাসকে

এক দিন বলেন, "ইহার পাঠশালার লেখা-পড়া সাঙ্গ হইয়াছে ; এ বালক বড় বুদ্ধিমান ; ইহাকে তুমি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া কলিকাতায় রাখ ; তথায় ভাল করিয়া ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা দাও।" কালীকান্তের কথা শুনিয়া ঠাকুরদাস বালক বিদ্যাসাগরকে কলিকাতায় আনাই স্থির করেন।

এই সময় পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের দেহত্যাগ হয়। তাঁহার মৃত্যু হইবার পর ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বা ১২৩৬ সালের কার্ত্তিক মাসের শেষ ভাগে ঠাকুরদাস, গুরুমহাশয় কালীকান্তের পরামর্শে ঈশ্বরচন্দ্রকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করেন। সঙ্গে কালীকান্ত ও আনন্দরাম গুটি নামক এক ভৃত্য ছিল। অষ্টম-বর্ষীয় বালক, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে যাইতেছে দেখিয়া, বালক বিদ্যাসাগরের স্নেহময়ী জননী মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর যেমন মাতৃভক্ত ছিলেন ; তাঁহার জননীও তেমনই পুত্রবৎসলা ছিলেন।

পিতা, পুত্র, গুরু মহাশয় এবং ভৃত্য,—চারি জনকেই পদব্রজে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। তখন জলপথ বড় সুগম ছিল না। উলুবেড়ের নূতন খালও তখন কাটা হয় নাই। গাঙের মাঝ দিয়া নৌকা করিয়া আসাটাও বড় বিপদ্-সঙ্কুল ছিল। একে তো ঝড় তুফানের ভয় ; তাহার উপর দস্যু-ডাকাতের উপদ্রব ; কাজেই গৃহস্থ লোক বড় কেহ নৌকা করিয়া আসিতেন না। ব্যবসাদার মহাজনেরাও নির্দ্দিষ্ট দিনে, জোট বাঁধিয়া যাতায়াত করিতমাত্র। এতদ্ভিন্ন অনেককেই হাঁটা পথে

আসিতে হইত। যাতায়াতের সময় অনেকেই মধ্যে মধ্যে চটি বা আত্মীয়বর্গের বাড়ীতে আশ্রয় লইত। ঠাকুরদাসও স-দল-বলে প্রথম দিন পাতুলগ্রামে মামা-শ্বশুরের বাটীতে বিশ্রাম করেন। পর দিন তিনি সন্ধ্যার সময় ১০ দশ ক্রোশ দূরস্থিত সন্ধিপুর গ্রামে এক জন আত্মীয় ব্রাহ্মণের বাটীতে থাকেন। পর দিন তাঁহারা শেঁয়াখালা হইতে শালিখার বাঁধা রাস্তা দিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র যে ধারকতাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রভাবে ভবিষ্যৎ জীবনে কীর্ত্তিকুশলতা লাভ করিয়াছিলেন, এই পথের মাঝে, সেই সুকুমার কোমল বয়সেই, তাহার নিদর্শন দেখাইয়াছিলেন। বিশাল বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্ভব এইখানে হইল।

এই পথের মাঝে "মাইল-ষ্টোন" অর্থাৎ পথের দূরত্ব-জ্ঞাপক শিলাখণ্ড দেখিয়া, বালক ঈশ্বরচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন,—"বাবা, বাটনা বাটিবার শিলের মতন এটা কি গা?" পিতা ঠাকুরদাস ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"ইহার নাম 'মাইল-ষ্টোন'—আধ-ক্রোশ অন্তর এইরূপ এক একটী 'মাইলষ্টোন' পোতা আছে। ইংরেজী অক্ষরে "মাইলের অঙ্ক লেখা।" ঈশ্বরচন্দ্র "মাইলষ্টোন" দেখিয়া ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত ইংরেজি অক্ষর শিখিয়া লইলেন। মধ্যে এক স্থানের "মাইল-ষ্টোন" দেখান হয় নাই। ঈশ্বরচন্দ্র বলেন,—"আমরা একটা 'মাইল-ষ্টোন' দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছি।" গুরুমহাশয় কালীকান্ত বলেন,—"ভুলি নাই, তুমি শিখিয়াছ কি না, জানিবার জন্য তোমাকে দেখাই নাই।"

ক্রমে সন্ধ্যার সময় তাঁহারা শালিখার ঘাটে গঙ্গা পার

হইয়া বড়বাজারের দয়েহাটায় শ্রীযুক্ত জগদ্‌দুর্ল্লভ সিংহের বাটীতে উপস্থিত হন। এই জগদ্‌দুর্ল্লভ সিংহের পিতা ভাগবতচরণ সিংহ, ঠাকুরদাসকে বাড়ীতে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয়। জগদ্‌দুর্ল্লভ বাবু পিতার ন্যায় ঠাকুরদাসকে ভক্তি-শ্রদ্ধা, এমন কি, তাঁহাকে পিতৃ-সম্বোধনও করিতেন। জগদ্‌দুর্ল্লভ একমাত্র বাড়ীর কর্ত্তা। বয়স তাঁহার তখন ২৫ পঁচিশ বৎসর মাত্র। গৃহিণী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তাঁহার স্বামী ও দুই পুত্র, এক বিধবা কনিষ্ঠা ভগিনী ও তাঁহার এক পুত্র;—এইমাত্র তাঁহার পরিবার।

বালক ঈশ্বরচন্দ্র এই পরিবারের বড় প্রীতিপাত্র হইয়াছিলেন। পর দিন প্রাতঃকাল হইতেই এই প্রীতির সূত্রপাত হইয়াছিল। বালক নিজের অদ্ভুত ধারকতা-শক্তি-বলে সিংহ-পরিবারের সকলকেই স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। যে দিন সন্ধ্যার সময় বালক ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন, তাহার পর দিন পিতা ঠাকুরদাস, জগদ্‌দুর্ল্লভ বাবুর কয়েকখানি ইংরেজী বিল ঠিক দিতেছিলেন। সেই সময় বালক ঈশ্বরচন্দ্র বলেন,—"বাবা আমি ঠিক দিতে পারি।" কেবল বলা নহে; সত্য সত্যই বালক কয়েক খানি বিল ঠিক দিয়া দিয়াছিলেন। একটীও ভুল হয় নাই। উপস্থিত ব্যক্তিগণ চমৎকৃত হইলেন। গুরু কালীকান্ত পুলকিত চিত্তে ও প্রফুল্ল বদনে ঈশ্বরচন্দ্রের মুখচুম্বন করিয়া বলিয়া উঠেন,—"বাবা ঈশ্বর!

তুমি চিরজীবী হও। তোমায় যে আমি অন্তরের সহিত ভাল বাসিতাম, আজ তাহা সার্থক হইল।"

মানব-জীবনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহা বড় বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া মনে হয় না। অসীম প্রতিভাসম্পন্ন বা অপরিমেয় বিদ্যাবুদ্ধিশালী বহুসংখ্যক ব্যক্তির বাল্য কালে ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ব্বাভাসের পরিচয় এইরূপ পাওয়া যায়। ভবিষ্যৎ জীবনে যাঁহার যে শক্তিপুষ্টির প্রতিপত্তি, বাল্য জীবনে তাঁহার সেই শক্তির অঙ্কুরোৎপত্তি। এই জন্য মিল্‌টন্‌ বলিয়াছেন,—

"The childhood shows the man as morning shows the day;"

প্রাতঃকাল-দৃষ্টে যেমন দিবার বিষয় বুঝা যায়, মানবের বাল্য দৃষ্টে তাহার উত্তর কাল তেমনই বোধগম্য হয়। ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থও বলিয়াছেন;—

"Child is the father of man."

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যখন সাত-আট বৎসরের সময় কলিকাতায় আসেন, তখন এক জন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"ঈশ্বর, কলিকাতায় কেমন আছ?" ভবিষ্যতের কবি উত্তর দিলেন,—

"রেতে মশা, দিনে মাছি।
এই নিয়ে কল্‌কাতায় আছি।"

বঙ্কিমচন্দ্র এক দিনে "ক, খ," শিখিয়াছিলেন।

জন্‌সনের অন্যান্য গুণের মধ্যে ধারকতা শক্তির প্রতিষ্ঠা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। যে সময়ে বালক জন্‌সন্‌ সবেমাত্র লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই সময় এক দিন তাঁহার মাতা, তাঁহাকে একখানি প্রার্থনা-পুস্তক মুখস্থ করিতে দেন। মুখস্থ করিতে বলিয়া মাতা উপরে উঠিয়া যান। পুত্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া বলেন,—"মা মুখস্থ করিয়াছি।" সত্য সত্যই বালক অনায়াসে সমস্ত মুখস্থ বলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি দুই বার মাত্র পুস্তকখানি পড়িয়াছিলেন।

পোপ ১২ বার বৎসর বয়সে কবিতা লিখিয়াছিলেন।* বাল্য-কালে তিনি কবিতা লিখিতেন; তাঁহার পিতার কিন্তু তাহা অভিপ্রেত ছিল না। এই জন্য পিতা তাঁহাকে কবিতা লিখিতে নিষেধ করেন। পোপ কিন্তু তাহা শুনিতেন না। এক দিন তাঁহার পিতা এই জন্য তাঁহাকে প্রহার করেন। প্রহারের পরও বালক এক কবিতায় বলিয়া ফেলিল ;—

"Papa papa pity take,
I will no more verses make."

মিল্‌টন্‌ বাল্যকালে যে পদ্য লিখিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া তাৎকালিক প্রসিদ্ধ লেখকবর্গ বিস্মিত ও লজ্জিত হইয়াছিলেন।

বিখ্যাত বিলাতী কারিকর (Mechanic) স্মিটন্‌ ৬ ছয় বৎসরের বয়সে কলের ছাঁচ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

---

* Ode on solitude.

এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। এ সব অমানুষিকী শক্তিরই পরিচয়। ইহা লইয়া ভাবিতে ভাবিতে কত মহা মহা চিন্তাশীল শক্তিশালী দার্শনিকের জীবনপাত হইয়াছে। বুদ্ধি-বৃত্তির ক্রমোন্নতি বা ক্রমবিকাশ-তত্ত্ব লইয়া, কত দার্শনিক ইহ-জগতের সুখৈশ্বর্য্য ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিয়া, চিন্তার অনন্ত সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছেন। আমরা ক্ষুদ্র জীব, তাহার কি মীমাংসা করিব? তবে যখনই দেখি, তখনই বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকি; এবং ভাবিয়া অকূল সমুদ্রে নিমগ্ন হই। সে বিচার-বিতর্কের শক্তি নাই; এবং তাহার প্রবৃত্তিও নাই। সবই প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল বলিয়া বুঝি; এবং তাহা বুঝিয়াই নিশ্চিন্ত হই।

বালক বিদ্যাসাগরের বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচয় পাইয়া উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। সকলেরই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, ঈশ্বরচন্দ্রকে কোন একটা ভাল স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। পুত্রের প্রশংসাবাদে পিতা ঠাকুরদাস পুলকিত হইয়া বলেন, "আমি ঈশ্বরচন্দ্রকে হিন্দু স্কুলে পড়াইব।" উপস্থিত সকলেই বলিলেন,—"আপনি ১০৲ টাকা মাত্র বেতন পান, আপনি ৫৲ টাকা বেতন দিয়া কিরূপে হিন্দু স্কুলে পড়াইবেন?" ঠাকুরদাস বলিলেন,—"৫৲ টাকায় যেরূপে হউক, সংসার চালাইব।" ঠাকুরদাসের হৃদয় তখন উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রজ্বলিত অনল-শিখায় উদ্দীপিত। বালকের প্রতিভা-কথা স্মরণ করিয়া, ব্রাহ্মণ আপনার দারিদ্র্য-দুঃখ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পূর্ণানন্দে

পূর্ণ ভাবে নিমগ্ন। ঠাকুরদাস, পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে হিন্দু স্কুলে পড়াইবেন বলিয়াই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তিন মাস কাল তাহা আর ঘটিয়া উঠে নাই। এই তিন মাস কাল ঈশ্বরচন্দ্র, নিকটবর্ত্তী একটী পাঠশালায় যাইতেন। এই পাঠশালার গুরুমহাশয়-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বরচিত চরিতে লিখিয়াছেন,—"পাঠশালার শিক্ষক স্বরূপচন্দ্র দাস, বীরসিংহের শিক্ষক কালীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় অপেক্ষা, শিক্ষাদান বিষয়ে, বোধ হয়, অধিকতর নিপুণ ছিলেন।" দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজ কাল বাঙ্গালা শিক্ষার এরূপ সুনিপুণ গুরুমহাশয় দুর্লভ। এ দুর্লভতার হেতু লোকের প্রকৃতি-প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন। এখন পাঠশালাও আছে, গুরুমহাশয়ও আছে; নাই সেই তলস্পর্শিনী জাতীয় শিক্ষা; আর নাই সেই জাতীয় ভাবাপন্ন সুদক্ষ শিক্ষক; এখনকার পাঠশালা ইংরেজিরই রূপান্তর; গুরু অন্যরূপ হইবে কিসে?

"কর্ত্তব্যোমহদাশ্রয়ঃ," মহাজনের এই মহাবাণী অবশ্য-পালনীয়। এ বাণীর সাক্ষাৎফল প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল, ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্য জীবনে। জগদ্দুর্লভ সিংহ কেবল যে পিতা-পুত্রকে আশ্রয়-মাত্র দিয়াছিলেন, তাহা নহে; তাঁহার পরিবার-বর্গ ও তিনি স্বয়ং তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন। জগদ্দুর্লভ বাবুর কনিষ্ঠ ভগিনী রাইমণি, বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে পুত্রাপেক্ষাও ভাল বাসিতেন। এই রমণী-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং বলিয়াছেন,—"স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা,

সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্য্যন্ত আমার নয়ন-গোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্য মূর্ত্তি, আমার হৃদয়-মন্দিরে, দেবীমূর্ত্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, তদীয় অকৃত্রিম গুণের কীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না।”

বাস্তবিকই রাইমণির সেই অকৃত্রিম যত্ন-স্নেহ ব্যতিরেকে বিদ্যাসাগরের কলিকাতায় থাকা দায় হইত। তিনি স্নেহময়ী মাতা ও পিতামহীর কথা ভাবিয়া প্রথম প্রথম বড় ব্যাকুল হইতেন। পিতা সর্ব্বক্ষণ তাঁহার নিকট থাকিতে পারিতেন না। তিনি প্রাতে এক প্রহরের সময় কর্ম্মস্থানে যাইতেন এবং রাত্রি এক প্রহরের সময় বাসায় ফিরিয়া আসিতেন। এই সময় রাইমণি এবং জগদ্দুর্লভ বাবুর অন্যান্য পরিবার নানা মিষ্ট কথায় তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিতেন; এবং নানাবিধ আহারীয় ও অন্যান্য মন-ভুলান জিনিষপত্র দিয়া, অনেকটা সান্ত্বনা করিতেন। এইরূপ অনেক দীনহীন বালকই মহদাশ্রয়ে থাকিয়া, প্রতিপালিত হইয়া, পরিণামে কীর্ত্তিমান্ হইয়া গিয়াছেন। কলিকাতার কোটিপতি রামদুলাল সরকার বাল্য কালে যদি হাটখোলার সেই সদাশয় দত্ত-পরিবারে প্রতি-পালিত না হইতেন, তাহা হইলে কে বলিতে পারে, তিনি ভবিষ্যৎ-জীবনে অতুল ধনের অধিকারী হইয়া, অক্ষয় কীর্ত্তি-সঞ্চয়ে সমর্থ হইতেন? রামদুলালের বাল্য-দরিদ্রতা এবং দত্ত-পরিবারের

তৎপ্রতি সদাশয়তার কথা স্মরণ হইলে, বাস্তবিকই মনে এক অচিন্তনীয় ভাবের উদয় হয়। বিলাতের বিখ্যাত গ্রন্থকার জনাথন্ সুইফট্ যদি বাল্য কালে স্যর্ উইলিয়ম্ হামিণ্টনের আশ্রয় না লইতেন এবং জার্ম্মাণ পণ্ডিত হিম্ ধর্ম্মপিতার সাহায্য না পাইতেন, তাহা হইলে এ জগতে তাঁহারা ফুটিতেন কি না সন্দেহ।

বালক বিদ্যাসাগর অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; কিন্তু ফাল্গুন মাসের প্রারম্ভে রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হন। ক্রমে পীড়া এত দূর উৎকট হইয়া পড়ে যে, মল-মূত্রত্যাগে তিনি সর্ব্বদা সাবধান হইতে পারিতেন না। তাঁহার পিতাকেই অনেক সময় স্বহস্তে মলমূত্র পরিষ্কার করিতে হইত। ঐ পল্লীর দুর্গাদাস কবিরাজ, তাঁহার চিকিৎসা করেন; কিন্তু রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। বীরসিংহ গ্রামে সংবাদ যায়। পিতামহী সংবাদ পাইয়াই কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি কলিকাতায় দুই তিন দিন থাকিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে বাড়ী লইয়া যান। তথায় সাত আট দিনের মধ্যে বিনা চিকিৎসায় তিনি সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র বাড়ীতেই ছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে পিতা ঠাকুরদাস তাঁহাকে পুনরায় কলিকাতায় আনয়নার্থ বীরসিংহ গ্রামে গমন করেন। এবারও পদব্রজে আসা স্থির হয়। পূর্ব্ব বারে সঙ্গে ভৃত্য ছিল। ভৃত্য, মধ্যে মধ্যে বালককে কাঁধে করিয়া আনিয়াছিল। এবার পিতা জিজ্ঞাসি-

লেন,—"কেমন ঈশ্বর! তুমি চলিয়া যাইতে পারিবে, না আনন্দরামকে সঙ্গে করিয়া লইব?" বালক বাহাদুরী করিয়া বলিল,—"না, আমি চলিয়া যাইতে পারিব।" বিদ্যাসাগরের বাহাদুরীর পরিচয় বাল্য কাল হইতে।

এবার পিতাপুত্রে চলিয়া আসিয়া প্রথম দিন পাতুলগ্রামে আশ্রয় লেন। পাতুলগ্রাম বীরসিংহ হইতে ৬ ছয় ক্রোশ দূর। ঈশ্বরচন্দ্রের এদিন চলিতে কষ্ট হয় নাই। তারকেশ্বরের নিকট রামনগর গ্রামে ঠাকুরদাসের কনিষ্ঠা ভগিনী অন্নপূর্ণাকে দেখিতে যাইবার প্রয়োজন হয়। কন্যা পীড়িত হইয়াছিলেন। রামনগর পাতুলগ্রাম হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী। পিতাপুত্রে দুই জনে প্রাতঃকালেই রামনগর অভিমুখে যাত্রা করেন। তিন ক্রোশ পথ গিয়া ঈশ্বর আর চলিতে পারেন নাই। পা টাটাইয়া ফুলিয়া যায়। পিতা বড়ই বিপদ্গ্রস্ত হন। তখন বেলা দুই প্রহরের অধিক। ঈশ্বরচন্দ্র তখন এক রকম চলচ্ছক্তি-হীন। পিতা বলিলেন—"বাবা! একটু চল, আগে মাঠে ফুটি-তরমুজ খাওয়াইব।" ঈশ্বরচন্দ্র অতি কষ্টে প্রাণপণে হাঁটিয়া, অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেই মাঠের কাছে গিয়া ফুটি-তরমুজ খাইলেন। পেট ঠাণ্ডা হইয়াছিল বটে; পা কিন্তু আর উঠে নাই। পিতা রাগ করিয়া পুত্রকে ফেলিয়া কিয়দ্দূর চলিয়া যান; কিন্তু আবার ফিরিয়া আসিয়া, রোরুদ্যমান পুত্রকে কাঁধে করিয়া লন। দুর্ব্বল-দেহ পিতা, অষ্টম বর্ষের বলবান্ বালককে কত দূর কাঁধে করিয়া লইয়া যাইবেন? খানিক

দূর গিয়া, আবার তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে কাঁধ হইতে নামাইয়া দেন; বিরক্ত হইয়া দুই একটা চপেটাঘাতও করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন ভিন্ন আর কি উপায় ছিল? এখন একেবারে চলচ্ছক্তি-হীন। পিতা আবার পুত্রকে কাঁধে করিয়া লন; এরূপ একবার কাঁধে করিয়া, একবার নামাইয়া, একটু একটু বিশ্রামান্তর চলিয়াছিলেন। এইরূপ অবস্থায় তাঁহারা সন্ধ্যার পূর্ব্বে রামনগরে উপস্থিত হন। পর দিন তাঁহারা শ্রীরামপুরে থাকিয়া, তৎপর দিবস কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই বার আবার বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিবার কথা। পিতা ঠাকুরদাস, ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত শিখাইতে মনঃস্থ করেন। তাঁহার ইচ্ছা, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শিখিলে, দেশে তিনি টোল করিয়া দিবেন। এই সময়ে মধুসূদন বাচস্পতি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতৃ-মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণের পিতৃব্য-পুত্র। মধুসূদন বাচস্পতি, ঠাকুরদাসকে পরামর্শ দেন;—"আপনি ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজে পড়িতে দেন, তাহা হইলে আপনকার অভিপ্রেত সংস্কৃত শিক্ষা সম্পন্ন হইবেক; আর যদি চাকরী করা অভিপ্রেত হয়, তাহারও বিলক্ষণ সুবিধা আছে; সংস্কৃত কলেজে পড়িয়া যাহারা 'ল' কমিটীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহারা আদালতে জজ-পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব আমার বিবেচনায় ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজেই পড়িতে দেওয়া উচিত। চতুষ্পাঠী অপেক্ষা কলেজে রীতিমত সংস্কৃত শিক্ষা হইয়া থাকে।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আত্ম-জীবনীতে ঐ সকল কথা আছে। অধিকন্তু তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—"বাচস্পতি মহাশয় এই বিষয় বিলক্ষণরূপে পিতৃদেবের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। অনেক বিবেচনার পর বাচস্পতি মহাশয়ের ব্যবস্থাই অবলম্বনীয় স্থির হইল।"

এই সময় ঠাকুরদাস সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণাধ্যাপক পণ্ডিত গঙ্গাধর তর্কবাগীশের সহিতও এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়াছিলেন। শেষে সংস্কৃত কলেজে দেওয়াই স্থির হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি, সংস্কৃত কলেজের উদ্দেশ্য ও প্রতিষ্ঠা, তাৎকালিক শিক্ষার অবস্থা, ভবিষ্যদ্ আভাস, ব্যাকরণ-শিক্ষা, কলেজের অধ্যাপক, বেতন-ব্যবস্থার ফল, পিতার শাসন, ব্যাকরণে প্রতিপত্তি ও পুরস্কার, একগুঁয়েমি, অধ্যয়ন ও অধ্যবসায়, কাব্যের শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য-কঠোরতা এবং ব্যাকরণ ও কাব্য শিক্ষার ফল।

১২৩৬ সালে ২০শে জ্যৈষ্ঠ বা ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ১লা জুন সোমবার ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, তখন সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত শিক্ষারই প্রচলন ছিল। ইংরেজি শিক্ষার অতি সামান্যমাত্রই স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। তখনকার সংস্কৃতাধ্যায়ী ছাত্রগণ ইংরেজি পড়িতে বাধ্য ছিলেন না। কেহ ইচ্ছা করিলে, ইংরেজি পড়িতেন মাত্র।

সংস্কৃত কলেজে প্রথমে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা করিলে, আদৌ মনে হয় না, সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শিক্ষা চালাইবার, কর্ত্তৃপক্ষের কোনরূপ সঙ্কল্প ছিল। তখন কেবল দ্বিজসন্তানেরই সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধি-

কার ছিল। তাঁহারা ঘরের মেজে বিছানার উপর বসিয়া, টোলের ধরণে অধ্যয়ন করিতেন; আর অধ্যাপকগণ স্বতন্ত্র আসনে বসিয়া তাকিয়া ঠেসান দিয়া অধ্যাপনা করিতেন।

কর্তৃপক্ষের অন্তরের উদ্দেশ্য হউক বা না হউক, আমাদিগের দুরদৃষ্টে সে শিক্ষাপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। সেই পরিবর্তনের সূত্রপাত বিদ্যাসাগরের পাঠ্যাবস্থায়; পরিপুষ্টি তার কার্য্যাবস্থায়।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজের প্রতিষ্ঠা-প্রস্তাবে, রাজা রামমোহন রায়-প্রমুখ বঙ্গের তাৎকালিক অনেক শক্তিশালী ব্যক্তি, আপত্তি তুলিয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা-কল্পে প্রকৃতপক্ষে মনস্তাপ পাইয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে যে শিক্ষা-কমিশনের অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার রিপোর্টেই রামমোহন রায়ের সে মনস্তাপের পরিচয় পাওয়া যায়। রিপোর্টে এইরূপ লেখা আছে;—

"Ram Mohan Roy, the ablest representative of the more advanced members of the Hindu community, expressed deep disappointment on the part of himself and his countrymen at the resolution of Government to establish a new Sanskrit College instead of a seminary designed to impart instruction in the Arts, Sciences and Philosophy of Europe."

রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন, টোলে যেরূপ সংস্কৃত শিক্ষা হইতেছে, তাহাই হউক; বরং তাহার উৎকর্ষসাধনের ব্যবস্থা হউক; কিন্তু সংস্কৃত শিখাইবার জন্য স্বতন্ত্র কলেজের প্রয়োজন নাই। যাহাতে পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির শিক্ষাপ্রসারের জন্য স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তদর্থে কর্তৃপক্ষের যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। টোলের শিক্ষা অব্যাহত রাখিবার পরামর্শ দেওয়া সাধু কল্পনা সন্দেহ নাই; তবে পাশ্চাত্য-শিক্ষাপ্রসারের পরামর্শ দিয়া তিনি হিন্দু-সমাজদ্রোহিতারই পরিচয় দিয়াছিলেন। তাৎকালিক ইংরেজি শিক্ষার ফলাফল আলোচনা করিলে, আমাদের এ কথার সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

হিন্দু কলেজের প্রসাদে তখন কলিকাতা সহরে উচ্ছৃঙ্খল ইংরেজি শিক্ষার আবর্ত্তে পড়িয়া অনেক হিন্দু-সন্তান বিপথগামী ও সমাজদ্রোহী হইয়া পড়িয়াছিলেন। আকস্মিক ইংরেজি শিক্ষার প্রবাহ, হিন্দু সমাজকে তখন অনেকটা উদ্বেলিত করিয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা-প্রতিবাদীরা তাহাতেও তৃপ্ত হন নাই। সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার ৭ সাত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, তখন হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্র, বিজাতীয় বিদেশীয় শিক্ষকের বিজাতীয় শিক্ষাভাব-প্রণোদনে এবং বিজাতীয় ইংরেজী শিক্ষার বিষময় ফলে, বিজাতীয় ভাবাপন্ন হইয়া, হিন্দু সমাজে একটা বিষম বিপ্লব



পণ্ডিত তারানাথ বাচস্পতি।

ঘটাইবার উপক্রম করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বে যাঁহারা কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের অনেকেরই অসদাদর্শে হিন্দু কলেজের তাৎকালিক অনেক ছাত্রেরই মতিগতি বিকৃত হইয়াছিল।

হিন্দু কলেজে পড়িয়া, অনেক হিন্দু-সন্তান পাশ্চাত্য সাহিত্য-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় তাঁহাদের অনেকের কিরূপ মতিগতি ঘটিয়াছিল, তাৎকালিক অধ্যাপক হোরেশ হেমান্ উইলসন্ সাহেবের রিপোর্টেও তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহারই কথা এখানে উদ্ধৃত করিলাম;—

"An impatience of the restrictions of Hinduism and a disregard of its ceremonies are openly avowed by many young men of respectable birth and talents."

Report of the Indian Education Commission, p. 257.

উহার তো ইহাই ভাবার্থ,—অনেক ভদ্র বংশজাত এবং বুদ্ধিমান্ হিন্দু-সন্তান প্রকাশ্য ভাবে স্বধর্ম্মে আস্থাশূন্য হইয়াছিলেন। অতঃপর পাঠকের বোধ হয়, আর কোন সন্দেহ রহিল না।

তাৎকালিক অনেক ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দু-সন্তান ইংরেজির গুণানুকরণে অক্ষম হইয়া দোষাবলীরই সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়া বসিয়াছিলেন। ইংরেজ রাজা; ইংরেজ জগতে প্রভুত শক্তি-

শালী; ইংরেজ সমুন্নত সভ্য জাতি বলিয়া সমগ্র পৃথিবীতে পরিগণিত। সভ্য ইংরেজ যাহা যাহা করিয়া থাকেন, তদানীন্তন ইংরেজি-শিক্ষিত অনেক কৃতী ব্যক্তি, তাহাই সভ্যতানুমোদিত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

প্রকৃত গুণের অনুকরণ বড় সোজা কথা নহে তো। গুণানুকরণ তাঁহাদের সাধ্যাতীত হইয়াছিল। যাহা সহজ-সাধ্য এবং অকষ্ট-কল্প, তাহাই তাঁহাদের অনুকরণীয় হইল। ইংরেজ গরু খান, ইংরেজ মদ খান, ইংরেজ কোট-প্যান্টলন পরেন, ইংরেজ ঘাড়ের চুল ছাঁটিয়া মস্তকের সম্মুখ ভাগে লম্বা লম্বা চুল রাখেন। এই সব অনায়াস-সাধ্য, কার্য্যগুলিকে সভ্যতার অঙ্গ ভাবিয়া, ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দু-সন্তানেরা তদনু-করণে পূর্ণ মাত্রায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এমন কি, তখন হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্র, কলেজের সম্মুখে, গোলদীঘির অনাবৃত প্রাঙ্গণে বসিয়া মদ খাইতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। অনেকে গরু খাইয়া, ভুক্তাবশেষ অস্থি-মাংস, প্রতিবাসী গৃহস্থের বাড়ীতে নিক্ষেপ করিয়া পরম আনন্দানুভব করিতেন। তাঁহারা ভাবি-তেন, এরূপ না করিলে, তাঁহাদের বর্ব্বরতার কলঙ্ক অপনীত হইবে না।

ইংরেজি শিক্ষার এতাদৃশ বিষময় ফল-সন্দর্শনে সমগ্র হিন্দু সমাজ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এক হিন্দু কলেজেই রক্ষা ছিল না; তাহার উপর সংস্কৃত কলেজটী ইংরেজি কলেজ হইলে, বোধ হয়, ঘরে ঘরে নরক-দৃশ্য দেখিতে হইত। সে সময় সংস্কৃত

কলেজ, ইংরেজি কলেজের অনুকরণে গঠিত হইলেও, সংস্কৃত শিক্ষার প্রচলন থাকায়, উহা হিন্দু-সন্তান ব্রাহ্মণগণের তবুও কতক আশ্রয়-স্থল হইয়াছিল।

তদানীন্তন ইংরেজি শিক্ষার কুফল-সন্দর্শনেই ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা, বোধ হয়, ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজে প্রেরণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজি পড়িয়া, তদানীন্তন ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তি-বর্গের ন্যায় বিকৃত হইয়া না পড়েন, ইহাও ঠাকুরদাসের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপ সিদ্ধ হয় নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র, সংস্কৃত কলেজে শিক্ষিত হইলেও, ইংরেজি শিক্ষার ব্যূহ-বেষ্টনে আবদ্ধ ছিলেন। এক দিকে হিন্দু কলেজের উন্মাদিনী শিক্ষা; অপর দিকে মিশনরী কলেজের মোহিনী মায়া; তদুপরি শক্তিশালী সাহেব সিবিলিয়নদের গাঢ় ঘনিষ্ঠতা। যে বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র, সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, তাহার পর বৎসরে পাদরী ডফ্ সাহেবের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টানী স্কুল "বিশপ্‌স-কলেজ" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইংরেজি শিক্ষার অপ্রতিহত ঘাত-প্রতিঘাতে হৃদয়বান্, মনস্বী ও তেজস্বী ঈশ্বরচন্দ্রও বিচলিত হইয়াছিলেন। অবিমিশ্র সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করিয়াও ঈশ্বরচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন, ইংরেজি না শিখিলে, বর্ত্তমান যুগে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন দুঃসাধ্য। তাই তিনিও সংস্কৃত পাঠ সমাপনান্তে কার্য্যাবস্থায় ইংরেজি শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফলে ইংরেজি শিক্ষার কুফল, তাঁহাতেও অনেকটা সংক্রামিত হইয়াছিল। তবে সংস্কৃত শিক্ষার ফলে,

তিনি অনেকটা জাতীয় ভাব সংরক্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার পরিচয়-প্রমাণ দুষ্প্রাপ্য হইবে না।

ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শ্রেণীর তৃতীয় বিভাগে ভর্ত্তি হইয়া সন্ধিসূত্র পাঠ করেন।

সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার সম্পূর্ণ সাহায্যকারিণী। এই জন্য ভারতে চিরকালই সংস্কৃত শিক্ষার্থীদিগকে সর্ব্বাগ্রে কয়েক বৎসর ধরিয়া ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া কণ্ঠস্থ করিতে হয়। মুগ্ধবোধ, পাণিনি, সংক্ষিপ্তসার প্রভৃতি ব্যাকরণই পাঠ্য। এই সব ব্যাকরণ সহজে আয়ত্ত করিবার জন্য অনেকেই সংক্ষিপ্তসারের "কড়চা" অভ্যাস করিয়া থাকেন।

ব্যাকরণ শিক্ষার অনুপাতে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যুৎপত্তি-বিকাশ। সংস্কৃত ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলে, সংস্কৃত শিক্ষা যেরূপ তলস্পর্শিনী হয়, অধুনা উপক্রমণিকা, কৌমুদী পড়িয়া সেরূপ হয় না। টোলে ব্যাকরণ শিক্ষার যে প্রথা প্রচলিত, প্রথমতঃ সংস্কৃত কলেজে সে প্রথাই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পরে এ প্রথার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, পাঠক পরে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন ব্যাকরণ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন, তখন কুমারহট্ট-নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ব্যাকরণের অধ্যাপক ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাকালে, অধ্যাপক উইল্‌সন সাহেব, বঙ্গের কৃতবিদ্য বিচক্ষণ পণ্ডিতগণকে নির্ব্বাচিত করিয়া, কলেজের অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত অধ্যাপক নিম্নলিখিত বিষয়ে অধ্যাপনা-কার্য্যে ব্রতী হইয়া

ছিলেন ;—নিমচাঁদ শিরোমণি,—দর্শন ; শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি,—বেদান্ত ; রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ,—স্মৃতি ; ক্ষুদিরাম বিশারদ,—আয়ুর্ব্বেদ ; নাথুরাম শাস্ত্রী,—অলঙ্কার ; জয়গোপাল তর্কালঙ্কার,—সাহিত্য ; গঙ্গাধর তর্কবাগীশ,—ব্যাকরণ ; হরিপ্রসাদ তর্কালঙ্কার,—ঐ ; হরনাথ তর্কভূষণ,—ঐ ; যোগধ্যান মিশ্র,—জ্যোতিষ্।

বেতন-ব্যবস্থায় অধ্যাপক-পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া, গবর্ণমেণ্ট অনেক অধ্যাপক-পণ্ডিতের সচ্ছন্দে সংসার নির্ব্বাহের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু বেতন-ব্যবস্থায়, অধ্যাপক-পণ্ডিতের নিয়োগে, অনেকেরই মুখরোধের সুযোগ সূত্রপাত হইল। বেতনের বাধ্য-বাধকতায়, স্বাধীন মত প্রকাশে, অনেক সময় ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। তখন না হউক, এখন তো তাহার প্রমাণ পদে পদে পাইতেছি।* গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য লইয়া কোন আলোচনা করিব না। করাও উচিত নহে। তবে যাহা অধুনা প্রত্যক্ষগোচরীভূত, তাহা তো অস্বীকার করিবার যো নাই। যে বিধি-বিধানে হিন্দুর ধর্ম্মাধর্ম্ম-সম্পর্ক, তাহাতে অনেক বেতন-ভোগী অধ্যাপক পণ্ডিত-মণ্ডলী স্বাধীন মত প্রদানে পশ্চাৎপদ হইয়া থাকেন। অধুনা অধ্যাপক-ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের বেতন-বৃত্তির

---

* ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে সহমরণ আইন বিধিবদ্ধ হয়। তৎকালে সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপকদের ধর্ম্মবিশ্বাস প্রবল ছিল বলিয়াই হউক বা কর্ত্তৃপক্ষ উইল্‌সন্ সাহেব, আইনের বিরোধী ছিলেন বলিয়াই হউক, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের স্বপক্ষে মত দেন নাই।

বরাদ্দ জন্য গবর্ণমেণ্ট সবিশেষ যত্নশীল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পোষণ পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা ভাবিয়া, অনেকেই এজন্য গবর্ণমেণ্টের প্রশংসাবাদে মুক্ত-প্রাণ। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী প্রকৃত হিন্দু, ইহাতে অনেকটা বিভীষিকারই ছায়া দেখিয়া থাকেন।

ঈশ্বরচন্দ্র কলেজে ভর্ত্তি হইলে, পিতা ঠাকুরদাস, প্রত্যহ ৯ নয় টার সময় ঈশ্বরচন্দ্রকে কলেজে দিয়া আসিতেন; এবং অপরাহ্ণ ৪ চারি টার সময় লইয়া যাইতেন। ৬ ছয় মাস কাল এইরূপই করিতে হইয়াছিল। তাহার পর ঈশ্বরচন্দ্র স্বয়ংই কলেজে যাতায়াত করিতেন। ৬ ছয় মাস পরে ঈশ্বরচন্দ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৫ পাঁচ টাকা বৃত্তি পান।

ঈশ্বরচন্দ্র বাল্য কালে "বাঁটুল" ছিলেন। ছাতা মাথায় দিয়া চলিয়া যাইলে মনে হইত; যেন একটী ছাতাই যাইতেছে। তাঁহার মাথাটা দেহের অনুপাতে একটু বড় ছিল। এই জন্য বালকেরা তাঁহাকে 'যশুরে কৈ' বলিয়া ক্ষেপাইত। বালক ঈশ্বরচন্দ্র সমবয়স্কদের বিদ্রূপোক্তিতে বড়ই বিরক্ত হইতেন। অনেক সময় তিনি রাগে রক্তমুখ হইয়া উঠিতেন; কিন্তু কথা কহিতে গিয়া আরও হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িতেন। তিনি তখন বড় 'তোতলা' ছিলেন। সেই জন্য সহজে সকল কথা উচ্চারিত হইত না; এবং এক একটী কথা উচ্চারণ করিতে কাল-বিলম্ব হইত; সুতরাং তাহাতেই সমবয়স্ক বালকেরা হাসির মাত্রা চড়াইয়া বিদ্রূপের মাত্রাও বাড়াইয়া দিত। ক্রমে 'যশুরে কৈ' নামটী 'কসুরে কৈ' শব্দে পরিণত হইয়াছিল। বালকেরা

তখন কি বুঝিত,—এই মাথা-মোটা 'যশুরে কৈ' কালে কত বড় লোক হইবে? তাহারা কি তখন বুঝিত,—মাথা অপেক্ষা বালক ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয়টা কত বৃহৎ?

বালক বিদ্যাসাগর কলেজে যাহা শিখিয়া আসিতেন, রাত্রি কালে প্রত্যহ পিতার নিকট তাহারই আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার জনক মহাশয়, সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ সম্পূর্ণ না হউক, তাহার অধিকাংশই যে জানিতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা আত্ম-জীবনীর একাংশে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে ব্যাকরণ পাঠ করিয়া, আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শনও পাইয়াছি। তাঁহার নিকটে যিনি ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন, এখন তিনি রীতিমত ভট্টাচার্য্য হইয়া অধ্যাপকতা করিতেছেন। প্রত্যহ পুত্রের আবৃত্তি শুনিয়া শুনিয়া ব্যাকরণে তাঁহারও অভিজ্ঞতা বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল। পুত্র কোন কথা বিস্মৃত হইলে, পিতা তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেন। পুত্র বুঝিতেন, তাঁহার পিতা ব্যাকরণে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন। পুত্রের নিকট পিতার প্রকারান্তরে কৌশলে অনুশীলন। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

পুত্রের বিদ্যানুরাগিতা-সম্বৰ্দ্ধনসম্বন্ধে, পর-সেবা-নিরত হইয়াও, পিতা, এক মুহূর্ত্তের জন্য কোনরূপ ত্রুটি করিতেন না। কার্য্য-স্থানের কঠোর পরিশ্রমেও, তিনি ক্লান্তি বোধ করিতেন না। রাত্রি ৯টার পর বাসায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি রন্ধনাদি করিতেন; এবং পুত্রকে আহার করাইয়া আপনি আহার করিতেন। তাহার পর পিতা পুত্রে একত্র শয়ন করিতেন। শেষ

রাত্রিতে পিতা, পুত্রের পঠিত বিদ্যার পর্য্যালোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে তিনি পর-মুখ-শ্রুত নিজের অভ্যস্ত নানাবিধ উদ্ভট শ্লোক পুত্রকে শিখাইতেন।

ঠাকুরদাস কোপন-স্বভাব এবং কঠোর-শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। যে দিন তিনি দেখিতেন, ঈশ্বরচন্দ্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, সে দিন তাঁহাকে নিদারুণ প্রহার করিতেন। এক দিন ঈশ্বরচন্দ্র পিতার নিকট চালাকাঠের মার খাইয়া, কলেজের তদানীন্তন কেরাণী রামধন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ীতে পলায়ন করিয়াছিলেন। রামধন বাবু তাঁহাকে অতি যত্নের সহিত বাড়ীতে রাখিয়া আহারাদি করান। পরে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া বাসায় পৌঁছাইয়া দেন। সময়ে সময়ে পিতার নিকট মার খাইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র এমনই আর্ত্তনাদ করিতেন যে, তাহাতে সিংহ-পরিবার উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিতেন; এবং ঠাকুরদাসকে বলিতেন,—"এরূপ প্রহারে হয় তো বালক কোন্ দিন মারা যাইবে; অতএব যদি এরূপ প্রহার কর, তাহা হইলে এখান হইতে তোমাকে স্থানান্তরে যাইতে হইবে।" ইহাতে প্রহারের মাত্রা কিছু কম হইত। ঈশ্বরচন্দ্রও অনেকটা সাবধান হইয়া চলিতেন। পাছে নিদ্রা আসে বলিয়া, তিনি আপনার চক্ষে সরিষা তেল দিতেন। তেলের জ্বালায় নিদ্রা পলায়ন করিত। বর্ত্তমান যশস্বী খ্যাতনামা কোন কোন ব্যক্তি ঘুম ভাঙাইবার জন্য বাল্য কালে এইরূপ ও অন্যরূপ উপায় অবলম্বন করিতেন, ইহাও আমরা

জানি। লেখকেরই কোন বন্ধু বাল্য কালে ঘুমাইবার পূর্ব্বে পায়ে দড়ি বাঁধিয়া রাখিতেন। দড়ির টানে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, তিনি পাঠাভ্যাসে রত হইতেন। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন; এবং এক্ষণে এক জন অধিক বেতন-ভোগী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী।

বুদ্ধিমান্ ও প্রতিভাশীল বালকদিগের জন্য প্রচণ্ড প্রহার-পীড়ন বা কঠোর দণ্ড-শাসনের প্রয়োজন হয় না। বরং এ ব্যবস্থায় অনেক সময় বিপরীত ফলই ফলিয়া থাকে। যাহারা স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিহীন বা বিদ্যার্জনে অমনোযোগী, তাহাদের তো কিছুতেই কিছুই হয় না; পরন্তু এমনও দেখিয়াছি, কঠোর শাসন-পীড়নে অনেক স্বাভাবিক বুদ্ধিমান্ বালক বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। আমাদেরই এক জন আত্মীয়ের একটী বুদ্ধিমান্ পুত্র ছিল। পিতা ভাবিতেন, নিয়ত কঠোর শাসনে রাখিতে পারিলেই, পুত্রের বিদ্যা-বুদ্ধির মাত্রা বাড়িবে। এই বিশ্বাসে, পুত্রের সামান্য দোষ দেখিলেই, পিতা, পুত্রের প্রতি কঠোর প্রহার-পীড়নের ব্যবস্থা করিতেন। ফলে, পুত্রের হৃদয়ে, পিতৃ-শাসনের বিভীষিকা এত দূর ঘনীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, পুত্র পিতাকে দেখিলেই দূরে পলায়ন করিত। তখন বহু সাধ্য-সাধনায়ও তাহাকে সমীপবর্ত্তী করা দুঃসাধ্য হইত। সুতরাং যাহার জন্য শাসন, ফলে তাহাই ঘুচিয়া গেল। এইরূপ শাসন-বিভীষিকায় পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতি-পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। প্রহার-পীড়ন-ফলে, বুদ্ধিমান্ ঈশ্বরচন্দ্রের অবশ্য

সেরূপ হয় নাই। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জীবনেও এরূপ শাসন-পীড়নের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার পিতাও ঠাকুরদাসের ন্যায় কোপন-স্বভাব ও কঠোর শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। আবার ইহাও দেখা যায়, এক জনের বুদ্ধিহীন পুত্র পিতার প্রহার-পীড়নেও, নির্বুদ্ধিতার সীমা অতিক্রম করিতে না পারিয়া অধঃপাতে গিয়াছে; অপর বুদ্ধিমান্ পুত্র অক্ষত-পৃষ্ঠে জীবনের পথ উজ্জ্বল করিয়াছে। এ সব দৃষ্টান্তের আলোচনায় অদৃষ্টবাদিত্বের পক্ষপাতিত্ব আসিয়া পড়ে না?

ব্যাকরণ শ্রেণীতে বালক ঈশ্বরচন্দ্র অন্য ছাত্র অপেক্ষা অধ্যাপকের প্রীতিপাত্র হইয়াছিলেন। অন্যান্য ছাত্রাপেক্ষা ব্যাকরণ বিদ্যায় তাঁহার অসম্ভাবিত ব্যুৎপত্তি দেখিয়া অধ্যাপক তাঁহার উপর বড় সন্তুষ্ট থাকিতেন। তিনি পাঠান্তে ঈশ্বর-চন্দ্রকে আপনার নিকট বসাইয়া উদ্ভট শ্লোক শিখাইতেন। পিতা ও অধ্যাপকের নিকট ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় চারি পাঁচ শত উদ্ভট শ্লোক শিখিয়াছিলেন।*

---

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্কলিত "শ্লোক-মঞ্জরী" নামক গ্রন্থে বহু-সংখ্যক উদ্ভট শ্লোক দেখিতে পাইবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন,—"এই উদ্ভট শ্লোক দ্বারা আমরা সবিশেষ উপকার লাভ করিয়াছিলাম, সন্দেহ নাই। আমাদের পঠদ্দশায়, উদ্ভট শ্লোকের যেরূপ আদর ও আলোচনা লক্ষিত হইয়াছিল, এক্ষণে আর সেরূপ দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ উদ্ভট শ্লোকের আলোচনা একেবারে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।"

ব্যাকরণ শ্রেণীতে তিন বৎসরের মধ্যে তিনি দুই বৎসর প্রচুর পারিতোষিক পাইয়াছিলেন; এক বৎসর পান নাই। সেই বৎসর তিনি মনঃসংক্ষোভে ও অভিমানে সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতা ও অধ্যাপকের অনুজ্ঞায় পারেন নাই। সে বৎসর যে তিনি পারিতোষিক পান নাই, তৎসম্বন্ধে কাহারও কাহারও মত এইরূপ,—'ঐ বৎসর প্রাইস্ সাহেব পরীক্ষক ছিলেন। সাহেব ভাল বুঝিতে পারিতেন না। ঈশ্বরচন্দ্র যাহা উত্তর করিতেন, তাহা ভালরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক করিতেন; সুতরাং উত্তর দিতে বিলম্ব হইত; কিন্তু প্রায়ই তাহা নির্ভুল হইত। যে বালক বিবেচনা না করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়াছিল, তাহা ভাল হউক, আর মন্দই হউক, সাহেব তাহাকে বুদ্ধিমান্ জানিয়া অধিক নম্বর দিয়াছিলেন।' সংস্কৃত ব্যাকরণের পরীক্ষায়, সাহেব পরীক্ষক সম্বন্ধে এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। সাহেব কেন, কোন কোন টোলের ও কলেজের অধ্যাপকদের এরূপ সংস্কার ছিল ও আছে, যে বালক দ্রুত উত্তর করিতে পারে, সে নির্ভুল বলিতেছে। সত্বর উত্তর করায় তাঁহারা ভুল ধরিতে পারেন না। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় দুই এক বার ঐরূপ বালকদের দ্বারা প্রতারিত হইয়াছিলেন।

এই সময় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের "একগুঁয়েমী" ফুটিতে আরম্ভ হয়। এই "একগুঁয়েমীর" দরুণ পিতা, অনেক সময় উত্ত্যক্ত হইতেন। পিতা বলিলেন,—"ফরসা কাপড় পরিয়া স্কুলে যাও।"

ঈশ্বরচন্দ্র বলিতেন,—"ময়লা কাপড় পরিয়াই যাইব।" যে দিন ঈশ্বরচন্দ্র স্নান করিব না বলিয়া মনে করিতেন, সে দিন তাঁহাকে স্নান করান বড়ই দুষ্কর হইত। পিতা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া, গঙ্গার ঘাটে বলপূর্ব্বক স্নান করাইয়া দিতেন। অন্য কোন গুরু জন কোন কথা বলিলে, ঈশ্বরচন্দ্র যদি মনে করিতেন, করিব না, তাহা হইলে, কেহই তাঁহাকে তাহা করাইতে পারিতেন না। গুণের মধ্যে এই ছিল, ঈশ্বরচন্দ্র কাহারও কথায় কোন উত্তর না দিয়া কেবল ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। এই জন্য পিতা ঠাকুরদাস, তাঁহাকে অনেক সময় "ঘাড়কেঁদো" বলিয়া ডাকিতেন। বালক ঈশ্বরচন্দ্রের "একগুঁয়েমীর" কথায় বালক জন্‌সনের "একগুঁয়েমির" কথা মনে পড়িয়া যায়। বাল্য কালে এক জন ভৃত্য, জন্‌সন্‌কে প্রত্যহ স্কুল হইতে লইয়া আসিত। এক দিন ভৃত্যের যাইতে বিলম্ব হওয়ায়, বালক জন্‌সন্‌ আপনি একাকী স্কুল হইতে বাহির হন; এবং পথে চলিয়া যান। স্কুলের কর্ত্রী জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, বালক হয়, পথ ভুলিয়া অন্যত্র গিয়া পড়িবে; না হয় অন্য কোনরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইবে। এই ভাবিয়া তিনি জন্‌সনের অনুবর্ত্তিনী হন। বালক জন্‌সন্‌ দেখিলেন, কর্ত্রী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন। তাঁহার শক্তি-সম্বন্ধে কর্ত্রী সন্দিহান হইয়াছেন ভাবিয়া, বালক জন্‌সন্‌, অভিমানে অভিভূত হইলেন; এবং অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন; এমন কি, তখনই ফিরিয়া গিয়া কর্ত্রীকে যথাসাধ্য প্রহার করিলেন। জন্‌সনের জীবনীলেখক বস্‌ওয়েল্‌, তাঁহার

এই "একগুঁয়েমী"র বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত তুলিয়া বলিয়াছেন,—"জনসনের ভবিষ্যৎ জীবনে ইহারই পরিচয় পাওয়া যায়।" বিদ্যাসাগর-সম্বন্ধে আমারাও এই কথা বলিতে পারি।

ব্যাকরণ পাঠের সময় ১২৩৭ সালে বা ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র কলেজের ইংরেজি শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ১২৩৩ সালে বা ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে এই ইংরেজি শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভবিষ্য বিশাল ইংরেজি-বৃক্ষের ইহাই বীজাঙ্কুর। ছাত্রেরা, কাজের মতন যৎকিঞ্চিৎ ইংরেজি শিখিতে পারে; ইংরেজি শিখিয়া, ইংরেজি চিকিৎসা গ্রন্থাদি কতক পরিমাণে সংস্কৃতে ও বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে পারে, এই উদ্দেশে এই ইংরেজি শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎকালে উলষ্টন সাহেব এই শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন।* ইহাতে পড়িতে কিন্তু অনেকের প্রবৃত্তি ছিল না। বহু ছাত্রের মধ্যে অল্পসংখ্যকই পড়িত। বিদ্যাসাগর ৬ ছয় মাস মাত্র এই শ্রেণীতে পড়িয়াছিলেন। সুতরাং ইংরেজিতে তিনি তাদৃশ জ্ঞান লাভ করেন নাই। তাহার জন্য ভবিষ্যৎ জীবনে অন্য চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। তাহার তত্ত্ব পরে পাইবেন।

এই বার বালকের অক্ষুণ্ণ শ্রমশীলতার পরিচয় লউন। ব্যাকরণ-শ্রেণীতে তিনি ৩ তিন বৎসর ৬ ছয় মাস অধ্যয়ন করেন। তিন বৎসরে ব্যাকরণ পাঠ সাঙ্গ করিয়া, বাকি ছয় মাস, তিনি

* Minutes of the Sanskrit College, 1835.

অমর-কোষের মনুষ্যবর্গ ও ভট্টিকাব্যের পঞ্চম সর্গ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। এ অল্প বয়সেও তিনি প্রায় সারা রাত্রি জাগিয়া পাঠাভ্যাস করিতেন। রাত্রি ১০টার সময় আহারান্তে ঠাকুরদাস দুই ঘণ্টা জাগিয়া থাকিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র তখন নিদ্রা যাইতেন। রাত্রি ১২টার সময় পিতা তাঁহাকে তুলিয়া দিতেন। তার পর বালক সমস্ত রাত্রি পড়িতেন। এইরূপ গুরুতর পরিশ্রমে ঈশ্বরচন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে পীড়া ভোগ করিতে হইত। এইরূপ অমানুষিক পরিশ্রম বিদ্যাসাগর যাবজ্জীবনই করিয়াছিলেন। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র পাঠ্যাবস্থায় এইরূপ পরিশ্রম করিয়া থাকেন বটে; কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনে অনেকেরই তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। পরিশ্রম করা তো পরের কথা; দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে শিখিলে,-তাঁহারা বিলাস-মদ-লালসার সম্পূর্ণ পরবশ হইয়া, এক একটা "বাবুজী" হইয়া পড়েন। বার্দ্ধক্যে রুগ্নশয্যায়ও বিদ্যাসাগর মহাশয় পুস্তক পরিত্যাগ করিতেন না।

নবম বর্ষ বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। একাদশ বৎসর বয়সে উপনয়ন হয়। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি সন্ধ্যা-আহ্নিক ভুলিয়া যান। কেবল পিতার ভয়ে সন্ধ্যাবন্দনাদির ক্রমগুলি করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের এই কপটতা আত্মদুর্ব্বলতা-প্রসূত। তখন তিনি বিদ্যাসাগর নন; যখন তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,- ইহা সেই সময়ের ঘটনা; পাঠক তাহা স্মরণ রাখিবেন। দ্বাদশ বৎসরে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত

লেজের কাব্য শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। সেই সময় পণ্ডিতবর গোপাল তর্কালঙ্কার সাহিত্যাধ্যাপক ছিলেন। মদনমোহন লঙ্কার ও মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, বালক বিদ্যা-রের সঙ্গে পাঠ করিতেন।* বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্যান্য অপেক্ষা অল্পবয়স্ক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত ধী-শক্তির চয় পাইয়া, অধ্যাপকমণ্ডলী বিস্মিত হইতেন। প্রথম বৎসরে চন্দ্র রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, রাঘব-পাণ্ডবীয় প্রভৃতি সাহিত্য-ক্ষায় সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় রে তিনি মাঘ, ভারবি, শকুন্তলা, মেঘদূত, উত্তরচরিত, মে,র্ব্বশী, মুদ্রারাক্ষস, কাদম্বরী, দশকুমারচরিত প্রভৃতি করেন। এ সব কাব্য আদ্যোপান্ত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। বাদে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। পুস্তক না দেখিয়া সংস্কৃত কাদি অনর্গল বলিতে পারিতেন। দ্বাদশবর্ষীয় বালক অনর্গল ত কথা কহিতে পারিতেন। প্রাকৃত ভাষায় কথা কহিতেও র কোন সঙ্কোচ হইত না। তদানীন্তন পণ্ডিতগণ তাঁহার স্মৃতি-শক্তি ও অশ্রুত-পূর্ব্ব বাক্যবিন্যাস-ক্ষমতা দেখিয়া ত হইতেন এবং প্রায়ই বলিতেন,—"এ বালক পৃথিবীতে তীয় পণ্ডিত হইবে।" প্রতিভা আর কাহাকে বলে? ন বালকের এরূপ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়?

এই মদনমোহন উত্তর কালে সুকবি খ্যাতি পাইয়াছিলেন ও মুক্তা-মদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদাদি কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া সুপণ্ডিত বলিয়া ত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় বৎসর সাহিত্য-পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম হন। হস্তাক্ষরের জন্য তিনি প্রতি বৎসরই পারিতোষিক পাইতেন। হস্তাক্ষরের প্রশংসা তাঁহার যাবজ্জীবনই ছিল। সকল সাহিত্য-সেবকের ভাগ্যে এরূপ প্রশংসা ঘটিয়া উঠে না। আধুনিক উচ্চতম সাহিত্য-সেবক ও সাহিত্য-সমালোচকদিগের সংস্রবে থাকিয়া, আমাদের কতকটা এই প্রতীতি জন্মিয়াছে। বিদ্যা-সাগর মহাশয়, অনেক সংস্কৃত পুঁথি স্বহস্তে লিখিয়া লইতেন। পুঁথির লেখা দেখিয়া সকলেই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। তিনি যে সকল পুঁথি স্বহস্তে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার পঙ্ক্তি-গুলি দেখিলে, বোধ হয়, যেন মুক্তা সজ্জিত রহিয়াছে।

এই সময় বালক বিদ্যাসাগর নিদারুণ কঠোরতার নির্ম্মম অভেদ্য ব্যূহ-বিবরে পতিত হন। সে কঠোরতা দরিদ্র হীনা-বস্থাপন্ন বালকের অনুকরণীয়, শিক্ষণীয় এবং সর্ব্বসাধারণের চিরস্মরণীয়। সেই সময় তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু * শিক্ষার্থ কলিকাতায় আগমন করেন। পাক-কার্য্যের ভার ঈশ্বরচন্দ্রের উপর পতিত হয়। কেবলই কি তাই? তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্নান করিয়া বাজারে যাইতেন এবং বাজার হইতে পিতার অবস্থানুসারে আলু, পটোল প্রভৃতি তরি-তরকারি ও মৎস্যাদি ক্রয় করিয়া লইয়া, বাসায় ফিরিয়া আসিতেন। তৎপরে তিনি নিজেই ঝাল হলুদ শিলে বাটিয়া

* ইনি পরে স্থায়রত্ন উপাধি-ভূষিত হন। ইনি স্কুলের ডিপুটী ইন্‌স্‌পেক্টর হইয়াছিলেন। ইঁহার রচিত একখানি পদ্য পুস্তক ছিল।

হইতেন। তখন পাথুরে কয়লার প্রচলন হয় নাই। তিনি স্বহস্তে কাট চালা করিতেন এবং উনুন ধরাইতেন। বাসায় চারিটী লোক খাইতেন। চারি জনের জন্য ভাত, ডাল, মাছের ঝোল রাঁধিয়া তিনি সকলকেই আহার করাইতেন। আহারান্তে সকলের উচ্ছিষ্ট মুক্ত করিতেন ও বাসনাদি ধুইতেন। হলুদ বাটিয়া, কাট চিরিয়া, বাসন মাজিয়া সত্যসত্যই তাঁহার অঙ্গুলি ও নখ ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল। তুমি আমি শুনিলে শিহরিয়া উঠি বটে; বালক ঈশ্বরচন্দ্র ইহাতেই কিন্তু অপার আনন্দ ও পরম পরিতোষ লাভ করিতেন। অনেক অবস্থাহীন ব্যক্তি বাল্য কালে এইরূপ কঠোরতার সহিত সংগ্রাম করিয়া, ভবিষ্যৎ জীবনে অতুল কীর্ত্তিমান্ ও যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। ডাক্তার গুডিব্ চক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধে এইরূপই শোনা যায়। তিনি এক জনের বাসায় রন্ধন করিতেন; রন্ধন করিবার সময় পুস্তক লইয়া পাঠ করিতেন। ইনি ভবিষ্যৎ জীবনে এক জন যশস্বী চিকিৎসক বলিয়া পরিচিত হন। বাল্যে বা যৌবনে কঠোরতার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনে কোন না কোন বিষয়ে কীর্ত্তিমান হইয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত ভারতে বা ইয়ুরোপে অনেক পাওয়া যায়। দারিদ্র্যের কঠোরতায় ভবিষ্যৎ জীবনোন্নতির বীজ উপ্ত হয়। দারিদ্র্যের নির্ম্মমতায়, অসাধারণ চরিত্র-শক্তি বা বুদ্ধি-বৃত্তি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে; কঠোরতার উত্তেজিকা শক্তি, দরিদ্রের শিরায় শিরায় শোণিত-প্রবাহে বিদ্যুৎ ছুটায় এবং দারিদ্র্যের আলিঙ্গনে প্রীতি ও প্রফুল্লতা, অধ্যবসায় ও আত্মসংযম

তাঁহার পক্ষে সহজসিদ্ধ হইয়া থাকে। এই জন্য রিচার্ বলিয়াছেন ;—

"I can not but chose to say to poverty, Be welcome, so thou come not too late in life."

স্পেনীয় কবি সারবেন্তিসের দারিদ্র্যের কথায় এক জন বলিয়াছিলেন ;—

"ইহাঁর দারিদ্র্যে পৃথিবী ধনশালিনী।" অর্থাৎ তাঁহার গ্রন্থে জগৎ উপকৃত।

সত্যসত্যই তো বুদ্ধিজীবী শক্তিশালী ব্যক্তি, দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া যে শক্তি ও ক্ষমতা সঞ্চয় করেন, আত্মীয়-পরিজন-পরিবৃত অতুল ধনের উপর অধিষ্ঠিত ব্যক্তি অনেক সময় তাহা পারেন না। কার্লাইল্ সাধে কি বলিয়াছেন ;—

"He who has battled, were it only with poverty and hard toil, will be found stronger and more expert than he who could stay at home from the battle, concealed among the provision waggons, or even rest unwatchfully, abiding by the stuff."

বালক বিদ্যাসাগর রন্ধনাদি করিয়া ভ্রাতা ও পিতাকে মনের আনন্দে আহার করাইতেন এবং সততই আত্মপ্রসাদে প্রফুল্ল থাকিতেন। যাহাকে আমাদের কঠোর কষ্ট বলিয়া মনে হয়, তাহা তাঁহার সুখকর বলিয়াই মনে হইত। তিনি রন্ধনের ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া মনে করিতেন না; অধিকন্তু পাঠাভ্যাসে

অবিরাম পরিশ্রম করিয়াও কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করিতেন না। কষ্টের সীমা ছিল না। যে ঘরে তিনি রন্ধন করিতেন, সে ঘরটী অতি জঘন্য ছিল। একে তো ঘরটী বাড়ীর সর্ব্ব নিম্নতলে, তাহার উপর জানালা অভাবে ভয়ানক অন্ধকারময়। নিকটে দুইটী পাইখানা ছিল; সুতরাং ঘরটী সদাই দুর্গন্ধে পূর্ণ থাকিত। মলমূত্রের কীট সকল 'কিলি বিলি' করিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিত। ঈশ্বরচন্দ্র রন্ধন করিবার সময় ঘটীতে জল লইয়া বসিয়া থাকিতেন। পোকাগুলো ঘরের ভিতর ঢুকিলেই, তিনি জল দিয়া ধুইয়া দিতেন। এতদ্ব্যতীত ঘরময় প্রায় আরসুলা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত। সময়ে সময়ে ভাতে-ব্যঞ্জনে আরসুলা উড়িয়া পড়িত। হঠাৎ কোন দিবস ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যঞ্জনের সঙ্গে একটা আরসুলা রাঁধা হইয়া গিয়াছিল। প্রকাশ করিলে বা পাতের নিকট ফেলিয়া রাখিলে, ভ্রাতৃগণ বা পিতা ঘৃণাপ্রযুক্ত আর ভোজন করিবেন না, ইহা ভাবিয়া তিনি আরসুলাটী ব্যঞ্জনের সহিত ভক্ষণ করেন।

আহারের তো এই অবস্থা। শয়নের অবস্থা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে তাঁহার শয়নব্যাপারের এইরূপ পরিচয় পাইয়াছি। নারায়ণ বাবু বলেন,—"এক দিন চন্দননগরের বাসা-বাড়ীতে আমি বলিলাম, বাবা এ ছোট ঘরে শুইতে আপনার কষ্ট হইবে না তো? বাবা বলিলেন, বলিস কিরে! ছেলে বেলায় বড়বাজারের বাসায় আমি দেড় হাত

চওড়া দুই হাত লম্বা, একটা বারাণ্ডায় প্রত্যহ শয়ন করিতাম। বারাণ্ডার আলিসা আমার বালিস ছিল। আমি বারাণ্ডার মাপে একটী মাজুরী করিয়াছিলাম, সেই মাজুরীতেই শয়ন করিতাম। এক দিন রাত্রিকালে দেখিলাম, সেই মাজুরীর উপর আমার দুই ভ্রাতা শুইয়া আছে। আমি তাহাদের নিকট গিয়া অনেক ডাকা-ডাকি করিলাম; তাহারা কিন্তু কিছুতেই উঠিল না; তখন আমি তাহাদের নিজের বিছানায় গিয়া শুইলাম। শুইবামাত্র আমার গায়ে বিষ্ঠা লাগিয়া গেল। আমি তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া একটু মজা করিব বলিয়া, যেখানে আমার সাধের বিছানায় আমার দুইটী ভাই শুইয়াছিল, সেই-খানে গিয়া, তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলাম, উঠ্‌বি তো ওঠ্‌, না হলে তোদের গায়ে বিষ্ঠা মাখাইয়া দিব। তখন তাহারা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। তাহাদিগকে উঠিতে দেখিয়া চলিয়া আসিলাম। সে রাত্রিতে আর নিদ্রা হয় নাই।” জগদ্দুর্লভ বাবুর বাড়ীর সম্মুখে তিলকচন্দ্র ঘোষ নামক এক ব্যক্তির বাড়ীর নিম্নতলে একটী ঘরে ঈশ্বরচন্দ্র শয়ন করিবার আদেশ পাইয়া-ছিলেন। তখন তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র কলিকাতায় থাকিতেন। ভ্রাতা তাঁহার শয্যায় শয়ন করিতেন। বালক বিদ্যাসাগর পাঠাভ্যাস করিয়া অধিক রজনীতে শয়ন করিতেন। এক দিন ভ্রাতা বিছানায় মলত্যাগ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পাছে এ কথা বলিলে, পেটের ব্যারাম হইয়াছে বলিয়া খাইতে না পান, সেই ভয়ে ভ্রাতা মলত্যাগের কথা প্রকাশ করেন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র তো তাহা জানিতে পারেন নাই। তিনি প্রাতে উঠিয়া দেখেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বিষ্ঠা। তখন তিনি বিষ্ঠা ধৌত করিয়া, স্বহস্তে ভ্রাতার মলমূত্রাদি পরিষ্কার করিয়া ফেলেন। বিদ্যাসাগরের পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি যেমন ছিল, ভ্রাতৃস্নেহও বরাবর তদ্রূপ ছিল।

বালক ঈশ্বরচন্দ্র যখন সাহিত্য শ্রেণীতে পড়িতেন, তখন তাঁহার উপর এক বেলা রন্ধনের ভার ছিল। রাত্রিকালে পিতা ৯টার সময় বাসায় আসিয়া পাকাদি করিতেন। এত কষ্টেও তাঁহার পাঠাভ্যাসে ত্রুটি ছিল না। তিনি কলেজে যাইবার সময় পুস্তক খুলিয়া পড়িতে পড়িতে যাইতেন; এবং কলেজ হইতে আসিবার সময়ও ঐরূপ পাঠ করিতেন। চিরকালই তিনি বিলাসে বীতস্পৃহ ছিলেন; সঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াও মোটা কাপড় ও মোটা চাদর ব্যবহার করিতেন। বাল্যে তাঁহার তাহাই ছিল। জননী চরকায় সূতা কাটিয়া, বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া, কলিকাতায় পাঠাইতেন। সেই মোটা কাপড় পরিয়া, তিনি কলেজে যাইতেন। বিদ্যাভ্যাসে তাঁহার ত্রুটির কথা শোনা যায় নাই। দৈবাৎ একটু ত্রুটি হইলে, পিতা ঠাকুরদাস ভয়ানক শাসন করিতেন। তিনিও পিতার শাসনকে বড় ভয় করিতেন। বাল্যাবস্থায় তিনি সন্ধ্যার মন্ত্র ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এ কথা পূর্ব্বে একবার উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। পিতা তাঁহাকে শাসন করেন। করিবামাত্র তিনি সন্ধ্যার পুঁথি দেখিয়া সন্ধ্যা করিয়াছিলেন।

কাব্যে ও ব্যাকরণে ঈশ্বরচন্দ্রের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অত্যদ্ভুত ব্যাপার। বীরসিংহ গ্রামে আদ্য শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে তিনি এত অল্প বয়সে অনেক সময় সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়া দিতেন। তাঁহার রচনা দেখিয়া, তাৎকালিক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলী অবাক্ হইতেন। মিলটন্ ত্রয়োদশ বর্ষে কবিতা রচনা করিয়া, তাৎকালিক বিলাতী পণ্ডিতবর্গকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।* জীবিত, সর্ব্বত্র প্রচারিত ও প্রচলিত ইংরেজি ভাষায় কবিতা লিখিবার চেষ্টামাত্রেই যদি মিলটন্ প্রতিভাশালী বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন, তাহা হইলে বালক বিদ্যাসাগর অধুনা সংকীর্ণ-প্রচার অপ্রচলিত সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত-জনমুগ্ধকর কবিতা রচনা করিয়া তদপেক্ষা অধিকতর প্রতিভাশালী বলিয়া কি পরিচিত হইতে পারেন না? সংস্কৃত ভাষা আজ যদি প্রচলিত থাকিত, সংস্কৃত যদি হিন্দু-সন্তানের সাধারণ শিক্ষণীয় ও পঠনীয় হইত, তাহা হইলে এই প্রতিভাশালী বাল-কবির মস্তিস্ক হইতে ভবিষ্য জীবনে অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী কবিতা নিঃসৃত হইয়া যে প্রতিভার পূর্ণ বিভায় দিগন্ত উদ্ভাসিত করিত না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? বালক বিদ্যাসাগর শ্রাদ্ধসভায় সমাগত পণ্ডিত-

---

* His first attempts in poetry were made as early as his 13th year, so that he is as striking an instance of perocity as of power of genius.—Shaw's Students English Literature.

মণ্ডলীর সহিত সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণের বিচার করিতেন। তাঁহার সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞতা ও কথনশক্তিশীলতার প্রতিপত্তি ক্রমে চারি দিকে প্রচারিত হইল। চারি দিকে ধন্য ধন্য রব উঠিল। লোকে বলিতে লাগিল, তিনি "অদ্বিতীয় পণ্ডিত।"

চতুর্থ অধ্যায়।

বিবাহ, শ্বশুরের পরিচয়, অলঙ্কারে প্রতিষ্ঠা, দয়া, সখ্ ও শ্রম।

ঈশ্বরচন্দ্রের ভূয়সী খ্যাতি-প্রতিপত্তি হওয়ায়, নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে কন্যা সমর্পণ করিবার জন্য লালায়িত হন। বিধির নির্ব্বন্ধে, ক্ষীরপাইনিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সপ্তম বর্ষীয়া কন্যা দীনময়ীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এ বয়সে তাঁহার বিবাহ করিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু পিতার অনুরোধে বিবাহ করিতে বাধ্য হন। দীনময়ী পাদুকা-কন্যা। পাদুকা-কন্যার সৌভাগ্যফলে স্বামীর লক্ষ্মী অচলা হয়। দীনময়ীর পতির অদৃষ্টে তাহাই হইয়াছিল। ভাগ্যবতী দীনময়ীও পুত্র কন্যা রাখিয়া স্বামীর পূর্ব্বে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া, নিজ সৌভাগ্যশালিতার এবং শুভগ্রহসম্পন্নতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে বহুবর্ষব্যাপক কৃচ্ছ্রসাধ্য সাবিত্রী-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। সকল নারীর ভাগ্যে সধবা অবস্থায় এই কঠোর ব্রত উদ্‌যাপিত করা ঘটিয়া উঠে না। অনেককে ব্রতের অনুদ্‌যাপিত অবস্থাতেই তনু ত্যাগ করিতে হয়। দীনময়ীর কপাল তেমন ছিল না। তিনি প্রকৃত সাধ্বীরই মত সকল দিক বজায় করিয়া, পতি-পুত্র রাখিয়া দিব্যধামে প্রয়াণ করেন।

এইখানে দীনময়ীর পিতা শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য্যের একটু পরিচয় দিই। এ পরিচয়ে পরিণামের সম্পর্ক আছে। বংশৌরসের সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য এই পরিচয়।

শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য্য অতি তেজস্বী, ক্রোধী ও বলশালী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তৎকালে তাঁহার গ্রামে তাঁহার বলবত্তার তুলনা ছিল না। পরন্তু তিনি সহজাত সহৃদয়তা ও উদারতা গুণে সর্ব্বজনের ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার বলবত্তা ও উদারতার দুই একটী গল্প শুনুন।

প্রতি বৎসর ক্ষীরপাই সহরে গাজন হইত। ভট্টাচার্য্য এই গাজনের অধিনেতা ছিলেন। গাজন লইয়া, সহর প্রদক্ষিণ করা তখনকার নিয়ম ছিল। স্বয়ং শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য্য গাজনের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ একটী পল্লীর লোক, তাঁহার বিষম প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাদের বিষম প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল, তাঁহারা শত্রুঘ্নকে গাজন লইয়া তাঁহাদের পল্লীতে যাইতে দিবেন না। শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য্য ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু বলদৃপ্ত ব্রাহ্মণেরও প্রতিজ্ঞা হইল, তিনি যে প্রকারেই হউক, প্রতিপক্ষের পল্লীতে যাইবেন। তিনি গাজন লইয়া, সেই দিকে অগ্রসর হন; কিন্তু গিয়া দেখেন, পল্লীর পথের সম্মুখে একটী হস্তী দণ্ডায়মান, তৎপশ্চাতে কিয়দ্দূরে একখানি রথ; তৎপশ্চাতে আরও দূরে প্রতিপক্ষেরা অবস্থিত ছিলেন। ভট্টাচার্য্য বুঝিলেন, এ সব গতিরোধের ব্যবস্থা। তিনি কিন্তু কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই, পথ হইতে একখানি

ইট্ কুড়াইয়া লইলেন। পরে হস্তীর শুণ্ড বগলে চাপিয়া রাখিয়া, সেই ইষ্টক খণ্ডে হস্তীকে এমনই প্রহার করিল যে, হস্তী তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, গর্জ্জন করিতে করিতে পলায়ন করিল। পরে ভট্টাচার্য্য সবলে রথখানা একাকী টানিয়া ফেলিয়া দেন। দুর্দান্ত বীরের বিক্রম-ব্যাপার দেখিয়া প্রতিপক্ষ পলায়ন করেন। ভট্টাচার্য্য ক্রোধান্ধ হইয়া, একাকী তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হন। প্রতিপক্ষের দলপতি হালদার ভয়ে বাটীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেন। ভট্টাচার্য্য পদাঘাতে, লৌহকীলবিশিষ্ট দ্বার ভগ্ন করিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করেন। তাঁহার পায়ে একটা লৌহ-শলাকা ফুটিয়া গিয়াছিল। তাহাতেও তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাঁহার শ্যালক ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ আসিয়া, তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন,—"ভট্টাচার্য্য করিয়াছ কি,পায়ে যে পেরেক ফুটিয়াছে।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"বটে বটে, টানিয়া বাহির করিয়া লও।" পেরেক বাহির করা হইল। ভট্টাচার্য্যের নিবৃত্তি নাই। তিনি প্রতিপক্ষের দলপতি হালদারের অন্বেষণে বাড়ীর ভিতরের দিকে ছুটিলেন। দলপতির লোকেরা ভয়ে, তাঁহাকে এমনই স্থানে ভয়ঙ্কররূপে ইষ্টকাঘাত করেন যে, তাহাতে ভট্টাচার্য্য বড়ই কাতর হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া, তাঁহাকে বাড়ীতে লইয়া আসেন।

প্রতিপক্ষের দল ভাবিলেন, ভট্টাচার্য্যকে সাংঘাতিক আঘাত লাগিয়াছে, তিনি বোধ হয়, আদালতে নালিশ করিবেন। ভট্টাচার্য্যের মনোগত অভিপ্রায় জানিবার জন্য, তাঁহারা এক জন

চর পাঠাইয়া দেন। ভট্টাচার্য্য, চরকে দেখিয়াই তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "হালদার ভাবিয়াছে, আমি নালিশ করিব। নালিশ করিব কি রে? উকীল-পেয়াদাকে পয়সা খাওয়াইব? এবার সে মারিয়াছে, আগামী বারে আমি মারিব। নালিশ-ফৌজদরী করিলে কি, আর গাজন থাকিবে?" চর এই কথা শুনিয়া চলিয়া যায়। পরে প্রতিপক্ষ সকলেই তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন এবং ক্ষমা ভিক্ষা করেন। দলপতি হালদার বলেন,—"ভট্টাচার্য্য, তোমার বল-পরীক্ষার জন্যই ঐরূপ করিয়াছিলাম। তুমি দ্বিতীয় ভীম বটে; তোমার শুধু বল নহে; মনুষ্যত্ব আছে। তোমার তেজ আছে; তোমার ভবিষ্যৎ ভাবিবার বুদ্ধি আছে। আমায় ক্ষমা কর।"

হালদারের কথা শুনিয়া, ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"এ সব কথায় আর কাজ নাই; আজ আমার বাড়ীতে তোমাদের সকলকে খাইয়া যাইতে হইবে।"

প্রতিপক্ষ-গণ, ভট্টাচার্য্যের নিমন্ত্রণ পরমানন্দে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে পরম-পরিতোষপূর্ব্বক আহারাদি করিয়া বিদায় লইয়াছিলেন।

আর এক সময় ভট্টাচার্য্য, এক দোকানে বসিয়াছিলেন। এমন সময়, চারি মণ কলাই-বোঝাই এক ছালা আসিয়া উপস্থিত হয়। উপস্থিত সকলে বলিল,—"ভট্টাচার্য্য, তুমি যদি এই ছালা, বাড়ী লইয়া যাইতে পার, তাহা হইলে, তোমায় এই কলাই দি।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"পারি বটে; কিন্তু

সোজা হইয়া যাইব না; দুই পা ও দুই হাত মাটীতে রাখিয়া, গরুর মতন চলিব; তোমরা আমার পিঠে এক খানি লেপ দিয়া, তাহার উপর কলাই চাপাইয়া দিবে।"

তাহাই হইল। ভট্টাচার্য্য সেই খান হইতে প্রায় আধ ক্রোশ দূরে সেই চারি মণ ছালা বহিয়া, বলদের মতন হাঁটিয়া বাড়ী গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ২০০। ৩০০ দুই শ তিন শ লোক গিয়াছিল। বাড়ীতে পৌঁছিলে, সকলেই ভট্টাচার্য্যকে কলাই লইতে অনুরোধ করে। ভট্টাচার্য্য বলেন,—"আমি কলাই লইয়া কি করিব; কোথায় রাখিব? তোমরা উপযুক্তরূপ চাউল তরি-তরকারী প্রভৃতি লইয়া এস; এই কলায়ে দাউল হউক; রাঁধিয়া-বাড়িয়া, সবাই আনন্দে আহার করিব।" তাহাই হইল।

এক সময় ভট্টাচার্য্যের গ্রামস্থ ঘোষ উপাধিধারী এক সদ্গোপ নিকটবর্ত্তী একটী খালের নিকট, বেণাবনের ভিতর লোক ঠেঙ্গাইয়া মারিত। ঘোষ খুব বলবান্ ছিল। গ্রামের লোক তাহার জন্য সদাই শঙ্কিত থাকিত। এক দিন ভট্টাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলেন,—"শত্রু, তুই থাকিতে ঘোষ জব্দ হয় না।" শত্রুঘ্ন বলিলেন,—"তাহার আর কি, এত দিন তো বল নাই? শত্রুঘ্ন, ঘোষকে জব্দ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

শত্রুঘ্ন এক দিন প্রাতঃকালে চুপি চুপি গিয়া, বেণাবনে লুকাইয়া থাকেন, কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া, তিনি দেখিলেন, সমস্ত বন আন্দোলিত হইতেছে; বুঝিলেন, ঘোষ কাহাকে ধরিয়াছে।

বাস্তবিক ঘোষ সে দিন এক জন পশ্চিমে খোট্টাকে ধরিয়াছিল। খোট্টাটী খুব বলবান্ ছিল। ঘোষ তাহাকে সহজে পাড়িতে পারে নাই। দুই জনেই ধ্বস্তাধ্বস্তি হইতেছিল। ভট্টাচার্য্য এই সময় তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হন। তাহাকে দেখিয়া ঘোষ শীকার ছাড়িয়া সম্মুখে একটী সিমুল গাছে উঠিয়া পড়ে। এই সময় খোট্টাটী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। ভট্টাচার্য্য তাহার মুখে জল দিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন করেন। পরে তিনি সিমুল বৃক্ষের তলায় গিয়া, বৃক্ষের উপর উঠিতে চেষ্টা করেন। স্থূলকায় বলিয়া উঠিতে না পারিয়া, তিনি সিমুল-তলে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বলিলেন,—"ঘোষ! তুই কতক্ষণ থাকিবি? তোকে না মারিয়া আমি যাইতেছি না।" ঘোষ গাছের উপর বসিয়া থর্ থর্ কাঁপিতে লাগিল। সে কোন মতেই গাছ হইতে নামিল না। ঘোষ গাছ হইতে কিছুতেই নামিতেছে না দেখিয়া, ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"নামিয়া আয়; আমার পা ছুঁইয়া দিব্যি কর্ যে, আর এ কাজ করিবি না; তা হ'লে এ যাত্রা তো'কে ক্ষমা করিব।"

ঘোষ বলিল,—"তুমি পৈতা ছুঁইয়া দিব্যি ক'র, আমি নামিয়া গেলে আমাকে মা'রবে না, তা হ'লে, আমি না'মব।"

ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন,—"আমি পৈতা ছুঁইয়া দিব্য করিলে, বিশ্বাস হইবে কেন?"

ঘোষ বলিল,—"আমি তোমার পা ছুঁইয়া দিব্যি কর্‌লে তুমি

বিশ্বাস কর্‌বে? আর তুমি ব্রাহ্মণ পৈতা ছুঁইয়া দিব্যি কর্‌লে আমি বিশ্বাস কর্‌ব না, এ বেশ কথা।"

ভট্টাচার্য্য পৈতা ছুঁইয়া দিব্য করিলেন। ঘোষ নামিয়া আসিয়া ভট্টাচার্য্যের পা ছুঁইয়া দিব্য করিল। ভট্টাচার্য্য ক্ষমা করিলেন। ঘোষ চলিয়া গেল। পরে ভট্টাচার্য্য সেই আহত খোট্টাটীকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যান। তিনি খোট্টাটীকে যথাযোগ্য আহারাদি করাইয়া বিদায় দেন।

ভট্টাচার্য্যের প্রতাপে সেই সময় অনেক দস্যু-লেঠেল জব্দ হইয়াছিল।

এক বার তাঁহার পৃষ্ঠ-ব্রণ হয়। ডাক্তার অস্ত্র করিবার পূর্ব্বে "ক্লোরোফরম্" করিয়া তাঁহাকে অজ্ঞান করিবার উপক্রম করেন। তিনি বলেন,—"অজ্ঞান কর্‌বে কেন? অস্ত্র কর, আমি অজ্ঞান হইয়া আছি।" ডাক্তার ছুরি বসাইলেন, ছুরি ভাঙ্গিয়া গেল। আবার ছুরি আনিয়া তবে অস্ত্র করিতে হয়।

দীনময়ী এই তেজস্বী পুরুষের কন্যা। এই তেজস্বিনীর পরিচয় যথাস্থানে পাইবেন। এখন ঈশ্বরচন্দ্রের পাঠ্য-প্রতিষ্ঠার পর্য্যালোচনা করা যাউক।

পঞ্চ দশ বর্ষ বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র অলঙ্কার-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন।* সেই সময় পণ্ডিত-প্রবর প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ

---

* ১২৪২ সালে ঈশ্বরচন্দ্র অলঙ্কার শ্রেণীতে পাঠ করেন। ইতিপূর্ব্বে শিক্ষা প্রথার প্রচলন-সম্বন্ধে দুইটী দল হইয়াছিল। একটী দল প্রাচ্য-শিক্ষা-প্রথা প্রচলনের, অপরটী পাশ্চাত্য-শিক্ষা প্রথা প্রচলনের পক্ষপাতী হইয়া-

মহাশয় অলঙ্কার শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতেন। এই শ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্র অন্যান্য ছাত্র অপেক্ষা অল্পবয়স্ক ছিলেন। এক বৎসরের মধ্যে তিনি সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ, রসগঙ্গাধর প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থ পাঠ করেন। অলঙ্কারের বাৎসরিক পরীক্ষায় তিনি সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। তখন পুস্তক ও টাকা পারিতোষিকের ব্যবস্থা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র এই কয়খানি পুস্তক পারিতোষিক পাইয়াছিলেন,—রঘুবংশ, সাহিত্যদর্পণ, রত্নাবলী, মালতীমাধব, উত্তররামচরিত, মুদ্রারাক্ষস, বিক্রমোর্ব্বশী, মৃচ্ছকটিক।

এক দিন পণ্ডিত-প্রবর তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁহাকে সাহিত্যদর্পণের আবৃত্তি করিতে দেখিয়া, তাৎকালিক বিখ্যাত দর্শনশাস্ত্রবেত্তা জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন বলিয়াছিলেন,—"এত ছোট ছেলে সাহিত্যদর্পণের এমন সুন্দর আবৃত্তি করিতে পারে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।" তর্কপঞ্চানন মহাশয়, ঈশ্বরচন্দ্রকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন,—"এই

ছিলেন। প্রথমতঃ প্রাচ্য প্রথার প্রচলন-কামীরাই প্রবল হইয়াছিলেন। তদানীন্তন অনেক উচ্চপদস্থ গণ্যমান্য সরকারী কর্ম্মচারী তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। ক্রমে কিন্তু এ দেশীয় শক্তিশালী ব্যক্তিদিগের সাহায্যে অপর পক্ষ প্রবল হইয়া উঠিল। ১২৪২ সালে লাট সাহেবের অন্যতম সভ্য মেকেল সাহেব অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভারতে কেবল পাশ্চাত্য-শিক্ষা প্রথা প্রচলিত করাই উচিত। তাঁহারই মত প্রবল হইল। প্রাচ্য-প্রথা-কামীদের আর মস্তক তুলিবার শক্তি রহিল না। ইংরেজি শিক্ষা-প্রসারের ইহা একটী সুদৃঢ় স্তর।

বালকের বয়োবৃদ্ধি হইলে, বালক, বাঙ্গালা দেশের অদ্বিতীয় লোক হইবে।”

এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র কলেজে মাসিক ৮৲ আট টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন।* তিনি যাহা বৃত্তি পাইতেন, তাহা পিতাকে আনিয়া দিতেন। পিতা, পুত্রের প্রথমাবস্থার বৃত্তি-লব্ধ টাকায় বীরসিংহ গ্রামের নিকট কতকটা জমি ক্রয় করিয়াছিলেন। এই জমিতে তাঁহার টোল বসাইবার সংকল্প ছিল। টোল বসাইয়া, ছাত্র রাখিয়া, সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি করিবেন, পিতার এ সাধ বরাবরই ছিল। পুত্রের বিদ্যা-গৌরব-সংবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার চিরপোষিত সাধ সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্রায়ই বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট এ কথা বলিতেন। তিনি যে টাকা বৃত্তি পাইতেন, পরে পিতা তাহা সমস্ত লইতেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র, বৃত্তির টাকায় হস্ত-লিখিত পুঁথি ক্রয় করিয়াছিলেন। আজিও এ সব পুঁথি তাঁহার লাইব্রেরিতে বিদ্যমান আছে।† কেবল তাহাই নহে। তিনি বাল্যকাল হইতে পরদুঃখ-মোচনে ব্রতী হইয়াছিলেন। সেই ক্ষুদ্র বুকখানি, অনন্তব্যাপিনী দয়ার আধার। তাঁর দয়া পৃথিবী-

---

* এই সময় কলেজে মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা ও ৮৲ আট টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল।

† বৎসর কতক পূর্ব্বে কোন সূত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আলাপ-পরিচয় হওয়ায়, এই পুঁথিগুলি দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। মুদ্রিত অন্যান্য সকল গ্রন্থের ন্যায় ইহা সযত্নে রক্ষিত।

ব্যাপিনী; কিন্তু দয়া যেমন, উপায় তো তেমন নহে; তবুও যে কোন উপায়ে যথাশক্তি দানে, দীনের দুঃখোদ্ধারে তিনি প্রাণান্ত পণ করিতেন। অবশিষ্ট যে টাকা থাকিত, তিনি সেই টাকায় জল খাইতেন। জল খাইবার সময়, যে সকল বালক তাঁহার নিকটে থাকিত, তিনি তাহাদিগকেও জল খাওয়াইতেন। কাহারও ছেঁড়া কাপড় দেখিলে, নিজের হাতে পয়সা না থাকিলেও, দরওয়ানের নিকট ধার করিয়া, তাহাদের কাপড় কিনিয়া দিতেন। বাসায় কেহ আসিলে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাহাকে জল খাওয়াইতেন। সে ভাবিত, ঈশ্বরচন্দ্র বড় মানুষের ছেলে; কিন্তু ঈশ্বর কিসে বড়, তাহা তো বুঝিত না। তিনি ধনে বড় ছিলেন না; তাঁহার মহৎ মন ছিল; তাহাতেই অবাধে ঐরূপ করিয়া যাইতেন। কোন সমবয়স্ক বালকের পীড়া হইলে, তিনি সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। কাহারও কোন সংক্রামক পীড়া হইলে, অপর কেহ তাহার নিকট যাইত না; তিনি কিন্তু অম্লানবদনে ও অকুণ্ঠিত চিত্তে, তাহার মলমূত্রাদি পরিষ্কার করিতেন।

বালক বিদ্যাসাগর, যখন বীরসিংহ গ্রামে যাইতেন, তখন সর্ব্বাগ্রে গুরুমহাশয় কালীকান্তের বাড়ীতে গিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিতেন। পরে ক্রমে ক্রমে তিনি প্রত্যেক প্রতিবাসীর বাড়ী বাড়ী গিয়া, সকলের তত্ত্ব লইতেন। কাহারও পীড়াদি হইলে, নির্ব্বিকার চিত্তে তাহার সেবাশুশ্রূষাদি করিতেন। এই

জন্য তখন বালক বিদ্যাসাগর গ্রামবাসী কর্তৃক দয়াময় নামে অভিহিত হইতেন। তিনি তখন বিদ্যাসাগর হন নাই; কিন্তু দয়াসাগর হইয়াছিলেন। কুকুর বিড়ালটী মারিলেও তাঁহার চক্ষে জল আসিত। মরি! মরি! ক্ষুদ্র বালকের কি অসীম দয়া!

যাঁহারা বাল্য কালে তাঁহার মাননীয় ছিলেন, বয়সে তাঁহারা তাঁহার নিকট সমান সম্মানই পাইতেন। তাঁহারা বিদ্যা-বুদ্ধিতে হীন হইলেও, বিদ্যাসাগর বিদ্যাভিমানে বা পদ গৌরবে গর্ব্বিত হইয়া কখনই তাঁহাদের প্রতি অসম্মান প্রকাশ করিতেন না; বরং তাঁহারা পূর্ব্বকার স্নেহভাব বিস্মৃত হইয়া, তাঁহার প্রতি সম্মান প্রকাশ করিলে, তিনি কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কলেজের উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন কলেজের তদানীন্তন কেরাণী রামধন বাবু তাঁহাকে দেখিয়া, সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিতেন। পাঠ্যাবস্থায় বিদ্যাসাগর ইহাঁর পরম স্নেহভাজন ছিলেন। ইহাঁকে এইরূপ সসম্ভ্রমে সম্মান করিতে দেখিয়া, বিদ্যাসাগর এক দিন বলিয়াছিলেন,—"আমি আপনার সেই স্নেহপাত্র আছি, আপনি অমন করিয়া আমাকে লজ্জা দিবেন না।" বিদ্যাসাগরের অমায়িকতা ও বিনয়নম্রতা দেখিয়া রামধন বাবু বিস্মিত হইয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগরের বাল্য কালে সখ্ ও সাধের মধ্যে ছিল, কবির গান শোনা। তিনি সমবয়স্ক বালকদিগকে লইয়া কবির গান করিতেন। কবির গানপ্রিয়তা-সম্বন্ধে এইরূপ একটী গল্প আছে। তিনি যখন চাকুরী করিয়া উপায়ক্ষম হন, তখন এক দিন স্বগ্রাম

হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। মধ্যে তিনি এক রাত্রি এক চটীতে অবস্থান করেন। প্রাতঃকালে তিনি শুনিলেন, চটীতে এক জন অতি সুমিষ্ট-স্বরে কবির গান গাইতেছে। তিনি উঠিয়া গিয়া সেই লোকটীর নিকট গমন করিলেন। যত ক্ষণ সে গান করিতেছিল, তিনি তত ক্ষণ নিঃশব্দে ও আনন্দোৎসুক হৃদয়ে গান শুনিতেছিলেন। গান থামিয়া গেলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, লোকটীর বাড়ী তথা হইতে ৬। ৭ ছয় সাত ক্রোশ দূরে এবং তাহার নিকট অনেক কবির গান সংগৃহীত আছে। তিনি তখন তাহাকে বলিলেন, "ভাই! আমি তোমার সঙ্গে যাইব; আমাকে তোমায় কতকগুলি গান দিতে হইবে।" লোকটী স্বীকার পাইল। পরে তিনি সেই লোকটীর বাড়ীতে গিয়া, অনেক গান সংগ্রহ করিয়া আনেন। যেখানে যে কবির গান শুনিতেন, তিনি তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। তাঁহার নিকট কবির গানের এক খানি প্রকাণ্ড খাতা ছিল। সখের মধ্যে এই কবির গান শোনা মাত্র এবং খেলা ছিল কেবল কপাটী ও লাঠি-খেলা। তিনি অনেক সময় সমবয়স্ক বালকদিগের সঙ্গে জুটিয়া মাঠ হইতে ধান কাটিয়া আনিতেন।

বিদ্যাসাগর যে দয়া ও সরলতার গুণে অমর হইয়া রহিলেন, তাহারই পরিচয় পাঠক, বিদ্যাসাগরের এই বাল্যে পাইলেন।

এই সব কথা এবং বাজার করা, রন্ধন করা প্রভৃতির কথা, বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট অবসর-ক্রমে খুলিয়া বলিতে তিনি কখন কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইতেন না। ইহাতে তো মহতের মাহাত্ম্য-

ত্রুটি হয় না; বরং এই সব কথা, শ্রোতার মুখ হইতে প্রচারিত হইয়া, সাধারণের অনেক বিষয়ে শিক্ষাস্থানীয় হয়।

অলঙ্কারের শ্রেণীতে পড়িবার সময় তাঁহাকে দুই বেলা রন্ধন করিতে হইত। রন্ধন-ভারে ও গুরুতর পাঠ পরিশ্রমে তিনি উদরাময় রোগে আক্রান্ত হন। প্রত্যহ রক্তভেদ হইত। কলিকাতায় রোগ আরাম হইল না। অগত্যা তাঁহাকে পল্লীগ্রামে যাইতে হইল। সেখানে দিনকতক থাকিয়া রোগ সারিয়া যায়। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এবারও সেই রন্ধন ও অধ্যয়ন। তবে মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকটা সাহায্য করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে বাজারও করিয়া দিতেন। এক দিন দীনবন্ধু, সন্ধ্যার সময় বাজার করিতে গিয়া, যোড়াসাঁকোর নূতন বাজারের এক স্থানে বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ বহুদিকে অনুসন্ধান করিতে করিতে, নূতন বাজারে যাইয়া ভ্রাতাকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিতে পান এবং তথা হইতে তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া আসেন। শুনিতে পাই, ইহার পর হইতে, ঈশ্বরচন্দ্র, আর ভ্রাতা দীনবন্ধুকে একাকী বাহিরে যাইতে দিতেন না।

পঞ্চম অধ্যায়।

স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠা, পিতৃভক্তির পরিচয়, বেদান্ত পাঠ, পিতৃঋণে কষ্ট, ন্যায়-দর্শনে প্রতিষ্ঠা, ব্যাকরণের অধ্যাপকতা, পাঠসমাপ্তি ও প্রশংসাপত্র।

অলঙ্কারের পাঠ সমাপ্ত হইলে পর, ১২৪৪ সালে বা ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি স্মৃতির শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। তৎকালে কলেজে স্মৃতির পূর্ব্বে ন্যায়-দর্শন ও তৎপরে বেদান্ত পড়িতে হইত। ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল, স্মৃতি পড়িয়া, "ল কমিটির" পরীক্ষা দিবেন। তৎপরে "ল কমিটি" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, জজ-পণ্ডিতের পদ-প্রাপ্তিই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।* কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহে তিনি ন্যায়-দর্শন ও বেদান্ত পড়িবার পূর্ব্বে স্মৃতি পড়িবার আদেশ পান। ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স তখন ১৭। ১৮ সতর আঠার বৎসর

---

* বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পূর্ব্বে সদর কোর্টের (এখনকার হাইকোর্ট) উকিল হইতে হইলে "ল" কমিটির অধীনে পরীক্ষা দিতে হইত। "ল" কমিটি সদর কোর্টের অন্তর্গত ছিল। এ কমিটির অস্তিত্ব এখনও লোপ পায় নাই। কমিটি এখন "প্লিডারসিপ" ও "মোক্তারসিপ" পরীক্ষা গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে। ঐ বৎসর হইতে "ল একজামিনেসন" প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর নিয়ম হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে "ল" পাস দিলে, তবে সদর কোর্টের উকিল হইবে; কমিটিতে পরীক্ষা হইবে না। তদবধি কমিটি "প্লিডারসিপ" এবং "মোক্তারসিপ" পরীক্ষা করিতেছেন। পূর্ব্বে প্রত্যেক জিলায়, যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা দিবার জন্য, এক এক জন ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা সচরাচর আদালতের জজ-পণ্ডিত বলিয়া উল্লিখিত হইতেন।

হইবে। ঈশ্বরের অদ্ভুত কীর্ত্তি! ভাবিলে বিস্ময়ে লোমাঞ্চ হইতে হয়। সচরাচর ২।৩ দুই তিন বৎসরে পণ্ডিতগণও স্মৃতির পাঠাভ্যাস করিয়া উঠিতে পারিতেন না। বালক ঈশ্বরচন্দ্র ৬ ছয় মাসে পড়া সাঙ্গ করিয়া "ল কমিটীর" পরীক্ষা দেন এবং প্রশংসিতরূপে উত্তীর্ণ হন। এই ৬ ছয় মাস কাল তিনি রন্ধনাদি করেন নাই। ৬ ছয় মাস কেবল প্রত্যহ ২।৩ দুই তিন ঘণ্টামাত্র নিদ্রা যাইতেন। স্মৃতি তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। অধ্যাপক এবং সহপাঠিগণ তাঁহার এতাদৃশ অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। এমন নহিলে কি মানুষ ভবিষ্যৎ জীবনে যশস্বী হইতে পারে? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই অদ্ভুত শক্তির কথা যখনই আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়, তখনই মহাকবি ভবভূতির সেই স্বল্পাক্ষর গভীর-ভাবপূর্ণ শ্লোকটী মনে পড়ে ;—

"বিতরতি গুরুঃ প্রাজ্ঞে বিদ্যাং যথৈব তথা জড়ে
ন তু খলু তয়োর্জ্ঞানে শক্তিং করোত্যপহন্তি বা।
ভবতি চ তয়োর্ভূয়ান্ ভেদঃ ফলং প্রতি তদ্‌যথা
প্রভবতি শুচী বিম্বগ্রাহী মণির্ন মৃদাং চয়ঃ।"

ভাবার্থ ;—গুরু, সুবোধ এবং নির্ব্বুদ্ধি দ্বিবিধ ছাত্রকেই সমভাবে বিদ্যা বিতরণ করেন ; কিন্তু তদুভয়ের বুঝিবার শক্তি বাড়াইতে বা কমাইতে পারেন না। বিদ্যা-বিষয়ে যে পূর্ব্বোক্ত ছাত্রদ্বয় প্রভূত পার্থক্য প্রাপ্ত হন, ইহা বলা বাহুল্য। নির্ম্মল মণি, প্রতিবিম্ব-গ্রহণে সমর্থ হয়, মৃৎপিণ্ড কিন্তু হয় না।

ঈশ্বরচন্দ্র যে সময় "ল কমিটী"র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, সেই সময় ত্রিপুরা জেলায় জজপণ্ডিতের পদ শূন্য হয়। তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, এই পদের জন্য প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা পূর্ণ হইতে বিলম্ব হইল না; কিন্তু পিতা তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করেন। পিতৃভক্ত পুত্র, পিতার অনুরোধে আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিলেন। যে পিতার সংসারক্লেশ-লাঘবের জন্য তাঁহার এই পদ-প্রার্থনা, সেই পিতা, যখন তাঁহাকে নিষেধ করিতেছেন, তখন কি পিতৃপ্রাণ পুত্র তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন? পিতাই যে তাঁহার একমাত্র আরাধ্য-দেবতা এবং মাতা যে একমাত্র আরাধ্যা দেবী ছিলেন। তাও বটে; আর অদৃষ্টও তাঁহাকে অন্য পথে লইয়া যাইল না। আরও দুইটী বিদ্যা তাঁহার বাকি ছিল। দর্শন শাস্ত্র পড়া হয় নাই। তিনি জজপণ্ডিতের পদ না লইয়া বেদান্ত শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। সেই সময় শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয় বেদান্তের অধ্যাপক ছিলেন। বেদান্ত পড়িবার সময় ঈশ্বরচন্দ্র গদ্য রচনায় সর্ব্বোচ্চ হইয়া ১০০৲ এক শত টাকা পুরস্কার পান। কষ্টের জীবনে দুঃখের অন্ত কি সহজে হয়? সকলই ভগবানের পরীক্ষা বৈ তো নয়।

পূর্ব্বেই এক বার বলা গিয়াছে, তৎকালে ঈশ্বরচন্দ্রের তৃতীয় ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র কলিকাতার বাসায় উপনীত হন। বাসার একটী লোক বাড়িল; সুতরাং তাঁহার কার্য্যও বাড়িল। এতদুপরি মধ্যম পুত্র দীনবন্ধুর বিবাহ দিয়া, ঠাকুরদাস বড় ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন; কাজেই ব্যয়ের হ্রাস করিতে হইল। এই

সময়ের ঘটনার উল্লেখ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় এক দিন আমাদিগের কোন বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন,—"বাল্যকালে আমি অনেক কষ্ট পাইয়াছি; কিন্তু কোন কষ্টকেই এক দিনও কষ্ট বলিয়া ভাবি নাই; বরং তাহাতে আমার উৎসাহ-উদ্যম বৰ্দ্ধিত হইত; কিন্তু ভাইগুলির কোন কষ্ট দেখিলে আমার যে কি অন্তর্যাতনা হইত, তা আর কি বলিব!" বিশ্বপ্রেমিক বিদ্যাসাগরের পক্ষে ইহা বিচিত্র কি!

যখন পিতা ঠাকুরদাস কলিকাতার বাসার ব্যয় কমাইয়া দেন, শুনিয়াছি—তখন বৈকালের জলখাবার জন্য আধ পয়সায় ছোলা আনিয়া ভিজান হইত এবং আধ পয়সার বাতাসা আসিত। ঐ ভিজা ছোলার অর্দ্ধেকে আবার রাত্রিকালে আলু-কুমড়ার ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইত। প্রাতে ও রাত্রিতে কুমড়ার ডালনায় পোস্ত দিয়া ছোলার ব্যঞ্জন হইত। ঈশ্বরচন্দ্রই দুই বেলা পাক করিতেন। ভাই দুইটীর পাতে তরকারী দিবার সময় তিনি চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারিতেন না। এই সময় আহারের যেমন কষ্ট; আবার থাকিবার ততোধিক কষ্ট হইয়াছিল। পিতা ঋণগ্রস্ত, ইহার উপর আশ্রয়দাতা সিংহ পরিবারও ঋণগ্রস্ত। পিতা পুত্রগুলিকে লইয়া তে-তলায় শয়ন করিতেন; কিন্তু জগদ্দুর্ল্লভ বাবু তে-তলাটী এক জনকে ভাড়া দেন। কাজেই তাহাদিগকে নিম্নে একটী ভদ্রলোকের বাসের অযোগ্য জঘন্য গৃহে বাসা করিতে হয়। কঠোর পরীক্ষা।

ইহাতেও ঈশ্বরচন্দ্র অকুণ্ঠিত। তিনি এই সময় ন্যায়-

দর্শন শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। মহাপণ্ডিত নিমচাঁদ শিরোমণি মহাশয়, ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন।* ন্যায়-দর্শনের দ্বিতীয় বৎসরের পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম হইয়া ১০০৲ এক শত টাকা এবং কবিতা রচনায় ১০০৲ এক শত টাকা পুরস্কার পান। ঈশ্বরচন্দ্রের কি অদ্ভুত শক্তি! তিনি ৫ পাঁচ বৎসরে দর্শন শাস্ত্রের পাঠ সমাপ্ত করেন। আর কেহ ৮।১০ আট দশ বৎসরে তাহা পারিতেন, কি না সন্দেহ। প্রতিভা আর কাহাকে বলে? তদীয় তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বাবু বলেন,—"যৎকালে তিনি দর্শন-শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখন দেশে যাইলে অনেকের সহিত বিচার হইত; সকলেই তাঁহার সহিত বিচারে সন্তুষ্ট হইতেন। কুরাণগ্রামবাসী সুবিখ্যাত দর্শনশাস্ত্রবেত্তা রামমোহন তর্কসিদ্ধান্তের সহিত তাঁহার প্রাচীন ন্যায়গ্রন্থের বিচার হয়। বিচারে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের পরাজয় হয়। ইহা শুনিয়া পিতৃদেব তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের পদরজ লইয়া দাদার মস্তকে দেন।" এ বিষয়ের জন্ম শম্ভুচন্দ্র বাবুর উপর নির্ভর করিতে হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী-সম্বন্ধে যে সকল মহোদয়ের নিকট হইতে অন্যান্য সকল বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব আমরা পাইয়াছি, তাঁহাদের সকলকেই এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, কিন্তু সদুত্তর পাই নাই। কেহ কেহ

* এই সময়ে এই নিমচাঁদ শিরোমণির মৃত্যু হওয়ার পর ঈশ্বরচন্দ্রের চেষ্টায় পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্করত্ন তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত হন। ইহা পাঠ্যাবস্থারও প্রতিপত্তি-পরিচায়ক।

তর্কচ্ছলে বলিতে পারেন,—অগ্রজ-সম্বন্ধে তখনকার অনেক কথা শম্ভু বাবুর মনে থাকিবারই সম্ভাবনা; অথচ কথাটা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও প্রতিভাশালীর পক্ষে অসম্ভবও নয়। আমরা কিন্তু বিপরীত ঘটনার সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। দর্শনবিদ্যায় তাঁহার যে রীতিমত পারদর্শিতা জন্মে নাই ও তাহাতে যে তাঁহার তাদৃশ প্রবৃত্তিও ছিল না, তাহার গল্প, বিদ্যাসাগর অনেক সময়ে অনেকের নিকট করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কলেজের পাঠ সমাপন করিলে, কলেজ হইতেই "বিদ্যাসাগর"* উপাধি প্রাপ্ত হন। বিংশতি-বর্ষীয় যুবক—"বিদ্যাসাগর!" এমন ভাগ্যবান্ এ সংসারে কয় জন? ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি বিদ্যায় বিশারদ হয়, বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে কয় জন? কি অপূর্ব্ব বুদ্ধি-বিক্রম! কলেজের অধ্যাপক-মাত্রেই বিস্মিত! যিনি ব্যাকরণের অধ্যাপক, তিনি ভাবেন,—"আমি ধন্য"; যিনি সাহিত্যের অধ্যাপক, তিনি বলেন,—"আমার অধ্যাপনা সার্থক"; যিনি দর্শন-স্মৃতির অধ্যাপক, তিনি মুক্ত-

---

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বাবুর মতে "১৮৪৬ খৃষ্ট অব্দের শেষে পাঠ্যাবস্থা শেষ করিয়া সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগ সময়ে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ অগ্রজ মহাশয়কে বিদ্যাসাগর উপাধি প্রদান করেন।" ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ নিশ্চিতই ভুল; কেননা, তিনি সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগ করিয়া, ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রথম চাকুরি করেন।

কণ্ঠে স্বীকার করেন,—"ঈশ্বরচন্দ্র নিশ্চিতই অসাধারণ-শক্তি-সম্পন্ন।" প্রত্যেকেই প্রত্যেক শাস্ত্রের প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। প্রশংসাপত্রে সকল বিষয়ের ও তত্তদ্বিষয়ক অধ্যাপকের মতামতের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাইবেন, "বিদ্যাসাগর" উপাধি-লিখিত প্রশংসাপত্রে। এই পত্র, কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ—রসময় দত্তের স্বাক্ষরিত। ১৭৬৩ শকের (১২৪৮ সালের) ২০শে অগ্রহায়ণের বা ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বরের প্রদত্ত উক্ত পত্রের অনুলিপি এই,—

"অস্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরায় প্রশংসাপত্রং দীয়তে। অসৌ কলিকাতায়াং শ্রীযুতকোম্পানীসংস্থাপিতবিদ্যামন্দিরে দ্বাদশ বৎসরান্ পঞ্চ মাংসাংশ্চোপস্থায়াধোলিখিতশাস্ত্রাণ্যধীতবান্।

ব্যাকরণম্........................শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মভিঃ
কাব্যশাস্ত্রম্.................... শ্রীজয়গোপাল শর্ম্মভিঃ
অলঙ্কারশাস্ত্রম্.................. শ্রীপ্রেমচন্দ্র শর্ম্মভিঃ
বেদান্তশাস্ত্রম্.................. শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ
ন্যায়শাস্ত্রম্.................... শ্রীজয়নারায়ণ শর্ম্মভিঃ
জ্যোতিঃশাস্ত্রম্.................. শ্রীযোগধ্যান শর্ম্মভিঃ
ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ...................... শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ

সুশীলতয়োপস্থিতৈস্তৈস্তৈস্তেষু শাস্ত্রেষু সমীচীনা ব্যুৎপত্তিরজনিষ্ট।

১৭৬৩ এতচ্ছকাব্দীয় সৌরমার্গশীর্ষস্য বিংশতিদিবসীয়ম্।

(Sd). "Rasamoy Dutta, Secretary,
10 Decr. 1841."

ঈশ্বরচন্দ্র দুই মাস ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা বেতনে ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক হইয়াছিলেন। এই টাকায় পিতা ঠাকুরদাস গয়া তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসেন। এই দুই মাস কাল মাত্র তাঁহার অধ্যাপনা-পরিপাটী দেখিয়া, অন্যান্য অধ্যাপক ও ছাত্রবর্গ মুগ্ধচিত্তে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী শক্তি স্বীকার করেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

সংস্কৃত রচনা, পরীক্ষার ব্যবস্থা, পরীক্ষার রচনা, অনুরোধে রচনা, স্বেচ্ছায় রচনা ও আমাদের বক্তব্য।

কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া, ঈশ্বরচন্দ্র চাকুরীতে প্রবৃত্ত হন। পরবর্ত্তী অধ্যায় হইতে তদ্বিবরণের বিবৃতি আরম্ভ হইবে। সংস্কৃত কলেজে পাঠের সময় তিনি যে সব রচনা লিখিয়াছিলেন, তাহার একত্র সমাবেশ হইলে, পাঠকগণের পড়িবার সুবিধা হইবে বলিয়া, এই অধ্যায়ে সেই সমস্ত সন্নিবেশিত হইল।

রচনা, সাহিত্য-শিক্ষার সবিশেষ সাহায্যকারিণী। রচনায় সাহিত্যের শিক্ষা-পুষ্টির পরিচয়। যে সময় ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে পড়িতেন, সে সময় রচনার উৎকর্ষ-সাধন জন্য, কলেজের ছাত্র, শিক্ষক ও কর্ত্তৃপক্ষের যথেষ্ট যত্ন-চেষ্টা ছিল। কেবল সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য নয়; ইংরেজি কলেজেও ইংরেজি শিক্ষার জন্য, রচনার সম্যক্ বিধি ব্যবস্থা দেখা যাইত। উৎসাহেই উৎকর্ষ। এই জন্য ছাত্রবৃন্দের রচনা-বিষয়ে উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থ যথোচিত পারিতোষিক বিতরণের বন্দোবস্ত ছিল। রচনার পরিপাটী, প্রকৃত পক্ষে পরীক্ষক ও কর্ত্তৃপক্ষের পরম প্রীতি উৎপাদন করিত। পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি,—"তখন রচনার জন্য যেমন ছাত্র-শিক্ষকের আগ্রহ দেখা যাইত, এখন আর বড় তেমন দেখা যায় না। এখনকার মতন তখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ী বিমিশ্র শিক্ষার বাঁধাবাঁধি তো ছিল না।

তখন যাঁহার যে বিষয়ে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকিত, তিনি সে বিষয়েরই উৎকর্ষ-সাধনের সুযোগ পাইতেন। যাঁহার সাহিত্যে প্রবৃত্তি, তিনি সাহিত্যেরই উৎকর্ষ-সাধনে যত্নশীল হইতেন। গণিত বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়েও সেইরূপ ছিল। অধুনা বিকট বিমিশ্র শিক্ষার বাঁধাবাঁধিতে কোন বিষয়ে প্রকৃষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভের সম্ভাবনা থাকে না। তখন সাহিত্যে যাঁহার প্রবৃত্তি থাকিত, রচনায়ও তাঁহার অনুরাগ দেখা যাইত। সাহিত্যাধ্যাপকগণও তদ্বিষয়ে যথেষ্ট যত্নশীল হইতেন। যে ছাত্র, অল্পের ভিতর বহুভাবময় রচনা লিখিতেন, তিনি প্রশংসিত হইতেন। একবার আমাদের "পরিশ্রম"-সম্বন্ধে ইংরেজি রচনার বিষয় ছিল। আমি এ সম্বন্ধে ১৫। ১৬ পনর ষোল ছত্র মাত্র লিখিয়াছিলাম। এই ১৫। ১৬ পনর ষোল ছত্রের জন্যও পুরস্কার পাইয়াছিলাম। পরন্তু এই সময় হইতেই আমি অধ্যাপক ও পরীক্ষকের প্রীতি-পাত্র হইয়াছিলাম।"

সংস্কৃত কলেজে রচনার জন্য পারিতোষিকের ব্যবস্থা থাকিলেও, ঈশ্বরচন্দ্র, রচনায় বড় অগ্রসর হইতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, "আমরা সংস্কৃত ভাষায় রীতিমত রচনা করিতে অক্ষম। যদি কেহ সংস্কৃত ভাষায় কিছু লিখিতেন, ঐ লিখিত সংস্কৃত প্রকৃত সংস্কৃত বলিয়া, আমার প্রতীতি হইত না।" *

ঈশ্বরচন্দ্রের এ বিশ্বাস চিরকালই দৃঢ়বদ্ধ ছিল। তাঁহার

* বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রকাশিত "সংস্কৃত রচনা"। প্রথম পৃষ্ঠা।

কার্য্যাবস্থায় এক জন কোন বিষয় সংস্কৃতে লিখিয়া, তাঁহাকে দেখাইতে গিয়াছিলেন। তিনি তাহার সংশোধন করিয়া দেন। তাঁহার সংশোধন-প্রণালী দেখিয়া, রচয়িতা চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন,—"আপনি এমন সুন্দর সংস্কৃত লেখেন, তবে আপনি যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহার মুখবন্ধে বা বিজ্ঞাপনে বাঙ্গালা লেখেন কেন?" তদুত্তরে তিনি একটু হাস্য করিয়া বলেন,—"সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকিলেও, বিশুদ্ধ সংস্কৃত রচনা দুরূহ বলিয়া আমার বিশ্বাস।"

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত রচনায় সহজে অগ্রসর হইতেন না বটে; কিন্তু যখনই রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখনই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া, পারিতোষিক পাইয়াছিলেন।

টোলে রচনার প্রথা নাই। সংস্কৃত কলেজেও প্রথমতঃ তাহা ছিল না। ইংরেজির প্রণালীমতে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বা ১২৪৫ সালে সংস্কৃত কলেজে এ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এই বৎসর নিয়ম হয়—স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্ত এই ৩ তিন উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগকে বার্ষিক পরীক্ষায় গদ্যে ও পদ্যে সংস্কৃত রচনা করিতে হইবে। এই নিয়মানুসারেই ঐ বৎসর সংস্কৃত গদ্যে "সত্যকথনের মহিমা"-সম্বন্ধে রচনার বিষয় ছিল। ১০ দশটা হইতে ১ একটা পর্য্যন্ত এই রচনা লিখিবার সময় নির্দ্ধারিত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় পরপৃষ্ঠায় প্রকাশিত রচনা লিখিয়া, ১০০৲ এক শত টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

সত্যকথনের মহিমা।

সত্যং হি নাম মানবানাং সার্ব্বজনীয়ায়া বিশ্বসনীয়তায়া হেতুঃ। তথাবিধায়াশ্চ বিশ্বসনীয়তায়াঃ ফলমিহ বহুলমুপলভ্যতে। তথাহি যদি নাম কশ্চিৎ সত্যবাদিতয়া বিনিশ্চিতো ভবতি সর্ব্ব এব নিয়তং তদ্বচসি সম্যগ্বিশ্বসন্তি। সত্যবাদী হি সততং সজ্জন-সংসদি সাতিশয়ং মাননীয়ঃ সবিশেষং প্রশংসনীয়শ্চ ভবতি।

যো হি মিথ্যাবাদী ভবতি ন কোঽপি কদাচিদপি তস্মিন্ বিশ্বসিতি। স খলু নিঃসংশয়ং নিরতিশয়ং নিন্দনীয়ো ভবতি ভবতি চ সর্ব্বত্র সর্ব্বথা সর্ব্বেষাং জনানামবজ্ঞাভাজনম্।

কিমধিকেন শিশবোঽপি বাললীলাসু যদি কশ্চিন্মিথ্যা-বাদিতয়া প্রতীয়মানো ভবতি ভো ভ্রাতরো নানেনাধমেনাস্মাভিঃ পুনর্ব্যবহর্ত্তব্যম্ অয়ং খলু মৃষাভাষীত্যাদিকাং গিরমুদ্গিরন্তী-ত্যলং পল্লবিতেন।

১০ দশটা হইতে ১ একটা পর্য্যন্ত উল্লিখিত রচনার জন্য সময় নির্দ্ধারিত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পরীক্ষার সময় প্রথমে উপস্থিত ছিলেন না। উপস্থিত থাকিবার তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। পণ্ডিত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের সক্রোধ আদেশে তিনি বেলা ১২ বারটার সময় রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার রচনা হাস্যাস্পদ হইবে; কিন্তু তদ্বিপ-রীতে তিনি এই রচনার জন্য পুরস্কার পান।

দ্বিতীয় বৎসর বিদ্যাসম্বন্ধে রচনা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র পর-পৃষ্ঠায় প্রকাশিত রচনার জন্য পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

বিদ্যা।

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিপুলঞ্চ বিত্তং
চিত্তং প্রসাদয়তি জাড্যমপাকরোতি।
সত্যামৃতং বচসি সিঞ্চতি কিঞ্চ বিদ্যা
বিদ্যা নৃণাং সুরতরুর্ধরণীতলস্থঃ॥ ১॥
বিদ্যা বিকাশয়তি বুদ্ধিবিবেকবীর্য্যং
বিদ্যা বিদেশগমনে সুহৃদ্দ্বিতীয়ঃ।
বিদ্যা হি রূপমতুলং প্রথিতং পৃথিব্যাং
বিদ্যা ধনং ন নিধনং ন চ তস্য ভাগঃ॥ ২॥
রূপং নৃণাং কতিচিদেব দিনানি নূনং
দেহং বিভূষয়তি ভূষণসন্নিকর্ষাৎ।
বিদ্যাভিধং পুনরিদং সহকারিশূন্য-
মামৃত্যু ভূষয়তি তুল্যতয়ৈব দেহম্॥ ৩॥
অন্যানি যানি বিদিতানি ধনানি লোকে
দানেন যান্তি নিধনং নিয়তং নু তানি।
বিদ্যাধনস্য পুনরস্য মহান্ গুণোঽসৌ
দানেন বৃদ্ধিমধিগচ্ছতি যৎ সদেদম্॥ ৪॥
নৈশ্বর্য্যেণ ন রূপেণ ন বলেনাপি তাদৃশী।
যাদৃশী হি ভবেৎ খ্যাতির্বিদ্যয়া নিরবদ্যয়া॥ ৫॥
দুর্ব্বলোঽপি দরিদ্রোঽপি নীচবংশভবোঽপি সন্।
ভাজনং রাজপূজায়া নরো ভবতি বিদ্যয়া॥ ৬॥

বিদ্বৎসভাসু মনুজঃ পরিহীণবিদ্যো
নৈবাদরং ক্বচিদুপৈতি ন চাপি শোভাম্।
হাসায় কেবলমসৌ নিয়তং জনানাং
তজ্জীবিতং বিফলমেব তথাবিধস্য ॥ ৭ ॥
অজ্ঞানখণ্ডনকরী ধনমানহেতুঃ
সৌখ্যাপবর্গফলমার্গনিদেশিনী চ।
সা নঃ সমস্তজগতামভিলাষভূমি-
র্বিদ্যা নিরস্য জড়তাং ধিয়মাদধাতু ॥ ৮ ॥

এই কবিতাগুচ্ছে প্রাচীন সংস্কৃত কবিতার মর্ম্ম নিবদ্ধ থাকিলেও, উহা একটী বিদ্যার্থীর রচনা বলিয়া বিবেচনা করিলে, মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনার পক্ষপাতী না হওয়ার পক্ষে ইহাও এক কারণ। ফলতঃ কবিতাগুলি সারল্যে ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ ও অতিমাত্র স্বাভাবিক।

প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষার সময় জি, টি, মার্শেল সাহেব সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তৃতীয় বৎসর অধ্যক্ষ ছিলেন বাবু রসময় দত্ত। এ বৎসর অগ্নীধ্র রাজার তপস্যা-সংক্রান্ত বিষয়টী রচনার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল। রসময় বাবু কয়েকটী কথা লিখিয়া দিয়া, তৎসম্বন্ধে কবিতায় শ্লোক রচনা করিতে বলিয়াছিলেন। তদনুসারে পরপৃষ্ঠায় প্রকাশিত কবিতাগুলি রচিত হয়। রসময় বাবু এ কবিতা দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।

অগ্নীধ্র রাজার উপাখ্যান।

অগ্নীধ্রো নাম ভূমীন্দ্রঃ প্রজারঞ্জনবিশ্রুতঃ।
আরাধয়ৎ সুতাকাঙ্ক্ষী গিরিপ্রস্থে প্রজাপতিম্ ॥ ১ ॥
ভগবান্ সোঽথ তজ্জ্ঞাত্বা প্রেষয়ামাস সত্বরম্।
প্রযত্নতঃ পূর্ব্বচিত্তিং নাম কামপি কামিনীম্ ॥ ২ ॥
নৃপতিস্তাং সমালোক্য কান্ত্যা ত্রৈলোক্যমোহিনীম্।
শ্লোকানুবাচ কতিচিজ্জড়বন্মোহমাশ্রিতঃ ॥ ৩ ॥

আলীঢ়নীরদচয়ে শিখরৈরমন্দৈগ্রে-
রুচ্চাবচৈরজগরৈরভিতো বিকীর্ণে।
ক্রব্যাদনৈরগণনৈর্ভয়মাদধানে
কিং নু ব্যবস্যসি মুনীশ্বর ভূধরেঽস্মিন্ ॥ ৪ ॥
কোদণ্ডযুগ্মমিদমদ্ভুতমম্বুজাক্ষি
ধৎসে কিমর্থমথবা হরিণোপমানাম্।
বালে বশীকরণবাসনয়া নিতান্ত-
মস্মাদৃশাং হতদৃশামজিতেন্দ্রিয়াণাম্ ॥ ৫ ॥
বাণাবিমৌ বিবিধবিভ্রমমন্থরৌ তে
পুঙ্খং বিনাপি রুচিরৌ নিশিতাগ্রভাগৌ।
ধাতুঃ কটাক্ষপতিতায় হতাশ্রয়ায়
কস্মৈ প্রযোক্তুমভিবাঞ্ছসি তন্ন বিদ্মঃ ॥ ৬ ॥
যদ্ দৃশ্যতে সুমুখি বিম্বফলং মনোজ্ঞং
মধ্যে সুবর্ণপরিকল্পিতবাগুরায়াঃ।

জানীমহে ন হি করিষ্যতি কস্য পুন-
শ্চেতোবিহঙ্গমশিশোর্বিপুলাং বিপত্তিম্॥ ৭ ॥
অস্মিন্ নিরাকৃতকলঙ্কশশাঙ্কবিম্বে
নীলাম্বুজন্মযুগলং যদিদং বিভাতি।
মন্যে সুধাংশুমুখি সংবননং বিধাত্রা
লোকত্রয়স্য বিহিতং মহতাদরেণ॥ ৮ ॥
যুষ্মচ্ছিখাবিগলিতা ললিতা নিতান্তং
শিষ্যা ইমে মুনিবরানুগতা ভবন্তম্।
প্রীতা ভজন্তি বিমলাং কিল পুষ্পবৃষ্টিং
ধর্ম্মব্রতা মুনিসুতা ইব বেদশাখাম্॥ ৯ ॥
তস্মাদ্বয়ং ভয়পরিপ্লববুদ্ধয়স্ত্বাম্
অভ্যার্থয়ামহ ইদং চটুলায়তাক্ষি।
উদ্যান্ বিজেতুমবনীং তব বিক্রমোঽয়-
মস্মাকমস্তু কুশলায় নিরাশ্রয়াণাম্॥ ১০ ॥

এই নৈসর্গিক মধুরতাময় আদিরসাত্মক কবিতা প্রাঞ্জলতা-গুণে সকলেরই চিত্ত প্রীত করিবে। যেন প্রাচীন কবির লিপি-পটুতা পদে পদে প্রতিভাত।

১২৪৫ সালে বা ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জন্ মিয়র্ নামে এক সিবি-লিয়ন্ সাহেবের প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়, পুরাণ, সূর্য্যসিদ্ধান্ত

* ১, ২, ৩, ৪, ৯ ও ১০ রসময় বাবুর কথানুসারে রচিত। ৫, ৬, ৭ ও ৮ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে রচিত।

ও যুরোপীয় মতের অনুযায়ী ভূগোল ও খগোল বিষয়ে এক শত শ্লোক রচনা করিয়া, এক শত টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। এই শ্লোকগুলি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশায় পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছিল। তখন উহার মুদ্রা-কার্য্য সমাপ্ত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর ১২৯৯ সালে ১৫ই বৈশাখে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।* ইহাতে এখন ৪০৮টী শ্লোক দেখা যায়। সুতরাং মিয়র্ সাহেবের নির্দ্দিষ্ট শত শ্লোক অপেক্ষা ইহাতে অতিরিক্ত শ্লোক রহিয়াছে। সেগুলি বোধ হয়, পরে রচিত। এ পুস্তকের প্রারম্ভেই ঈশ্বরচন্দ্রের আস্তিকতা, গুরুদেবপরায়ণতা ও বিনয়-নম্রতার প্রমাণ রহিয়াছে।

---

* খগোল-ভূগোল রচনা-সংক্রান্ত পুস্তকের সূচনায় বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহার একটী সহাধ্যায়ীর দুর্ব্ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা একটু বিচিত্র। সেই জন্য তাহা এইখানে প্রকাশ করিলাম,—খগোল-ভূগোল সম্বন্ধে রচনা হইবার পূর্ব্বে মিয়র্ সাহেব পদার্থ-বিদ্যা সম্বন্ধে রচনার বিষয় নির্দ্ধারিত করিয়া এক শত টাকা পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ১০০টী শ্লোকে এই রচনা লিখিবার কথা ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক জন সহাধ্যায়ী আসিয়া তাঁহাকে বলেন,—"তুমি ৫০টী শ্লোক লিখিও এবং আমি ৫০টী লিখিব। পরে তোমার নামেই হউক, আর আমার নামেই হউক, এই রচনাটী কর্ত্তৃপক্ষকে দেওয়া যাইবে।" সহাধ্যায়ীর বহু পীড়াপীড়িতে বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্মত হন। রচনা কর্ত্তৃপক্ষকে দিবার কিয়দ্দিন পূর্ব্বে সেই সহাধ্যায়ীটী আসিয়া বলেন যে, আমি শ্লোক-গুলি লিখিতে পারি নাই। ইহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন,—"তবে আমার লেখা এই শ্লোকগুলি আর কি হইবে?" এই বলিয়া তিনি সেই স্বরচিত শ্লোকগুলি তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া ফেলেন। পরে কিন্তু তাঁহার সহাধ্যায়ীটী ১০০ এক শত শ্লোকই রচনা করিয়া আনিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে দেখান এবং পুরস্কার পান।

আস্তিকতার প্রমাণ,—

যৎক্রীড়াভাণ্ডবদ্ভাতি ব্রহ্মাণ্ডমিদমদ্ভুতম্।
অসীমমহিমানং তং প্রণমামি মহেশ্বরম্ ॥ ১ ॥

বিনয়নম্রতা ও গুরুপরায়ণতার পরিচয়,—

জগদ্বর্ণনকর্ম্মেদং শর্ম্মণে কিমু মাদৃশাম্।
খদ্যোতানাং তমোনাশোদ্যমো হাস্যায় কস্য ন ॥ ৪ ॥
তথাপি শরণীকৃত্য* গুরূণাং চরণং পরম্।
কিঞ্চিদ্বক্ষ্যামি সংক্ষেপাৎ সুধিয়ঃ শোধয়ন্তু তৎ ॥ ৫ ॥

এ ভাবের এমন প্রমাণ আর পরবর্ত্তী গ্রন্থে পাই না। এইটী বুঝি, কেবল অবিমিশ্র সংস্কৃত শিক্ষার ফল।

খগোল-ভূগোল পুস্তকে যেরূপ বিভাগক্রমে দ্বীপ, বর্ষ, বর্ষখণ্ড এবং জনপদসমূহ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে অনেক স্থলে পুরাণের অপেক্ষা পুরাণাংশ সুখপাঠ্য ও সুবোধ।

পুরাণমতে সাতটী পরিচ্ছেদে পৃথক্ পৃথক্ দ্বীপবর্ণন, অষ্টম পরিচ্ছেদে দ্বীপাতিরিক্ত সত্ত্বযুত ভূমিভাগ, কাঞ্চনভূমি, লোকালোক পর্ব্বত এবং ভূমণ্ডলের পরিমাণ, আর নবম পরিচ্ছেদে খগোল বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। খগোল বৃত্তান্তে রাশিচক্র, গ্রহ-সংস্থান প্রভৃতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণমতের পরেই সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত। সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মতে একটী পরিচ্ছেদ। এক পরিচ্ছেদেই ভূগোল ও খগোল সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। তবে ইহাতে ভূগোল অপেক্ষা খগোলের বৃত্তান্ত অপেক্ষাকৃত

* "শরণীকৃত্য", অদ্ভুতভাবে 'চ্বি' চিন্তনীয়।

বিস্তৃত। পুরাণ ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মতে প্রথমে ভূগোল, পরে খগোল। সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মতের পরে য়ুরোপীয় মত। তাহাতে প্রথমে খগোল, পরে ভূগোল। য়ুরোপীয় ভূগোলে আসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা ক্রমে বর্ণিত। য়ুরোপ-খণ্ডে ইংলণ্ডাদিক্রমে প্রধান দেশগুলি পৃথক্ পৃথক্ বর্ণিত। য়ুরোপীয় ভূগোল-খগোল সংস্কৃত শ্লোকাকারে রচিত হওয়ায় বালকগণের অভ্যাসের সুবিধা। সর্ব্বত্রই রচনা প্রাঞ্জল। এই-রূপ সংক্ষিপ্ত, সরল, সুখবোধ্য রচনা বিদ্যাসাগরের এতদ্বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞানের পরিচায়ক। সেই অল্প বয়সে ঈদৃশ ভাষা ও পদার্থ-জ্ঞান যে পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ও ইহজন্মের অধ্যবসায়ের ফল, ইহা একবাক্যে সকলেরই স্বীকার্য্য। য়ুরোপীয় মতের ভূগোল-সংক্রান্ত সংস্কৃত রচনার কয়েকটী উদ্ধৃত হইল,—

পুরাণসূর্য্যসিদ্ধান্তমতমেবং প্রদর্শিতম্।
মতং য়ুরোপপ্রথিতং সংক্ষেপেণাধুনোচ্যতে ॥ ২৩০ ॥
আধারভূতং সর্ব্বেষাং ধাত্রা নির্ম্মিতমম্বরম্।
তদন্তরালসংলীনো বর্ত্ততে তপতাম্পতিঃ ॥ ২৩১ ॥
নাস্ত্যস্য প্রাণসঞ্চারো নায়ঞ্চলতি দূরতঃ।
তেজোময়ঃ পৃথুর্ভূমের্দশলক্ষ-গুণেন সঃ ॥ ২৩২ ॥
ভ্রমতো গ্রহচক্রস্য সদা মধ্যস্থলস্থিতঃ।
উষ্ণতাতেজসী তেভ্যো দদাত্যেষ নিরন্তরম্ ॥ ২৩৩ ॥
সর্ব্বেষামেব বস্তূনামন্যোন্যাকর্ষণং ভবেৎ।
গুরুণা কৃষ্যতে তত্র লঘু স্বাভিমুখং যতঃ ॥ ২৩৪ ॥

আকর্ষতি ততো ভানুগ্র´হান্ স্বাভিমুখং সদা।
তথাকর্ষতি পৃথ্বীন্দুং যতোহস্য লঘুতা ততঃ ॥ ২৩৫ ॥
অর্কস্যাকর্ষণাদূর্দ্ধমধস্তাদাত্মনাং তথা।
ভ্রমন্তি নিয়তং মধ্যদেশে পৃথ্ব্যাদয়ো গ্রহাঃ ॥ ২৩৬ ॥

এক সময় অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়, "গোপালায় নমোহস্তু মে" এই চতুর্থ চরণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া এক ঘণ্টা সময় দিয়া সকলকে শ্লোক রচনায় নিযুক্ত করেন। গোপালের কথা কবিতার বিষয়ীভূত হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"মহাশয়, আমরা কোন্ গোপালের বর্ণনা করিব। এক গোপাল আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন; এক গোপাল বহুকাল পূর্ব্বে বৃন্দাবনে লীলা করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন।" পণ্ডিত মহাশয় হাস্য করিয়া, গোকুলের গোপাল-সম্বন্ধে লিখিতে বলেন। বিদ্যাসাগরের শ্লোক-রচনায় পণ্ডিত মহাশয় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। সেই শ্লোকগুলি এই,—

"গোপালায় নমোহস্তু মে"।

যশোদানন্দকন্দায় নীলোৎপলদলশ্রিয়ে।
নন্দগোপালবালায় গোপালায় নমোহস্তু মে ॥ ১ ॥
ধেনুরক্ষণদক্ষায় কালিন্দীকূলচারিণে।
বেণুবাদনশীলায় গোপালায় নমোহস্তু মে ॥ ২ ॥
ধৃতপীতদুকূলায় বনমালাবিলাসিনে।
গোপস্ত্রীপ্রেমলোলায় গোপালায় নমোহস্তু মে ॥ ৩ ॥

বৃষ্ণিবংশাবতংসায় কংসধ্বংসবিধায়িনে।
দৈতেয়কুলকালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥ ৪ ॥
নবনীতৈকচৌরায় চতুর্ব্বর্গৈকদায়িনে।
জগদ্ভাণ্ডকুলালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥ ৫ ॥

ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় আর এক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে শ্লোকের পাদ-পূরণ করিতে পারিতেন, পাঠক, এখানে তাহারও প্রমাণ পাইলেন। এ কবিতায় গোপালের প্রতি ভগবদ্ভাব প্রকটিত।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অনুরোধে, আর একবার সরস্বতী-পূজার সময়, ঈশ্বরচন্দ্র নিম্নলিখিত রস-পূর্ণ কবিতাটী লিখিয়াছিলেন,—

লূচী-কচুরী-মতিচুর-শোভিতং
জিলেপি-সন্দেশ-গজা-বিরাজিতম্।
যস্যাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্নুমঃ
সরস্বতী সা জয়তান্নিরন্তরম্ ॥

কবিতাটীর রচনা-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"শ্লোকটী দেখিয়া, পূজ্যপাদ তর্কালঙ্কার মহাশয় আহ্লাদে পুলকিত হইয়াছিলেন এবং অনেককে ডাকাইয়া আনিয়া, স্বয়ং পাঠ করিয়া শ্লোকটী শুনাইয়াছিলেন।"

অল্পায়তনে কি সুন্দর রস-রচনা! ভবিষ্যৎ জীবনে কিন্তু

* "সংস্কৃত রচনা" পুস্তক, ১৬ পৃষ্ঠা।

এরূপ রস-রচনার পরিচয় দিবার সুযোগ ঘটে নাই। রস-রচনার সে পরিচয় নাই থাকুক; রসালাপের প্রসিদ্ধি অপ্রতুল নয়।

পরীক্ষার্থ রচনা বা অনুরোধ-জন্য রচনা ভিন্ন ঈশ্বরচন্দ্র, মধ্যে মধ্যে স্বেচ্ছায় কিছু কিছু রচনা করিতেন। সকল রচনা পাওয়া যায় নাই। এ সম্বন্ধে তিনি এইরূপই লিখিয়াছেন,—

"এক আত্মীয়, আমার রচনা দেখিবার নিমিত্ত সাতিশয় আগ্রহপ্রকাশ এবং সত্বর ফিরিয়া দিবার অঙ্গীকার করিয়া, সমুদায় রচনাগুলি লইয়া যান; বারংবার প্রার্থনা করিয়াও, তাঁহার নিকট হইতে, আর ফিরিয়া পাইলাম না। এইরূপে রচনাগুলি হস্তবহির্ভূত হওয়াতে, আমি যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ পাইয়াছি। পুরাণ-কাগজের মধ্যে অনেক অনুসন্ধান করিয়া, যে কয়টী গ্রন্থ পাইয়াছিলাম, তন্মাত্র মুদ্রিত হইল"।*

স্বেচ্ছাকৃত রচনার মধ্যে কেবল "মেঘ"-বিষয়িণী একটী কবিতা পাওয়া যায়। সেই কবিতাটী এইখানে প্রকাশিত হইল,—

মেঘ।

প্রায়ঃ সহায়যোগাৎ সম্পদমধিকর্ত্তুমীশতে সর্ব্বে।
জলদাঃ প্রাবৃড়পায়ে পরিহীয়ন্তে শ্রিয়া নিতরাম্॥ ১॥

কিং নিম্নগা জলদমণ্ডলবর্জ্জিতেন
তোয়েন বৃদ্ধিমুপগন্তুমধীশতে তাম্।

---

* "খগোল-ভূগোল" রচনাটী লইয়া যেমন একখানি পুস্তক হইয়াছে, এই রচনাগুলি লইয়া, ১২৯২ সালে ১লা অগ্রহায়ণ বা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে "সংস্কৃত-রচনা" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

ন স্যাদজস্রগলিতং যদি পান্থযূনাং
সাহায্যকায় কিল নির্ম্মলমশ্রুবর্ষম্ ॥ ২ ॥
কান্তাভিসাররসলোলুপমানসানাম্
আতঙ্ককম্পিতদৃশামভিসারিকাণাম্।
যদ্ বিঘ্নকৃদ্ দুরিতমর্জিতবানজস্রং
কেনাধুনা ঘন তরিষ্যসি তন্ন বিদ্মঃ ॥ ৩ ॥
ক্ষীণং প্রিয়াবিরহকাতরমানসং মাং
নো নির্দ্দয়ং ব্যথয় বারিদ নাত্মবেদিন্।
ক্ষীণো ভবিষ্যসি হি কালবশং গতঃ সন্
আস্তে তবাপি নিয়তস্তড়িতা বিয়োগঃ ॥ ৪ ॥
সর্ব্বত্র সন্নমৃতদস্তটিনীশরীর-
সংবর্দ্ধকস্তনুভৃতাং শমিতোপতাপঃ।
যচ্চাতকেষু করুণাবিমুখোঽসি নিত্যং
নায়ং মতো জলদ কিং বত পক্ষপাতঃ ॥ ৫ ॥
লোকোত্তরা যদি চ তোয়দ তে প্রবৃত্তি-
রেষা যদব্ধিসরিতোরসি সঙ্গহেতুঃ।
জাগর্ত্তি সজ্জনসভাসু তথাপি ঘোরং
ত্বৎকল্মষং কৃপণপান্থবধূবধোত্থম্ ॥ ৬ ॥
ত্বং হি স্বভাবমলিনস্তব নাশ্রুমজ্জং
ত্বদ্ধার্জ্জিতং বিরহিবর্গনিসর্গবৈরি।
কস্ত্বাং স্তুবীত বদ তোয়দ লোকসিদ্ধাং
প্রেক্ষামহে ন যদি জীবনদায়িতাং তে ॥ ৭ ॥

কান্তাবিয়োগবিষজর্জ্জরপান্থযূনাং
ত্বং জীবনাপহরণব্রতদীক্ষিতোঽসি।
ত্বামামনন্তি ঘন জীবনদায়িনং যৎ
কিং স ভ্রমো ন বদ তৎ স্বয়মেব বুদ্ধ্বা ॥ ৮ ॥
গর্জ্জন্ ভৃশং তত ইতঃ সততং বৃথা কিং
নো লজ্জসে জলদ পান্থনিতান্তশত্রো।
আস্তে হি নান্যগতিচাতকপোতচঞ্চু-
সম্পূরণেঽপি বত যস্য ন শক্তিযোগঃ ॥ ৯ ॥
জীমূত চাতকগণং ননু বঞ্চয়িত্বা
মা মুঞ্চ বারি সরসীসরিদর্ণবেষু।
কং বা গুণং শিরসি সংস্তুতৈললেপে
তৈলপ্রদানবিধিনা লভতেঽত্র লোকঃ ॥ ১০

কবিতায় কি সুন্দর স্বভাব-বর্ণন, কি মনোহর অলঙ্কার-বিন্যাস, কি সরল সরস রচনা-কৌশল! বিদ্যাসাগর কবি বলিয়া পরিচিত নহেন; কিন্তু কেবল এই একটী মাত্র কবিতা-পাঠে বলিতে পারি,—বিদ্যাসাগর স্বভাব-কবি! বাল-কবির কি অপূর্ব্ব প্রতিভা! বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্রও বাঙ্গালায় "বর্ষার মানভঞ্জন" নামে একটী কবিতা লিখিয়াছিলেন।* ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় যেমন প্রথমে মেঘের স্বভাব-বর্ণন, পরে বিরহিণীর বিরহ-ব্যঞ্জন; বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতায়ও তেমনই প্রথমে বর্ষার

* ১৩০১ সালের, শ্রাবণ মাসের সাহিত্য। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত মাসিক পত্র।

স্বভাব-বর্ণন, পরে মানিনীর মানভঞ্জন। উভয়ই পূর্ণ কবিত্বময়। বাল্যে উভয়ে কবি। উত্তর কালে উভয়েই সাহিত্য-পুষ্টির উত্তর-সাধক। তবে পথ ও প্রণালী স্বতন্ত্র।

রচনার বঙ্গানুবাদ দিলাম না। দিবার প্রয়োজনও নাই। রচনা, যেরূপ সরস ও সরল, তাহাতে যাঁহাদের সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিন্মাত্র বোধ আছে, তাঁহারা ইহার রস-মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। এ রচনাগুলি পড়িলে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, সর্ব্ব-রস-বিকাশে এবং ছন্দোবিন্যাসে বিদ্যাসাগর শক্তিমান্। বাল্যে যিনি এমন মধুর, সুললিত ও বিশুদ্ধ সংস্কৃত লিখিতে পারেন, প্রবৃত্তি বা অভ্যাস রাখিলে, অথবা নিজ-রচনা-শক্তিতে অবিশ্বাসী হইয়া সংস্কৃত রচনাকল্পে উদাসীন না হইলে, তিনি ভবিষ্যৎ জীবনে উপাদেয় এবং সুপাঠ্য সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের সম্মান রক্ষা করিতে পারিতেন, সন্দেহ নাই। সংস্কৃত ভাষার সংকীর্ণ-প্রচারও বোধ হয়, সংস্কৃত গ্রন্থ-প্রণয়নের প্রবৃত্তি-প্রণোদন-পক্ষে অন্তরায় হইয়াছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কার্য্যাভাস, চাকুরিতে প্রবেশ, সাহেবের গুণগ্রাহিতা, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, ইংরেজি শিক্ষা, অক্ষয়-কুমার দত্তের সহিত পরিচয়, মহাভারত-অনুবাদ ও অধ্যাপনা-প্রণালী।

পাঠ্যাবস্থার অবসানে, কার্য্য-কালের প্রারম্ভ। এইবার কার্য্য-বীর বিদ্যাসাগর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কার্য্যময় সংসারে কার্য্যের কীর্ত্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু প্রকারে। পাঠক! বাল্য কালে ও পাঠ্যাবস্থায় যে অপরিসীম শ্রমশীলতা, যে প্রগাঢ় গভীর একাগ্রতা, যে অবিচলিত আত্মনির্ভরতা এবং যে অনিবার্য্য বুদ্ধিমত্তা ও তেজস্বিতা দেখিয়াছেন, কার্য্যক্ষেত্রেও তাহারও প্রচুর প্রমাণ ও পরিচয় পাইবেন।

বিপদে নির্ভীকতা, কর্ত্তব্যপালনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা, নিরাশায় সজীবতা এবং সর্ব্বাবস্থায় নিরভিমানিতা ও সর্ব্ব কার্য্যে নিঃস্বার্থতা দেখিতে চাহেন তো পাঠক দেখিবেন, বিদ্যাসাগরের জীবনে, কার্য্যাবস্থার প্রারম্ভ হইতে, দেহাবসানের পূর্ব্বাবস্থা পর্য্যন্ত। করুণার কথা আর কি বলিব? বলিয়াছি তো তাহার তুলনা নাই। এ বহু-বর্ণময় ভারতভূমিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সকল কার্য্যই সর্ব্ববাদিসম্মত হওয়া সম্ভব নহে এবং হয়ও নাই। কিন্তু সকল কার্য্যেই যে সেই শ্রমশীলতা, সেই দৃঢ়তা, সেই নির্ভীকতা, সেই বুদ্ধিমত্তা এবং সেই বিদ্যাবত্তা,

সকল সময়েই পূর্ণ মাত্রায় পরিচালিত হইত, তাহা তাঁহার জীবনী-পর্য্যালোচনায় নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইবে। তিনি সকল কার্য্যে সকল সময়েই স্বাধিকারভূতা ও স্বকীয় বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্মতা শক্তিরই আমূল সঞ্চালন ও পূর্ণ প্রয়োগ করিতেন। এক কথায় বলি, এমন এক-টানা খর স্রোত, ইহ-সংসারে মনুষ্য-জীবনে বড়ই দুর্লভ। এই বার তার পূর্ণ পরিচয়। করুণার-পরিচয় অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে পাইবেন। স্থূল কথা, জীবনে যাহা যাহা প্রয়োজন, বিদ্যাসাগরের জীবনীতে তাহাই যথেষ্ট পরিমাণে উদ্ঘাটিত হইবে। হিন্দু-ধর্ম্মানুরাগী হিন্দু-সন্তানকে অবশ্য অতি সাবধানে বিদ্যাসাগরের জীবনী পর্য্যা-লোচনা করিয়া দোষ-ভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, গুণ-ভাগ গ্রহণ করিতে হইবে। অলৌকিক গুণগ্রাম, বিদ্যাসাগরে যে বহুপ্রকার আছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কর্ম্মীর জীবনে যে কখন কর্ম্মাবসাদ হয় না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন, তাহারই প্রমাণ। তাহাই সর্ব্ব সময়ে সকলেরই অনুকরণীয় এবং শিক্ষণীয়। কর্ম্মীর কার্য্যাভাব যে কখন থাকে না, বিদ্যাসাগরের কর্ম্মাবস্থার প্রথম হইতেই তাহার প্রমাণ। বিখ্যাত ইংরেজি গ্রন্থকার সিডন্ স্মিথ্ বলিয়াছেন,—

"Let every man be occupied, and occupied in the highest employment of which his nature is capable, and die with the consciousness that he has done his best."

অর্থাৎ সকলেই যেন কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। যাঁহার যেরূপ প্রকৃতি, তিনি যেন তদনুসারে উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত হন। আপন কার্য্য যথাসাধ্য সাধন করিয়াছেন, এইটী বুঝিয়াই যেন তিনি মরিতে পারেন।

এ মহাবাণীর সার্থকতা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনীতেই পরিলক্ষিত হয়। সেই টুকুই, সুহৃদয় পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিলে, শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্যারম্ভ ১২৪৮ সালের অগ্রহায়ণ বা ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। এখানে কার্য্য-অর্থে চাকুরী বুঝিতে হইবে। কার্য্যের অবশ্য সু-বিশাল অর্থ,—মনুষ্য-জীবনের করণীয় মাত্র। চাকুরী, কার্য্যের অন্তর্ভূত। বিদ্যাসাগর মহাশয়, যখন সংস্কৃত কলেজের পাঠ সমাপন করেন, তখন ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ শূন্য হয়।* বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন বীরসিংহ গ্রামে। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের তাৎকালিক সেক্রেটরী মার্সেল্ সাহেব, তাঁহাকে তথা হইতে আনাইয়া, এই পদে অভিষিক্ত করেন। এই খানে মার্সেল সাহেবের গুণগ্রাহিতার একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজনীয়।

প্রধান পণ্ডিতের পদ শূন্য হওয়ায়, অনেকেই সেই পদের প্রার্থী হন। কলিকাতা বহুবাজার-মলঙ্গাপাড়া-নিবাসী কালিদাস দত্ত, মার্সেল্ সাহেবের সবিশেষ সুপরিচিত ছিলেন।

* এই কলেজ ১৮০০ খৃষ্টাব্দে (১২০৭ সালে) প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অকৃত্রিম বন্ধু শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, মার্সেল্ সাহেব, কালিদাস বাবুকে বড় ভালবাসিতেন। কালিদাস বাবুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহার এক জন পরিচিত পণ্ডিত, ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের প্রধান-পণ্ডিত-পদে নিযুক্ত হন। মার্সেল্ সাহেব কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি জানিতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন; অধিকন্তু এক জন অসামান্য-শক্তিশালী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। কালিদাস বাবু, সাহেবের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, দ্বিরুক্তি করিলেন না; বরং আনন্দ সহকারে সাহেবের সে সংপ্রস্তাবের সম্পূর্ণ পোষকতা করেন। কালিদাস বাবুও ঈশ্বরচন্দ্রের দক্ষতা ও বিদ্যা-বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে আদৌ সন্দিহান ছিলেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের প্রধান পণ্ডিত করা, মার্সেল্ সাহেবের একান্ত ইচ্ছা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা এ সংবাদ পাইয়া, বীরসিংহ গ্রাম হইতে পুত্রকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। মার্সেল্ সাহেবের এই গুণগ্রাহিতা দেখিয়া, অনেকেই সাহেবকে ধন্যবাদ করিয়াছিলেন। সত্য সত্যই মার্সেল্ সাহেব প্রকৃত সহৃদয় গুণগ্রাহী লোক ছিলেন। তদানীন্তন সিবিলিয়ান্, সওদাগার প্রভৃতি সকল সাহেব-সম্প্রদায়ের এইরূপ সহৃদয়তা ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রায়ই পাওয়া যাইত। এখন আমাদের অদৃষ্ট-দোষ বলিতে হইবে, অনেকটা

বিপরীত প্রমাণই প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। এরূপ হইবার কারণ কি? এ সম্বন্ধে দুই মত আছে। এক মত এই, পূর্ব্বে উচ্চ-বংশীয় সাহেবেরাই সিবিলিয়ান্ মনোনীত হইয়া আসিতেন। তাঁহাদের দৃষ্টি ও প্রবৃত্তি অনেক উচ্চ ছিল। নেটিভ্‌কে তাঁহারা ঘৃণা করিতেন না। এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ফলে বংশাবংশের বিচার নাই; * সুতরাং দৃষ্টি-প্রবৃত্তিরও তারতম্য ঘটিয়াছে। আর এক মত এই, এখনকার ইংরেজি শিক্ষিত-সম্প্রদায় সাম্যবাদ-মন্ত্রের প্রভাবে অভিভূত হইয়া, সাহেবদের সঙ্গে সমান সম্মান-ভাগী হইতে চাহেন; সাহেব-সম্প্রদায় কিন্তু সে সাম্য-সম্মানের সীমান্তর্ভূত না হইয়া "নেটিভ্‌দের" নিকট অধিকতর সম্মান পাইবার প্রত্যাশা করেন। ঠিক্ সে সম্মানটী পান না বলিয়াই তাঁহারা অধুনা নেটিভ্‌দের প্রতি বিরক্ত ও বিরূপ। ইল্‌বার্ট-বিলের আন্দোলন ফল, ইহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের প্রধান পণ্ডিতের বেতন ৫০ পঞ্চাশ টাকা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বে মধুসূদন তর্কালঙ্কার এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পদ প্রাপ্ত হন।

বিলাত হইতে যে সকল সিবিলিয়ান্, ভারতে চাকুরী করিতে আসিতেন, তাঁহাদিগকে এই ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দ্দূ ও পার্শী শিখিতে হইত। ইহাতে উত্তীর্ণ হইতে

* ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বা ১২৬১ সালে নির্ব্বাচন-প্রথার পরিবর্ত্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এই প্রথা এখনও প্রচলিত।

পারিলে, তাঁহারা কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিতেন। এই সকল ভাষার সাহেব-পরীক্ষকদিগকে সাহায্য করিবার এবং সিবিলিয়ানদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য পণ্ডিত ও মৌলবী নিযুক্ত থাকিতেন। বলা বাহুল্য, যে সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে প্রধান পণ্ডিত হন, সে সময় এখনকার মত বিলাতে, প্রতিযোগিনী সিবিলিয়ান্-পরীক্ষা ছিল না। তখন মনোনীত হইয়া, তত্রত্য "হালিবরী কলেজে" পড়িতে হইত এবং তৎপরে সিবিলিয়ান্ হইয়া, এ দেশে আসিতে হইত। এই সকল সিবিলিয়ান্ তখন "রাইটার্স অব্ দি কোম্পানী" নামে অভিহিত হইতেন। এই জন্য তাঁহারা যে বাড়ীতে থাকিতেন, তাহার নাম ছিল, "রাইটার্স বিল্ডিং"। এই "রাইটার্স বিল্ডিং" হইতে বর্ত্তমান "রাইটার্স বিল্ডিং" নাম। এখন কলিকাতার যেখানে "রাইটার্স বিল্ডিং" অবস্থিত, তদানীন্তন "রাইটার্স বিল্ডিং" সেই খানেই ছিল। সিবিলিয়ান্গণ এই "রাইটার্স বিল্ডিংে" বাস করিতেন। এখানে সিবিলিয়ান্ সাহেবদের নাচ, ভোজ, আমোদ-প্রমোদ যথারীতি সম্পন্ন হইত। বাড়ীর মধ্যস্থলে, "ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ" ও তাহার "আফিস্" ছিল। আফিসে পণ্ডিত ও মৌলবী ব্যতীত, "হেড্ রাইটার" বা "কেসিয়ার" এবং তদধীন দুই তিনটী কেরাণী কার্য্য করিতেন।

ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ, সিবিলিয়ানদের আশ্রয়-স্থল ছিল; এ জন্য ইহা সাহেব সম্প্রদায়ের নিশ্চিতই চির-স্মরণীয়। কিন্তু ইহা অপর বিশেষ কারণেও বাঙ্গালীর হৃদয়ে চির-জাগরূক

থাকিবে। এই ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে, বিদ্যাসাগরের ইহ-যুগ-সম্মত ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য-গৌরবের সূত্রপাত হয়। ইহার পরিচয়, পাঠক, পরবর্ত্তী ঘটনাবলীতে প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের চির-স্মরণ-যোগ্যতার অন্য গুরুতর কারণ আছে। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ, বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের পুষ্টি-কল্পে অন্যতম শক্তিশালী সহায়। বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি-কাল নির্ণয় করা বড় দুরূহ। কেহ বলেন, শ্রীচৈতন্যদেবের সময়েই ইহার সৃষ্টি। তিনি যে কৃষ্ণযাত্রা করিয়াছিলেন, তাহাই গদ্য-সাহিত্য-সৃষ্টি-কল্পে প্রধান সহায়। কেহ বলেন, তাহা নয়; তাহার পরবর্ত্তী কালেই ইহার সৃষ্টি। চৈতন্যমঙ্গল গান হইবার পূর্ব্বে যে "গৌর-চন্দ্রিকা" কীর্ত্তন হইত, তাহা গদ্যে লিখিত ছিল। সেই গদ্যে বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য-স্রোতস্বতীর উৎপত্তি-স্থান। আমাদের পরমাত্মীয় বিশ্বকোষ-প্রকাশক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন, তিনি ৩০০। ৪০০ তিন চারি শত বৎসরের পূর্ব্বে বাঙ্গালা-গদ্যে লিখিত একখানি পুঁথি দেখিয়াছেন। যাহা হউক, তাহা লইয়া এক্ষণে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। * ১৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গদ্য-সাহিত্যের অস্তিত্ব সত্ত্বেও উহা অনেকটা দুর্ব্বল ও নির্জীব ছিল। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, গদ্য-সাহিত্য-পাঠের প্রয়োজনীয়তা-পীড়নে, পাঠ্য গদ্য-সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে দৃষ্টি পতিত হয়।

---

* বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি-পুষ্টি সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ, স্বতন্ত্র পুস্তকে লিখিবার ইচ্ছা আছে।

ফলে ইহার পর অনেকগুলি পাঠ্য গদ্য পুস্তক প্রণীত হইয়াছিল। সেগুলি গদ্য সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে অনেকটা সহায় হইলেও, পূর্ণ পুষ্টির পরিচায়ক নয়। সে পরিচয়, অনেকটা বিদ্যাসাগর-প্রণীত পাঠ্য-পুস্তকে প্রতিভাত। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ গদ্য-সাহিত্যের পুষ্টিকল্পের জন্য বাঙ্গালীর আশীর্ব্বাদ-পাত্র বটে; কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য-পাঠ্যে ধর্ম্মাভাব-প্রণোদনের কতক উত্তর-সাধক।

ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে থাকিয়া, সিবিলিয়ানদিগকে মাসে মাসে পরীক্ষা দিতে হইত। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার একটা সময় নির্দ্ধারিত ছিল। সেই নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, সিবিলিয়ানদিগকে বিলাতে প্রতিগমন করিতে হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় মাসে মাসে পরীক্ষার কাগজ পত্র দেখিতেন। এতদ্ভিন্ন মার্সেল সাহেব, তাঁহার নিকট সংস্কৃত কাব্যাদি পাঠ করিতেন। অধ্যাপনে পণ্ডিত হইলেও, কার্য্যে তাঁহার ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্ক; সুতরাং তাঁহার ইংরেজি শিখিবার প্রয়োজন হইল। তদ্ব্যতীত তাঁহাকে হিন্দী পরীক্ষাও কাগজপত্র দেখিতে হইত। কাজেই হিন্দী শিক্ষারও আবশ্যক হইল। ইংরেজি শিক্ষা অপেক্ষা হিন্দী শিক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজ; কেন না; বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের সঙ্গে হিন্দীর অনেকটা সাদৃশ্য। তিনি মাস-কতক পরিশ্রম করিয়া এক জন হিন্দী ভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট হিন্দী শিখিয়া লইলেন।

ইংরেজি শিক্ষা অপেক্ষাকৃত কষ্টকর; বিশেষতঃ, চাকুরীর

অবস্থায়; কিন্তু বিদ্যাসাগরের মত অসাধারণ শ্রমশীল এবং অসীম অধ্যবসায়ী ব্যক্তির নিকট কোন্ কার্য্য কষ্টকর? তাহা হইলে, অন্যান্য সাধারণের সহিত তাঁহার স্বাতন্ত্র্য রহিল কোথায়? সাধারণের সহিত অসাধারণের স্বাতন্ত্র্য সর্ব্ব সময়ে, সর্ব্ব দেশে। তাহা না হইলে, ৫০ পঞ্চাশ টাকার বেতনভোগী এক জন সামান্য কর্ম্মচারী, সংসারের সর্ব্বোচ্চ পথে, ভবিষ্য বংশধরদিগের জন্য সজীব পদাঙ্ক রাখিয়া যাইতে পারেন কি? বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ ছিলেন, প্রথম "প্রিণ্টার"; রালে ছিলেন, সামান্য সৈনিক পুরুষ; ইংলণ্ডের কবি-গুরু চসর ছিলেন, সৈনিক পুরুষ; সেক্সপিয়র ছিলেন, নাট্যশালার নট; আর কত নাম করিব? ইহাঁরা যে গুণে বড়, বিদ্যাসাগর সেই গুণে বড়। ইহাঁদের স্বাতন্ত্র্য সাধারণ হইতে যে গুণে, বিদ্যাসাগরেরও স্বাতন্ত্র্য সেই গুণে। সেই গুণ,— শ্রমশীলতা ও একাগ্রতা।

পৃথিবীতে যাঁহারা সর্ব্বোচ্চ প্রতিভাশালী বলিয়া পরিচিত, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিলে, বোঝা যাইবে, তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কর্ম্মশীল; এমন কি, তাঁহাদের অধিকাংশকে অতি হীন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছে। এই জন্যই বলিতে হয়, প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ, মানুষের সহিষ্ণুতায় এবং শ্রমশীলতায়। প্রতিভার কার্য্যে বিরাম বা বিরতি কোন কালে থাকে না। ওয়াসিংটন্ বাল্য কালে পাঠ্যাবস্থায় অবসরে রসিদ, ছাড়, হাতচিঠী প্রভৃতি নকল করিতেন। বিদ্যাসাগরের প্রতিভা বাল্য কাল হইতেই পরিপুষ্ট, তাঁহার শ্রমশীল-

তায়। পাঠ্যাবস্থায় কাজ না থাকিলে এবং আবশ্যক না হইলেও, যিনি অবসরে, পুঁথি নকল করিয়া কার্য্যানুরাগিতার পরিচয় দিতেন, তাঁহার পক্ষে এই অবস্থায় চাকুরীর অত্যাবশ্যক ইংরেজি শিক্ষাটা আর কষ্টকর কি? বিখ্যাত ইতিহাসলেখক নিবো চাকুরী করিতে করিতে, অবসর সময়ে আরব্য, রোমান এবং অন্যান্য "শ্লাবনিক" ভাষা শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন।

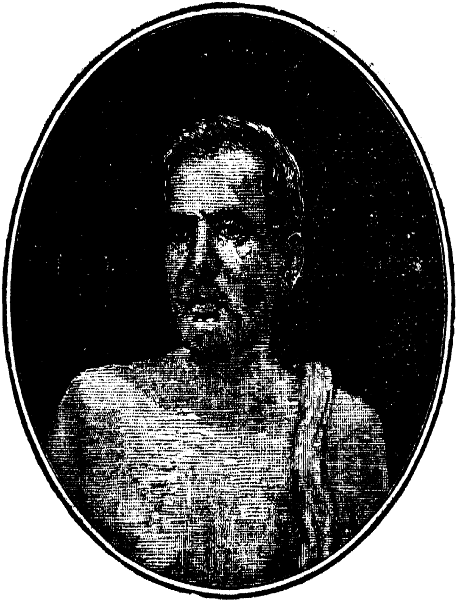
বিদ্যাসাগরের ন্যায় এক জন অতি-শ্রমশীল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যে ইংরেজিটা শিখিয়া লইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? ইংরেজি শিক্ষার উপর তাঁহাকে আরও গুরুতর পরিশ্রম-সাপেক্ষ কার্য্যের ভার লইতে হইয়াছিল। এই সময়, তাঁহার নিকট সন্ধ্যাকালে ও প্রাতঃকালে অনেকেই সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কাব্যাদি পড়িতে আসিতেন। এই সকল লোককে পড়াইয়া, তিনি আবার স্বয়ং ইংরেজি পড়িতেন। এ অসাধারণ অধ্যবসায়ের কথা ভাবিলে, বাস্তবিকই বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়। কখনই বা তিনি সময় পাইতেন, আর অত গুরুতর পরিশ্রমই বা কেমন করিয়া করিতেন?

এই সময় তাঁহার বাসা ছিল, বহুবাজার পঞ্চাননতলা নিতাই সেনের বাড়ীতে। এই বাড়ীর বাহিরে দুইটী বড় বড় ঘর ছিল। একটী ঘরে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতারা থাকিতেন এবং অপর ঘরে অন্যান্য আত্মীয়েরা বাস করিতেন। পরে এখান হইতে অতি নিকটেই হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা বাড়ীতে বাসা উঠিয়া যায়।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইংরেজি শিখিবার বাসনা বড়ই বলবতী হয়। যেখানে ইচ্ছা, সেইখানেই উপায়। তিনি ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রত্যহ প্রাতে ইংরেজি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। নীলমাধব বাবু, রাজকৃষ্ণ বাবুর পিস্‌তুতো ভাই। ইনি তালতলা-নিবাসী প্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্র ছিলেন। দুর্গাচরণ বাবু তখন ডাক্তার হন নাই; হেয়ার সাহেবের স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। দুর্গাচরণ বাবু এই সময় প্রায়ই প্রত্যহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় আসিতেন। ক্রমে তাঁহার সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্দ হয়। দুর্গাচরণ বাবু ডাক্তার হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাঁহার হৃদয়ের কার্য্যে অনেক সহায়তা করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, দুর্গাচরণ বাবুর সহায়তায় ও চিকিৎসায় অনেক আর্ত্ত-পীড়িতের কষ্ট নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেন। নীলমাধব বাবুর নিকট কিছু দিন ইংরেজি শিখিয়া, তিনি হিন্দু কলেজের অন্যতম ছাত্র রাজনারায়ণ গুপ্তের নিকট রীতিমত ইংরেজি শিক্ষা করেন।* ইংরেজি অঙ্ক শিখিবার জন্যও বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায়ই শোভাবাজার-রাজবাড়ীতে শ্রীযুক্ত

---

* রাজনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট মাসিক ১৫৲ টাকা বেতন পাইতেন, যিনি বলেন, তাঁহার কথা নির্ব্বিবাদ নয়; কেন না রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, তিনি প্রত্যহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় আহার করিয়া কলেজে পড়িতে যাইতেন এবং মাসে মাসে যৎকিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক স্বরূপ পাইতেন।



শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ বসু।

আনন্দচন্দ্র বসু, অমৃতলাল মিত্র এবং শ্রীনাথ ঘোষের নিকট যাইতেন।* অঙ্ক শিখিবার জন্য, তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টা ছিল; কিন্তু বিষয়টা তাঁহার তত প্রীতিপ্রদ হয় নাই; অথচ ইহাতে অনেকটা সময় অনর্থক অতিবাহিত হইত; তদুপরি বিষয়টা তাঁহার নীরস বলিয়া বিবেচিত হইত; অগত্যা তিনি তাহা হইতে বিরত হন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, অঙ্কবিদ্যা-চর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহার চরম ফল,—আত্মোৎকর্ষ। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিমিশ্র শিক্ষা-প্রণালীতে অনেকেরই আত্মোৎকর্ষে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। ইংলণ্ডের কোন কোন কর্তৃপক্ষ, এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। আধুনিক বিমিশ্র শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে, অনেকেরই স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি-পরিচালনার সুযোগ ঘটিয়াছিল। সেই জন্য অনেকেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-সম্মত বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, আত্মোৎকর্ষের পরিচয় দিতে পারিতেন। এ আত্মোৎকর্ষ তত্ত্ব-সম্বন্ধে ১৩০১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাধনায়' ‡

---

* অমৃতলাল বাবু শোভাবাজারের ৺ রাজা-রাধাকান্ত বাহাদুরের মধ্যম জামাতা, শ্রীনাথ বাবু কনিষ্ঠ জামতা এবং আনন্দকৃষ্ণ বাবু দৌহিত্র। আনন্দ বাবুর জননী, রাজা-বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ কন্যা ছিলেন। ইঁহাদের সকলের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধুত্ব ছিল। ইঁহারা হিন্দু কলেজে পড়িয়া ইংরেজিতে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে কেবল আনন্দ বাবু জীবিত আছেন।

‡ মাসিক পত্রিকা—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত।

চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কয়েকটী যুক্তি-সঙ্গত কথা বলিয়াছেন। কথাগুলি এই,—

"যদি কোন পাঠশালা বা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার অধীনস্থ ছাত্রদিগকে এক ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করে অর্থাৎ তাহাদের প্রত্যেকের নিজত্ব না ফুটাইয়া তুলিয়া যদি একটা সাধারণ আদর্শে সকলকেই গঠিত করিবার প্রয়াস পায়, তবে বুঝা যায় যে, সে পাঠশালা বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃত শিক্ষাবিধানে নিতান্ত অযোগ্য ও অসমর্থ। প্রকৃত শিক্ষা কি? না, আত্মোৎকর্ষ-সাধন—উন্নতি-সাধন। যাহা আত্মার অভ্যন্তরে গূঢ়ভাবে থাকে, তাহা উপর দিকে আনা—উন্নয়ন করা—নিজত্বের কর্ষণ করা—নিজেকে নিজের যথার্থ অনুরূপ করিয়া তোলা। কোন ব্যক্তিবিশেষকে একটা স্থানীয় আদর্শের কিম্বা লৌকিক আদর্শের অনুরূপ করিয়া গঠন করিতে গেলে, শিক্ষার উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়।"

স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি-প্রণোদনে আত্মোৎকর্ষের কিরূপ সুবিধা, তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, পুত্রব্লো ও কলরাডোর সরকারী পাঠশালার "ব্যক্তিগত শিক্ষা প্রণালীর" কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এখানকার বিদ্যালয়ে, "প্রত্যেক ঘরে কতকগুলি ছাত্র পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আপন আপন কাজ করে, শিক্ষক তাহাদিগকে সারি সারি দাঁড় করাইয়া কিংবা মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা করিয়া অথবা লেকচার দিয়া কিংবা বাখ্যা করিয়া সময় নষ্ট করেন না। তিনি কেবল প্রত্যেকের ডেস্কের নিকট গিয়া ছাত্রদিগের সহকারি-স্বরূপ হইয়া উৎসাহ ও উপদেশ প্রদান করেন।"

শিক্ষা-সাধন-সম্বন্ধে যে কথ, বৃত্তি-নির্ব্বাচন-সম্বন্ধেও সেই কথা। এতৎ-সম্বন্ধেও ১৩০০ সালের চৈত্র মাসের সাধনায়

জ্যোতিরিন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন,—"অনেক সময় দেখা যায়, যে কর্ম্ম যাকে সাজে, সে কর্ম্ম, সে পায় না, বা করে না। যে ডাক্তার হইবার উপযুক্ত, সে হয় তো আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে; যে আইন ব্যবসায়ের উপযুক্ত, সে হয় তো ইঞ্জিনিয়রের কাজ করিতেছে। এইরূপ অনুপযোগী কাজে প্রবেশ করিয়া কেহই সফলতা লাভ করিতে পারে না,—তাহার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইয়া যায়।" জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর মতে, কে কোন্ কাজের উপযুক্ত, তাহা তাহার দৈহিক ও মানসিক লক্ষণে কতক বোঝা যায়। কোন কোন য়ুরোপীয় দার্শনিকেরও এই মত। কিন্তু এরূপ মত-মীমাংসায় অনেক সময় ব্যত্যয় দেখা যায়। ডাক্তার গিলবার্ট মীমাংসা করেন, যাঁহারা বুদ্ধিজীবী ও প্রতিভাশালী, তাঁহাদের মস্তক বৃহৎ। কিন্তু আলেক্জাণ্ডর্, জুলিয়স্ সিজর্, ফ্রেডারিক দি গ্রেট্, বায়রন্, বেকন্, প্লেটো, আরিষ্টটল্ প্রভৃতি প্রতিভাশালী লোকদিগের মস্তক সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, বিপরীত মীমাংসায় উপস্থিত হইতে হয়।

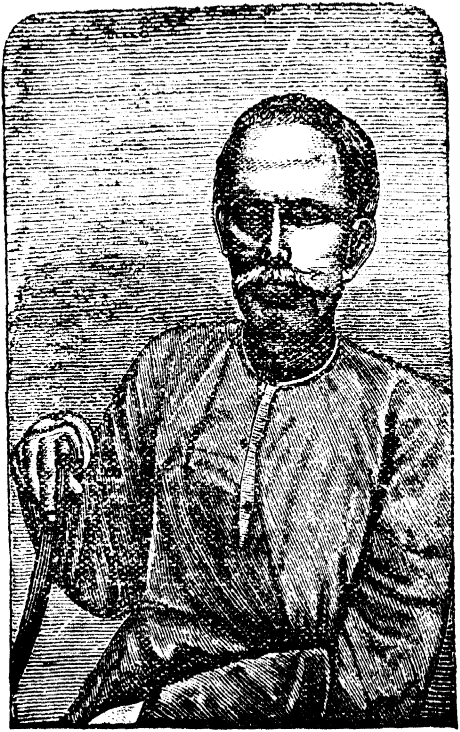
এরূপ অবস্থায়, দৈহিক-মানসিক লক্ষণ-নির্ণয়ে, বৃত্তি-নির্ব্বাচনের অব্যর্থতা স্বীকার করিতে একটা দ্বিধা হয় না কি? বংশ-পরম্পরাগত বৃত্তি-সাধনায় সেরূপ দ্বৈধ ভাব থাকিবার কথা নয়। যাঁহারা এ কথা মানিবেন, তাঁহারা হিন্দুর জাতি-ভেদেরই গৌরব ঘোষণা করিবেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় অঙ্ক-শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, আনন্দকৃষ্ণ বাবুর নিকট, সেক্সপীয়র পড়িতেন। সেক্সপীয়র পড়িবার জন্য

প্রায়ই তিনি শোভাবাজার-রাজবাটীতে যাতায়াত করিতেন। এই সময় তিনি রাজা রাধাকান্ত দেব-বাহাদুরের নিকট পরিচিত হন। এক দিন মধ্যাহ্নে রাজা বাহাদুর, আহারান্তে মুখ-প্রক্ষালন করিতেছিলেন, সেই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজ-বাটীতে ত° নন্দকৃষ্ণ বাবুর নিকট যাইতেছিলেন; হঠাৎ তাঁহার প্রতি রাজা-বাহাদুরের দৃষ্টি পতিত হয়। তিনি পার্শ্বস্থ একটী আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করেন,—"ঐ যে হৃষ্ট-পুষ্ট তেজঃপুঞ্জময় ব্রাহ্মণ-যুবকটী যাইতেছেন, উটী কে? উহঁার মুখে যেন প্রতিভার প্রভা ফাটিয়া পড়িতেছে। উহঁাকে ডাকিয়া আন তো।" আত্মীয়টী তখনই বিদ্যাসাগরকে রাজা-বাহাদুরের নিকটে ডাকিয়া লইয়া যান। রাজা-বাহাদুর, তখন তাঁহার নিকট তাঁহার আনুপূর্ব্বিক পরিচয় গ্রহণ করেন। তিনি বিদ্যাসাগরের কথা-বার্ত্তায় যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়াও বুঝিয়াছিলেন। তখন তিনি,—"বিদ্যাসাগর"-উপাধিধারী একটী ব্রাহ্মণ-যুবক-মাত্র। সে "বিদ্যাসাগরে" বিশ্ব-বিশ্রুতি সংঘটিত হয় নাই। তখনকার বিদ্যাসাগর, এখনকার বিদ্যাসাগর ছিলেন না।

এই শোভাবাজার-রাজবাটীতে অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় হয়। তখন অক্ষয় বাবু তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।* তত্ত্ববোধিনীর সহিত

* কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যেই ১৭৬১ শকে (১২৪৬ সালে) ২১এ কার্ত্তিকে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। "১৭৬৫ শকের



অক্ষয়কুমার দত্ত।

আনন্দকৃষ্ণ বাবুপ্রমুখ অন্যান্য অনেক কৃতবিদ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। আনন্দকৃষ্ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি,—"বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় বাবু উভয়েই রাজ-বাড়ীতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইংরেজি অঙ্ক ও সাহিত্য পড়িতে যাইতেন। তাঁহারা ছাদের উপর বসিয়া খড়ি দিয়া, অঙ্ক পাতিয়া, জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতেন; মাস পাঁচ ছয় পরে, বিদ্যাসাগর অঙ্ক বিদ্যা পরিত্যাগ করেন। ইহাতে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। অতঃপর তিনি সেক্সপীয়র পড়িতেন। ইহা শীঘ্রই আয়ত্তও করিয়াছিলেন।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যিনি যাহা লিখিতেন, আনন্দকৃষ্ণ বাবুপ্রমুখ কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগকে তাহা দেখিয়া, আবশ্যকমত সংশোধনাদি করিয়া দিতে হইত। এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় আনন্দ বাবুর বাড়ীতে বসিয়াছিলেন, এমন সময় অক্ষয়কুমার বাবুর একটা লেখা তথায় উপস্থিত হয়। আনন্দ বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অক্ষয়কুমার বাবুর লেখাটা পড়াইয়া শুনাইয়া দেন। অক্ষয়কুমার বাবু পূর্ব্বে যে সব অনুবাদ করিতেন, তাহাতে কতকটা ইংরেজি ভাব থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়, অক্ষয়কুমার বাবুর লেখা দেখিয়া বলিলেন,—"লেখা

(১৮৪৩ খৃঃ) ভাদ্র মাস হইতে শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির যত্নে ঐ সভা হইতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' নামে এক মাসিক-পত্র প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বেই অক্ষয় বাবু তত্ত্ববোধিনী সভার এক সভ্যকার্য্যে ব্রতী হইয়া, ১৭৭৭ শক পর্য্যন্ত ১২ বৎসর কাল অবাধে ঐ কার্য্য সম্পাদন করেন।—শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন-কৃত "বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব।" ২৫৫ পৃষ্ঠা।

বেশ বটে ; কিন্তু অনুবাদের স্থানে স্থানে ইংরেজি ভাব আছে।” আনন্দকৃষ্ণ বাবু, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাহা সংশোধন করিয়া দিতে বলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সংশোধন করিয়া দেন। এইরূপ তিনি বার কতক সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। অক্ষয় বাবু সেই সুন্দর সংশোধন দেখিয়া, বড়ই আনন্দিত হইতেন। তখনও কিন্তু তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জানিতেন না। লোক দ্বারা প্রবন্ধ প্রেরিত হইত এবং লোক দ্বারা ফিরিয়া আসিত। তিনি সংশোধিত অংশের বিশুদ্ধ-প্রাঞ্জল বাঙ্গালা দেখিয়া ভাবিতেন,—“এমন বাঙ্গালা কে লেখে ?” কৌতূহল-নিবারণার্থ তিনি এক দিন স্বয়ং আনন্দ বাবুর নিকট উপস্থিত হন ; এবং তাঁহারই নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিচয় পান। আনন্দকৃষ্ণ বাবুর পরিচয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত পরে তাঁহার আলাপ-পরিচয় হয়। ইহার পর অক্ষয় বাবু যাহা কিছু লিখিতেন, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখাইয়া লইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সংশোধন করিয়া দিতেন। পরে পরস্পরের প্রগাঢ় সৌহার্দ্দও সংগঠিত হয়।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে অপূর্ব্ব শুভ-সংযোগ। এ শুভ-সংযোগের দিন বাঙ্গালীর চির স্মরণীয়। উভয়েই বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আডিসন্-ষ্টীলের শুভ-সংযোগে ইংরেজি সাহিত্য-প্রসারের শুভ লক্ষণ ভাবিয়া, আজিও বিলাতবাসী ইংরেজ আনন্দে উৎফুল্ল হন। হয় তো অনেক আধুনিক ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীও, এই শুভ-সংযোগের



শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দিনকে জাতীয় উৎসবের দিন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু বাঙ্গালার অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের এ শুভ-সংযোগ, কয় জন বাঙ্গালী স্মরণ করেন?

অক্ষয়কুমার বাবুর প্রস্তাবে এবং তত্ত্ববোধিনী সভার অন্যান্য সভ্যগণের সমর্থনে বিদ্যাসাগর মহাশয় তত্ত্ববোধিনী সভার অন্তর্গত "পেপার-কমিটীর" অন্যতম সদস্য-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। * এই সূত্রে তিনি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অত্যন্ত মানাস্পদ হইয়াছিলেন। বলিয়া রাখি, ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন সম্বন্ধ ছিল না। "পেপার-কমিটী" বা

* "কিছু দিন তত্ত্ববোধিনী সভার অন্তর্গত গ্রন্থাধ্যক্ষ সভা নামে একটী সভা ছিল। ঐ সভার সভ্যদের নাম গ্রন্থাধ্যক্ষ এবং অক্ষয় বাবুর উপাধি গ্রন্থ-সম্পাদক ছিল। তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে যে কোন পুস্তক বা প্রবন্ধ মুদ্রিত হইত, তাহা গ্রন্থাধ্যক্ষদের সম্মতি লইয়া মুদ্রিত করিতে হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা থাকে। তত্ত্ববোধিনী সভা দেবেন্দ্র-বাবুর স্নেহ-পাত্রী। তিনি অন্যত্র কোন সদ্ব্যবস্থা দেখিলে, তাহা ঐ সভাতেও প্রবর্ত্তিত করিবার ইচ্ছা করিতেন। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর পেপার কমিটী দেখিয়া, তত্ত্ববোধিনী সভাতেও তদনুরূপ গ্রন্থাধ্যক্ষ-সভা প্রবর্ত্তিত করেন। ইহাতে উপকারও দর্শিয়াছিল। অবিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত বা অন্যরূপে দূষিত, কোন প্রবন্ধ বা গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে পারিত না। এমন কি, গ্রন্থাধ্যক্ষ-বিশেষের বিরচিত প্রবন্ধও কখন কখন অধিকাংশের মতক্রমে অগ্রাহ্য হইয়াছে। আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধাপ্রসাদ রায়, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ এই সভার সভ্য ছিলেন। বিদ্যাসাগরের সহিত এই অন্তরবাধীন অক্ষয় বাবু আপনাকে উপকৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।"—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি প্রণীত "অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত" ৫০ ও ৫২ পৃষ্ঠা।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল, কেবল সাহিত্যের সংস্রবে, ধর্ম্মের টানে নহে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কোন প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে, অক্ষয় বাবুকেও তৎসম্বন্ধে "পেপার-কমিটী"র সভ্যদিগের মতামত লইতে হইত। তাহার একটী প্রমাণ নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

"কবির পন্থিদিগের কৃতান্ত-বিষয়ক পাণ্ডুলেখ্য প্রেরণ করিতেছি। যথাবিহিত অনুমতি করিবেন।"

তত্ত্ববোধিনী সভা, ১৭৭০ শক, ১৪ই আষাঢ়। } শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত, গ্রন্থ-সম্পাদক।

"প্রেরিত প্রস্তাব-পাঠে পরিতোষ পাইলাম। ইহা অতি সহজ ও সরল ভাষায় সুচারুরূপে রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে। অতএব পত্রিকায় প্রকাশ-বিষয়ে আমি সন্তুষ্ট-চিত্তে সম্মতি প্রদান করিলাম। ইতি—

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

"শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উক্ত পাণ্ডুলেখ্যের স্থানে স্থানে যে সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা অতি উত্তম হইয়াছে।"

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

অক্ষয়কুমার দত্তেরই যত্নে বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৭৭০ শকের ফাল্গুন মাসে বা ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৬৭ সংখ্যায় মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। আদিপর্ব্বের কিয়দংশ-মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। অনুবাদের একটু নমুনা এই ;—

নারায়ণ ও সর্ব্বনরোত্তম নর এবং সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

কোন কালে কুলপতি শৌনক নৈমিষারণ্যে দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞানুষ্ঠান

করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে এক দিবস ব্রত-পরায়ণ মহর্ষিগণ দৈনন্দিন কর্ম্মাবসানে একত্র সমাগত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে কাল যাপন করিতেছেন, এই অবসরে সূত লোমহর্ষণ-পুত্র পৌরাণিক উগ্রশ্রবা বিনীত ভাবে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বিগণ দর্শনমাত্র অদ্ভুত কথা শ্রবণ-বাসনাপরবশ হইয়া, তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন। উগ্রশ্রবা বিনয়নম্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক সেই সমস্ত মুনিদিগকে তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও যথোচিত অতিথি-সৎকারান্তে বসিতে আসন প্রদান করিলেন। পরে সমুদায় ঋষিগণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলে, তিনিও নির্দ্দিষ্ট আসনে নিবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তাঁহার শ্রান্তি দূর হইলে, কোন ঋষি কথাপ্রসঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে পদ্মপলাশলোচন সূতনন্দন! তুমি এক্ষণে কোথা হইতে আসিতেছ এবং এত কাল কোথায় কোথায় ভ্রমণ করিলে বল।" *

কিছু দিন অনুবাদ মুদ্রিত হইবার পর, কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্মতি লইয়া মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশ করিতে থাকেন। কালীপ্রসন্ন বাবু ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন,—

"মহাভারতানুবাদ সময়ে অনেক স্থলে অনেক কৃতবিদ্য মহাত্মার নিকট আমাকে ভূয়িষ্ঠ সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট চিরজীবন কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ রহিলাম। আমার অদ্বিতীয় সহায় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং মহাভারতের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং অনুবাদিত প্রস্তাবের কিয়দংশ কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের অধীনস্থ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রচারিত ও কিয়দ্ভাগ পুস্তকাকারেও মুদ্রিত করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি মহাভারতের অনুবাদ করিতে উদ্যত

* বলা বাহুল্য, ইহার পূর্ব্বে মহাভারতের এরূপ বঙ্গানুবাদ হয় নাই।

হইয়াছি শুনিয়া, তিনি কৃপাপরবশ হইয়া সরল-হৃদয়ে মহাভারতানুবাদে ক্ষান্ত হন। বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদে ক্ষান্ত না হইলে, আমার অনুবাদ হইয়া উঠিত না। তিনি কেবল অনুবাদেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই। অবকাশানুসারে আমার অনুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন ও সময়ে সময়ে কার্য্যোপলক্ষে যখন আমি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিতাম, তখন স্বয়ং আসিয়া আমার মুদ্রাযন্ত্রের ও ভারতানুবাদের তত্ত্বাবধারণ করিয়াছেন। ফলতঃ বিবিধ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পাঠ্যাবস্থাবধি আমি যে কত প্রকারে উপকৃত হইয়াছি, তাহা বাক্য বা লেখনী দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না।" মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব্ব অনুবাদের উপসংহার—(১৭৮৮ শক)।

মহাভারত অনুবাদ করিবার পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় "বাসুদেব-চরিত" ও "বেতাল-পঞ্চ বিংশতি", এই দুই খানি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। ঐ দুই গ্রন্থে, অনুবাদের কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তাহার বিস্তৃত আলোচনা অন্য অধ্যায় হইবে। এই অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে মহাভারতের কথা এইখানেই প্রকাশ করিলাম। তত্ত্ববোধিনী সংস্রব ত্যাগের কথাটাও এইখানে বলিয়া রাখি।

কয়েক বৎসর পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় তত্ত্ববোধিনীর সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার উপযুক্ত সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকতা ত্যাগ করিলে, কানাইলাল পাইনের প্রস্তাবে ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমর্থনে সম্পাদককে বৃত্তি দিবার প্রস্তাব হয়। সেই সময় বাবু

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহাতে এই বলিয়া প্রতিবাদী হন, কেবল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আয়ে যদি বৃত্তি দেওয়া সম্ভাবিত হয়, তবে তাহা হইতে পারে; তত্ত্ববোধিনী সভার আয় ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আয় একত্র মিলিত করিয়া তাহা হইতে দেওয়া অবিধি। সাধারণ সভ্যের মতানুসারে কিন্তু উহার বিপরীত ব্যবস্থা ধার্য্য হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে অক্ষয়কুমারকে মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি দেওয়াইবার প্রধান উদ্যোগী। 'অক্ষয় বাবুর অসাধ্য রোগ তত্ত্ববোধিনী সভার ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একটী বিপত্তির বিষয়, ইহা বলা বাহুল্য। ঐ সভার সভ্যেরা তন্নিমিত্ত অতিমাত্র দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, ইহাও বলা অতিরিক্ত। তাঁহারা ইহাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। দেশমান্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এ বিষয়ের জন্য বিশেষ উদ্যোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহা কর্ত্তৃক বিরচিত যে বিষয়ের বৃত্তান্ত ১৭৭৯ সতরশ উনআশী শকের (১২৬৪ সালের) কার্ত্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশিত হয়; পশ্চাৎ উদ্ধৃত হইতেছে,—

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারিত হওয়াতে, এতদ্দেশীয় লোকদিগের যে নানা গুরুতর উপকার লাভ হইয়াছে, ইহা বোধবিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। আদ্যোপান্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলে, শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সৃষ্টির প্রধান উদ্যোগী এবং এই মহোপকারিণী পত্রিকার অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি লাভের অদ্বিতীয় কারণ বলিয়া বোধ হইবে। তাঁহারই যত্নে ও পরিশ্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্ব্বত্র এরূপ আদর-ভাজন ও সর্ব্ব-সাধারণের এরূপ উপকার-সাধন হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ তিনি অনন্য-মনা ও অনন্য-কর্ম্মা হইয়া

কেবল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদনেই নিয়ত নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। তিনি এই পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, অবিশ্রান্ত অত্যুৎকট পরিশ্রম দ্বারা শরীরপাত করিয়াছেন, বলিলে বোধ হয়, অত্যুক্তি-দোষে দূষিত হইতে হয় না। তিনি যে অতি বিষম শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়া, দীর্ঘকাল অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তাহা কেবল ঐ অত্যুৎকট মানসিক পরিশ্রমের পরিণাম, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব যিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নিমিত্ত শরীরপাত করিয়াছেন, সেই মহোদয়কে সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করা ও তাঁহার প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা আবশ্যক; না করিলে, তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের ব্যতিক্রম হয়। দীর্ঘকাল দুরন্ত-রোগে আক্রান্ত থাকাতে, অক্ষয়কুমার বাবুর আয়ের সঙ্কোচ, ব্যয়ের বাহুল্য এবং তন্নিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ঘটিবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে। এ সময় কিছু অর্থ-সাহায্য করিতে পারিলে, প্রকৃতরূপে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হয়, এই বিবেচনায় গত শ্রাবণ মাসের দ্বাদশ দিবসীয় বিশেষ সভায় শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল পাইন প্রস্তাব করেন যে, তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে কিছুকালের জন্য অক্ষয় বাবুকে সাহায্য প্রদান করা যায়। তদনুসারে অদ্য সমাগত সভ্যেরা নির্দ্ধারিত করিলেন, অক্ষয়কুমার বাবু যত দিন পর্য্যন্ত সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ-শরীর হইয়া পুনরায় পরিশ্রমক্ষম না হন, তত দিন তিনি সভা হইতে আগামী আশ্বিন মাস অবধি পঞ্চবিংশতি মুদ্রা মাসিক পাইবেন। আর ইহাও নির্দ্ধারিত হইল যে, এই প্রতিজ্ঞার প্রতিলিপি অক্ষয়কুমার বাবুর নিকট প্রেরিত হয় এবং সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও অবিকল মুদ্রিত হয়।"
—(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৭৯ শক, কার্ত্তিক মাস) *

---

* শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি-প্রণীত "বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত" ২৩৩ ও ২৩৪ পৃষ্ঠা।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তত্ত্ববোধিনীর সম্পর্ক ত্যাগ সম্বন্ধে নানাজনে নানাকথা বলেন। আমরা বিশ্বস্ত-সূত্রে এই কথা শুনিয়াছি ;—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত অক্ষয়কুমার দত্তের মত বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, তত্ত্ববোধিনীর সম্পর্ক ত্যাগ করাই অক্ষয়কুমার দত্তের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ বাবুরও তাহা বড় অনভিপ্রেত ছিল না। তবে সভার অন্যান্য সভ্যের চেষ্টা ও উদ্যোগে অক্ষয়কুমার দত্ত পেন্‌সন্ লইয়া বিদায় গ্রহণ করেন। এ কথা আমরা উপরে বলিয়া আসিয়াছি। তত্ত্ববোধিনীর সহিত অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পর্ক-ত্যাগে বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। এই জন্যই তত্ত্ববোধিনীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধারও একটু হ্রাস হইয়াছিল। ক্রমে সাহিত্যের সঙ্গে ধর্ম্মভাব বিজড়িত দেখিয়া এবং কোন কোন বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ বাবুর সহিত তাঁহার ঠিক মতমিল হইতেছে না বুঝিয়া, অক্ষয়কুমার দত্তের কিছুকাল পরেই তিনি তত্ত্ববোধিনীর সম্পর্ক ত্যাগ করেন। দুই জন স্বাধীন-চেতা, তেজস্বী-পুরুষের মত সংঘর্ষে পরিণাম এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। এই কারণেই কেশবচন্দ্র সেন-প্রমুখ কয়েক ব্যক্তির সহিত ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বাসায় ইংরেজি শিখিতেন, তখন হাইকোর্টের অন্যতম অনুবাদক শ্যামাচরণ সরকার, রামরতন মুখোপাধ্যায়, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন। তাঁহার

অধ্যাপনা-প্রণালী এমনই কৌশলময় যে, অতি দুরূহ বিষয়ও অল্প দিনের মধ্যে সহজে শিক্ষার্থীদিগের আয়ত্ত হইত। সে শিক্ষা-প্রণালীর কথা শুনিয়া, সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন পণ্ডিত-মণ্ডলীও চমৎকৃত হইতেন। শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি কিরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেন, এবং তাঁহার শিক্ষা দিবার প্রণালীটা কিরূপ ছিল, রাজকৃষ্ণ বাবুর সংস্কৃত শিক্ষা-তত্ত্বটা বিবৃত করিলেই, পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। বুঝিবেন, এই জগতে শ্রমশীল কর্ম্মশূরের অসাধ্য কিছুই নাই।

রাজকৃষ্ণ বাবু বহুবাজার-নিবাসী ৺ হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসার সম্মুখেই ইহাঁর বাড়ী ছিল। তখন ইহাঁর বয়স ১৫।১৬ বৎসর। ইনি হিন্দু কলেজে ইংরেজি পড়িয়া, এই বয়সেই পড়া-শোনা ছাড়িয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত ইহাঁর আলাপ-পরিচয় হওয়াতে, ইনি প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় যাইতেন। এক দিন তিনি দেখিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু, সুর করিয়া, মেঘদূত পড়িতেছেন। সুন্দর সুর-লয়ে উচ্চারিত সেই রসপূর্ণ ও ভাবময় শ্লোকের আবৃত্তি শ্রবণ করিয়া, রাজকৃষ্ণ বাবু বিমোহিত হইলেন। তখন তাঁহার সংস্কৃত শিখিবার বাসনা হইল। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহাকে সংস্কৃত শিখাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এত বয়সে

মুগ্ধবোধ পড়িয়া, সংস্কৃত শিখিতে গেলে, সংস্কৃত শিক্ষা দুষ্কর হইবে ; অধিকন্তু অনর্থক সময় নষ্ট হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজকৃষ্ণ বাবুকে বলেন,—"দেখ, আমি যখন মুগ্ধবোধ মুখস্থ করি, তখন ইহার এক বর্ণও বুঝিতে পারি নাই ; পরে যখন সংস্কৃত সাহিত্যে অগ্রসর হইলাম, তখন ইহার অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হই। তোমাকে মুগ্ধবোধ মুখস্থ করাইয়া, সংস্কৃত শিখাইতে হইলে, এ বয়সে সংস্কৃত শিক্ষা দায় হইবে। অতএব তোমাকে একটা সহজ উপায়ে ব্যাকরণ শিখাইতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি সে দিন রাজকৃষ্ণ বাবুকে বিদায় দেন। রাজকৃষ্ণ বাবুকে বিদায় দিয়া, তিনি ব্যাকরণ শিখাইবার একটা সরল পথের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন।

পর দিন রাজকৃষ্ণ বাবু আসিয়া দেখেন, তাঁহার জন্য ব্যাকরণ শিখিবার সরল ও সহজ উপায় উপস্থিত। চারি 'তা' ফুল্‌স্কেপ্‌ কাগজে, বাঙ্গালা অক্ষরে, বর্ণমালা হইতে ধাতু প্রত্যয়াদি পর্য্যন্ত, মুগ্ধবোধের সারাংশ লিখিত। রাজকৃষ্ণ বাবু দেখিয়া অবাক্ হন। রাজকৃষ্ণ বাবু আমাদিগকে বলিয়াছেন,—"ইহাই উপক্রমণিকা ব্যাকরণের সূত্রপাত। উপক্রমণিকা ব্যাকরণের পূর্ব্বাভাস এই খানেই তাঁহার মস্তকে প্রবেশ করে।" রাজকৃষ্ণ বাবু সেই ফুল্‌স্কেপ্‌ কাগজে লিখিত ব্যাকরণের সারাংশ এবং তাৎকালিক ব্যাপ্‌টিষ্ট প্রেসে মুদ্রিত একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করেন। মাস দুই তিন পড়িয়া, তিনি ব্যাকরণের আভাস কতকটা আয়ত্ত করিয়া লন। তিন.

চারি মাসের পর তিনি মুগ্ধবোধ পড়িতে আরম্ভ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিক্ষা দিবার প্রণালীর গুণে এবং স্বকীয় অসাধারণ অধ্যবসায়ে ও পরিশ্রম-বলে রাজকৃষ্ণ বাবু ৬ ছয় মাসের মধ্যে মুগ্ধবোধ পড়া সাঙ্গ করেন। পরে তিনি কাব্যাদি-পাঠে প্রবৃত্ত হন।

এই সময় সংস্কৃত কলেজে "জুনিয়র্" ও "সিনিয়র্" পরীক্ষা প্রচলিত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজকৃষ্ণ বাবুকে "জুনিয়র্" পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন। রাজকৃষ্ণ বাবুও সম্মত হন; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় এক দিন সংস্কৃত কলেজে গিয়া শোনেন, একটী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ৮ আটটী টাকা "জুনিয়র" বৃত্তি পাইতেছেন। ব্রাহ্মণের সেই ৮ আটটী টাকায় লেখাপড়া এবং আহারাদি সবই নির্ভর করিত। এ সংবাদ পাইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাবিয়াছিলেন,—"রাজকৃষ্ণের জুনি-য়র্ পরীক্ষা দেওয়া হইবে না; কেন না, রাজকৃষ্ণ যদি পরীক্ষায় বৃত্তি পায়, তাহা হইলে পর বর্ষে এই ব্রাহ্মণের বৃত্তি-রোধ হইবে।" স্বভাবসিদ্ধ পরদুঃখ-কাতর বিদ্যাসাগর, ব্রাহ্মণের অবস্থা ভাবিতে ভাবিতে বড়ই কাতর হইয়া পড়েন। তিনি বাসায় ফিরিয়া আসিয়া, রাজকৃষ্ণ বাবুকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলেন। রাজকৃষ্ণ বাবুও "জুনিয়র্" পরীক্ষা দিবার কামনা পরিত্যাগ করেন। ইহা গুরু-শিষ্যেরই সহৃদয়তার পরিচায়ক নয় কি? করুণা-স্রোতে উভয়েরই বলবতী বাসনা ভাসিয়া গেল! অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজকৃষ্ণ বাবুকে

"সিনিয়র্" পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন। "সিনিয়র্" পরীক্ষা দিবার প্রস্তাব শুনিয়া রাজকৃষ্ণ বাবু বলেন,—"আমি কি পারিব ?" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন,—"কেন পারিবে না ? তবে একটু বেশী পরিশ্রম করিতে হইবে। তুমি যদি প্রত্যহ আহারাদি করিয়া বেলা ৯ টার সময় আমার সহিত ফোর্ট উলিয়ম্ কলেজে যাইতে পার, তাহা হইলে আমি তোমায় পড়াইতে পারি।" রাজকৃষ্ণ বাবু সম্মত হন।

প্রত্যহ ৯ নয় টার সময় আহারাদি করিয়া রাজকৃষ্ণ বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে ফোর্ট উলিয়ম্ কলেজে যাইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্রায় বেলা ৩ তিনটা পর্য্যন্ত সাহেবদিগকে পড়াইতেন এবং অন্যান্য কাজ করিতেন। ইহার মধ্যে কোন রকমে অবকাশ পাইলেই, তিনি সাহেবের গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, রাজকৃষ্ণ বাবুকে পড়াইয়া যাইতেন। ৩ তিনটার সময় আফিসের কার্য্য সমাধা হইলেই, তিনি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ফোর্ট উলিয়ম্ কলেজেই রাজকৃষ্ণ বাবুকে পড়াইতেন। পরে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া উভয়ে আহারাদি সমাপন করিয়া, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইতেন। ঐ সময় অন্যান্য শিক্ষার্থীদিগকেও শিক্ষা দিতে হইত। রাজকৃষ্ণ বাবু কোন কোন দিন পড়িতে পড়িতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় ঘুমাইয়া পড়িতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহাকে জাগরিত করিয়া পড়াইতেন। এইরূপ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিক্ষা দিবার সুপ্রণালীতে এবং নিজের অবিচলিত অধ্যবসায়ে

রাজকৃষ্ণ বাবু ২॥০ আড়াই বৎসরের মধ্যে ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতিশাস্ত্রে শিক্ষিত হন।

রাজকৃষ্ণ বাবুর অধ্যাপনায়, বিদ্যাসাগরের শুদ্ধ শ্রমশীলতা নহে, উদ্ভাবিনী-শক্তিমত্তারও সম্পূর্ণ পরিচয়। সময়ের দুর্নিরীক্ষ্য গতির প্রতি অন্তর্ভেদিনী দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া, তিনি স্বকীয় শক্তিমাহাত্ম্যে দুর্জয় সিবিলিয়ানদিগকেও কিরূপ মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, পরে তাহার পরিচয় পাইবেন।

৪।৫ চারি পাঁচ বৎসরের শিক্ষা ২॥০ আড়াই বৎসরে। কথাটা সহরময় রাষ্ট্র হইল। দলে দলে পণ্ডিতগণ, বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ বাবুকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। অকৃত-পূর্ব্ব অভিনব পদ্ধতি ও প্রথার প্রতিষ্ঠা এইরূপই। বিখ্যাত স্কচ্ গ্রন্থকার কারলাইলের নূতন পদ্ধতি ও প্রণালী মতে প্রবন্ধসমূহ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে পর, ভূরি ভূরি বিজ্ঞতম বিদ্বন্মণ্ডলী, সুদূর স্কট্‌লণ্ডের পার্ব্বত্য-প্রদেশ "ডমফ্রের" ক্ষেত্রাবাসে গিয়া কারলাইলকে দেখিতে যাইতেন। আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থকার এমার্সন্ সাহেব, কেবল কার-লাইলকে দেখিয়া নয়ন মন সার্থক করিবার জন্য স্কটলণ্ডে আসিয়াছিলেন।

১৮৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে বা ১২৫০-৫১ সালে রাজকৃষ্ণ বাবু, সংস্কৃত কলেজের "সিনিয়র্" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৫ পনর টাকা বৃত্তি পান; পরে ২ দুই বৎসর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২০ কুড়ি টাকা করিয়া প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি প্রাপ্ত হন। আর এক বার পরীক্ষা

দিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু দারুণ পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয়; এমন কি, তিনি মৃতকল্প হইয়াছিলেন। শরীর শোধরাইবার জন্য তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে হয়; সুতরাং আর পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই।

সপ্তম অধ্যায়।

প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি, বাঙ্গালা চিঠি, শিক্ষা-বিভাগের পরিবর্ত্তন, পিতার কার্য্য-ত্যাগ, বাসার অবস্থা, সহৃদয়তার পরিচয়, প্রতিশ্রুতি-পালন, চলচ্ছক্তির প্রমাণ, বীরসিংহে কৌতুক, দুর্ব্বলে দয়া, মাতৃ-ভক্তি, সংস্কৃত রচনা, তেজস্বিতা, পদ-পরিবর্ত্তন ও গুণগ্রাহিতা।

ফোর্ট-উইলিয়ম্ কলেজে চাকুরী করিবার পূর্ব্বে, পাঠ্যাবস্থাতেও বিদ্যাসাগর মহাশয়, নিজ-গুণগ্রামে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের প্রীতিপাত্র হইয়াছিলেন। তখনও তাঁহার অনেকটা প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তাই, তিনি দর্শন-পাঠ-কালে অধ্যাপক পণ্ডিত নিমচাঁদ শিরোমণি মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায়, চেষ্টা করিয়া, পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে তৎপদে অধিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে তাঁহার প্রতিপত্তি অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। মার্সেল্ সাহেব, তাঁহাকে অন্তঃকরণের সহিত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, কোন বিষয়ের জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি তৎসাধনে কৃতকার্য্য না হইয়া ক্ষান্ত হইতেন না।

এই সময়, সংস্কৃত কলেজের দুই জন ব্যাকরণাধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। তখন বাবু রসময় দত্ত, কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ঐ পদের প্রার্থী

হইয়াছিলেন।* ইনি [illegible] কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। ঐ পদের জন্য কিন্তু একটা পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরীক্ষা দিয়া প্রথম হইয়াছিলেন। কি কারণে বলা যায় না, রসময় দত্ত ইহাঁকে সেই পদটী না দিয়া তাড়াতাড়ি পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ-পদে নিয়োজিত করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, এ কথা মার্সেল্ সাহেবকে অবগত করেন। মার্সেল্ সাহেব, তদানীন্তন "এডুকেশন্ কৌন্সিলের" সেক্রেটরী ডাক্তার মৌয়েটকে ঐ কথা বলেন। মৌয়েট্ সাহেব, রসময় বাবুর বন্দোবস্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে ঐ পদে নিযুক্ত করেন।†

পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়, স্বীয় "বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্য-বিষয়ক-প্রস্তাব" নামক পুস্তকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিপত্তি-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"মার্শেল্ সাহেব বিদ্যাসাগরের সহিত যত ঘনিষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিলেন, ততই তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র, তেজস্বিতা, উদারতা প্রভৃতি সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইতে লাগিলেন। তদবধি সকল বিষয়েই বিদ্যাসাগরের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন এবং তদীয় মত গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রায় কোন কর্ম্ম করিতেন না। ঐ সময়ে ডাক্তার মৌএট্ সাহেব এডু-

---

* ১৭৪২ শকে বা ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইনি ২৪ পরগণার অন্তর্গত চাঙড়িপোতা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ১২ বৎসর সংস্কৃত কলেজে পড়িয়াছিলেন। উত্তর কালে ইনি সোমপ্রকাশের সম্পাদক হন। ইহাঁর সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সবিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল।

† নববার্ষিকী, বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত, ২২৮ পৃষ্ঠা।

কেশন কৌন্সিলের সেক্রেটরী ছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে সংস্কৃত বিদ্যা ও হিন্দুধর্ম্মসংক্রান্ত কোন কথা জানিবার প্রয়োজন হইলে মার্শেল্ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেন; মার্শেল্ সাহেব, বিদ্যাসাগর দ্বারা মৌএট্ সাহেবের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লইতেন। এই সূত্রে মৌএট্ সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগরের পরিচয় হয়। তদবধি তিনি বিদ্যাসাগরের প্রতি অত্যন্ত সম্মান ও বিশ্বাস করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার পরমাত্মীয় ও যারপরনাই হিতৈষী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

মার্সেল্ সাহেব, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত পড়িতেন। তিনি বেশ বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে বাঙ্গালায় কথাবার্ত্তাও কহিতে ভাল বাসিতেন। আবশ্যক হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহাকে বাঙ্গালায় চিঠি-পত্র লিখিতেন। এক বার তাঁহার বাড়ীতে আত্মীয়ের অসুখ হওয়ায়, তিনি কার্য্যে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এ কথা তিনি বাঙ্গালায় চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র নারায়ণ বাবুর নিকট হইতে সেই চিঠিখানি সংগ্রহ করিয়াছি। চিঠিখানি এইখানে প্রকাশ করিলাম,—

"শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং।

"সবিনয়নিবেদনং—

অদ্য আমার পিতৃব্যপুত্রের প্রাতঃকালাবধি চারি বার ভেদ হইয়াছে ২০ ড্রপ্ লডেনম্ দেওয়াতে আপাততঃ প্রায় এক ঘণ্টা ভেদ বন্ধ হইয়াছে কিন্তু একেবারে নিবৃত্ত হইয়াছে

এমত বোধ হয় না অতএব তাহার নিকটে থাকা অত্যাবশ্যক সুতরাং অদ্য যাইতে পারিলাম না ত্রুটিমার্জ্জনে আজ্ঞা হয়। কিমধিকমিতি ২৮ নবেম্বর ১৮৪৩

আজ্ঞাবর্ত্তিনঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

মহামহিম—

শ্রীযুক্ত কাপ্তান জি টি মার্শল মদেকাশ্রয় মহাশয়

মহোদয়েষু—

শ্রীঈ চ শর্ম্মণঃ ফোর্ট উইলিয়মকালেজ।

এ পত্রের শিরোভাগে "শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং" লেখা আছে। ইহা বিশ্বাস কি অভ্যাসের ফল, ঠিক্ করিয়া তাহা বলিবার উপায় নাই। তবে তখনও বিশ্বাসের ফল বলিয়া একেবারে অবিশ্বাস করাও যাইতে পারে না। তখনও তিনি অবিমিশ্র সংস্কৃত শিক্ষার ফলভোগী। তবে ইহার পরবর্ত্তী কালে, যখন তিনি ইংরেজি-বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়া ইংরেজি ভাষাদর্শিত শিক্ষাপ্রণালীর পূর্ণমাত্রায় পোষকতা করিতেছিলেন, যখন হিন্দুচিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে বিরত ছিলেন, যখন ভ্রান্ত-বিশ্বাসে হিন্দু সমাজের সংস্কার করিতেছেন বলিয়া প্রকৃত হিন্দু সমাজের গ্লানিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তখনকার তাঁহার কোন কোন চিঠি-পত্রের শিরোনামায় "শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং" বা "শ্রীশ্রীহরিঃ সহায়ঃ" লেখা দেখা যায়। কোন সময় তিনি একবার সুকিয়াষ্ট্রীট-নিবাসী ডাক্তার চন্দ্রমোহন

ঘোষের বাড়ীতে বসিয়া, পাইকপাড়ার রাজবাটীতে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্র লেখা হইলে পর, চন্দ্রমোহন বাবু এক বার পত্রখানি দেখিতে চাহেন। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় হাস্য করিয়া বলেন,—"তুমি যাহা ভাবিতেছ, তাহা নহে ; এই দেখ, শ্রীশ্রীহরিঃ সহায়ঃ লিখিয়াছি।" ইহাতে মনে হয়, তিনি যে কারণে চটি জুতা পরিতেন ; থান-ধুতি, মোটা চাদর গায়ে দিতেন ; ভট্টাচার্য্যের মতন মাথা কামাইতেন, সেই কারণে পত্রের শিরোভাগে ঐরূপ লিখিতেন। ইহাকে হয় তো তিনি বাঙ্গালীর জাতীয়ত্বের একটা অঙ্গ মনে করিতেন।

এ পত্রের আর একটা বিশেষত্ব আছে। যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থাদিতে অধুনা ভূরি ভূরি ইংরেজি মতানুসারী বিরাম-চিহ্নাদি দেখিতে পাওয়া যায়, এ পত্রে তাহার একটীমাত্র নাই।

ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে চাকুরীতে প্রবৃত্ত হইবার পরই, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তদানীন্তন শিক্ষা-বিভাগের একটা বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন দেখিতে হয়। শিক্ষা-বিভাগের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। শিক্ষা-বিভাগের অধীন হইয়া, তন্মতানুসারে তাঁহাকে শিক্ষা-প্রণালীর অনেক প্রবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় শিক্ষা-বিভাগের কি ছিল, কি পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত-বিবরণ বলিয়া রাখা ভাল। পরিবর্ত্তনে শিক্ষা-প্রণালীর কিরূপ তারতম্য হইয়াছিল, তাহাও কতকটা বুঝিয়া রাখা উচিত।

ইতিপূর্ব্বে শিক্ষা-বিভাগের পরিচালনা-ভার, "কমিটী অব্ পব্লিক্ ইন্‌ষ্ট্রক্‌শন্" নাম্নী সভার হস্তে বিন্যস্ত ছিল। এই সভা ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে বা ১২৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সভা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, ১২ বৎসর প্রাচ্যশিক্ষা প্রচলনকারী এবং পাশ্চাত্য-শিক্ষা-প্রবর্ত্তন-প্রয়াসীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। শেষে মেকলের মতামত-প্রভাবে প্রথমোক্ত দলের পরাভব হয়। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে বা ১২৪৬ সালে তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড অক্‌লণ্ডের এই মর্ম্মে এক "মিনিট" প্রকাশিত হয়,—"ইয়ুরোপীয় সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান-শিক্ষা ইংরেজিতে হইবে বটে; তবে বর্ত্তমান প্রাচ্য বিদ্যালয়গুলিও পূরা দমে চলিবে। ইংরেজি ছাত্রদিগকে যেমন উৎসাহ দেওয়া যাইতে পারে; প্রাচ্য-বিদ্যার্থীদিগকেও সেইরূপ উৎসাহ দেওয়া হইবে; পরন্তু ইংরেজির সঙ্গে এ দেশীয় ভাষার শিক্ষা চলিবে; যে যাহা পসন্দ করে, সে তাহাই শিখিবে।" অতঃপর "কমিটী অব্ পব্লিক্ ইন্‌ষ্ট্রক্‌শন্" এই শিক্ষা-প্রণালীর পর্য্যালোচনার প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন। ইহার পর ইংরেজি শিক্ষার বেগ খরতর হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বা ১২৪২ সালে সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা প্রদত্ত হয়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে বা ১২৪৪ সালে আদালত হইতে পার্সি ভাষা উঠিয়া যায়। এদেশীয় বিচার-কর্ত্তাদের উপর অধিকতর বিস্তৃত ভাবে কার্য্যভার অর্পিত হয়। সুতরাং নূতন শিক্ষা-প্রণালীর কার্য্যও প্রশস্ততর হইতে লাগিল। কমিটী, বাঙ্গালাকে ৯ নয়টী সার্কেলে অর্থাৎ অংশে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক ভাগে

একটী করিয়া কলেজ হইয়াছিল।* প্রত্যেক ভাগের অন্তর্ভূত প্রত্যেক জেলায় একটী করিয়া ইংরেজি-বাঙ্গালা স্কুল হইয়াছিল। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বা ১২৫৯ সালে কমিটী, শিক্ষা-বিভাগের ভার, অধিকতর শক্তিশালিনী সভা "কৌন্সিল অব্ এডুকেশনের" উপর অর্পণ করেন। এই কৌন্সিলের অধীনে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনেক কার্য্য করিতে হইয়াছিল। পরবর্ত্তী ঘটনায় কৌন্সিলের কার্য্য-কলাপের ফল উদ্ঘাটিত ও আলোচিত হইবে।

ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্য-কালেই, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বা ১২৫১ সালে তদানীন্তন বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ, বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত পাশ্চত্য বিদ্যালয়ের আদর্শে গঠিত বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ৪ চারি বৎসরের মধ্যে এইরূপ ১০১ এক শত একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সব বিদ্যালয়ের সহিতও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্পর্ক ছিল। এই সকল বিদ্যালয় বাঙ্গালা ভাষার প্রসার-প্রবর্ত্তনের জন্য সৃষ্ট হয়; পরন্তু বাঙ্গালা পাঠ্যে বিজাতীয় ভাব-প্রণোদনের সম্পূর্ণ সহায় হইয়াছিল। সেই জন্য এই সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা কথাটা এইখানে বলিয়া রাখিলাম।

---

* এই কমিটীর কার্য্যকালেও ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বা ১২৪২ সালে হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছিল, বাঙ্গালায় এক লক্ষ গ্রাম্য স্কুল ও পাঠশালা ছিল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বা ১২৬২ সালের পূর্ব্বে ইহাদের উন্নতি-পক্ষে কোন চেষ্টা হয় নাই।

ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের কার্য্য-কালে এক দিন পথে পিতা ঠাকুরদাসের কি একটা দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়। কাহারও কাহারও মুখে শুনি, অশ্বের পদাঘাতে তিনি আহত হন; কিন্তু এ কথার সত্যতা-সম্বন্ধে কেহই দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত নন। যাহা হউক, এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়, পিতাকে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন,—"বাবা! এখন তো আমি ৫০্ পঞ্চাশ টাকা পাইতেছি, স্বচ্ছন্দে সংসার চলিবে, আপনি আর কেন পরিশ্রম করেন? আপনি দেশে গিয়া থাকুন।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিতান্ত অনুরোধে পিতা ঠাকুরদাস কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, দেশে যাইয়া বাস করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহাকে মাসে মাসে ২০্ কুড়ি টাকা পাঠাইয়া দিতেন এবং বাসায় ৩০্ ত্রিশ টাকা খরচ করিতেন। এই সময় বাসায় তাঁহার দুই সহোদর, দুই জন পিতৃব্যপুত্র, দুই জন পিস্তুতো ভাই, এক জন মাস্তুতো ভাই এবং অনুগত ভৃত্য শ্রীরাম নাপিত * থাকিতেন। এতদ্ব্যতীত দুই চারি জন অতিরিক্ত লোকও প্রায়ই দুই বেলা আহার পাইত। বাসায় সকলকেই

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, যখন সুকিয়া ষ্ট্রীটে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসা ছিল, তখন কতকগুলি আত্মীয়-লোক তাঁহার প্রাণনাশ-কল্পে ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। তখন এই অনুগত ভৃত্য শ্রীরামের কল্যাণেই তিনি আত্ম-রক্ষায় সমর্থ হন। সে ব্যাপার, বর্ত্তমান কালে বিবৃত করিবার পক্ষে নানা বাধা আছে।

পর্য্যায়-ক্রমে রন্ধন করিতে হইত। বিদ্যাসাগর-মহাশয়ও রন্ধন করিতেন। তা না করিলে কি ৩০৲ ত্রিশ টাকায় এত গুলি লোকের অন্ন-সংস্থান হয়? বিদ্যাসাগরের নিকট কি শিখিবার বস্তু ছিল ও আছে, পাঠক! তাহা বুঝিতে কি এখনও বাকি রহিল? ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা বেতনভোগী বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যবস্থা কয় জনের দেখিতে পাই?

এই সময়ে মার্সেল্ সাহেব, সংস্কৃত কলেজের "জুনিয়র্" ও "সিনিয়ার্" পরীক্ষার পরীক্ষক হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সংস্কৃত প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া সাহেবের সাহায্য করিতে হইত। ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, বেদান্ত প্রভৃতি সকল প্রশ্নই তিনি নিজেই লিখিয়া দিতেন। ভাবি তাই, একটা মানুষ, এত কাজ কি করিয়া করিতেন? ভাবি, আর মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া পড়ি। কিন্তু আবার যখন বিলাতের বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ কব্ডেনের কথা মনে হয়,—"আমি ঘোড়ার মতন, এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম না করিয়া খাটিতেছি"; যখন ভাবি,—"রোমক সম্রাট্ সিজর্, আল্পস্ হইতে সৈন্য সঞ্চালন করিবার সময় লাটীন অলঙ্কার-শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন,"—তখনই মনকে প্রবোধ দিই, শক্তিশালী শ্রমশীল ব্যক্তির ইহ-জগতে অসাধ্য কি? এই গুণেই তো পশুর উপর মনুষ্যের রাজত্ব; সামান্যের উপর অসামান্যের প্রভুত্ব।

মস্তিষ্কের পরিচয় পাইলেন, এখন এই সময়ের একটু হৃদয়ের পরিচয় লউন। পাঠ্যাবস্থায় যখন তিনি সামান্য বৃত্তি পাইতেন,

তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা হইতেই অন্নার্থী ও বস্ত্রার্থীকে সাধ্যানুসারে অন্ন-বস্ত্র দান করিতেন। এখন তিনি ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা বেতনভোগী। ২০৲ কুড়ি টাকা দেশে পিতার নিকট পাঠাইতেন; আর ৩০৲ ত্রিশ টাকা মাত্র রাখিতেন বাসা-খরচের জন্য। উপরেই এই সংবাদ এক বার বলা গিয়াছে। এই ৩০৲ তিরিশ টাকার মধ্যেও তিনি বাসাখরচ চালাইয়া, আবশ্যকমত সাধ্যানুসারে অন্ন-বস্ত্রার্থী এবং পীড়িত ব্যক্তির সাহায্য করিতেন। দৃষ্টান্ত অনেক আছে; কত বলিব? দুই একটীর মাত্র উল্লেখ করি।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে বা ১২৫০ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশের বিসূচিকা পীড়া হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংবাদ পাইয়া, ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া, তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হন। ডাক্তার, তাঁহার চিকিৎসা করেন এবং তিনি নিজ হস্তে মল-মূত্র পরিস্কৃত করিয়াছিলেন। ঔষধের মূল্য, বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে দিয়াছিলেন। কোন অনাথ দুঃস্থ লোক পীড়িত হইলে, তিনি স্বয়ং গিয়া তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেন; এবং তাহাকে বাঁচা-ইবার জন্য নিজের ব্যয়ে সাধ্যানুসারে ঔষধ-পথ্য যোগাইতেন।

এক বার নারিকেল-ডাঙ্গায় অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চা-ননের ভাগিনেয় ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ওলাউঠা হয়। বিদ্যা-সাগর মহাশয় রাত্রিকালে তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার চিকিৎসা করান। তিনি নিজের বাসা হইতে মাদুর-বিছানা

লইয়া গিয়া, রোগীর শয্যার ব্যবস্থা করিয়া দেন। রাজকৃষ্ণ বাবু বলেন,—"তাঁহাকে প্রায়ই এইরূপ করিতে হইত। তাঁহার সে অকৃত্রিম দয়ার কার্য্য কি সব আমার স্মরণ আছে? আর কতই বা বলিব মহাশয়, আর কতই বা শুনিবেন? সে সব কথা স্মরণ হইলে, সেই দয়াবতারের সেই করুণ-মূর্ত্তি, হৃদয়ে জাগরূক হয়। তাঁহার কথা ভাবিলে বুক ফাটিয়া যায়; চক্ষের জল রাখিতে পারি না! আহা! তেমন দয়ালু দাতা কি আর এ জগতে দেখিব?"

এক বার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসার সম্মুখে কোন এক ব্যক্তির ভৃত্য, ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হয়। যাঁহার ভৃত্য, তিনি তাহাকে হাত ধরিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দেন। আহা! সে অনাথ-পীড়িতের এমন কেহই ছিল না যে, তাহার মুখে একটু জল দেয়। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর সংবাদ পাইয়া, তখনই গিয়া, সেই পীড়িত ভৃত্যকে বুকে করিয়া তুলিয়া আনিয়া, আপনার শয্যায় শয়ন করাইয়া দেন। তাঁহার অবিরাম যত্ন-শুশ্রূষায় এবং সুহৃদ্-চিকিৎসকের চিকিৎসায় রোগী, ২।৪ দুই চারি দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে। কি মায়া! কি করুণা!

বিদ্যাসাগর মহাশয়, সুবিধা পাইলেই, আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব এবং গুণবান্ কৃতবিদ্য লোকের চাকুরী করিয়া দিতেন। কোন কোন সময় তিনি অপরের জন্য হানি-স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এই সময় সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের প্রথম

শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। মার্সেল সাহেব, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। ঐ পদের বেতন ৮০৲ আশী টাকা। ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার বেতনভোগী বিদ্যাসাগর, ঐ পদ গ্রহণে অসম্মত হন। তাহার কারণ এই,—

তিনি পূর্ব্বে তাৎকালিক বহু-শাস্ত্রাধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে যেরূপেই হউক কোন একটী চাকুরী করিয়া দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন; এবং উপস্থিত পদে তর্কবাচস্পতি মহাশয় উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া, তাঁহার ধারণা ছিল। সুযোগ পাইয়া তিনি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবার চেষ্টা পাইলেন। এই পদে তর্কবাচস্পতি মহাশয় যাহাতে নিযুক্ত হন, তাহার জন্য তিনি মার্সেল সাহেবকে অনুরোধ করেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—"যখন সাহেব, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন, তখন তিনি বলেন,—মহাশয় টাকার প্রত্যাশা করি না, আপনার অনুগ্রহ থাকিলেই, আমি চরিতার্থ হইব।" বিদ্যাসাগর মহাশয় যে এরূপ চাটুবাক্য প্রয়োগ করিবেন, তাঁহার জীবন-সমালোচনা করিলে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে সাহস হয় না। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, প্রকৃত প্রতিশ্রুতির কথা বলিলে সাহেব হয় তো তাঁহাকে অহঙ্কারী মনে করিবেন; সুতরাং কথা রক্ষার সম্ভাবনা নাই বলিয়া, তিনি এইরূপ তুষ্টিকর কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর আত্মগোপন করিয়া, সাহেবের তুষ্টিকর কথা বলিবেন, এ কথা

বিশ্বাস করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইবে না; আর মার্সেল্ সাহেবও যে আত্মতুষ্টি-কর কথায় বিমূঢ় হইয়া পড়িবেন, এ ধারনাও আমাদের নাই। যাহা হউক, মার্সেল সাহেব, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথায়, তর্কবাচস্পতি মহাশয়কেই উক্ত পদে নিযুক্ত করিতে চাহেন। যে দিক্ দিয়াই হউক, ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বার্থত্যাগের সজীব সঙ্কেত। এরূপ প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে একটু হৃদয়-বলের প্রয়োজন। জর্ম্মন্ পণ্ডিত হীনের জীবনী-পাঠে, তদানীন্তন মনস্বী রস্কিনের এইরূপ স্বার্থত্যাগের পরিচয় পাওয়া যায়। রস্কিনকে এক বার একটী উচ্চ পদ দিবার প্রস্তাব হয়; তিনি কিন্তু হীনকে ঐ পদের উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, উক্ত পদ তাঁহাকেই দিবার জন্য অনুরোধ করেন। এ ব্যাপার, কেবল বিদ্যাসাগরের স্বার্থত্যাগের পরিচয় নয়; প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে, তাঁহাকে কিরূপ কঠোরতা সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাইলে, পাঠক আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন।

যে সময় তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে নিযুক্ত করিবার কথা হয়, সেই সময় তর্কবাচস্পতি মহাশয় অম্বিকা-কাল্‌নায় অবস্থিতি করিয়া, তেজারতীর কারবার করিতেছিলেন; এতদ্ব্যতীত তথায় তাঁহার একটী টোলও ছিল। তাঁহাকে প্রয়োজন সোমবারে; কথা হয় শনিবারে; সুতরাং পত্র পাঠাইলে সময়ে পত্র পৌঁছিবার সম্ভাবনা নাই; পৌঁছিলেও তর্কবাচস্পতি মহাশয় এ কার্য্য স্বীকার করিবেন কি না, তাহার স্থিরতা ছিল না। এই জন্য

বিদ্যাসাগর মহাশয়, সেই দিনই এক জন আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া কাল্‌নাভিমুখে যাত্রা করেন। কলিকাতা হইতে কাল্‌না প্রায় ২৪। ২৫ ক্রোশ দূর। তিনি ও সেই সঙ্গী আত্মীয়, সারা-রাত পদব্রজে চলিয়া পরদিন তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হন। তর্কবাচস্পতি ও তাঁহার পিতাঠাকুর, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে তাঁহার গমন-কারণ জানিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং শতবার ধন্যবাদ করিলেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর অনায়াসে ও অক্লেশে এত পথ-শ্রম সহ্য করিয়াছেন, এ কথা ভাবিয়া তাঁহারা বিস্ময়-বিহ্বলচিত্তে স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন,—“ধন্য বিদ্যাসাগর! তুমিই নরাকারে দেবতা।” যাহা হউক, শুনিয়াছি, এ পদগ্রহণে তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের কি একটা আপত্তি উপস্থিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় আপত্তি খণ্ডন করিয়া, তাঁহাকে এ পদ গ্রহণে সম্মত করান। পরদিন তিনি আবার সেই আত্মীয় সঙ্গে কলিকাতায় উপস্থিত হন। তর্কবাচস্পতি মহাশয় সঙ্গে আসেন নাই; তাঁহার প্রসংশা-পত্রাদি, বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং আনিয়া মার্সেল্ সাহেবকে প্রদান করেন। মার্সেল্ সাহেব, তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে নিযুক্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ করেন। পরে তর্কবাচস্পতি মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া পদ প্রাপ্ত হন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ “পথ-চলার” কথাটা কবি-কল্পনাই বলিয়া যেন মনে হয়। সত্য সত্যই কিন্তু তাঁহার “পথ-চলা” শক্তি এমনই ছিল। তাঁহার “পথ-চলা”-সম্বন্ধে কত কথাই

শুনিয়াছি। তখন তিনি হৃষ্ট-বলিষ্ঠ-কলেবর শক্তিশালী যুবক ছিলেন। উত্তর-কালে তিনি রোগ-ভগ্ন দেহে যেরূপ চলিতে পারিতেন, এক জন ভীম-কলেবর সুদৃঢ়-দেহসম্পন্ন যুবকও তেমন চলিতে পারেন কি না, সন্দেহ। তাঁহার উত্তর কালেও কিরূপ হাঁটিবার শক্তি ছিল, প্রসঙ্গ-ক্রমে তাহার এই খানে দুই একটী দৃষ্টান্ত দিলাম,—

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজ-পতি মহাশয় আমাদিগকে বলিয়াছেন,—"এক দিন কর্ম্মটাড়ে আমি, দাদা মহাশয় এবং আর কয়েক জন, প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইবার উদ্‌যোগ করি। আমি বলিলাম, 'দাদা-মহাশয় আজ আপনাকে হারাইয়া দিব। দেখি আপনি কেমন আমাদের অপেক্ষা হাঁটিয়া যাইতে পারেন।' দাদা-মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—'ভাল তাহাই হইবে।' এই বলিয়া আমরা সকলে হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম; আমাদের সঙ্গীরা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলেন; আমি কেবল তাঁহার সঙ্গে যাইতে লাগিলাম; কিয়দ্দূর যাইয়া দেখি, দাদা মহাশয় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, চটি জুতা পায়ে চট্ চট্ করিতে করিতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন। আমি চেষ্টা করিয়াও, তাঁহাকে ধরিতে পারিলাম না। দাদা মহাশয় দূর হইতে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'হারাবি না?' আমি অবাক্।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যো-

পাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন,—"সংস্কৃত কলেজে চাকুরী করিবার সময়, এক দিন বাবার বীরসিংহ হইতে কলিকাতায় একদিনে আসিবার প্রয়োজন হয়। তিনি তাড়া-তাড়ি বাহির হইবার উদ্‌যোগ করেন। সেই সময় মদনমণ্ডল নামে এক জন পাইক বাবাকে বলিল,—'আমি তোমার সঙ্গে কলিকাতায় যাইব।' বাবা বলিলেন,—'তুমি আমার সঙ্গে হাঁটিতে পারিবে?' সে স্বীকার করিল। পরে উভয়েই হাঁটিতে লাগিলেন। ৪।৫ ক্রোশ পথ আসিয়া মদনমণ্ডল দেখিল, বাবা তাহাকে ছাড়িয়া ৩। ৪ রসি অগ্রসর হইয়াছেন। সে 'হা রা রা' করিয়া, লাঠি ঘুরাইয়া, আপনি দু-চার পাক ঘুরিয়া, দ্রুতপদে বাবাকে ধরিবার চেষ্টা করিল; এবং ছুটিয়া গিয়া বাবাকে ধরিল। উভয়ে আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। ১০।১২ ক্রোশ দূরে গিয়া মদন বাবাকে বলিল,—'দেখ আজ আর কলিকাতায় যাওয়া হইবে না; এই চটিতে থাকা যাক্।' বাবা হাসিয়া বলিলেন, 'আমাকে যাইতেই হইবে। তুমি এই পয়সা লইয়া, চটিতে থাক; কাল্ তখন যাইও।' মদন চটিতে রহিয়া গেল। বাবা কলিকাতায় আসিলেন।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্ব্বে এক দিনেই হাঁটিয়া বাড়ী যাইতেন; এক দিনেই বাড়ী হইতে কলিকাতায় আসিতেন। বীরসিংহ গ্রাম হইতে প্রায় ১০। ১২ দশ বার ক্রোশ দূরে মসাট নামক স্থানে একটী করিয়া ডাব খাইতেন মাত্র। যখন কলেজের পিন্সিপাল ছিলেন, তখনও তিনি প্রায় হাঁটিয়া যাইতেন।

এমন কি, সঙ্গীদের মোট-বোঝা ভারী হইলে, তিনি তাহাদের মোট-বোঝা কতক নিজের মস্তকে লইয়া হাঁটিতেন। এক বার পথে তিনি এইরূপ অবস্থায় যাইবার সময়, কলেজের দুই জন দ্বারবানের সম্মুখে পতিত হন। দ্বারবানেরা তাঁহার তদবস্থা দেখিয়া, তাঁহার মোট লইবার চেষ্টা করে। তিনি কিন্তু তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় বিদায় দিয়া, আপনি মোট বহিয়া চলিয়া যান।

ফোর্ট উইলিয়মে চাকুরী করিবার সময়, তাঁহার বাড়ী যাইবার যেরূপ প্রায় সুযোগ ঘটিত, কলেজে চাকরীর সময় সেরূপ ঘটিত না। তখন তিনি প্রায়ই বাড়ী যাইতেন। বাড়ী গিয়া, প্রতিবেশীর তত্ত্ব লওয়া, আর্ত্ত-পীড়িতের শুশ্রূষা করা, অনাথ-অনাথার দুঃখাপনোদনের চেষ্টা করা, আমোদ কৌতুক করা, তাঁহার কার্য্য ছিল। এতৎ-সম্বন্ধে দুই একটী দৃষ্টান্ত এইখানে প্রকটিত হইল।

বাড়ী যাইলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়, মধ্যে মধ্যে ভ্রাতা পুত্র এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন সঙ্গে মধ্যাহ্নে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতেন। পথে কৌতুক করিবার জন্য কোন নালা-নর্দ্দমা দেখিলেই লাফাইয়া পার হইতেন এবং মধ্যম ভ্রাতাকে সেই নালা-নর্দ্দমা পার হইবার জন্য উপরোধ করিতেন। মধ্যম ভ্রাতা বাহাদুরী দেখাইবার জন্য কখন কখন লাফাইতে গিয়া পড়িয়া যাইতেন। সেই সময় হো হো হাসির রব হইত। তিনি মধ্যম ভ্রাতাকে লইয়া এইরূপ কৌতুক প্রায়ই করিতেন।

এক বার তিনি বীরসিংহ গ্রাম হইতে হাঁটিয়া আসিতেছিলেন। এক মাঠের মাঝে দেখিলেন, একটী অতি বৃদ্ধ কৃষক মাথায় মোট করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিদ্যাসার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, লোকটীর বাড়ী সেখান হইতে ২।৩ দুই তিন ক্রোশ দূরে। তাহার যুবক পুত্র, তাহার মস্তকে বোঝা চাপাইয়া দিয়া তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়াছে। বৃদ্ধ এখন চলচ্ছক্তিহীন। বৃদ্ধের অবস্থা দেখিয়া এবং পুত্রের ব্যবহারের কথা শুনিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধের মস্তক হইতে সেই বোঝা আপন মস্তকে তুলিয়া লইলেন; এবং বৃদ্ধকে সঙ্গে করিয়া তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত গেলেন। তিনি সেই মোট, বৃদ্ধের বাড়ীতে পৌঁছিয়া দিয়া, আবার হাঁটিয়া কলিকাতায় আসেন।

এমন অনেক গল্প শুনিয়াছি, সব কথা বলিবার স্থান হইবে না। পাঠক ইহাতেই অবশ্য বুঝিয়াছেন, বিদ্যাসাগরের চলচ্ছক্তি কিরূপ অসামান্য। বল দেখি, মস্তিষ্ক ও দেহের এরূপ শক্তিসমাহার ইহ-সংসারে অতি বিরল কি না? আর কোন বাঙ্গালীর এমন দেখিয়াছ কি? কেবলই কি তাই? এমন অনাত্মপরতা বা কয় জনের আছে বল? বল, বুদ্ধি, দয়া,—তিনটীর একত্র সমাবেশ; বড় ভাগ্যবান্ না হইলে কি হয়? একাধারে যে ত্রিবেণীর ত্রিধারা।

ইহার উপর আবার মাতৃ-ভক্তির মন্দাকিনী-ধারা পূর্ণোচ্ছ্বাসে প্রবাহিত। এই খানে তাহারও একটু পরিচয় দিব।

এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কার্য্য করিবার সময়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় ভ্রাতার বিবাহ-সম্বন্ধ হইয়াছিল। বীরসিংহ গ্রাম হইতে জননী পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন,—"তুমি অতি অবশ্য আসিবে।" মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তখন মার্সেল্ সাহেবের নিকট ছুটীর জন্য প্রার্থনা করেন; ছুটী কিন্তু পাইলেন না। তখন তিনি ভাবিলেন,—"আমাকে না দেখিয়া মা মরিবেন; অত্যন্ত কৃতঘ্ন আমি মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে পারিলাম না। হা ধিক্! শত ধিক্।" সকলেই বাড়ী গিয়াছেন; বিদ্যাসাগর মহাশয় শূন্য-প্রাণে ও উদাস মনে, সারা রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইলেন। পর দিন প্রাতঃকালে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, ছুটী না পাই, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিব। অদ্য কিন্তু বাড়ী নিশ্চিতই যাইব।" তিনি মার্সেল্ সাহেবকে গিয়া বলিলেন;—"ছুটী না দেন, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলাম,—মঞ্জুর করুন; চাকুরীর জন্য জননীর অশ্রু-জল সহ্য করিতে পারিব না।" সাহেব স্তম্ভিত হইলেন! ভাবিলেন,—"এ কি এ অদ্ভুত মাতৃ ভক্তি!" তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, প্রসন্ন-চিত্তে তখনই ছুটী মঞ্জুর করিলেন। ছুটী পাইয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় বাসায় আসিলেন এবং বেলা ৩ তিনটার সময় ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। আষাঢ় মাস,—আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন,—মুহুর্ম্মুহুঃ কড় কড় বজ্র-ধ্বনি,—চকিতে বিদ্যুৎ-চমকানি—অবিরাম বাত্যা-প্রবাহিনী,—মুষলধারে বৃষ্টি,—পথ ঘাট কর্দ্দমাক্ত। বিদ্যাসাগর কিছুতেই

ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, মাতৃ-উদ্দেশে ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় ভৃত্য শ্রীরামের অনুরোধে, তাঁহাকে সে রাত্রি, কৃষ্ণরামপুরের এক দোকানে অবস্থিতি করিতে হয়। তখনও ১২। ১৩ বার তের ক্রোশ অবশিষ্ট। পরদিন প্রত্যূষে তিনি আবার চলিতে লাগিলেন। শ্রীরাম ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার বাড়ী নিকটস্থ কোন গ্রামে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে বাড়ী যাইতে বলিলেন। শ্রীরাম কিন্তু প্রভুর বিপদা-শঙ্কায় সঙ্গ ছাড়িল না। সে ধীরে ধীরে প্রভুর পদানুসরণ করিতে লাগিল। কিয়দ্দূর গিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষুধার্ত্ত ও ক্লান্ত শ্রীরামকে একটী দোকানে ফলারে বসাইয়া বলি-লেন,—"শ্রীরাম এই পয়সা লও,—বাড়ী যাও।" এই কথা বলিয়া তিনি দ্রুতপদে তীরবেগে চলিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীরাম সঙ্গ লইতে পারিল না। ক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয় দামোদর নদের তীরে উপস্থিত হইলেন। বিষম বর্ষায় দামোদরে খরতর একটানা স্রোত,—'দুকূল-ভরা',—'কানে কান জল।'

গ্রীষ্মকালে দামোদরে সামান্য-মাত্র জল থাকে; এমন কি, হাঁটিয়াই পার হওয়া যায়। বর্ষাকালে কিন্তু ইহা প্রলয়ঙ্করী সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করে। আজ সেই দামোদর বাত্যা-বিক্ষোভিত বারিধিবৎ ভীষণ সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিলেন,—পারাপারের নৌকা অন্য পারে। তাঁহার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, পিতা, ভ্রাতা,

ভগিনী, যুবতী বনিতা *—সবই আছে। আজ কিন্তু বিদ্যাসাগর ভাবিতেছেন, তাঁহার কেহই নাই;—আছেন কেবল,—"জননী"। বিদ্যাসাগর বাহ্যজ্ঞান শূন্য;—অন্তরে বাহিরে কেবল সেই অন্নপূর্ণা মাতৃমূর্ত্তি। অনন্ত-বিশ্ব-ব্যোম-ব্যাপিনী মাতৃ মূর্ত্তি! তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নৌকার অপেক্ষা না করিয়া, উচ্চকণ্ঠে 'মা, মা' বলিয়া ডাকিয়া, দামোদরের জলে ঝাঁপ দিলেন।

দেখিতে দেখিতে বিদ্যাসাগর সাঁতার দিয়া দামোদর পার হইয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর কি নিজ বলে সে দুর্জ্জয় দামোদর পার হইলেন? মানুষের শক্তিতে কি তাহা কুলায়? এ ব্যাপার দেখিয়াই মনে হয়, মাতৃভক্তের কাতর-ক্রন্দনে স্থির থাকিতে না পারিয়া, স্বয়ং মাতৃরূপিণী মহামায়া বিদ্যাসাগরকে বুকের ভিতর করিয়া লইয়া, সেই দুরন্ত দামোদর পার করিয়া দিয়াছিলেন। পার হইয়া বিদ্যাসাগর আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথে তাঁহাকে দ্বারকেশ্বর নদ সাঁতরাইয়া পার হইতে হয়। মাঠের মাঝে 'কুড়ান খালের' নিকট সন্ধ্যা উপস্থিত হয়। এই খানে ভয়ানক দস্যুর ভয় ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, অকুতোভয়ে মাতৃপদ স্মরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। রাত্রি ৯ নয়টার সময় তিনি বাড়ীতে উপস্থিত হন। উপস্থিত হইয়া দেখেন, বর

* ১৮৩৬ কি ৩৭ খৃষ্টাব্দে বা ১৮৪৩ কি ৪৪ সালের ফাল্গুন মাসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছিল।

বিবাহ করিতে গিয়াছে; মা কিন্তু ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া, অনাহারে পড়িয়া আছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এক বার উচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন, "মা! মা! আমি এসেছি।" বিদ্যাসাগরের কণ্ঠস্বর বুঝিয়া, মা ঘরের বাহিরে আসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন মাও কাঁদেন, পুত্রও কাঁদেন। উভয়েই অনাহারে ছিলেন। উচ্ছ্বাস-বেগের হ্রাস হইলে পর, মাতা ও পুত্র, একত্র আহার করিতে বসেন।

বহুতর বিদেশীয়-গ্রন্থ-পাঠক, বহুতর মাতৃভক্ত বিদেশীয় পুরুষের নাম শুনিয়া থাকেন। জন্‌সন্, জেনারল্ ওয়াশিংটন্ প্রভৃতির মাতৃভক্তি, অতুলনীয় বলিয়া পরিকীর্ত্তিত; কিন্তু বল-দেখি, বাঙ্গালী বিদ্যাসাগরের এ মাতৃভক্তির তুলনা কি হয়? শুনিয়াছি, রোমক-বীর সম্রাট্ সিজর্, যখন ইংলণ্ড-বিজয়-মানসে, সাগর পার হইবার উপক্রম করেন, তখন ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহাকে জাহাজে উঠিতে অনেকেই নিষেধ করেন; কিন্তু তিনি কাহারও নিষেধ শোনেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়, যখন দামোদরে ঝাঁপ দিবার উপক্রম করেন, তখন নিকটস্থ জন কয়েক লোক, তাঁহাকে পাগল ভাবিয়া, সে দুষ্কর কার্য্যে বাধা দেয়; বিদ্যাসাগর কোন বাধা মানেন নাই। বাহ্য জগতে উভয়েরই অবস্থা একরূপ; অন্তর্জগতের ক্রিয়া নিশ্চিতই ভিন্ন রূপ। এক জনের বিজয়-বাসনা, অপরের মাতৃপূজা। বল দেখি, পাঠক! কাহার সাহস প্রশংসনীয়? এ জগতে কোন্ বীর স্মরণীয়? বিদ্যাসাগরের

মাতৃভক্তির এই একটী মাত্র দৃষ্টান্ত পাইলেন; পরে আরও বহুপ্রকার পাইবেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, বাল্য-রচনায় যেমন সুন্দর সুপাঠ্য কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, যৌবনেও তাঁহার সেইরূপ কবিতা রচনা করিবার শক্তি ছিল। তিনি যখন ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের পণ্ডিত, তখন কষ্ট-নামে এক সিবিলিয়ন্ সাহেব তাঁহাকে নিজের নামে একটী কবিতা রচনা করিতে অনুরোধ করেন। অনুরোধের বশে নিম্নলিখিত কবিতাটী রচিত হইয়াছিল,—

"শ্রীমান্ রবর্টকষ্টোঽদ্য বিদ্যালয়মুপাগতঃ।
সৌজন্যপূর্ণৈরালাপৈর্নিতরাং মামতোষয়ৎ॥
স হি সদ্‌গুণসম্পন্নঃ সদাচাররতঃ সদা।
প্রসন্নবদনো নিত্যং জীবত্বব্দশতং সুখী॥"

কষ্ট সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ২০০৲ দুই শত টাকা পুরস্কার দিতে প্রস্তুত হন। তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া কলেজে জমা দিতে বলেন। সাহেব তাহাই করেন। যে ছাত্র, সংস্কৃত রচনায় প্রথম হইতেন, তিনি এই টাকা হইতে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার পাইতেন। ৪ চারি বৎসর ৪ চারিটী ছাত্র এই পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ইহার নাম হইয়াছিল, "কষ্ট-পুরস্কার"। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে টাকা না লইয়া, সংস্কৃত-চর্চ্চার শুভোদ্দেশে ৪ চারিটী স্বদেশীয় পণ্ডিতকে প্রকারান্তরে এই টাকা দেওয়াইলেন। ইহা কি

কম মহত্ত্ব! কষ্ট সাহেবের দ্বিতীয় অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিম্নলিখিত শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন ;—

"দোষৈর্বিনাকৃতঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বৈরাসেবিতো গুণৈঃ।
কৃতী সর্ব্বাসু বিদ্যাসু জীয়াৎ কষ্টো মহামতিঃ॥
দয়াদাক্ষিণ্যমাধুর্য্যগাম্ভীর্য্যপ্রমুখা গুণাঃ।
নয়বর্ত্ম রতে নূনং রমন্তেঽস্মিন্ নিরন্তরম্॥
সদাসদালাপরতের্নিত্যং সৎপথবর্ত্তিনঃ।
সর্ব্বলোকপ্রিয়স্যাস্য সম্পদস্তু সদা স্থিরা॥
অস্য প্রশান্তচিত্তস্য সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ।
সর্ব্বধর্ম্মপ্রবীণস্য কীর্ত্তিরায়ুশ্চ বর্দ্ধতাম্॥
বিদ্যাবিবেকবিনয়াদিগুণৈরুদারৈঃ।
নিঃশেষলোকপরিতোষকরশ্চিরায়।
দূরং নিরস্তখলদুর্ব্বচনাবকাশঃ।
শ্রীমান্ সদা বিজয়তাং নু রবর্টকষ্টঃ॥"

কষ্ট সাহেব যখন এই কবিতা রচনা করিতে অনুরোধ করেন, তখন তিনি পঞ্জাবের সিবিলিয়ান্ পদ হইতে চির-বিদায় লইয়া বিলাত যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন।

অতঃপর উত্তর-চরিত, শকুন্তলা ও মেঘদূতের সংক্ষিপ্ত টীকা ভিন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয় এ ভাবে আর কোন শ্লোকাদি রচনা করিয়াছিলেন কি না, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। তিনি যে এ ভাবে আর সংস্কৃত গদ্য বা পদ্য রচনা করিয়াছিলেন, এমন বোধও হয় না। সংস্কৃত-রচনায় তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না।

আধুনিক লোকে প্রকৃত বিশুদ্ধ সংস্কৃত রচনা করিতে পারে, এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল না। একদিন মেঘদূতের স্বচরিত টীকা দেখিয়া, তিনি স্বীয় দৌহিত্রের নিকট একটু হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—"ওরে আমি বেশ সংস্কৃত লিখেছি তো।"

ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে অধ্যাপনার কালে বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহেবদের পরীক্ষক হইতেন। তদুপলক্ষে বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—"পরীক্ষায় পাস না হইলে, কোন কোন সিবিলিয়নকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইত। এ কারণ মার্সেল সাহেব দয়া করিয়া ঐ সিবিলিয়নদের কাগজে নম্বর বাড়াইয়া দিতে বলিতেন। অধ্যক্ষের কথা না শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়, ন্যায়ানুসারে কার্য্য করিতেন। উপরোধ করিলে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিতেন, অন্যায় দেখিলে কার্য্য পরিত্যাগ করিব। এ কারণ সিবিলিয়ন্ ছাত্রগণ ও অধ্যক্ষ মার্সেল সাহেব, তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ ন্যায়পরতা অসম্ভব নয়; কিন্তু রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে মার্সেল সাহেবের যেরূপ সদাশয়তা ও সৎসাহসিকতার কথা শুনি, তাহাতে তিনি বিদ্যাসাগরকে এরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এ কথা হঠাৎ স্বীকার করিতে যেন মন চাহে না। তবে স্বজাতি-প্রেমের কথা স্বতন্ত্র।

অষ্টম অধ্যায়।

বাসুদেব-চরিত ও সাহিত্য-সন্ধান।

ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে প্রবেশ করিবার পর, বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের কর্তৃপক্ষ-কর্তৃক সুপাঠ্য বাঙ্গালা গদ্য-পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হন। সেই অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি "বাসুদেব-চরিত" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। "বাসুদেব-চরিত" শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া রচিত। "বাসুদেব-চরিতে" শ্রীমদ্ভাগবতের কোন কোন স্থান পরিত্যক্ত; কোন কোন স্থানের ভাবমাত্র গৃহীত এবং কোন কোন স্থান অবিকল অনুবাদিত। ইহা অবলম্বন বা অনুবাদ হউক; লিপি মাধুর্য্যে ও ভাষা-সৌন্দর্য্যে, মূল সৃষ্টি সৌন্দর্য্যেরই সম্যক্ সমীপবর্ত্তী।

"বাসুদেব-চরিত" বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থের আদর্শ-স্থল। হিন্দু-সন্তানেরই ইহা প্রকৃত পাঠ্য। বাঙ্গালী হিন্দু পাঠকের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে, "বাসুদেব-চরিত" ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই। যে "বাসুদেব-চরিতে" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ-ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত, তাহা খৃষ্টান সাহেব সিবিলিয়ন্ কর্তৃক যে অননুমোদিত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

"বাসুদেব-চরিতে" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ লীলা প্রকটিত; পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে ভগবদাবির্ভাবের পূর্ণ প্রকটন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় অবশ্য মনে করিয়াছিলেন, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব বিকসিত হইলেও, সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদমাত্র ভাবিয়া, সাহেব সিবিলিয়নগণ ইহাকে সাদরে উপাদেয় বাঙ্গালা পাঠ্যরূপে গ্রহণ করিবেন। বস্তুতঃ ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত প্রথম গ্রন্থ হইলেও, অনুবাদের গুণে, ভাষার লালিত্য-মাধুর্য্যে, বর্ণনার বিকাশ-চাতুর্য্যে এবং ভাব-সম্ভারের যথাযথ বিন্যাসে, ইহা বাঙ্গালা ভাষা-শিক্ষার্থী সাহেব সিবিলিয়নদের যে অতি আদরণীয় পাঠ্য হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহার পূর্ব্বে বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত, এমন সুন্দর বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ আর ছিল না। অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতই এই ফোর্ট উইমিয়ম্ কলেজের পাঠার্থীদের জন্য বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন পাঠ্যই এমন সুপাঠ্য হয় নাই; সুপাঠ্য কি, কদর্য্য ভাষার জন্য তাহার অধিকাংশই অপাঠ্য হইয়াছিল।* কেবল "ফোর্ট উইলিয়ম্" কলেজের পাঠ্য

---

* কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ নামক যে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়, তাহার ব্যবহারের জন্য অনেকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। কেরি সাহেব ঐ স্থানে আসিয়াই বাঙ্গালা ও ইংরেজিতে ব্যাকরণ ও অভিধান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে ব্যাকরণ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে; কিন্তু অভিধান এখন অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। * * * সাহেব ভিন্ন কয়েক জন বাঙ্গালী ঐ কালেজের অধ্যাপক হইয়া কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রামরাম বসু অতি কদর্য্য গদ্যে প্রতাপাদিত্যচরিত নামে এক পুস্তক লেখেন এবং পণ্ডিতবর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রবোধচন্দ্রিকা রচনা করেন।—বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ২০৩।২০৪ পৃষ্ঠা।

কেন, যে সময় "বাসুদেব-চরিত" রচিত হয়, সেই সময় এবং তাহার পূর্ব্বে যে সকল বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহার কোন খানি ভাষা-পারিপাটিতে, "বাসুদেব-চরিতে"র সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। ভাষার নমুনা স্বরূপ, "বাসুদেব-চরিতে"র কিয়দংশ মাত্র এইখানে উদ্ধৃত করিলাম,—

"এক দিবস দেবর্ষি নারদ মথুরায় আসিয়া কংসকে কহিলেন, মহারাজ! তুমি নিশ্চিত রহিয়াছ, কোনও বিষয়ের অনুসন্ধান কর না; এই যাবৎ গোপী ও যাদব দেখিতেছ, ইহারা দেবতা, দৈত্যবধের নিমিত্ত ভূমণ্ডলে জন্ম লইয়াছে এবং শুনিয়াছি, দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া নারায়ণ তোমার প্রাণসংহার করিবেন, এবং তোমার পিতা উগ্রসেন এবং অন্যান্য জ্ঞাতি-বান্ধবেরা তোমার পক্ষ ও হিতাকাঙ্ক্ষী নহেন; অতএব, মহারাজ! অতঃপর সাবধান হও, অদ্যাপি সময় অতীত হয় নাই, প্রতিকার চিন্তা কর। এই বলিয়া দেবর্ষি প্রস্থান করিলেন। কংস শুনিয়া অতিশয় কুপিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ সপুত্র বসুদেব-দেবকীকে আনাইয়া তাঁহাদিগের সমক্ষে পুত্রের প্রাণনাশ করিল এবং তাঁহাদিগকে কারাগারে নিগড়-বন্ধনে রাখিল। অনন্তর নিজ পিতা উগ্রসেনকে দূরীকৃত করিয়া স্বয়ং রাজ্য-শাসন ও প্রজা পালন করিতে লাগিল এবং প্রলম্ব, বক, চাণুর, তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতি দুর্বৃত্ত সৈন্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যদুবংশীয়দের উপরি নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে লাগিল। তাঁহারা প্রাণভয়ে পলাইয়া কুরু, কেকয়, শাম্ব, পাঞ্চাল, বিদর্ভ, নিষধ আদি নানা দেশে প্রচ্ছন্নবেশে বাস করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ কংসের শরণাপন্ন ও মতানুযায়ী হইয়া মথুরাতেই অবস্থান করিলেন।

* * * *

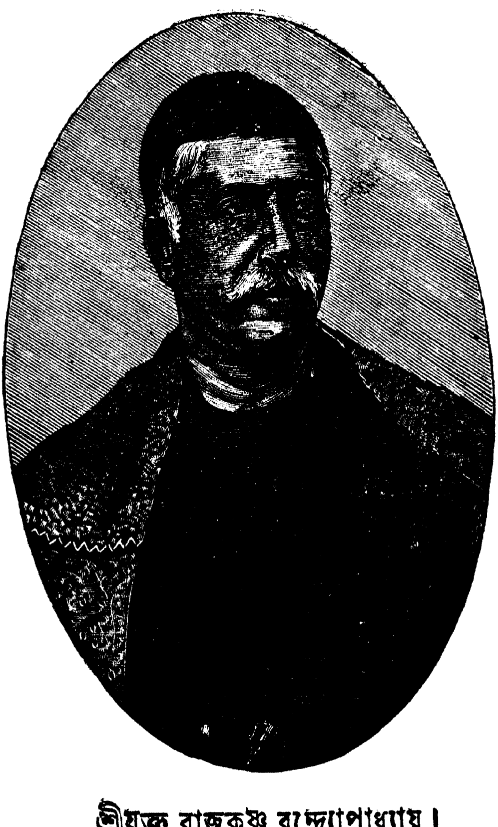
অনন্তর অষ্টম মাস পূর্ণ হইলে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমীর অর্দ্ধরাত্র

সময়ে ভগবান্ ত্রিলোকনাথ দেবকীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন। তৎকালে দিক্ সকল প্রসন্ন হইল, গগনমণ্ডলে নির্ম্মল নক্ষত্রমণ্ডল উদিত হইল, গ্রামে নগরে নানা মঙ্গল-বাদ্য হইতে লাগিল। নদীতে নির্ম্মল জল ও সরোবরে কমল প্রফুল্ল হইল। বন উপবন প্রভৃতি মধুর মধুকর-গীতে ও কোকিলকলকলে আমোদিত হইল; এবং শীতল সুগন্ধি মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহিতে লাগিল। সাধুগণের আশয় ও জলাশয় সুপ্রসন্ন হইল। দেবলোকে দুন্দুভি-ধ্বনি হইতে লাগিল। সিদ্ধ চারণ কিন্নর গন্ধর্ব্বগণ গীতি ও স্তুতি করিতে লাগিল। বিদ্যাধরীগণ অপ্সরাদিগের সহিত নৃত্য করিতে লাগিল। দেব ও দেবর্ষিগণ হর্ষিতমনে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। মেঘ সকল মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে লাগিল।"

কেবল-সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতের রচিত বাঙ্গালা ভাষার এ পরিপাটী কি কম প্রশংসনীয়? সংস্কৃতে অভিজ্ঞ হইলেই যে এরূপ বাঙ্গালা ভাষা লিখিবার শক্তি হয়, এ কথা বলিতে পারি না। রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও পাদরী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তো সংস্কৃত ভাষায় অল্প-বিস্তর অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন জন্য সামান্য প্রয়াস পান নাই। বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধন-কল্পে তাঁহারাও কম সহায় নহেন। সে জন্য তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য-পাত্র, সন্দেহ নাই? * তাঁহারাও কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায়,

---

* চিরস্মরণের চিহ্ন-স্বরূপ এই তিন জনের প্রতিকৃতি স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃষ্ট পুষ্টি-কর্ত্তা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিকৃতির সহিত ইঁহাদেরও প্রতিকৃতি সতত বাঙ্গালা-পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে, ভাষা-পুষ্টি-সাধন-কল্পে উৎসাহ ও উদ্যমের উন্মেষণা



শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।



রাজা রামমোহন রায়।

বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক প্রণয়নে সমর্থ হন নাই। তুলনায় সমালোচনা করিবার জন্য, তাঁহাদেরও প্রত্যেকের ভাষার একটু একটু নমুনা প্রকাশ করিলাম।

রাজা রামমোহন রায় "পৌত্তলিকদিগের ধর্ম্ম-প্রণালী", "বেদান্তের অনুবাদ", 'কঠোপনিষদ্", 'বাজসনেয়-সংহিতোপনিষদ্", "মাণ্ডুক্যোপনিষদ্", "পথ্যপ্রদান" প্রভৃতি কয়েক খানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। "পথ্যপ্রদান" হইতে ভাষার একটু নমুনা দিলাম,—

"বাস্তবিক ধর্ম্মসংহারক অথচ ধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী নাম গ্রহণ পূর্ব্বক যে প্রত্যুত্তর প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সমুদায়ে দুই শত অষ্টাত্রিংশৎ পৃষ্ঠ সংখ্যক হয়, তাহাতে দশ পৃষ্ঠ পরিমিত ভূমিকা গ্রন্থারম্ভে লিখেন। এই দশ পৃষ্ঠে গণনা করা গেল যে ব্যঙ্গ ও নিন্দাসূচক শব্দ ভিন্ন স্পষ্ট কটূক্তি বিংশতি শব্দ হইতে অধিক আমাদের প্রতি উল্লেখ করিয়াছেন,—এইরূপ

হইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাঠ্যাবস্থায় ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায় বিলাতে ব্রিষ্টল সহরে ৬১ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও পাদরী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগরের সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসারে প্রবৃত্ত ছিলেন। ইহাঁরা উভয়ে ইংরেজীতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন; পরন্তু কৃষ্ণ বন্দ্য খৃষ্টান হইয়াছিলেন। ইহাঁদের বাঙ্গালা ভাষার হিতৈষিণা প্রকৃতই প্রশংসার যোগ্য। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ৭০ বৎসর বয়সে রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র ও ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ৮৫ বৎসর বয়সে কৃষ্ণ বন্দ্য মানবলীলা সংবরণ করেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক সময় অনেকটা ঘনিষ্ঠতা ছিল। "ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউসনে"র কোন কার্য্যালোচনার পর উভয়ের সে ঘনিষ্ঠতা বিচ্ছিন্ন হয়। কৃষ্ণ বন্দ্যোর সহিত মৌখিক আলাপ-প্রীতিমাত্র ছিল।

সমগ্র পুস্তক প্রায় দুর্ব্বাক্যে পরিপুষ্ট হয়। ইহাতে এই উপলব্ধি হইতে পারে যে দ্বেষ ও মৎসরতায় কাতর হইয়া ধর্ম্ম-সংহারক শাস্ত্রীয় বিবাদচ্ছলে এইরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া অন্তঃকরণের ক্ষোভ নিবারণ করিতেছেন, অন্যথা দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ বিনা শাস্ত্রীয় বিচার সর্ব্বথা সম্ভব ছিল।"

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় "ষড়্‌-দর্শন সংগ্রহ", "বিদ্যা-কল্পদ্রুম" * প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যাকল্পদ্রুম হইতে ভাষার একটু নমুনা দিলাম,—

"এতদ্দেশের প্রাচীন ইতিহাস পুস্তকে অনেক অনেক নরপতি ও বীরদিগের দেবপুত্ররূপে বর্ণনা আছে, ইহাতে বোধ হয় পূর্ব্বকালীন লোক-দের সত্যাপেক্ষা অদ্ভুত বিবরণে অধিক আদর ছিল এবং পুরাণ লেখকেরা কবিতার ছন্দোলালিত্যাদির প্রতি অনুরক্ত হইয়া শব্দবিন্যাস করত পাঠক-বর্গের মনোরঞ্জন পুরঃসর বিবিধ বিষয়ে উপদেশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলেন, সুতরাং অবিকল ইতিবৃত্ত লিখিয়া স্ব স্ব কল্পনা-শক্তিকে খর্ব্ব করেন নাই। কাব্য ও অলঙ্কারের রসে রসিক হইয়া স্ব স্ব কবিত্ব ও নৈপুণ্য প্রকাশপূর্ব্বক সাধারণের সন্তোষ করিয়া উল্লিখিত শূরবীর রাজাদিগের মানের গৌরব করিবেন, তাঁহাদিগের ইহাই বিশেষ তাৎপর্য্য ছিল।"

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক বাঙ্গালা মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়া, আপনার বিদ্যাবুদ্ধি ও গবেষণার পরিচয়ের সঙ্গে, বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনা-কামনারও পরিচয় দিয়াছেন। তাহা হইতে ভাষার একটু নমুনা দিলাম,—

* বিদ্যাকল্প-দ্রুম কোষ-গ্রন্থ; খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছিল। ইহাতে প্রথম জীবন-চরিত প্রকাশিত হয়। পুস্তকের এক দিকে ইংরেজি ও অন্য দিকে তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ আছে।



পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্য।

"পরন্তু এতদ্দেশীয় মহাশয় জনসকল যদি একত্র হওত ঈষদমুগ্রহাবলোকন করিয়া স্বদেশীয় মঙ্গলবৃদ্ধির উৎসাহ জন্মাইবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নানা উপায় দ্বারা তদভিষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। ভদ্র ভদ্র স্থানে অথবা গ্রামে গ্রামে সর্ব্ব সাধারণের সার্ব্বকালিক বংশপরম্পরায় উপকারার্থে গ্রামভেটি ও বারইয়ারির ধন অথবা তত্রত্য প্রত্যেক ব্যক্তি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মাসিক দান দ্বারা এক গ্রন্থালয় স্থাপন করিলে কোন ব্যক্তির ব্যয়ক্লেশ হইবে না, অথচ অতুল উপকার। গ্রন্থের অভাব প্রযুক্ত অনেকে নানা শাস্ত্রালোচনার যোগ্য হইয়াও স্বয়ং গ্রন্থসংগ্রহে অপারকবোধে আলস্যের হস্তে পতিত হন। অনেকের ইতিহাস ও ভুগোলবৃত্তান্ত শ্রবণে ও পঠনে স্বতই ইচ্ছা জন্মে, কিন্তু তাদৃশ গ্রন্থাদির অভাবপ্রযুক্ত নিরর্থক ভৌতিক ও মান্ত্রিক গল্পজল্পনাতে কালযাপন করেন।

"আমরা পল্লীগ্রামবাসী জনের প্রতি অমর্ষান্বিত হইয়া দুর্ব্বল পরামর্শপক্ষের উল্লেখ করিতেছি; কিন্তু তাহাই যে সর্ব্বত্ররেই রীতি হউক এমত আমাদের অভিসন্ধি নহে।

"এতদ্রূপ ভদ্র ধনাঢ্য পল্লীগ্রাম অনেক আছে, যে তাহাতে প্রতিবৎসর মিথ্যা কর্ম্মোপলক্ষে অনেক ব্যক্তি শত শত টাকার বারুদ পোড়াইয়া ক্ষণিক আমোদ করেন, মিথ্যা সং নির্ম্মাণ করিয়া কত শত মুদ্রা ব্যয় করেন। এমত সকল গ্রামে এক একটি উত্তম গ্রন্থালয় না থাকা তত্তদ্ গ্রামস্থ ব্যক্তিদিগের কি পর্য্যন্ত নিন্দাকর তাহা তাঁহারাই বিবেচনা করিয়া দেখুন।"

ইহাঁদের গ্রন্থ হইতে অনেক সার কথার শিক্ষা লাভ হয়, সন্দেহ নাই; ভাষাও অনেকটা ব্যাকরণ-দোষাদিশূন্য; কিন্তু ভাষার বিশদতা ও প্রাঞ্জলতার অভাব জন্য, তাঁহাদের রচনা যে অনেকটা দুর্বোধ হইয়া পড়িয়াছে, তৎসম্বন্ধে কাহারও দ্বিধা থাকিতে পারে না। বাগ্-বিন্যাসের দীর্ঘতা ও ছত্র-সন্নিবেশের

বিশৃঙ্খলতা হেতু এই সব রচনা, মনোহারিণী হইতে পারে নাই। কতকটা ইংরেজী প্রণালীর অনুবর্ত্তী হওয়ায়, ইহাঁদের লিপি-পদ্ধতি অনেকটা জটিল হইয়া পড়িয়াছে।

এই তিন জনের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের ভাষা কিঞ্চিৎ দুর্বোধ। রাজেন্দ্রলালের ভাষা কতকটা ভাল বটে; কিন্তু ইহা কৃষ্ণবন্দ্যের অপেক্ষা দুর্বোধ। কৃষ্ণ বন্দ্যের ভাষা কতকটা জটিল বটে; কিন্তু অধিকতর প্রাঞ্জল। কেবল "বাসুদেব-চরিতে" নহে, ইহার পরে রচিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেক গ্রন্থেই সংস্কৃত প্রণালীমতে দীর্ঘ সমাসযুক্ত শব্দপ্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সব শব্দ বা বাক্য এমনই যথাভাবে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, তাহা কোন রূপেই শ্রুতিকটু হয় নাই; বরং তাহা মধুর মৃদঙ্গ-নিনাদবৎ পাঠক ও শ্রোতার কর্ণমূলে এবং হৃদয়ের অন্তস্তলে অপূর্ব্ব সুখ-সঞ্চার করিয়া থাকে। লিপি-পদ্ধতি একরূপ হইলেও, বিষয়ের লঘুতা ও গুরুতা অনুসারে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত পুস্তকাবলীতে ভাষাপ্রয়োগেরও সারল্য ও গাম্ভীর্য্যের তারতম্য বহুপ্রকারেই দেখিতে পাইবে। এ সম্বন্ধে বিদ্যা-সাগরের অদ্ভুত শক্তি! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনায় ব্যর্থ বাক্যপ্রয়োগ অতীব বিরল। তিনি যেখানে যে বাক্যটী প্রয়োগ করিয়াছেন, মনে হয়, তাহা তুলিয়া লইয়া, তৎসম-সংজ্ঞক অন্য বাক্য-প্রয়োগ দুরূহ। এ শক্তির পরিচয় প্রথম হইতেই তাঁহার "বাসুদেব-চরিতে"।



রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত, বাসুদেব-চরিত রচনা হইবার পূর্ব্বে, অন্যান্য অনেক মহাত্মাই বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের পুষ্টি-সাধন জন্য পুস্তক রচনা করিয়াছেন। এ জন্য কেরি, মার্সমান্ প্রভৃতি মিশনরী বাঙ্গালীর আশীর্ব্বাদ-পাত্র। তবে ইহাঁরাও যে ভাষার সম্যক্ পরিপাটী বা পরিপুষ্টি-সাধনে কৃতকার্য্য হন নাই, বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেই তাহা বিদিত আছেন। মিশনরী ভাষার একটু নমুনা এইখানে দিলাম,—

"এক বড় বিলেতে অনেক বেঙ্গের বসতি ছিল। তাহার ধারে কতকগুলি বালক হঠাৎ খাপরা খেলা খেলিতে লাগিল, আর জলে একজাই খাপ্রাবৃষ্টি করিতে লাগিল; ইহাতে ক্ষীণ ও ভীত বেঙ্গেদের বড় দুঃখ হইল। শেষে সকল হইতে সাহসী এক বেঙ্গ বিল হইতে উপরে মুখ বাড়াইয়া কহিল, হে প্রিয় বালকেরা! তোমরা এত ত্বরাতেই কেন আপন জাতির নিষ্ঠুর স্বভাব শিক্ষহ?"

কেরি, মার্সমান প্রভৃতি মিশনরী ভিন্ন অনেক সিবিলিয়ন্ সাহেব ও বাঙ্গালী মনস্বী, সংবাদপত্র এবং পুস্তকাদি প্রকাশ করিয়া, বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি-সাধনের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।*

* ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হালহেড্ নামক এক সিবিলিয়ান্ সাহেব বঙ্গভাষায় এক ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। তখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। চার্লস্ উইলকিন্স নামক হালহেড্ সাহেবের এক বন্ধু স্বহস্তে কুদিয়া ঢালিয়া এক সাট বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করেন। এই অক্ষরে হালহেড্ সাহেবের ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ বাহাদুর যে সকল আইন সংগৃহীত করেন, ফরষ্টর নামক এক সাহেব তাহা বাঙ্গালাতে অনুবাদ করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মার্শন্, ওয়ার্ড প্রভৃতি মিসনরী শ্রীরামপুরে আসিয়া অবস্থিতি করেন। ইহাঁরা শ্রীরামপুরে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া

স্থানান্তরে যথাপ্রসঙ্গে সংবাদ-পত্রের আলোচনা করিব। এখানে বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি-পরিচায়ক কয়েকখানি পুস্তকের উল্লেখ করিবমাত্র। এতদুল্লেখে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা-প্রকৃষ্টতা ও বাঙ্গালা ভাষার চরম পুষ্টিকারিতা কতক উপলব্ধ হইবে।

প্রকৃত বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি-কাল নির্ণয় করা দুরূহ। তবে আমরা প্রায় তিন শত বৎসরের পূর্ব্বে লিখিত যে গদ্য-সাহিত্যের পুঁথি দেখিয়াছি, তাহার আলোচনা করিলে প্রতীত হয়, প্রকৃত গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি ইহার বহুপূর্ব্বে।* ইহার ভাষা তেজোময়ী ও প্রাণময়ী না হউক, ইহার গঠন-প্রকারে মনে হয়, প্রকৃত গদ্য-সাহিত্য সৃষ্টির কাল নির্ণয় দুষ্কর। এইখানে ভাষার একটু নমুনা দিলাম,—

"তাহার রূপ কি। স্বরূপ প্রকৃতিতে জড়িত। বাহ্যজ্ঞান রহিত। তেঁহ নিত্য চৈতন্য। তাহাকে জানিব কেমনে। তেঁহ আপনাকে আপনি জানান। যে জন চেতন সেই চৈতন্য। অতএব স্বরূপ রূপ এক বস্তু হয়। বর্ত্তমান অনুমান এই দুইরূপ। * * *। তাহার নাম কি? সপ্ত স্বর্গ সপ্ত পাতাল কি কি। ভূলোক ভবলোক স্বরলোক মহোলোক

দেবনাগর বাঙ্গালা প্রভৃতি নানা অক্ষর প্রস্তুত করেন এবং সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি, উড়িয়া প্রভৃতি নানা ভাষায় বাইবেল অনুবাদিত করিয়া ঐ যন্ত্রে মুদ্রিত করিতে লাগিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত প্রভৃতি বাঙ্গালার প্রাচীন প্রাচীন গ্রন্থ সকলও উহাতে মুদ্রিত হইতে লাগিল।—বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব, ২০৩ পৃষ্ঠা।

* এই পুঁথি কলিকাতা বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে আছে, ইতিপূর্ব্বে এ পুঁথির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তখন এ পুঁথি আমাদের হস্তগত হয় নাই।

ইয়াট্‌স্ সাহেব জীবিত থাকিলে, তাঁহার মনের এ ক্লেশ একেবারে না হউক, কতকটা দূরীকৃত হইতে পারিত, সন্দেহ নাই।

ভাষার পুষ্টিতত্ত্বনির্ণয় করিতে হইলে, প্রাচীনতম সাহিত্যের আলোচনা করা কর্ত্তব্য; অন্ততঃ বিদ্যাসাগর বিরচিত বাসুদেবচরিতের ভাষা বুঝাইতেও তাহার প্রয়োজন; কিন্তু এখানে সে সম্বন্ধে আলোচনার স্থানাভাব; এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পাঠকের বিরক্তিকর হইবার সম্ভাবনা। তবে কতকটা কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কয়েকখানি পুস্তকের উল্লেখ করিলাম।

প্রথমে "তোতা-ইতিহাসে"র উল্লেখ করা উচিত। এখানি "তোতা-কাহানী" নামক উর্দ্দূ পুস্তকের অনুবাদ। হিন্দীতেও "শুকবাহাত্তরী" নামক এইরূপ একখানি পুস্তক আছে। তোতা অর্থাৎ শুকপক্ষীর মুখে গল্পচ্ছলে কয়েকটী প্রসঙ্গ। ইহার লিপি-প্রণালী বিশুদ্ধ নয়; ভাষাও গ্রাম্য-দোষ-বর্জ্জিত নয়; স্থানে স্থানে বিজাতীয় ভাব-ব্যক্তিরও অভাব নাই; সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে অযথা গ্রাম্যবাক্য প্রয়োগে অনেক স্থানে শ্রুতিকটু হইয়াছে। তবে শব্দ প্রয়োগ সরল ও সহজ। একটু নমুনা দিলাম,—

"পূর্ব্বকালে ধনবানদের মধ্যে আমদ-সুলতান নামে এক জন ছিলেন; তাঁহার প্রচুর ধন ও ঐশ্বর্য্য এবং বিস্তর সৈন্য-সামন্ত ছিল; একসহস্র অশ্ব পঞ্চশত হস্তী নবশত উষ্ট্র ভারের সহিত তাঁহার দ্বারে হাজির থাকিত। কিন্তু তাঁহার সন্তানসন্ততি ছিল না। এই কারণ তিনি দিবারাত্রি ও প্রাতে ও সন্ধ্যাতে ঈশ্বরপূজকদের নিকট গমন করিয়া সেবার দ্বারা সন্তা-

নের বর প্রার্থনা করিতেন। কতক দিবস পরে ভগবান সৃষ্টিকর্ত্তা সূর্য্যের ন্যায় বদন চন্দ্রের ন্যায় কপাল অতি সুন্দর এক পুত্র তাহাকে দিলেন। আমদ সুলতান ঐ সন্তান পাইয়া বড় প্রফুল্লিতচিত্ত পুষ্পবৎ বিকসিত হইয়া সেই নগরস্থ প্রধান লোক আর মন্ত্রী ও পণ্ডিত এবং শিক্ষাগুরু আর ফকিরদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া বহুমূল্য খেলাৎ বস্ত্রাদি দিলেন। যখন সেই বালকের সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রম হইল তখন আমদ সুলতান্ একজন বিদ্বান লোকের স্থানে পড়িবার জন্যে সেই পুত্রকে সমর্পণ করিলেন। কতক দিবসেতে সেই বালক আরবী ও পারসী শাস্ত্রের সমুদয় পুস্তক পড়িয়া সমাপ্ত করিয়া রাজসভার ধারামতে কথোপকথন আর বসন উঠন শিক্ষা করিলেন। তার পর রাজার আর সভাস্থ লোকদের পসন্দেতে [illegible] হইলেন।”

“তোতা ইতিহাস” কাহার লিখিত, তাহা জানিতে পারা যায় নাই; তবে যে ইহা এদেশীয় লোকের লিখিত, ইয়াট্‌স সাহেব তাহার স্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। এদেশীয়ের লিখিত হইলেও, ইহার বাঙ্গালা কতকটা পাদরীদের বাঙ্গালার মতন।

১৮০২ খৃষ্টাব্দের রামরাম বসুর লিখিত “লিপি মালা” প্রকাশিত হয়। পত্রের উত্তর-প্রত্যুত্তরচ্ছলে সকল প্রবন্ধই লিখিত। লিখন-প্রণালী প্রায়ই পূর্ব্বোক্তরূপ। তবে অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত; কিন্তু ভাষা জটিল। নমুনা এই,—

“তোমাদিগের মঙ্গলাদি সমাচার অনেক দিবস পাই নাই, তাহাতেই ভাবিত আছি; সমাচার বিশেষরূপ লিখিবা। চিরকাল হইল তোমার খুল্লতাত গঙ্গা পৃথিবীতে আগমন হেতু সমাচার প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তখন তাহার বিশেষণ প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই।”

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে "রাজাবলী" নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কতকগুলি হিন্দু ও মুসলমান রাজার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লইয়া ইহা লিখিত। ইহার ভাষা কতকটা পুষ্টতর বটে; কিন্তু দূরান্বয়তাপ্রযুক্ত শ্রুতি-কঠোর। নমুনা,—

"শকাদিত্য পাহাড়ী রাজার অধর্ম্ম ব্যবহার শুনিয়া উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য সসৈন্যে দিল্লীতে আসিয়া শকাদিত্য রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে যুদ্ধে জয় করিয়া আপনি দিল্লীতে সম্রাট হইলেন। * * * এক দিবস ধাররাজ বিক্রমাদিত্যকে ও ভর্তৃহরিকে আপন নিকটে আনাইয়া উপদেশ করিতে লাগিলেন, অরে বাছারা, বিদ্যাহীন যে মনুষ্য সে পশু; অতএব নানা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে যত্নেতে প্রসন্ন করিয়া তাঁহাদের মুখাৎ আপনার হিত শুনিয়া ও বেদ ও ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ ও [illegible]শাস্ত্র ও জ্ঞান-শাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র ও ধনুর্ব্বেদ ও গন্ধর্ব্ববিদ্যা ও নানাবিধ শিল্পবিদ্যা উত্তমরূপে অধ্যয়ন কর; এই সকল বিদ্যাতে বিলক্ষণ বিচক্ষণ হও; ক্ষণমাত্র বৃথা কালক্ষেপ করিও না ও হস্তি অশ্ব রথারোহণেতে সুদৃঢ় হও ও নিত্য ব্যায়াম কর, ও লম্ফেতে ও উল্লম্ফেতে ও ধাবনেতে ও গড়চক্রভেদেতে ও ব্যূহরচনাতে ও ব্যূহভঙ্গেতে নিপুণ হও।"

মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মার লিখিত বত্রিশসিংহাসনও এই সময়ে কতকটা এই প্রণালীতে লিখিত হয়। ইহার ভাষা "তোতা ইতিহাস" ও "লিপি-মালা" অপেক্ষা অনেকটা ভাল। তবে কষ্ট-কল্পিত; সুতরাং রস-মাধুর্য্যের অভাব। নমুনা,—

"এক দিবস রাজা অবন্তীপুরীতে সভা মধ্যে দিব্য সিংহাসনে বসিয়াছেন, ইতোমধ্যে এক দরিদ্র পুরুষ আসিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল, কথা কিছু কহিল না। তাহাকে দেখিয়া রাজা মনের মধ্যে বিচার করিলেন,

যে লোক যাত্রা করিতে উপস্থিত হয়, তাহার মরণ কালে যেমন শরীরের কম্প হয় এবং মুখ হইতে কথা নির্গত হয় না, ইহারও সেই মত দেখিতেছি, অতএব বুঝিলাম, ইনি যাত্রা করিতে আসিয়াছেন, কহিতে পারেন না।”

ইহার পর রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র উল্লেখযোগ্য। ইহা ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে প্রথমে শ্রীরামপুরে ও পরে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে মুদ্রিত হয়। বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালা জীবনী বোধ হয় ইহাই প্রথম। ইহার ভাষা সরল ও সহজ; পরন্তু ইহাতে অধিকতর পুষ্টিরও পরিচয়; কিন্তু শব্দ-লালিত্যের বড়ই অসদ্ভাব। নমুনা এই,—

“তাহাতে পাত্র নিবেদন করিলেন, মহারাজ, আমরা পুরুষানুক্রমে এ রাজ্যের পাত্র, কিন্তু স্বর্গীয় মহারাজারা আর আর প্রকার সুখ্যাতি করিয়াছেন, যজ্ঞ কেহ করেন নাই। মহারাজ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পাত্রকে কহিলেন, আমি অতি বৃহৎ যজ্ঞ করিব, তুমি আয়োজন কর।”

ইহার পর এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “বাসুদেব-চরিত” প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, রামজয় তর্কালঙ্কারপ্রণীত “সাংখ্য-ভাষা-সংগ্রহ”, লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার প্রণীত “মিতাক্ষরা-দর্পণ”, কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননপ্রণীত “ন্যায়-দর্শন,” “পুরুষ-পরীক্ষা,” “হিতোপদেশ,” “জ্ঞান-চন্দ্রিকা,” “প্রবোধ-চন্দ্রিকা,” প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে “পুরুষ-পরীক্ষা,” “হিতোপদেশ,” “প্রবোধ-চন্দ্রিকা,” প্রভৃতি ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের পাঠ্য ছিল।* এই কয়খানি পুস্তক প্রায় এক

* এই সব পুস্তক মুদ্রিত হয়। অনেক অমুদ্রিত হস্তলিখিত পুস্তকও

প্রণালীতে লিখিত। তবে ইহাদের ভাষা পূর্ব্বোক্ত পুস্তকের ভাষা অপেক্ষা পুষ্টতর। লিপি-পদ্ধতি বিশুদ্ধতর। সংস্কৃত-শব্দ-প্রয়োগ বহুল। বাক্যাড়ম্বর ও দূরান্বয়তা হেতু ইহা জটিল, নীরস সন্ধি-প্রয়োগ-দোষে শ্রুতি-কঠোর। শ্রুতিসুখ-কারিতার জন্যই তো সন্ধি-নিয়ম। সকল পুস্তকের ভাষা-নমুনা উদ্ধার করিবার স্থান হইবে না। পুরুষ-পরীক্ষা হইতে একটু নমুনা দিলাম,—

"বঞ্চক কহিতেছে, ভো রাজকুমার আমি স্বাভাবিক লুব্ধ বণিক্ তোমার ধন লইয়া বাণিজ্যার্থে বৃহন্নৌকারোহণ করিয়া সাগর-পারে গিয়াছিলাম। সেখানে ক্রীত বস্তু বিক্রয় করিয়া মূল ধন হইতে একশত গুণ লাভ পাইয়া তথা হইতে আসিতে সমুদ্রের তটের নিকটে আমার বৃহত্তরণী মগ্ন হইল, তাহাতেই আমার সকল ধন নষ্ট হইল, এখন প্রাণমাত্রাবশিষ্ট হইয়া আসিয়াছি। সে যাহা হউক, আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছি, তন্নিমিত্ত তুমি আমার প্রাণদণ্ড কর।"

এখানে আর একখানি পুস্তক উল্লেখযোগ্য। এ খানি জনসনকৃত "রসলাসে"র অনুবাদ। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর কর্তৃক অনুবাদিত ও প্রকাশিত হয়। ইহার ভাষা জটিল;—শব্দালঙ্কারপূর্ণ। ভাষা অশুদ্ধ নহে; তবে ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের অসামঞ্জস্য এবং অন্বয়ের দোষ আছে। সেই জন্য জটিল। নমুনা এই,—

পাঠ্য ছিল। আমরা হস্তলিখিত ভগবদ্গীতার একখানি পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি। ইহা পদ্যে অনুবাদিত।

"ইমলাক উত্তর করিলেন, সুখ দুঃখের কারণ নানাবিধ এবং অনিশ্চিত। আর সদা পরস্পর ক্লান্ত এবং নানাসম্বন্ধে চিত্রবিচিত্র ও অপূর্ব্ব নানাঘটনাধীন হয়। অতএব যিনি আপনাবস্থাকে অতি নির্ব্বিবাদে নির্দ্ধারিত করেন, তিনি অবশ্য জীবিত থাকিয়া, বিবেচনায় ও অনুসন্ধানে পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হইবেন।"

ভাষার যে নমুনা দিলাম, ইহাতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা গদ্যের যে কয়টী ক্রম হইয়াছে, পাঠক, তাহার কতক অবশ্য আভাস পাইলেন। প্রথম ক্রম,—পাদরীদের লেখা। দ্বিতীয় ক্রম,—এদেশীয় লেখকদের লিখিত "তোতা-ইতিহাস," "লিপি-মালা," 'রাজাবলী," "কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র" "বত্রিশ সিংহাসন" প্রভৃতি; তৃতীয় ক্রম,—ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের পাঠ্য পুস্তক,—"পুরুষ-পরীক্ষা," "হিতোপদেশ" প্রভৃতি। তিনটী ক্রমেই পুষ্টতরতার পরিচয়। এখন পাঠক বুঝুন, "বাসুদেব-চরিত্রের" ভাষা আরও কত পুষ্টতর। ইহার প্রণালী-পথ সম্পূর্ণ নূতন। এমন বিশুদ্ধ ও সুখবোধ ভাষা পূর্ব্বে কোন গ্রন্থেরই ছিল কি? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার সরলতা ও সুখবোধতার প্রমাণ-স্বরূপ পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় একটী রহস্য-জনক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন,—

"এক সময়ে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে স্থানীয় কোন বিষয়ের বিচার হয়। সিদ্ধান্ত স্থির হইলে এক জন পণ্ডিত তাহা বাঙ্গালায় লেখেন। সেই রচনা শ্রবণ করিয়া এক জন অধ্যাপক অবজ্ঞা

প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন,—এ কি হয়েছে? এ যে বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালা হয়েছে। এ যে অনায়াসে বোঝা যায়।"

ভাষ-পুষ্টিকারিত্বের কৃতিত্ব বিদ্যাসাগরের অনুবাদেই আরম্ভ। বিলাতের জন্‌সন্‌, মিল্‌টন্‌, স্কট্‌ কার্‌লাইল্‌ প্রভৃতি প্রায় সকল প্রতিপত্তিশালী লেখককে প্রথম প্রথম অনুবাদেই হাত পাকাইতে হইয়াছিল। অনুবাদ হউক, "বাসুদেব-চরিতে" উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় আছে। প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ বাঙ্গালায়, কিরূপে অবিকল সুন্দর অনুবাদ করিতে হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার পথ দেখাইলেন। তবে "বাসুদেব-চরিতে"র অনুবাদের ভাষা ও লিপিভঙ্গী অপেক্ষা, তাঁহার পরবর্ত্তী অনুবাদ ও প্রবান্ধাদির লিপিভঙ্গী যে অধিকতর পরিমার্জ্জিত ও বিশুদ্ধীকৃত হইয়াছে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। "Voyage to Abysinia" (ভয়েজ্‌ টু আবিসিনিয়া) নামক গ্রন্থের জন্‌সন্‌ সর্ব্বপ্রথম যে গদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন, তাহার লিপি-পদ্ধতির সহিত, তৎকৃত পরবর্ত্তী পুস্তাকাদির লিপি-পদ্ধতির তুলনা করিলে যেমন তারতম্য অনুভূত হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরবর্ত্তী গ্রন্থাদির লিপি-পদ্ধতির সহিত এ অনুবাদের লিপি-পদ্ধতির তুলনা করিলে তেমনই তারতম্য বোধ হইবে।

বঙ্গভাষা যতই উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হউক, বঙ্গবাসীকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট চিরঋণী থাকিতে হইবে। তাঁহার লিপি-ভঙ্গী ও বাগ্‌-বিন্যাস-চাতুরী যেন "নিতুই নব।" অবিকল অনুবাদ হইয়াছে; কিন্তু ভাব-ভঙ্গ আদৌ হয় নাই।

স্বল্পাক্ষরে যিনি বহু ভাব প্রকাশ করিতে পারেন, তিনি শক্তিশালী লেখক বলিয়া পরিচিত। ভাব-পূর্ণ সংযমিত শব্দ-প্রয়োগে যিনি নিপুণ, তিনি সু-লেখক নামে প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ প্রতিষ্ঠা যে আছে, তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী "বিধবা-বিবাহ" ও "বহুবিবাহ" সম্বন্ধে পুস্তক এবং অন্যান্য অনুবাদিত ও সঙ্কলিত পুস্তকাবলীর মুখবন্ধ, প্রস্তাবনা প্রভৃতি পাঠ করিলে সহজে উপলব্ধ হয়।

অনুবাদে এবং লিপিচাতুর্য্যে অক্ষয়কুমার দত্তেরও কৃতিত্ব কম নহে। ভাষার পরিশুদ্ধি ও সুপদ্ধতি সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগরের সমকক্ষ। তবে বিদ্যাসাগরের ন্যায় অক্ষয়কুমারের ভাষায় বৈচিত্র্য নাই। বিদ্যাসাগরের ভাষা একসুরে বাঁধা; কিন্তু রাগালাপের বৈচিত্র্য বহুল। এ ভাষায় খেয়াল, ধ্রুপদ, টপ্পা, চুট্‌কী সবই আছে। অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষা একই সুরে বাঁধা; কিন্তু রাগালাপের বৈচিত্র্য নাই। বিদ্যাসাগরের ভাষায় মৃদঙ্গ, তবলা, ঢোল, খোল সকলেরই আওয়াজ পাইবে; অক্ষয়কুমারের ভাষায় কেবল মৃদঙ্গেরই আওয়াজ। বিদ্যাসাগরের ভাষা না বুঝিলেও, তাহার কেমন একটা মধুর-অস্ফুট আওয়াজ কানে বাজিবে।

যাহা হউক, "বাসুদেব-চরিতে"র ন্যায় উপাদেয় পাঠ্যও ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল। খৃষ্টান সাহেবেরা এ পুস্তকের অনুমোদন করেন নাই; তজ্জন্য দুঃখ নাই। দুঃখ এই, একখানি সুপাঠ্য পুস্তকে হিন্দুসন্তানেরা

বঞ্চিত হইয়াছেন। দুঃখ এই, বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপ ভগবানের অবতারত্ব-প্রতিপাদক পুস্তক আর লেখেন নাই। চিরকালই কিছু তাঁহাকে সাহেব সিবিলিয়নদের জন্য পাঠ্য লিখিতে হয় নাই। প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা থাকিলে, তিনি হিন্দু-সন্তানদের জন্য এইরূপ ইহ-পরকালের শিক্ষণীয় সুপাঠ্য পুস্তক লিখিতে পারিতেন। সাহেবদের জন্য এরূপ গদ্য লেখেন নাই; হিন্দু-সন্তানদের জন্যই বা লিখিয়াছেন কৈ? সে প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা থাকিলেও, ভাষা-সম্পদ্ সীতার বনবাসেও তাহার পরিচয় পাইতাম। আরও দুঃখের বিষয়, "বাসু-দেবচরিত" মুদ্রিত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবিতাবস্থায় এ পুস্তক মুদ্রিত করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু সে সময় পুস্তকের পাণ্ডুলিপি খুঁজিয়া পান নাই। তাঁহার পুত্র নারায়ণ বাবু ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি অনেক কষ্টে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। তিনি এ পুস্তক মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মুদ্রিত হইলে, ইহা যে হিন্দু-সন্তানের একখানি প্রকৃত পাঠ্য হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব-প্রতি-পাদিনী আদ্যন্ত লীলা-কথা সম্বন্ধে এক হিন্দী প্রেমসাগর *

* আগরার লল্লুজি "প্রেমসাগর"-প্রণেতা। ইনি হিন্দীভাষায় প্রথম উৎকৃষ্ট গদ্য-গ্রন্থকর্ত্তা। "প্রেমসাগর" উৎকৃষ্ট হিন্দী-গদ্য গ্রন্থ। ইঁহার প্রণীত "সভা-বিলাস" নামক পদ্য-গ্রন্থও সাধারণের পরম প্রিয় পাঠ্য। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে গিলক্রাইষ্ট সাহেবের অনুরোধে "প্রেম সাগর" লিখিত হইয়া কতকাংশে মুদ্রিত হয়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইহা পূর্ণাকারে মুদ্রিত হয়।

ভিন্ন, বাঙ্গালায় এমন সুললিত গদ্য আর দ্বিতীয় নাই। আমরা নারায়ণ বাবুর নিকট পুস্তকের জীর্ণ পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি। ইহাতে কোন বৎসর বা তারিখের উল্লেখ নাই। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ এবং ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে কোন সময়ে ইহা লিখিত হইয়াছিল।

নবম অধ্যায়।

প্রতিপত্তি-পরিচয়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কার্য্য-ত্যাগ, সংস্কৃত কলেজের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর পদে নিয়োগ, কলেজের সংস্কার, তেজস্বিতা, গুণগ্রাহিতা, ভ্রাতৃবিয়োগ.

কলেজের কার্য্য-ত্যাগ ও সখের কাজ।

ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে চাকুরী করিবার সময় কেবল সিবিলিয়ন্ সাহেব সম্প্রদায় কেন, তাৎকালিক এ দেশীয় অনেক সম্পত্তিশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিতও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। এই সময় মুরশিদাবাদের বর্ত্তমান মহারাণী, স্বর্ণময়ীর স্বামী রাজা কৃষ্ণনাথের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। মুরশিদাবাদ রাজ-পরিবারের কর্ম্মচারিগণ তাহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বা ১২৫৪ সালে মৃত রাজার উইল সম্বন্ধে যে মোকদ্দমা হয়, তাহাতে নবীনচন্দ্র নামে এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়াছিলেন,—"রাজা কৃষ্ণনাথ ইংরেজিতে যে উইল করিয়াছিলেন, রাজার ইচ্ছানুসারে আমি, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহায্যে, সেই উইলের বাঙ্গালা অনুবাদ করি। আমি অনুবাদ করি এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা লিখেন। উইল অনুবাদের সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়, ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। এক্ষণে তিনি সংস্কৃত কলেজের সহকারী সেক্রেটরী।" *

---

* The Bengal Hurkara and India Gagette, Thursday, 22 July, 1847.

পরে মুরশিদাবাদ রাজ-পরিবার এবং স্বয়ং মহারাণী স্বর্ণময়ীর সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এতাদৃশ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় আবশ্যক হইলে, মহারাণীর নিকট অর্থ ঋণ লইতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজ-পরিবারের কর্ম্মচারিগণকে যেরূপ নানা বিষয়ে সাহায্য করিতেন, মহারাণীর নিকটও তিনি সেইরূপ অনেক বিষয়ে সাহায্য পাইতেন। এ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি যথাপ্রসঙ্গে স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে।

কেবল মুরশিদাবাদের রাজ-পরিবার কেন, পাঠক! পরে পরিচয় পাইবেন, এই দরিদ্র-সন্তান দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কত রাজা, মহারাজা, জমীদার, তালুকদার প্রভৃতি অতুল বিভবশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের কিরূপ সহায় হইয়াছিলেন।

১৮৪৬ সালের মার্চ্চ মাসে বিদ্যাসাগর মহাশয়, ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের কার্য্য পরিত্যাগ করেন। এই সময়, সংস্কৃত কলেজের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যু হয়। বাবু রসময় দত্ত তখন সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক জন সবিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর পদ গ্রহণ করিলে, সংস্কৃত কলেজের প্রকৃতই অনেক উন্নতি হইবে, ইহাই তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। তবে এ পদের বেতন পঞ্চাশ টাকা ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজেও পঞ্চাশ টাকা বেতন পাইতেন। সুতরাং এ

পদের জন্য, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের পদ ত্যাগ করিবেন না, রসময় বাবুর ইহাও ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই এই পদ গ্রহণ করেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই এই পদে অধিষ্ঠিত করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ্চ শিক্ষা বিভাগে এক পত্র লেখেন। এই পত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী করিবার জন্য তাঁহার সবিনয় অনুরোধ ছিল। এই পদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবার জন্যও তিনি যথেষ্ট উপরোধ করিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন, এ পদের বেতন বৃদ্ধি না হইলে, বিদ্যাসাগরের ন্যায় এক জন উপযুক্ত লোক পাওয়া দুরূহ। রসময় বাবু যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহার সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদপ্রার্থনার আবেদন-পত্র ও প্রশংসা-পত্রাদি পাঠান হইয়াছিল।

রসময় দত্তের পত্র ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রশংসা-পত্রাদি পাইয়া, শিক্ষা-বিভাগের তাৎকালিক সেক্রেটরী এফ্, জে, মোনাট্ এম, ডি, সাহেব অতি সন্তোষ-সহকারে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সংস্কৃত কলেজের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী পদে নিযুক্ত করিতে স্বীকার করেন। তবে তিনি সে সময় পদের বেতন বৃদ্ধি করিতে সম্মত হন নাই।

মোনাট্ সাহেব, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রেল, রসময় বাবুকে এই মর্ম্মে পত্র লেখেন,—"ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেই আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী পদে নিযুক্ত করা হইল; কিন্তু আপাততঃ তাঁহার

বেতন বৃদ্ধি হইবে না। পরে কার্য্য বুঝিয়া বেতন বৃদ্ধি করিবার সম্ভাবনা রহিল।”

৪ঠা এপ্রেল, এই পত্রের এক অনুলিপিও ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। রসময় বাবুও তাঁহাকে আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বুঝাইয়া বলেন,—“তুমি যদি এ পদ গ্রহণ কর, তাহা হইলে, কলেজের উন্নতি হইবে। কলেজের উন্নতি হইলে, নিশ্চিতই বেতন বৃদ্ধি হইবে।”

বেতন বৃদ্ধির আশা বুঝিয়া এবং রসময় বাবুর অনুরোধ রক্ষা না করা অন্যায় ভাবিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় পদগ্রহণে সম্মত হন। এই এপ্রিল মাসেই তিনি সংস্কৃত কলেজের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী হন।

সংস্কৃত কলেজের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী পদ গ্রহণ করিলে পর, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের পণ্ডিতপদে নিযুক্ত হন। ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্সেল সাহেবকে বলিয়া কহিয়া, কলিকাতার তালতলা-নিবাসী দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের হেড-রাইটার-পদে নিযুক্ত করিয়া দেন।

সংস্কৃত-কলেজের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের অনেক সংস্কার সাধন করেন। পূর্ব্বে শিক্ষকই কি, আর ছাত্রই কি, কলেজে আসিবার বা যাইবার কাহারও

কোন বাঁধাবাঁধি, আঁটা-আঁটি নিয়ম ছিল না। একদা তিনি সকল অধ্যাপকের আগমনের বহুপূর্ব্বে সমাগত হইয়া কলেজের প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখভাগে আপন মনে পদ চারণা করিতে-ছিলেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য স্মার্ত্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, তাহা লক্ষ্য করিয়া অপরাপর অধ্যাপকদিগকে কহিলেন, "ওগো আর আমাদের বিলম্বে আসা চলিবে না, বিদ্যাসাগর অগ্রে আসিয়া কৌশলে আমাদিগকে তাহা জানাইতেছেন।" তৎপর দিবস হইতে তাঁহারা সকলে যথাসময়ে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর, শিরোমণি, প্রভৃতির ছাত্র ছিলেন, সুতরাং তিনি মুখে কোন কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, অনেক বিষয়ে সু-কৌশলে সু-ব্যবস্থা ও সুনিয়ম করিয়া দেন। তিনি সংস্কৃত-কলেজে প্রথম কাষ্ঠের পাশ প্রচলিত করেন। কোন ছাত্র এই পাশ না লইয়া বাহিরে যাইতে পারিত না। কাহারও সেক্রেটরীর অনুমতি ব্যতীত কোন কাজ করিবার অধিকার ছিল না। ইনি যে সকল কবিতা অশ্লীল মনে করিয়াছিলেন, তাহা সংস্কৃত পাঠ্য-সাহিত্য হইতে তুলিয়া দেন। সাহিত্যশ্রেণীতে অঙ্কশিক্ষার ব্যবস্থা ইঁহার দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বে এ ব্যবস্থা ছিল না।

এই সময়ে হিন্দু-কলেজের "প্রিনসিপল" কার্ সাহেবের সহিত, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটু মনান্তর ঘটিয়াছিল। এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয়, কার্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সাহেব তখন টেবিলের উপর পা তুলিয়া বসিয়াছিলেন।

তিনি তদবস্থায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে কথা কহেন। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়, আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করেন; কিন্তু সে দিন তৎসম্বন্ধে কোন কথা না কহিয়া ফিরিয়া আসেন। আর এক দিন কার্ সাহেব, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া আপনার চটিরাজ-শোভিত পা দুখানি টেবিলের উপর তুলিয়া দেন; অধিকন্তু সাহেবকে বসিতেও বলেন নাই। সাহেব সে দিন সংক্ষুব্ধ মনে ফিরিয়া আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবহারের কথা, শিক্ষা-সমাজের সেক্রেটরী ময়েট্ সাহেবকে বিদিত করেন। বিদ্যাসাগর মহাশেয়র নিকট কৈফিয়ৎ লওয়া হইল। কৈফিয়তে বিদ্যাসাগর মহাশয়, কার্ সাহেবের দুর্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন। ময়েট্ সাহেব, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইহা তীব্র তেজস্বিতা ভাবিয়া সন্তুষ্ট হন। এটা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তেজস্বিতা নিশ্চয়ই; কিন্তু তিনি যদি সাহেবের সঙ্গে ঐরূপ ব্যবহার না করিয়া, সাহেবকে দুটো মিষ্ট কথায় উপদেশ দিয়া অথবা কর্ত্তৃপক্ষকে বলিয়া শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে আমাদের বিবেচনায় তাঁহার অধিকতর মাহাত্ম্য প্রকাশ হইত।

বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরকালই গুণের পক্ষপাতী ছিলেন। এই সময় সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপক-পদ শূন্য হয়। বাবু রসময় দত্ত, তখনও কলেজের সেক্রেটরী ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই পদে

নিযুক্ত হইতে অনুরোধ করেন। শুনিতে পাই, এ পদ গ্রহণ করিলে অনেকটা কর্তৃত্ব লোপ হইবে এবং কর্তৃত্ব লোপ হইলে, কলেজের শিক্ষা-প্রণালীর শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে অনেকটা অন্তরায় ঘটিবে ভাবিয়া, তিনি এ পদ গ্রহণে অসম্মত হন; তবে এ পদে যাহাতে এক জন প্রকৃত গুণবান্ উপযুক্ত লোক নিযুক্ত হন, ইহাই তাঁহার সম্পূর্ণ চেষ্টা ছিল। সেই সময়, তাঁহার বাল্য সহাধ্যায়ী মদনমোহন তর্কালঙ্কার কৃষ্ণনগর কলেজের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় জানিতেন, তর্কালঙ্কার মহাশয়, সাহিত্য শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন। তিনিই যোগাড়-যন্ত্র করিয়া, তর্কালঙ্কার মহাশয়কে এই পদে নিযুক্ত করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের আসিবার পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়, দিনকতক সাহিত্য শ্রেণীতে পড়াইয়াছিলেন।

এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চতুর্থ ভ্রাতা দ্বাদশ বর্ষীয় বালক হরচন্দ্রের ওলাউঠায় মৃত্যু হয়। ভ্রাতৃ-শোকে বিদ্যাসাগর মহাশয় মৃত-কল্প হন। ভ্রাতার মৃত্যু-সময়ে তিনি দেশে উপস্থিত ছিলেন। কার্য্যবশে তাঁহাকে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল বটে; কিন্তু ভ্রাতৃ-শোকে তিনি ৫। ৬ পাঁচ ছয় মাস এক রকম আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিলে হয়।

এই দুর্ঘটনার পর সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী রসময় দত্তের সহিত তাঁহার মনান্তর ঘটে। তিনি শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে যে সব প্রস্তাব করিতেন, তাহা সময় সময় সেক্রেটরীর অনুমোদিত হইত না। মতান্তরই মনান্তরের কারণ। তেজস্বী

বিদ্যাসাগর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। পদত্যাগ করিতে দেখিয়া, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, স্বজন, পরিজন, সকলে অবাক্ হইলেন। কেহ কেহ বলিলেন, বিদ্যাসাগর পরিত্যাগ করিলেন বটে; কিন্তু এত বড় সংসার চালাইবেন কিসে? সত্য সত্যই ইহা ঘোরতর অবিমৃষ্যকারিতা; কিন্তু তেজস্বী বিদ্যাসাগর দিগ্বিজয়ী বীরের ন্যায় অচল অটলভাবে ও অম্লান বদনে উত্তর দিলেন,— "আলু পটোল বেচিয়া খাইব, মুদীর দোকান করিব, তবুও যে পদে সম্মান নাই, সে পদ লইব না।" এ সময় তাঁহার বাসায় অনেকগুলি অনাথ বালক অন্নবস্ত্র পাইত। তিনি তাহাদের কাহাকেও অন্নবস্ত্রে বঞ্চিত করেন নাই। মধ্যম ভ্রাতা ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে চাকুরী করিয়া যে ৫০ পঞ্চাশটী টাকা পাইতেন, তাহাই একমাত্র উপায় ছিল। এই টাকায় বাসাখরচ চলিতে লাগিল। মাসে মাসে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা ঋণ করিয়া বাড়ীতে পাঠাইতে হইত। রাজকৃষ্ণ বাবুর নিকট শুনিয়াছি, "পদ পরিত্যাগের পর তাঁহাকে একটী দিনের জন্যও মলিন বা বিষণ্ন দেখা যায় নাই। পূর্ব্বের ন্যায় তিনি তেমনই হিমগিরিবৎ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। মুখ দেখিয়া মনে হইত না, তাঁহার মনে কোন কষ্ট কি দুঃখ আছে।" অনন্যোপায় সামান্যাবস্থাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ পদত্যাগ দুষ্কর নিশ্চিতই; কিন্তু যাঁহাদের ভিতরে তেজ আছে, যাঁহাদের আত্মশক্তি ও সামর্থ্যের উপর অচল বিশ্বাস আছে, তাঁহাদের পক্ষে ইহা বিচিত্র কিছুই নহে।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগর

মহাশয় কোন চাকুরীতে পুনঃ প্রবৃত্ত হন নাই। এই সময় হিন্দী ও ইংরেজি বিদ্যায় তাঁহার অনেকটা ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল। আনন্দকৃষ্ণ বাবু বলেন,—"তাঁহার মুখে সেক্সপিয়রের আবৃত্তি শুনিয়া আমরা বিমোহিত হইতাম।" শিক্ষা-সমাজের অধ্যক্ষ মার্সেল সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় কাপ্তেন ব্যাঙ্ক সাহেবকে কয়েক মাস হিন্দী ও বাইবেল শিক্ষা দেন। ব্যাঙ্ক সাহেব মাসিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার হিসাবে তাঁহাকে কয়েক মাসের বেতন একবারে দিতে চাহেন। তিনি কিন্তু তাহা লন নাই।

দশম অধ্যায়।

বেতাল-পঞ্চবিংশতি, সংস্কৃত-যন্ত্র ও কবি-প্রীতি।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বা ১২৫৪ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্সেল সাহেবের অনুরোধে হিন্দী "বৈতাল-পঁচ্চিসী" নামক গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ করেন। "বেলাত-পঞ্চবিংশক" নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থও আছে।*

বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্বয়ং সু-বিশারদ সংস্কৃতজ্ঞ হইয়াও, মূল সংস্কৃত-প্রসঙ্গের অনুবাদ না করিয়া, অনুবাদিত হিন্দী গ্রন্থ অবলম্বন করিলেন কেন, এ প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। এই সময় তিনি হিন্দী ভাষায় যথেষ্ঠ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার পরিচয়-স্বরূপই বোধ হয়, হিন্দী গ্রন্থের অনুবাদ। বস্তুতই অনুবাদিত "বেতালে" তাঁহার নবার্জ্জিত হিন্দী-ভাষাভিজ্ঞতারই প্রকৃষ্ট পরিচয়।

হিন্দী "বৈতাল-পঁচ্চিসী"র যে যে স্থান অশ্লীল বলিয়া মনে হইয়াছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। "বেতালে"র ভাষা প্রাঞ্জল, ললিত, মধুর ও বিশুদ্ধ। তবে প্রথম সংস্করণে, দীর্ঘ দীর্ঘ সমাস-সমন্বিত রচনা হেতু, "বেতাল" বড় শ্রুতি-কঠোর হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণে এইরূপ শ্রুতি-কঠোর সমাস-সমন্বিত বাক্যের প্রয়োগ ছিল,—"উত্তাল তরঙ্গ-

---

* এই গ্রন্থ শিবদাস ভট্ট কর্ত্তৃক রচিত। সংবৎ ১৮৯৬ কৃষ্ণ-অষ্টমীতে বৃহস্পতিবার এই পুস্তকের রচনা সমাপ্ত হয়।

মালা-সঙ্কুল উৎফুল্ল ফেননিচয়চুম্বিত ভয়ঙ্কর তিমি মকর নক্র চক্র ভীষণ স্রোতস্বতীপতি প্রবাহমধ্য হইতে সহসা এক দিব্য তরু উদ্ভূত হইল।" এরূপ ভাষা বাঙ্গালার উপযোগী নয় বলিয়া, পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই জন্য আধুনিক সংস্করণে ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। মনস্বী ও বিচক্ষণ লেখকেরা সহজেই আপনাদের ভ্রম বুঝিয়া তাহা সংশোধন করিয়া লয়েন। জনসনের "রাস্বালার" বাক্যাবড়ম্বরে অনেকটা শ্রুতিকটু হইয়াছিল। ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়া, "কবিদিগের জীবনী"তে এ দোষ পরিত্যাগ করিতে সাধ্যানুসারে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। "রাস্বালা"র অপেক্ষা "কবি-জীবনী"র ভাষা অধিকতর সরল ও সহজ হইয়াছে। "বেতালে"র প্রথম সংস্করণের বাক্যাড়ম্বর-প্রমাণ জন্য যে স্থল উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে এখনকার সংস্করণে এইরূপ আছে;—"কল্লোলিনীবল্লভের প্রবাহমধ্য হইতে, অকস্মাৎ এক স্বর্ণময় ভূরুহ বিনির্গত হইল।" বেতাল, একাদশ উপাখ্যান, ৯৫ পৃষ্ঠা।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, অনেক স্থলেই ঠিক অনুবাদও করেন নাই। যে স্থান উদ্ধৃত হইল, তাহার মূলেই ইহার প্রমাণ। হিন্দী মূলে এইরূপ আছে,—

"সাগরমেঁসে এক সোনেকা তরবর নিকলা। বহ অমুহদকে পাত, পুখরাজকে ফুল, মুক্তেকে ফলোঁসে ঐসা খুব লদা হুআ থা, কি জিসকা বয়ান নহীঁ হো সকতা ঔর উসপর মহা সুন্দরী বীণ হাথমেঁ লেয়ে মীঠে মীঠে সুরোঁসে গাতী থী।"

মূলে, সাগরের বাক্যাড়ম্বরময় বিশেষণ নাই; কিন্তু বৃক্ষের পাতা, মূল ও ফলের প্রকার আছে। অনুবাদে বিশেষণ আছে; কিন্তু ফলাদির প্রকার নাই।

"বাসুদেব-চরিতে"র ভাষা অপেক্ষা বেতালের ভাষা অধিকতর সংযমিত ও মার্জ্জিত। ভাষার একটু নমুনা এই,—

"উজ্জয়িনী নগরে গন্ধর্ব্বসেন নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার চারি মহিষী। তাঁহাদের গর্ভে রাজার ছয় পুত্র জন্মে। রাজকুমারেরা সকলেই সুপণ্ডিত ও সর্ব্ব বিষয়ে বিচক্ষণ ছিলেন। কালক্রমে, নৃপতির লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শঙ্কু সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তৎকনিষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বিদ্যানুরাগ, নীতিপরতা ও শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন; তথাপি, রাজ্যভোগের লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়া, জ্যেষ্ঠের প্রাণসংহারপূর্ব্বক, স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইলেন; এবং, ক্রমে ক্রমে, নিজ বাহুবলে, লক্ষযোজনবিস্তীর্ণ জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া, আপন নামে অব্দ প্রচলিত করিলেন।"

মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথমে যেমন সমাদৃত হয় নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বেতালও" প্রথম সেরূপ সমাদর পায় নাই। কেহ কেহ বলেন, শ্রীরামপুরের মিশনীরা ইহার আদর প্রথম বাড়াইয়া দেন। অসম্ভবই বা কি? স্কটের "ওয়েভার্লি" প্রকাশিত হইবামাত্রই সমাদৃত হয় নাই। তাহার সমাদর হইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। সেকস্‌পিয়রের আদর, তদীয় জীবিত-কালে হয় নাই। জর্ম্মণ-পণ্ডিতের

গুণগ্রাহিতাগুণেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাই; নহিলে সে প্রতিপত্তি প্রস্ফুটিত হইতে হয় তো আরও অনেক সময় লাগিত। মিলটনের জীবদবস্থায় "প্যারাডাইস্ লষ্টের" প্রতিপত্তি ছিল না। এমন অনেক দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়। যাহাই হউক, "বেতালে"র আদর প্রথমে হউক বা না হউক, যখন ইহা আদরণীয় হইয়া উঠে, তখন অনেকেই বেতালের অনেক অংশ মুখস্থ করিয়া রাখিতেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখেই আমরা এ কথা শুনিয়াছি।

"বেতালে"র প্রথম কয়েক সংস্করণে বিরাম-চিহ্ন অর্থাৎ কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় নাই; পরে সাধারণের সুবিধার্থ ব্যবহৃত হয়। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের জন্য কর্তৃপক্ষ, ৩০০৲ তিন শত টাকা দিয়া, ১০০৲ একশত খণ্ড বেতাল ক্রয় করিয়াছিলেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, ৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম, এ, তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জীবন-চরিত লেখেন। এই জীবন-চরিতের ৪২ পৃষ্ঠায় "বেতাল"-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র লিখিত হয়;—

"বিদ্যাসাগর-প্রণীত "বেতাল-পঞ্চবিংশতি"তে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা এতদূর সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল যে, বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় এ কথা স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে "বেতাল" পড়াইয়া শুনান হইয়াছিলমাত্র। তাঁহাদের কথা-মতে দুই একটী শব্দমাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, ইহার প্রমাণার্থ তিনি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে এই পত্র লেখেন ;—

অশেষগুণাশ্রয়

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভ্রাতৃপ্রেমাস্পদেষু

সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্

তুমি জান কি না বলিতে পারি না, কিছুদিন হইল, সংস্কৃত-কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত প্রচারিত করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "বিদ্যাসাগর-প্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এত দূর সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছিল যে বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে"। বেতালপঞ্চবিংশতি সম্প্রতি পুনরায় মুদ্রিত হইতেছে। যোগেন্দ্র বাবুর উক্তি বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হওয়াতে, এই সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তাহা ব্যক্ত করিব, স্থির করিয়াছি। বেতালপঞ্চবিংশতির সংশোধন বিষয়ে তর্কালঙ্কারের কত দূর সংস্রব ও সাহায্য

ছিল, তাহা তুমি সবিশেষ জান। যাহা জান, লিপি দ্বারা আমায় জানাইলে, অতিশয় উপকৃত হইব। তোমার পত্র খানি, আমার বক্তব্যের সহিত, প্রচারিত করিবার অভিপ্রায় আছে, জানিবে ইতি।

ত্বদেকশর্ম্মশর্ম্মণঃ

কলিকাতা। শ্রীঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্মণঃ

১০ই বৈশাখ, ১১৮৩ সাল।

বিদ্যারত্ন মহাশয় তদুত্তরে যে পত্র লেখেন, তাহা এইখানে সন্নিবেশিত হইল ;—

"পরমশ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়

জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপ্রতিমেষু

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, প্রণীত। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবন চরিত গ্রন্থে বেতালপঞ্চবিংশতি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "বিদ্যাসাগর-প্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এতদূর সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল যে, বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।" এই কথা নিতান্ত অলীক ও অসঙ্গত ; আমার বিবেচনায় এরূপ অলীক ও অসঙ্গত কথা লিখিয়া প্রচার করা যোগেন্দ্রনাথ বাবুর নিতান্ত অন্যায় কার্য্য হইয়াছে।

এতদ্বিষয়ের প্রকৃত বৃত্তান্ত এই—আপনি, বেতালপঞ্চবিংশতি রচনা করিয়া, আমাকে ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে শুনাইয়াছিলেন। শ্রবণকালে আমরা মধ্যে মধ্যে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতাম। তদনুসারে স্থানে স্থানে দুই একটী শব্দ পরিবর্ত্তিত হইত। বেতালপঞ্চবিংশতি বিষয়ে, আমার অথবা তর্কালঙ্কারের এতদতিরিক্ত কোন সংস্রব বা সাহায্য ছিল না।

আমার এই পত্রখানি মুদ্রিত করা যদি আবশ্যক বোধ হয়, করিবেন, তদ্বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি ইতি।

কলিকাতা। সোদরাভিমানিনঃ
১২৮৩ সাল, ১২ই বৈশাখ। শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মণঃ

পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ নাকি পণ্ডিতপ্রবর তারানাথ তর্কবাচস্পতির নিকট উহা শুনিয়াছিলেন। যখন এই পত্র লেখালেখি হয়, তখন বাচস্পতি মহাশয় জীবিত ছিলেন না।

প্রথমাবস্থায় সকলকেই যে একটুকু অধিক সতর্ক, কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত থাকিতে হয়, এই ঘটনায় তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

এই সময়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় "সংস্কৃত-যন্ত্র" প্রতিষ্ঠিত করেন।* ৬০০৲ ছয়শত টাকা ঋণ করিয়া একটী প্রেস ক্রয়

* বিদ্যাসার মহাশয় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় উভয়েই এই মুদ্রাযন্ত্রের সমান অংশীদার ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনান্তর হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন কারণে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের উপর বিরক্ত হইয়া, তাঁহার সহিত

করা হয়। এই প্রেসে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কৃষ্ণনগরের মহারাজার বাড়ী হইতে আনীত হয়। মার্সেল সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের জন্য ৬০০৲ ছয় শত টাকায় ১০০৲ এক শত খণ্ড ভারতচন্দ্র ক্রয় করেন। এই টাকায় দেনা শোধ হয়। এই প্রেসে সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। ক্রমে "প্রেসটী" লাভবান্ হইতে থাকে।

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বড় প্রিয় ছিল। ভারতচন্দ্রকে তিনি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস,—কালিদাস যেমন সংস্কৃতে, ভারতচন্দ্র তেমনই বাঙ্গালায়। কালিদাসের গ্রন্থে যেমন সংস্কৃতের; ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে তেমনই বাঙ্গালার পরিপাটী। অন্নদামঙ্গলের পরিমার্জ্জিত ভাষা, বাঙ্গালা ভাষায় আদর্শ বলিয়া, তাঁহার ধারণা ছিল। তিনি ভাবিতেন, বাঙ্গালার ভারতচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী কবি। ভারতচন্দ্রের পর, দাশরথি রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রসিকচন্দ্র রায়কে খাঁটী বাঙ্গালী কবি বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্রদ্ধা-ভাজন ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার কোন কোন বিষয়ে, বিশেষতঃ বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে, মতের মিল না থাকিলেও, তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রকৃত বাঙ্গালা কবি বলিয়া

সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে প্রয়াসী হন। ৺ শ্যামাচরণ বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সালিসি হইয়া গোল মিটাইয়া দেন। প্রেস বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্পত্তি হয়।

শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার রচনা প্রকৃত বাঙ্গালা কবিতার আদর্শ ভাবিয়া, তাঁহার কবিতাকে আদর করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় ইংরেজী ভাব বা ছায়া থাকিত না, অথচ তাঁহার রচনার ভাষা তাঁহার নিজস্ব ;—বাঙ্গালা ভাষায় নিজস্ব। বাঙ্গালা-ভাষার,—বাঙ্গালী জাতির ইহা গৌরবের বিষয় বলিয়াই, বিদ্যাসাগর মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতার খ্যাতি-প্রচার করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় কবি রসিকচন্দ্রের কবিতায়ও তিনি পরম প্রীতি প্রদর্শন করিতেন। রসিকচন্দ্র প্রকৃত বাঙ্গালী কবিশ্রেণীর শেষ কবি। রসিকচন্দ্রের দেহান্তরে খাঁটী বাঙ্গালী কবিশ্রেণীর অবসান হইবে বলিয়াও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশ্বাস ছিল। রসিকচন্দ্রের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যথেষ্ট বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। রসিকচন্দ্রের কোন কোন কবিতা-পুস্তক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে পাঠ্য-পুস্তকরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। রসিকচন্দ্রের কবিতা, তিনি এত ভাল বাসিতেন যে, আপনার দৌহিত্রদিগকেও তদ্রচিত অনেক কবিতা মুখস্থ করাইতেন। রসিকচন্দ্র, আধুনিক সাহিত্য-সেবকদিগের মধ্যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট যেরূপ উৎসাহ পাইতেন, তেমন আর কাহারও নিকট পাইতেন না। শ্রীরামপুর—বরা গ্রামে রসিকচন্দ্রের নিবাস ছিল। কলিকাতায় আসিলে তিনি সর্ব্বাগ্রেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহার যথেষ্ঠ আদর করিতেন। রসিকচন্দ্রের সহিত, আমাদের সাক্ষাৎ হইলে, তিনি



কবিবর রসিকচন্দ্র রায়।

শতমুখে বিদ্যাসাগরের সহৃদয়তা ও বদান্যতার কীর্ত্তন করিতেন। বিদ্যাসাগরের নামে, তাঁহার শতধারায় ভক্তি-প্রবাহ উথলিয়া উঠিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পর, রসিকচন্দ্র একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। অন্যান্য অনেক বার বৃদ্ধ রসিকচন্দ্রের মুখে অনেক রস-ভাষ শুনিয়াছিলাম। তাঁহার বার্দ্ধক্য-জরা বদনমণ্ডলেও যৌবনসুলভ হাস্য-কৌতুকের লহরী দেখিয়াছি। এবার কিন্তু আর তাঁহার সে ভাব দেখি নাই। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে বৃদ্ধের দেহ-যষ্টি ভগ্ন হইয়াছিল। পরম সুহৃদ্ বিদ্যাসাগরের গুণগরিমা ও বান্ধব-বাৎসল্য স্মরণ করিয়া তিনি কেবলমাত্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। রসিকচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "যখন বিদ্যাসাগর নাই; তখন আমিও আর নাই; আমি জীবন্মৃত হইয়া রহিলাম।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর বৎসর দুই পর বৃদ্ধ কবি রসিকচন্দ্র, মানবলীলা সংবরণ করেন। সহৃদয় সুহৃদের সুদারুণ শোক, অনেকটা রসিক রায়ের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল।

একাদশ অধ্যায়।

বাঙ্গালা-ইতিহাস, দুর্গাচরণের পরিচয়, ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে পুনঃপ্রবেশ, ইংরেজি লিপি-পটুতা, শুভকরী, জুনিয়র সিনিয়র পরীক্ষা, গুণবানের পুরস্কার, পুত্রের জন্ম ও ভ্রাতৃবিয়োগ।

১২৫৬ সালে বা ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্শমান্ সাহেব-কৃত হিষ্টরি অব্ বেঙ্গল "History of Bengal" অর্থাৎ ইংরেজিতে লিখিত বঙ্গদেশের ইতিহাস নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ করেন। সর্ব্বত্রই ইহার আদর হইয়াছিল। ভাষা তেমনই মনোহর, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ।

এই ইতিহাসে নবাব সিরাজদ্দৌলার রাজত্বকাল হইতে বড় লাট লর্ড বেণ্টিকের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত শাসন-বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের মার্সেল সাহেবের অনুরোধে ইহা রচিত হইয়াছিল। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় সিরাজদ্দৌলার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা লইয়া, একখানি ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। এই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়, এই ইতিহাসকে দ্বিতীয় ভাগ বলিয়াছেন। *

---

* ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অবধারিত ছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরেজ-রাজত্বের পূর্ব্ব ঘটনা অবলম্বনে আর এক পুস্তক অনুবাদ করিবেন। কেন সে সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয়, জ্ঞাত নহি।

প্রথম সংস্করণে, এই ইতিহাস "মার্সেল সাহেবের অনুমত্যনুসারে লিখিত," এইরূপ দেখা যায় বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরেজি পুস্তক হইতে এই প্রথম বাঙ্গালা অনুবাদ করিলেন। সংস্কৃত ও হিন্দী হইতে বাঙ্গালা অনুবাদে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, এই ইতিহাসেও সেই কৃতিত্বের পরিচয় পাই। ইংরেজি হইতে হউক, হিন্দী হইতে হউক, আর সংস্কৃত হইতে হউক, অনুবাদের কৃতিত্বে বিদ্যাসাগর অতুলনীয়। তবে ইতিহাসে অনুবাদের কৃতিত্বপ্রমাণ যেরূপ, গবেষণা ও প্রকৃত তথ্যনির্ণয়ের কৃতিত্বপ্রমাণ সেরূপ নহে। মার্শমান্ সাহেব, সিরাজুদ্দৌলাকে যেরূপ নিষ্ঠুর, নৃশংস ও অ-রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, গবেষণাফলে তাহারই বিপরীত প্রমাণ করা যাইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লাইব্রেরীতে যে সব ইতিহাস-সংগ্রহ দেখিতে পাই, একটু মনোযোগ সহকারে তাহারই আলোচনা করিলে, সিরাজুদ্দৌলার চরিত্রের তাহাতেই বিপরীত প্রমাণ হইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লাইব্রেরীতে সংগৃহীত ইতিহাসসমূহের সাহায্যে, আমি জন্মভূমিতে সিরাজুদ্দৌলার চরিত্রের কলঙ্ক-প্রক্ষালনে প্রয়াস পাইয়াছিলাম। মনে হয়. তাহাতে কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছি। এই সব ইতিহাসের পর্য্যালোচনায়, অন্ধকূপের অস্তিত্ব-সম্বন্ধেও সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস লিখিবেন বলিয়াই, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রাচীনতম ও অধুনাতন ইতিহাস গ্রন্থ-সমূহ

সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি মনস্কামনা সিদ্ধ করিতে পারেন নাই। মনস্কামনা সিদ্ধ হইল না বলিয়া, এক দিন আলমারিবদ্ধ এই সমুদয় ইতিহাস পুস্তক দেখিতে দেখিতে অবিরল-ধারায় অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন।

১২৫৬ সালে বা ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজের "হেড রাইটার" এবং "ট্রেজারার" পদ শূন্য হয়। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কাজ করিতেন। এই পদে নিযুক্ত থাকিয়াই, দুর্গাচরণ বাবু মেডিকেল কলেজে পড়িতেন। ইনিই পরে প্রসিদ্ধ ডাক্তার হন। ইনি মেডিকেল কলেজের "আউট ষ্টুডেণ্ট" ছিলেন; অর্থাৎ বিনা বেতনে পড়িতে পাইতেন; পরীক্ষা দিয়া উপাধি পাইবার অধিকারী ছিলেন না। কেবল মার্সেল সাহেবের অনুগ্রহে তাঁহার 'পড়া-শোনা চলিত। চাকুরী করিতে করিতে একবার মার্সেল সাহেব, ছুটি লইয়া, বিলাত গিয়াছিলেন। সেই সময় কর্ণেল রাইলি সাহেব, তাঁহার স্থানে কাজ করিতেছিলেন। দুর্গাচরণ কাজ করিতে করিতে "পড়া-শোনা" করেন, রাইলি সাহেবের এমন ইচ্ছা ছিল না। এই জন্য দুর্গাচরণকে বড়ই বেগ পাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, মার্সেল সাহেব ফিরিয়া আসিলে, দুর্গাচরণের আবার একটু সুবিধা হইয়াছিল। পরে ১২৫৬ সালে বা ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি "হেড রাইটারী" পদ পরিত্যাগ করেন। দুর্গাচরণের জীবনীতেও অনেক অলৌকিক ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত

তাঁহার যে সম্পর্ক ছিল, সেই সম্পর্ক-সংঘটিত ঘটনাবলী একে একে বিবৃত করিলে, একখানি অতি বৃহৎ পুস্তক হইতে পারে। কাহারও জীবনী লিখিতে গেলে, তৎসংশ্লিষ্ট খ্যাতনামা ব্যক্তি-বর্গেরও জীবনীর অন্ততঃ কিছু কিছু আভাস দিয়া না যাইলে, জীবনী-লেখা সার্থক বা সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু এ পুস্তকে তাহার সম্ভাবনা নাই। দুর্গাচরণ বাবুর একখানি সম্পূর্ণ জীবনী বাঙ্গালা ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত হওয়া উচিত। তাঁহার একখানি ইংরেজি জীবন-চরিতে দেখিয়াছি। তাহাও সম্পূর্ণ নহে।

মার্সেল সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট-উইলিয়ম্ কলেজে দুর্গাচরণ বাবুর পদ গ্রহণ করেন।

ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের "হেড্ রাইটারের" বেতন ছিল ৮০৲ আশী টাকা। এইবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাংসারিক অবস্থা কতক সচ্ছল হইল। তিনি এ সময়ে স্বকীয় ইংরেজী বিদ্যার উন্নতি-সাধনে অধিকতর যত্নশীল হইয়াছিলেন। যত্নে সিদ্ধি নিশ্চিতই। তাঁহার ইংরেজী লেখার লিপি-নৈপুণ্য দেখিয়া সিবিলিয়ন্ সাহেবগণও সন্তুষ্ট হইতেন। বাঙ্গালা হস্তাক্ষরের ন্যায় তাঁহার ইংরেজী হস্তাক্ষরও সুন্দর হইয়াছিল। ইংরেজী হস্তাক্ষরের ছত্রগুলিও মুক্তাপঙ্ক্তিবৎ প্রতীয়মান হইত। তাঁহার বাঙ্গালা ও ইংরেজি হস্তাক্ষরের নমুনা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। লিপিনৈপুণ্যেরও পরিচয় যথাস্থানে পাইবেন।

১২৫৬ সালে বা ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের কয়েক জন ছাত্র "শুভকরী" নামে এক পত্রিকার প্রচার করেন। * বিদ্যাসাগর মহাশয় কতকগুলি লোকের অনুরোধ-পরবশ হইয়া এই কাগজে বাল্য-বিবাহের দোষ উল্লেখ করিয়া একটী প্রবন্ধ লেখেন। কাহারও কাহারও মতে "চৈত্র মাসের চৈত্র-সংক্রান্তিতে লোকে যে জিহ্বা বিদ্ধ করে, পিঠ ফুঁড়িয়া চড়ক করিয়া থাকে এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে যে গঙ্গায় অন্তর্জ্জলি করে, এই দ্বিবিধ প্রথার নিবারণার্থে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের সুলেখক মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত গোস্বামীর প্রতি বিদ্যাসাগর ভার দিয়াছিলেন।" রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখার গুণে "শুভকরী" কতকটা প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। পণ্ডিত মাধবচন্দ্র গোস্বামীর লিপি-কৌশলেও উহার সুনাম হওয়া যে সঠিক-সংবাদ, তাহা আমরা অক্ষয়কুমার দত্তের ন্যায় শ্রদ্ধেয় ও বিশ্বস্ত লোকমুখে অবগত হইয়াছি। শুভকরীর অস্তিত্ব কিন্তু অল্প দিন মাত্র ছিল। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়, হিন্দু-কলেজ, হুগলী-কলেজ এবং ঢাকা-কলেজের সিনিয়র ছাত্রদিগের বাঙ্গালা পাঠ্যের পরীক্ষক হন। রচনার প্রশ্ন ছিল, স্ত্রী-শিক্ষা

---

* পুরাতন "শুভকরী" পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। চেষ্টা বিফল হইয়াছে। "উত্তরপাড়া" লাইব্রেরীতে "ফাইল" ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ফাইল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়, আমাকে ১৩০১ সালের ১২ই অগ্রহায়ণ এই সংবাদ দিয়াছেন।

হস্তলিপি।

My dear Mr Harrison,

I am very sorry that though I have made two attempts to meet you,

১৮৫১ সানের ২১ অক্টোবর তারিখে রেবিনিউ বোর্ডের আফিসিয়েটিং সেক্রেটারি সাহেবের লিখিত ৫১৮ নম্বরের পত্র।

হওয়া উচিত কি না। এই সূত্রে কলিকাতার বর্ত্তমান বালিকা বা মহিলা-বিদ্যালয় বীটন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ড্রিঙ্ক ওয়াটার বীটন্ সাহেবের সহিত তাঁহার সদ্ভাব সংস্থাপিত হয়। *

এই সকল ব্যাপারে ঠিক বোঝা যায়, দেশের দুরদৃষ্টবশে ও সংসর্গদোষে বিদ্যাসাগর-সদৃশ পণ্ডিতেরও যৌবনাবস্থাতেই ধর্ম্মবিরুদ্ধ সংস্কার, হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল।

যে সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের "হেড্ রাইটার," সেই সময় তিনি সংস্কৃত কলেজের "জুনিয়র" ও "সিনিয়র" বিভাগের বাৎসরিক পরীক্ষা গ্রহণ করিবার ভার প্রাপ্ত হন। এ কাজেও তাঁহাকে সাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতে হইয়াছিল। তিনি এবং জর্ম্মাণ-পণ্ডিত ডাক্তার রোয়ার সাহেব, উপরি-উক্ত দুই পরীক্ষার প্রশ্ন প্রস্তুত করিতেন। রোয়ার সাহেব † সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন বটে; কিন্তু সংস্কৃত প্রশ্নপ্রণয়নে তাঁহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেকটা সাহায্য লইতে হইত। প্রশ্ন-সঙ্কলনের জন্য, প্রকৃত পারিশ্রমিক না হউক, পুরস্কার-স্বরূপ উভয়েই কিছু কিছু অর্থ পাইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, একটী সৎকার্য্যে সে অর্থের ব্যয় করেন।

---

* ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বা ১২৫৬ সালে বীটন্ বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার নাম প্রথমে ছিল হিন্দু-বালিকাবিদ্যালয়। প্রথম ২৫ পঁচিশটী বালিকা লইয়া এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

† ইনি সাহিত্যদর্পণ নামক অলঙ্কার গ্রন্থ ও ভাষা-পরিচ্ছেদ নামক ন্যায়শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন।

সিনিয়র পরীক্ষায় রামকমল ভট্টাচার্য্য, কাব্যে ও অলঙ্কারে সর্ব্ব-প্রথম হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার পারিশ্রমিক প্রাপ্ত অর্থ হইতে, তাঁহাকে সমগ্র সংস্কৃত মহাভারত ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। যে অর্থ অবশিষ্ট ছিল, তাহা দীন-দরিদ্রে বিতরিত হইয়াছিল।

রামকমল ভট্টাচার্য্যকে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে পুরস্কার দিয়াছিলেন, তাহার জন্য তাঁহাকে তদানীন্তন শিক্ষা-বিভাগের (এডুকেশন কৌন্সিলের) কর্ত্তৃপক্ষের সম্মতি লইতে হইয়াছিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর মহাশয়, অনুমতি পাইবার জন্য কৌন্সিলে পত্র লিখিয়াছিলেন। কৌন্সিল্ ১২ই ডিসেম্বর পত্র লিখিয়া সম্মতি প্রদান করেন। কৌন্সিল্ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই কাজটীকে তাঁহার বদান্যতার উপযোগী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। স্পষ্টই লিখিয়া-ছিলেন,—"Creditable to the liberality of Pundit Issurchauder Surma" ইহাতেই বোঝা যায়, বিদ্যাসাগরের "বদান্যতার" প্রচার ইহার বহুপূর্ব্ব হইতেই।

১২৫৬ সালে ৩০শে কার্ত্তিক বা ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ১৪ই নবেম্বর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহার কিছুদিন পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবার ভ্রাতৃ-বিয়োগ ঘটে। তাঁহার পঞ্চম সহোদর হরিশ্চন্দ্র কলি-কাতায় আসিয়াছিলেন। বয়স তাঁহার ৮ বৎসর মাত্র। কলি-কাতায় আসিবার কিয়দ্দিন পরে তাঁহারও ওলাউঠা রোগে মৃত্যু

হয়। বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়, ভ্রাতৃশোকে বড়ই কাতর হইয়া পড়েন। এই সময়ে তিনি শোকাতুরা জননীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য, কলিকাতায় লইয়া আসেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী কলিকাতায় আসিয়া রাজকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজকৃষ্ণ বাবুর মাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর মাতাও তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। শোক কিছু শান্ত হইলে, ৫।৬ পাঁচ ছয় মাস পরে, বিদ্যাসাগর মহাশয় জননীকে বীরসিংহে পাঠাইয়া দেন। তিনি নিজে কিন্তু সহজে ও শীঘ্র ভ্রাতৃশোক ভুলিতে পারেন নাই। বাদ্যধ্বনি শ্রুতিগোচর হইলে, তিনি চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেন। এই সময় তাঁহার মৃত ভ্রাতার কথা হৃদয়ে জাগরূক হইত। হরিশ্চন্দ্র এক দিন কোন বিবাহের বাজনা শুনিয়া বলিয়াছিলেন,—"দাদা! আমার বিয়ের সময় তোমায় এমনই বাজনা করতে হবে।" কনিষ্ঠের সেই সুধাবর্ষী সুমিষ্ট কথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়ে শক্তি-শেল সম বিদ্ধ হইয়াছিল।

দ্বাদশ অধ্যায়

সাহিত্যাধ্যাপকতা, টেক্সিবুক, তর্কালঙ্কারের পত্র, রিপোর্ট ও জীবন-চরিত।

১২৫৭ সালে ২৫শে অগ্রহায়ণ বা ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর সোমবার বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক-পদ প্রাপ্ত হন। এই পদের বেতন ছিল ৯০৲ নব্বুই টাকা। তিনি ৮ই ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের "হেড রাইটারী" পদ পরিত্যাগ করেন। শিক্ষা-সমাজের অধ্যক্ষ মার্সেল সাহেবের অনুরোধে তিনি সংস্কৃত কলেজের পদগ্রহণে সম্মত হন। ইহাঁর পূর্ব্বে মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপকতা করিতেন। তিনি মুরশিদাবাদের জজ-পণ্ডিত হওয়ায় এই পদ শূন্য হয়।* বিদ্যাসাগরের অনুরোধে তাঁহার প্রিয় শিষ্য ও সোদরসম মিত্র রাজকৃষ্ণ বাবু ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের "হেড রাইটার" পদে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বে রাজকৃষ্ণ বাবু জার্ডিন কোম্পানির বাড়ীতে "খাজাঞ্চি" ছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন সাহিত্যাধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন,—"আমাকে যদি শীঘ্রই কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে, এ পদ গ্রহণ করিব।" শিক্ষা-সমাজের

* "জজ-পণ্ডিতি" পদ প্রাপ্ত হইবার কয়েক মাস পর, তর্কালঙ্কার মহাশয় ডিপুটী মাজিষ্টর হন।

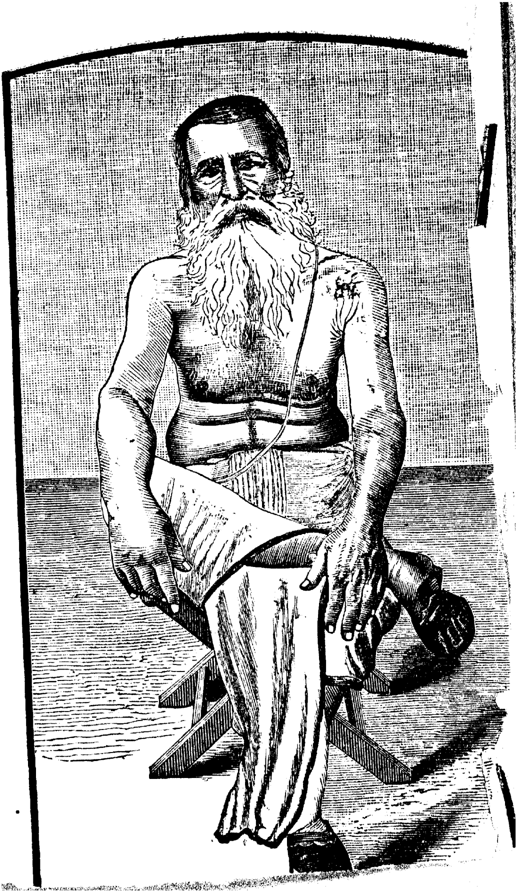
অধ্যক্ষ ময়েট সাহেব; তাঁহার নিকট হইতে এই মর্ম্মে পত্র লিখাইয়া লয়েন। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, শ্বশুরের জীবনীতে লিখিয়াছেন, "কলেজের অধ্যক্ষপদ তর্কালঙ্কার মহাশয়কেই দিবার প্রস্তাব হয়; তিনি তাহা স্বয়ং না লইয়া বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সেই পদে নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করেন" বিদ্যাসাগর মহাশয় এ কথা অস্বীকার করেন। তিনি নিজ-পদপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"আমি যে সূত্রে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত হই, তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত এই;—মদনমোহন তর্কালঙ্কার, জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া, মুরশিদাবাদ প্রস্থান করিলে, সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। শিক্ষা-সমাজের তৎকালীন সেক্রেটারী, শ্রীযুক্ত ডাক্তার মোয়েট সাহেব, আমায় ঐ পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। আমি নানা কারণ দর্শাইয়া, প্রথমতঃ অস্বীকার করি। পরে, তিনি সবিশেষ যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করাতে, আমি বলিয়াছিলাম, 'যদি শিক্ষাসমাজ আমাকে প্রিন্‌সিপালের ক্ষমতা দেন, তাহা হইলে আমি এই পদ স্বীকার করিতে পারি।' তিনি আমার নিকট হইতে ঐ মর্ম্মে একখানি পত্র লেখাইয়া লয়েন। তৎপরে, ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে, আমি সংস্কৃত কালেজে সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হই। আমার এই নিয়োগের কিছু দিন পরে, বাবু রসময় দত্ত

মহাশয় কর্তৃক সংস্কৃত কালেজের বর্ত্তমান অবস্থা ও উত্তরকালে কিরূপ ব্যবস্থা করিলে, সংস্কৃত কালেজের উন্নতি হইতে পারে, এই দুই বিষয়ে রিপোর্ট করিবার নিমিত্ত, আমার প্রতি আদেশ প্রদত্ত হয়। তদনুসারে আমি রিপোর্ট সমর্পণ করিলে, ঐ রিপোর্ট দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া, শিক্ষা-সমাজ আমাকে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতা কার্য্য, সেক্রেটারী ও আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী, এই দুই ব্যক্তি দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছিল; ঐ দুই পদ রহিত হইয়া, প্রিন্সিপালের পদ নূতন সৃষ্ট হইল। ১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষে, আমি সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল অর্থাৎ অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলাম।"*

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিবার জন্য, তর্কালঙ্কার মহাশয়ের যে অনুরোধ ছিল না, স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়ই তাহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় যে, তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পদোন্নতি হইয়াছিল, তাহা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের লিখিত একখানি পত্রে প্রকাশ পায়। যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মনান্তর হয়, তখন তর্কালঙ্কার মহাশয় দুঃখ করিয়া পরম মিত্র শ্যামাচরণ বিশ্বাস মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই উক্ত কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। পত্রখানি এই;—

* বেতালপঞ্চবিংশতির দশম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।



"ভ্রাতঃ! ক্রমশঃ পদোন্নতি ও এই ডেপুটি মাজেষ্ট্রেটী পদ-প্রাপ্তি যে কিছু বল, সকলই বিদ্যাসাগরের সহায়তা-বলে হইয়াছে। অতএব তিনি যদি আমার প্রতি এত বিরূপ ও বিরক্ত হইলেন, তবে আর আমার এই চাকরী করায় কাজ নাই; আমার এখনি ইহাতে ইস্তাফা দিয়া, তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া উচিত। শ্যাম হে! কি বলিব ও কি লিখিব; আমি এই সবডিভিজনে আসিয়া অবধি যেন মহা সাপরাধীর ন্যায় নিতান্ত ম্লান ও স্ফূর্ত্তিহীন-চিত্তে কর্ম্ম-কাজ করিতেছি। অথবা আমার অসুখের ও মনোগ্লানির পরিচয় আর কি মাথা-মুণ্ড জানাইব, আমার বাল্যসহচর, একহৃদয়, অমায়িক, সহোদরাধিক, পরম বান্ধব বিদ্যাসাগর আজি ৬ ছয় মাস কাল হইতে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করে নাই। আমি কেবল জীবন্মৃতের ন্যায় হইয়া আছি। শ্যাম! তুমি আমার সকল জান, এই জন্যে তোমার নিকট এত দুঃখের পরিচয় পাড়িলাম।"

তর্কালঙ্কার মহোদয়ের জামাতা ও তদীয় চরিতাখ্যায়ক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই পত্রকে অপ্রামাণিক পত্র বলিয়াছেন। তাহার আলোচনা স্থানান্তরে নিবদ্ধ হইবে।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, "এডুকেশন কৌন্সিলের" সেক্রেটরী ময়েট সাহেবের নির্ব্বন্ধতাতিশয়েই বিদ্যাসাগর মহাশয়, সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ও তাঁহার "বাঙ্গালা-ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক" প্রস্তাবে এই কথাই লিখিয়াছেন।

সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক হইয়াই কলেজের শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে "রিপোর্ট" লিখিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ময়েট সাহেব কর্তৃক অনুরুদ্ধ হন। শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষরা এই সময় সংস্কৃত কলেজের অচির-অস্তিত্ব লোপের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। এইরূপ আশঙ্কার কারণও ছিল। সংস্কৃত কলেজে পূর্ব্বের ন্যায় ছাত্র ভর্ত্তি হইত না। ক্রমেই ছাত্রসংখ্যা কম হইয়া আসিতেছিল। ছাত্রসংখ্যা হ্রাসের বলবৎ কারণও উপস্থিত হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের পাঠ-সমাপনে অনেক সময় লাগিত; পরন্তু সেই সময় ইংরেজি-বিদ্যার বেগও অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ইংরেজি বিদ্যার প্রসার বাড়াইবার জন্য তখন শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষরাও অধিকতর যত্নশীল হইয়াছিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে "এডুকেশন-কৌন্সলে"র উপর শিক্ষা-বিভাগের ভার পড়িয়াছিল। কৌন্সিল উচ্চশ্রেণী ইংরেজি ও বাঙ্গালা শিক্ষার উৎকর্ষসাধনেই বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এতদর্থ তাঁহারা পরীক্ষা ও বৃত্তির যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যাহারা বেশ কৃতকার্য্য হইত, তাহাদিগের সরকারী কার্য্যে প্রবিষ্ট হইবারও বেশ সুবিধা হইত। ইংরেজি শিক্ষার জন্য পাঠ্য-নির্দ্ধারণ, পরীক্ষা-গ্রহণ, শিক্ষক-নিয়োজন প্রভৃতি কার্য্যে কৌন্সিল কোনরূপ ত্রুটি করিতেন না। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ২৮টী

স্কুল ছিল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কৌন্সিলের যত্ন ও চেষ্টায় ১৫১টী হইয়াছিল। ছাত্র ছিল, ৪,৬৩২ টী; হইয়াছিল, ১৩,১৬৩ টী। শিক্ষক ছিল, ১৯১টী, হইয়াছিল, ৪৫৫টী। যাহারা ভাল ইংরেজি লেখা-পড়া শিখিত, তাহারা সহজেই চাকুরী পাইত। ইংরেজি বিদ্যা অর্থকরী বিদ্যা হইয়াছিল; সংস্কৃত বিদ্যাত আর তাহা ছিল না; পরন্তু সংস্কৃতপাঠ-সমাপনে অনেক সময় লাগিত। কাজেই সংস্কৃত পড়িবার প্রবৃত্তিও লোকের কম হইয়াছিল। ক্রমেই সংস্কৃত কলেজের ছাত্র কমিতে আরম্ভ হয়। এই জন্য কৌন্সিলের কর্ত্তৃপক্ষরাও সংস্কৃত কলেজের লোপাকাঙ্ক্ষা করেন। তাঁহারা সংস্কৃত কলেজটী উঠাইয়া দিবারও একরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তবে কলেজটী একেবারে না উঠাইয়া কোনরূপ ইহার সংস্কার হইতে পারে কি না, ইহাও তাঁহাদের আলোচ্য হইয়াছিল। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, কলেজের শিক্ষা-প্রণালী কোনরূপে সহজ করিতে পারিলে এবং কোনরূপে ইহাতে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন করিতে পারিলে, অনেকেরই সংস্কৃত কলেজে পড়িবার প্রবৃত্তি হইতে পারে। এই সব ভাবিয়া, তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ইহার একটী রিপোর্ট লিখিতে বলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সম্বন্ধে দক্ষ, তাঁহাদের এইরূপই ধারণা ছিল।

কৌন্সিলের কর্ত্তৃপক্ষ কি অভিপ্রায়ে রিপোর্ট লিখিতে বলিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। কি উপায়ে সংস্কৃত কলেজে সহজ শিক্ষাপ্রণালী

প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল। সহজ-প্রণালীর উদ্ভাবন করিতে না পারিলে যে সংস্কৃত কলেজ থাকা ভার হইবে, তিনি তাহা বুঝিয়াছিলেন। সেই সহজপ্রণালীর উদ্ভাবনা করিয়া, কৌন্সিলের অনুমত্যনুসারে তিনি প্রকাণ্ড রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন। রিপোর্টটী ইংরেজীতে লেখা। আমরা বাঙ্গালায় তাহার মর্ম্মানুবাদ করিয়া দিলাম।

এফ, জে,ময়েট্
কৌন্সিল অব্ এডুকেশন
(শিক্ষা-সমিতির) সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

কৌন্সিল্ অব্ এডুকেশনের অবগতির জন্য আমি সংস্কৃত কালেজের শিক্ষা সম্বন্ধে একটী রিপোর্ট দিতেছি।

ব্যাকরণ-বিভাগ।

বর্ত্তমান-পদ্ধতি অনুসারে এই বিভাগ পাঁচটী শ্রেণীতে বিভক্ত।

(১) ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর দুইটী মাত্র ব্যাকরণের শ্রেণী ছিল। একটী মুগ্ধবোধ শ্রেণী ও অপরটী পাণিনি। দ্বিতীয় মুগ্ধবোধ বানান শ্রেণী ১৮২৫ খৃঃ জানুয়ারি মাসে খোলা হয়। তৃতীয়টী ১৮২৫ খৃঃ নবেম্বর, চতুর্থটী ১৮৪৬ খৃঃ মে, পঞ্চম ১৮৪৭ খৃঃ জানুয়ারি। পাণিনি শ্রেণী ১৮২৮ খৃঃ উঠিয়া যায়। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পঠিত হইয়া থাকে। মুগ্ধবোধ, ধাতুপাঠ, অমরকোষ, ভট্টিকাব্য। পঞ্চম শ্রেণীতে মুগ্ধবোধের ১৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পঠিত হয়। চতুর্থ শ্রেণীতে উক্ত পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠ হয়। তৃতীয় শ্রেণীতে ১০০ শত পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে উক্ত পুস্তকের অবশিষ্ট ৯১ পৃষ্ঠা ও ধাতুপাঠ। প্রথম

শ্রেণীতে ভট্টি কাব্যের কয়েক সর্গ ও অমরকোষের কিয়দংশ অধীত হয়। এই বিভাগে অধ্যয়ন করিতে চারি বৎসর কাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু উপরোক্ত পঞ্চ বিভাগে অধ্যয়ন করিতে হইলে পাঁচ বৎসর সময় অতিবাহিত করা প্রয়োজনীয় বোধ হয়। অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট প্রণালীর অভাবে, ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বালকেরা এই বিভাগে পাঠকালে যে সময় অতিবাহিত করেন, সময়ের সহিত তুলনা করিলে, তাহাদিগের শিক্ষা যৎসামান্য বলিতে হইবে। মুগ্ধবোধ অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ। ইহার প্রণেতা বোপদেব, সংক্ষিপ্ততার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় থাকাতে তিনি তাঁহার পুস্তককে অতিশয় দুরূহ করিয়াছেন। একে সংস্কৃত ভাষা অতিশয় কঠিন, তাহাতে একখানি দুরূহ ব্যাকরণ সহকারে ইহার শিক্ষা সুরু করা, আমার বিবেচনায় সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এতাদৃশ ব্যাকরণে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে যেরূপ কষ্টে পতিত হইতে হয়, তাহা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। সুকুমার-মতি বালকবৃন্দ সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভকালে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের কাঠিন্যপ্রযুক্ত তাহাদিগের শিক্ষকগণের উচ্চারিত কথাগুলি কেবল মুখস্থ করিয়া রাখে। তাহারা যে পুস্তক পাঠ করে, তাহার বিন্দুবিসর্গও নিজে নিজে বুঝিতে পারে না। এরূপে কেবল ব্যাকরণ অধ্যয়নেই পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হয়। কিন্তু ভাষায় কিঞ্চিন্মাত্রও প্রবেশাধিকার জন্মে না। ইহা নিতান্তই বিস্ময়কর যে, এক ব্যক্তি ক্রমাগত ভাষাশিক্ষায় পাঁচ বৎসর কাল ব্যয় করিল, অথচ তাহার বিন্দুমাত্রও বুঝিতে সমর্থ হইল না। বিশেষতঃ মুগ্ধবোধের বৃহদাকার টীকা-টিপ্পনি সত্ত্বেও উহা নিতান্তই অসম্পূর্ণ গ্রন্থ। সুতরাং বর্ত্তমান পদ্ধতি অনুসারে সংস্কৃত কালেজের ছাত্রের প্রথম পাঁচ বৎসর বৃথা ব্যয় হয়। তাহার সমস্ত পরিশ্রম ও কষ্টের ফল এইমাত্র হয় যে, ব্যাকরণ শাস্ত্রে তাহার অধীত-বিদ্যা নিতান্তই অসম্পূর্ণ। এই বিভাগে ধাতুপাঠ নামে যে অপর

পুস্তক অধীত হয়, তাহার ছন্দোবদ্ধ সংস্কৃত ধাতুসংগ্রহ মাত্র। অমর-কোষ একখানি ছন্দোনিবন্ধ অভিধান। আমি স্বীকার করি যে, এই দুই গ্রন্থ সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত হইলে সাহিত্য-শাস্ত্র অধ্যয়ন-কালে কিছু সুবিধা হইতে পারে; কিন্তু উক্ত গ্রন্থদ্বয় মুখস্থ করিতে যে সময় ও পরিশ্রম ব্যয়িত হয়, তাহার তুলনায় প্রাপ্ত উপকার অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ প্রচলিত উৎকৃষ্ট সংস্কৃত পদ্য-গ্রন্থাবলী, যাহা সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্রের ভূষণস্বরূপ, প্রায়ই প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথের অত্যুৎকৃষ্ট ব্যাখ্যায় অলঙ্কৃত; সুতরাং উক্ত পুস্তকদ্বয়ের অধ্যয়ন নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়।

এ স্থলে ইহার উল্লেখ আবশ্যক যে, উপরোক্ত টীকাকার তাঁহার অন্যান্য সহযোগীর ন্যায় নহেন। তাঁহারা গ্রন্থের দুরূহ অংশগুলি পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত সরল অংশগুলি বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। এই সকল বিষয় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিশেষ প্রতীতি হইবে যে, মুগ্ধবোধ, ধাতুপাঠ ও অমর-কোষ পাঠে পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত করা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। এই বিভাগে অপর পাঠ্যপুস্তক ভট্টিকাব্য। ইহা রাম ও তাঁহার কার্য্য-কলাপ-সমন্বিত একখানি পদ্য-গ্রন্থ। এই পুস্তক খানি ব্যাকরণ শাস্ত্রের সূত্র সকলের উদাহরণ প্রদর্শনাভিপ্রায়েই লিখিত হইয়াছে। ইহা ব্যাকরণ বিভাগের নিতান্ত অনুপযোগী বলিয়া বোধ হয় না।

এক্ষণে ব্যাকরণ বিভাগে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার করিতে ইচ্ছা করি। আমার সামান্য বিবেচনায় ইহা যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় যে, যে চারি বৎসর ব্যাকরণ বিভাগে অতিবাহিত করা নির্দ্ধারিত আছে, উক্ত সময়ের মধ্যে যে ছাত্রেরা কেবল ব্যাকরণেই পারদর্শিতা লাভ করিবে, তাহা নহে; তাহার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ সাহিত্যেও কিঞ্চিৎ প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিবে। এক্ষণে তাহারা সাহিত্য-বিভাগে

যে ক্লেশ অনুভব করে, তাহাদিগকে আদৌ তাহা করিতে হইবে না। একখানি অসম্পূর্ণ ব্যাকরণ অধ্যয়নানন্তর তাহাদিগকে সাহিত্য বিভাগে প্রবেশ করিতে হয় এবং ভাষায় তাহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্রও জ্ঞান জন্মে না।

আমি যে প্রণালী-প্রচলনের পক্ষপাতী, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে। প্রথমতঃ বালকেরা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ব্যাকরণ পাঠ করিবার পরিবর্ত্তে এ দেশীয় ভাষায় রচিত ব্যাকরণের প্রধান প্রধান নিয়ম ও সূত্রগুলি পাঠ করিবে। তৎপরে তাহারা দুই কিংবা তিন খানি সংস্কৃত পাঠ্য অধ্যয়ন করিবে। এই সকল গ্রন্থে হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ হইতে বালকদিগের পাঠোপযোগী উদ্ধৃত অংশ থাকিবে। এই সমস্ত পাঠে ছাত্রদিগের দুই বৎসর কাল অতিবাহিত হইবে। তৎপরে তাহারা সিদ্ধান্ত-কৌমুদী আরম্ভ করিবে ও তাহা ব্যাকরণ বিভাগে উচ্চতম-শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিবে। সমস্ত সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে এইখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে একমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহা যেরূপ সম্পূর্ণ, তাদৃশ সরল। সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রেরা রঘুবংশ, ভট্টিকাব্য হইতে উদ্ধৃত অংশ ও দশকুমারচরিত পাঠ করিবে। আমার প্রস্তাব এই যে, পাঁচটী শ্রেণীর পরিবর্ত্তে চারিটীমাত্র শ্রেণী থাকিবে ও পঞ্চমটী চতুর্থ শ্রেণীর একটী বিভাগ বলিয়া গণ্য হইবে। উভয় বিভাগেই একই পুস্তক অধীত হইবে। এই বন্দোবস্ত দ্বারা একটী বৎসর বাঁচিয়া যাইবে এবং ব্যাকরণ বিভাগে পাঁচ বৎসরের পরিবর্ত্তে চারি বৎসর নির্দ্ধারিত হইবে।

সাহিত্য-বিভাগ।

ব্যাকরণ বিভাগ হইতে ছাত্রেরা এই শ্রেণীতে উন্নীত হইলে তাহা-দিগকে এখানে ২ দুই বৎসর কাল পাঠ করিতে হয়। তাহারা এখানে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি অধ্যয়ন করে। (১) রঘুবংশ, (২) কুমার-সম্ভব, (৩) মেঘদূত, (৪) কিরাতার্জ্জনীয়, (৫) শিশুপালবধ, (৬) নৈষধ-চরিত,

(৭) শকুন্তলা, (৮) বিক্রমোর্ব্বশী, (৯) রত্নাবলী, (১০) মুদ্রারাক্ষস, (১১) উত্তর-চরিত, (১২) দশকুমার-চরিত ও (১৩) কাদম্বরী।

তাহারা এখানে বাঙ্গালা হইতে সংস্কৃত এবং সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে অভ্যাস করে ও গণিত-শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে। উপরোক্ত ত্রয়োদশ খানি পুস্তকের মধ্যে প্রথম ছয়খানি প্রসিদ্ধ পদ্য-গ্রন্থ। সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ নাটক; অবশিষ্ট দুই খানি গদ্য। রঘুবংশ একখানি ঐতিহাসিক পদ্য-গ্রন্থ ও উনবিংশ সর্গে বিভক্ত। রামচন্দ্র, তাঁহার উপরিতন তিন পুরুষ ও তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণের কার্য্য-কলাপই রঘুবংশের বর্ণিত বিষয়। ইহাতে রাজা অগ্নিবর্ণের বৃত্তান্ত পর্য্যন্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

"কুমার-সম্ভব" এই নামকরণেই ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কার্ত্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত ইহার বর্ণিত বিষয়। কিন্তু ইহার প্রচলিত সাত সর্গ পাঠে দৃষ্ট হইবে যে, ইহাতে বর্ণিত বিষয়ের কিয়দংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বটে; কিন্তু কার্ত্তিকেয়ের মাতা পার্ব্বতীর জন্ম, শিব কর্ত্তৃক কামদেব ভস্ম, পার্ব্বতীর তপস্যা ও তাঁহার সহিত শিবের বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারও ইহাতে বর্ণিত আছে।

মেঘদূত ১১৮ শ্লোকে রচিত একখানি পদ্যগ্রন্থ। কোন যক্ষ তাঁহার প্রভু ধনাধিপতি কুবেরের কোন কারণে ক্রোধভাজন হওয়াতে, তাঁহার প্রভু কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া সুদূরবর্ত্তী প্রদেশে প্রিয়া-বিরহিত হইয়া পূর্ণ এক বৎসরকাল বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রণয়ী যক্ষ এই বিপৎপাতে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া নিজ প্রিয়ার নিকট তাঁহার বার্ত্তাবহনের জন্য একখণ্ড মেঘকে কুবেরের রাজধানী অলকা-নগরীতে যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

শকুন্তলা ও বিক্রমোর্ব্বশী দুই খানি নাটক। প্রথম খানিতে কণ্বঋষি-প্রতিপালিত শকুন্তলা ও রাজা দুষ্মন্তের প্রণয়-ব্যাপার অবলম্বনে লিখিত; দ্বিতীয় খানি রাজা পুরু ও উর্ব্বশীর বৃত্তান্ত-ঘটিত ব্যাপারে পরিপূর্ণ। এই

সমস্ত অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ও অমর কবি কালিদাসের রসময়ী লেখনী-প্রসূত। প্রত্যেক গ্রন্থেই তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার সুস্পষ্ট পরিচয় দেদীপ্যমান আছে। শিশুপাল-বধ, কিরাতার্জ্জুনীয় ও নৈষধ-চরিত বীররস-প্রধান কাব্য। প্রথম খানি মহাকবি মাঘ-রচিত ও বিংশ সর্গে বিভক্ত। দ্বিতীয়, কবি ভারবি রচিত ও সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত। তৃতীয় খানি শ্রীহর্ষপ্রণীত ও দ্বাবিংশ সর্গে বিভক্ত। শ্রীকৃষ্ণের হস্তে শিশুপালের মৃত্যু কবি-মাঘের পদ্য-গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়। কিরাতার্জ্জুনীয় গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়, অর্জ্জুনের তপস্যা। ছদ্মবেশধারী কিরাতরূপী শিবের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ও অবশেষে তাঁহার বীরত্বের পরিতোষিক-স্বরূপ মহাদেবের নিকট হইতে তাঁহার পাশুপত-অস্ত্র লাভ। রাজা নলের কার্য্য কলাপই নৈষধ চরিতের বর্ণিত বিষয়। উপরোক্ত প্রথম দুই খানি পুস্তকে উৎকৃষ্ট বীররসাত্মক কাব্যের সমস্ত গুণ লক্ষিত হয়। কেবল মধ্যে মধ্যে ক্লেশকর দুই একটী স্থান দৃষ্ট হয়। শিশুপাল-বধের সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ সর্গ উন্নত ভাবপূর্ণ কবিতায় পরিপূর্ণ; কিন্তু উহাতে ও কিরাতার্জ্জুনীয়ের স্থানে স্থানে অশ্লীল-শ্লোক দৃষ্ট হয়। নৈষধ-চরিত আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত শব্দাড়ম্বর ও অত্যুক্তি বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ বা প্রাঞ্জল নহে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে শ্লোক সকল সুন্দরভাবে পরিপূর্ণ। ভবভূতিপ্রণীত উত্তর-চরিত এক খানি নাটক-বিশেষ। ইহাতে রামচন্দ্রের জীবনের শেষ অংশ বর্ণিত আছে। রত্নাবলী একখানি নাটক। দক্ষ ইহার গ্রন্থকর্ত্তা। রাজা শ্রীহর্ষ কর্তৃক অর্থদানে পুরস্কৃত হইয়া তিনি উক্ত পুস্তকখানি প্রণয়ন করেন। তিনি ঐরূপ আর একখানি পুস্তক রচনা করিয়া উভয় পুস্তকই রাজা শ্রীহর্ষরচিত বলিয়া প্রচারিত করেন। রাজা উদয়ন ও রত্নাবলী ঘটিত প্রণয়-কাহিনী অবলম্বনে উক্ত নাটকখানি রচিত। এই উভয় পুস্তকই সর্ব্ববিধায়ে অতি উৎকৃষ্ট। বিশাখদত্তপ্রণীত মুদ্রারাক্ষস একখানি রাজনৈতিক নাটক নামে অভিহিত হইতে পারে। ইহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, গ্রীকদিগের

বর্ণিত চান্দ্রকোটাসের চন্দ্রগুপ্তের (প্রধান মন্ত্রী চাণক্য) স্বীয় প্রভুর নূতন অধিকৃত রাজ্যের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্ম কূটনীতিপূর্ণ কৌশল প্রয়োগ দ্বারা নন্দবংশোদ্ভব শেষ রাজার প্রভুভক্ত-প্রধান মন্ত্রী রাক্ষসের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিতেছেন। ইহাও একখানি সুকৌশলসম্পন্ন সুন্দর গ্রন্থ। দশকুমারচরিত ও কাদম্বরী গদ্যগ্রন্থ। প্রথমোক্ত গ্রন্থে কতকগুলি বন্ধু নিজ নিজ ইতিহাস বর্ণনা করিতেছে। ভাষা বিশুদ্ধ ও সুন্দর। কিন্তু ইহাতে স্থানে স্থানে দোষপূর্ণ অংশ আছে। দণ্ডী ইহার গ্রন্থকর্ত্তা। কাদম্বরী একখানি উপন্যাস বা গদ্য-বীররসাত্মক কাব্য। ইহা দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ সংস্কৃত রচনার একখানি আদর্শ-গ্রন্থ। গ্রন্থকর্ত্তা বাণভট্ট এই সর্ব্বজন প্রশংসনীয় পুস্তকখানি সম্পূর্ণ করিবার পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় ভাগ রচনা করেন। পুত্রের রচনা পিতার অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে নিকৃষ্ট। এ সম্বন্ধে আর অধিক বক্তব্যের প্রয়োজন নাই।

গণিত-শিক্ষা-সম্বন্ধে আমার বক্তব্য, জ্যোতিষ-শিক্ষা-প্রকরণে প্রকাশ করিব।

আমি যে পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করি, তাহা এই। ব্যাকরণ-বিভাগ-সংক্রান্ত রিপোর্টে আমি উল্লেখ করিয়াছি, রঘুবংশ প্রথম ব্যাকরণ-শ্রেণীতে অধীত হউক ও দশকুমারচরিতের উদ্ধৃত অংশ সকল অপর একটী ব্যাকরণ-বিভাগে পঠিত হউক এবং শিশুপাল-বধ, কিরাতার্জ্জুনীয় ও নৈষধ-চরিতে অনেক অশ্লীল শ্লোক থাকা প্রযুক্ত সমস্ত পঠিত হইবার পরিবর্ত্তে উহার উদ্ধৃত অংশসমূহ পঠিত হউক। কাদম্বরীর পূর্ব্বভাগ পাঠ্য-পুস্তকরূপে গণ্য হউক। অন্যান্য সমুদয় গ্রন্থ সমস্তই পঠিত হউক। আমি ইহাও প্রস্তাব করিতেছি যে, বীর-চরিত ও শান্তিশতক এই শ্রেণীতে পাঠ্য-পুস্তকরূপে গৃহীত হউক। বীর-চরিত ও উত্তরচরিত একখানি নাটকরূপে পরিগণিত হইতে পারে। তন্মধ্যে বীর-চরিত পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তর-চরিত অপরার্দ্ধ। বীর-চরিত উত্তর-চরিত অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

শান্তিশতক একখানি সুন্দর নীতিপূর্ণ পদ্য-গ্রন্থ। ছাত্রেরা এ সময় অনুবাদ ও সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিতে অভ্যাস করিবে।

অলঙ্কার শ্রেণী।

সাহিত্যচর্চ্চার পর ছাত্রেরা এই শ্রেণীতে আসে ও এখানে দুই বৎসর কাল অধ্যয়ন করে। তাহারা এই শ্রেণীতে অলঙ্কার-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি অধ্যয়ন করে।

(১) সাহিত্য-দর্পণ। (৩) কাব্য-দর্শন।

(২) কাব্যপ্রকাশ। (৪) রসগঙ্গাধর।

সাহিত্য-শ্রেণীতে যে সমস্ত পদ্য গ্রন্থ পাঠ করিবার তাহাদিগের অবসর থাকে, এস্থলে তাহারা সেই পদ্যগ্রন্থসমূহ পাঠ করে। এতদ্ব্যতীত তাহাদিগকে অনুবাদ ও রচনা শিক্ষা করিতে হয়। তাহাদিগকে আবার গণিত শ্রেণীতে গমন করিতে হয়। এই গণিতশ্রেণী-সম্বন্ধে আমি নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। অলঙ্কার-সম্বন্ধে কাব্যপ্রকাশ ও দশরূপক অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। কিন্তু সচরাচর সাহিত্য-দর্পণই পঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমি নিম্নলিখিত কারণে কাব্যপ্রকাশ ও দশরূপক গ্রন্থদ্বয়কে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করি। কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্য-দর্পণ অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ গ্রন্থ। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, অলঙ্কারশাস্ত্র-বিষয়ে ইহা একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। মল্লিনাথের ন্যায় উৎকৃষ্ট টীকাকারগণ তাঁহাদিগের ব্যাখ্যায় পুনঃ পুনঃ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কাব্যপ্রকাশে নাটকরচনা-সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। দশরূপকে অলঙ্কারশাস্ত্রের উক্ত বিভাগের বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। বিশেষতঃ নিজ বিভাগে ইহা অতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত।—সাহিত্য-দর্পণ অপেক্ষা কাব্যপ্রকাশ ও দশরূপক অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে পঠিত হইতে পারে। তন্নিমিত্ত কাব্যপ্রকাশ ও দশরূপক, সাহিত্য-দর্পণের স্থান অধিকার করিতে পারে। উক্ত গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিবার পর অপরটী

অধ্যয়ন করা কেবল সময় নষ্ট মাত্র। যদি ব্যাকরণ-শ্রেণী-সংক্রান্ত আমার বক্তব্যগুলি গৃহীত হয়, তবে অলঙ্কার শ্রেণীতে কেবল সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠের আবশ্যকতা থাকে না। এ কারণে যে সময় উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা গণিত ও অন্যান্য বিষয়ে নিয়োগ করা যাইতে পারে। তাহার উল্লেখ পরে করিব।*

জ্যোতিষ ও গণিতশ্রেণী।

সাহিত্য ও অলঙ্কার শ্রেণীর ছাত্রেরা এই শ্রেণীতেও অধ্যয়ন করে। এখানে তাহারা লীলাবতী ও বীজগণিত পাঠ করে। লীলাবতী ভাস্করাচার্য্যপ্রণীত একখানি অঙ্ক ও পরিমিত বিষয়ক গ্রন্থ। বীজগণিত উক্ত গ্রন্থকারপ্রণীত। উভয় গ্রন্থই অতি সংক্ষিপ্ত। পুস্তকদ্বয়ে কোন প্রকার শৃঙ্খলা নাই ও ইংলণ্ডীয় ভাষায় রচিত তৎসদৃশ পুস্তকের ন্যায় উহাতে কিছুই নাই। তাহা অকারণে অতিশয় কঠিন করিয়া রচিত হইয়াছে। প্রশ্নাবলী ছন্দে নিবদ্ধ। এই দুই খানি পুস্তক শিক্ষা করিতে ছাত্রগণের দুই বৎসর লাগে। অধ্যয়ন বিভাগের এই স্থানে সবিশেষ পরিবর্ত্তনের আবশ্যক। ইংলণ্ডীয় গ্রন্থকারগণের পুস্তক হইতে অঙ্ক, বীজগণিত ও জ্যামিতি সম্বন্ধে পুস্তকাদি সংগ্রহ হওয়া উচিত। এই সকল পুস্তক অধ্যয়নের পর বালকেরা অতি সহজেই লীলাবতী ও বীজগণিত পুস্তক শিক্ষা করিতে পারিবে। গণিতবিদ্যার উচ্চ শাখাসমূহ অনুবাদিত ও পাঠ্য পুস্তকরূপে গণ্য হওয়া উচিত। হার্শেল সাহেবকৃত জ্যোতিষশাস্ত্রের ন্যায় পুস্তকের বঙ্গভাষায় অনুবাদ হওয়া উচিত ও গণিত শ্রেণীতে তাহার পঠনা হওয়া আবশ্যক। ঐ সমস্ত পুস্তক ইংরাজী ভাষাতেই পাঠ্য হইতে পারে। কিন্তু বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইলে বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের

* পূর্ব্বে এই অলঙ্কার শ্রেণীতে এক বৎসর পড়িতে হইত। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দের ২৮শে নবেম্বর দুই বৎসর পড়িবার নিয়ম হয়।

বিশেষ উপযোগী হইবে। সাহিত্য ও অলঙ্কার শ্রেণীর ছাত্রগণ ব্যতীত স্মৃতি ও স্থায় শ্রেণীর ছাত্রদিগেরও গণিতাধ্যাপকের উপদেশ শ্রবণ করা উচিত। এ স্থলে সংস্কৃত কলেজের নিম্নশ্রেণীর কাব্যের শেষ হইল, ইহা বিবেচিত হইতে পারে। এই বিভাগের শ্রেণীসমূহে মনোহর অথচ প্রয়োজনীয় বিষয়সম্বলিত বঙ্গভাষায় রচিত পুস্তক সকল অধীত হইবার প্রয়োজনীয়তা আমি অনুভব করি, সুতরাং এই প্রস্তাব করি যে, উক্ত পুস্তকসমূহে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট থাকে।

ব্যাকরণের চতুর্থ শ্রেণীর জন্য—পশু-সংক্রান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প।

তৃতীয় শ্রেণীর জন্য—রুডিমেণ্টস্ অব্ নলেজ ও চেম্বার্স সাহেব কৃত গ্রন্থাবলী।

দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য—চেম্বার্স সাহেব কৃত মরাল-ক্লাস-বুক।

• প্রথম শ্রেণীর জন্য বিবিধ বিষয়। যথা—মুদ্রাঙ্কণ, চুম্বকাকর্ষণ, নৌ-বিদ্যা, ভূমিকম্প, পিরামিড্, চীনদেশীয় প্রাচীর, মধুমক্ষিকা ইত্যাদি।

সাহিত্য শ্রেণীর জন্য—চেম্বার্স সাহেব কৃত জীবন-চরিত ও অন্যান্য মনোহর ও প্রয়োজনীয় বিবিধ-বিষয়ক প্রবন্ধ। যথা—টেলিমেকস, রাসেলাস্ ও মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অনুবাদসমূহ।

অলঙ্কার শ্রেণীর জন্য—নৈতিক, রাজনীতিক ও সাহিত্য-বিষয়ক পুস্তকাবলী ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তকাদি।

যদি এডুকেশন কৌন্সিলের অধ্যক্ষেরা এই সকল বঙ্গভাষায় রচিত গ্রন্থ, পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট করেন, তবে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা অনায়াসে বঙ্গভাষায় সুন্দর পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিবে ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে ও তাহাদিগের চিত্তবৃত্তি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিবে।

পূর্ব্বোক্ত বাঙ্গালা গ্রন্থের মধ্যে জীবন-চরিত মুদ্রিত হইয়াছে।

বোধোদয় ও নীতিবোধ মুদ্রিত হইতেছে এবং অন্যান্য পুস্তকগুলি প্রস্তুত হইতেছে। এই সমস্ত পুস্তক প্রচলনের জন্য কৌন্সিলকে কোন অতিরিক্ত ব্যয় বহন করিতে হইবে না। এ স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্গভাষায় রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সঙ্কলনগুলি প্রস্তুত করিতে কোন আর্থিক আনুকূল্যের প্রয়োজন হইবে না।

সংস্কৃত কলেজের গণিত শ্রেণীর ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাবলী। যথা,—অঙ্কবিদ্যা, বীজগণিত, জ্যামিতি ও জ্যোতিষ-শাস্ত্র। এই সকল গ্রন্থ রচনা করিবার জন্য কৌন্সিল অব্ এডুকেশনের সাহায্য নিতান্ত আবশ্যক ও কৌন্সিলের সঞ্চিত অর্থ হইতে এ বিষয়ে সহজেই সাহায্য করা যাইতে পারে।

স্মৃতি বা আইন শ্রেণী।

অলঙ্কার শ্রেণী হইতে ছাত্রেরা এই শ্রেণীতে উন্নীত হয় ও এখানে তিন বৎসর কাল অধ্যয়ন করে। পাঠ্য-পুস্তকগুলি এই :—মনুসংহিতা, মিতাক্ষরা দ্বিতীয় অধ্যায়, বিবাদ-চিন্তামণি, দায়ভাগ, দত্তক-মীমাংসা, দত্তক-চন্দ্রিকা, অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব। হিন্দু-আইন সম্বন্ধে মনুসংহিতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহাতে সামাজিক, নৈতিক, রাজনীতিক, ধর্ম্মসংক্রান্ত ও অর্থ-শাস্ত্রবিষয়ক নিয়মাবলী সন্নিবিষ্ট আছে। প্রাচীন কালে আদর্শ-হিন্দু-সমাজের বিষয় ইহাতে বর্ণিত আছে। বিজ্ঞানেশ্বর-রচিত মিতাক্ষরা, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রণীত গ্রন্থের টীকামাত্র। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেওয়ানি, ফৌজদারি ও দায় সম্বন্ধীয় আইন-কানুন বিবৃত আছে। পশ্চিমোত্তরাঞ্চলে মিতাক্ষরা এক খানি সর্ব্ববাদি-সম্মত প্রামাণ্য-গ্রন্থ।

বিবাদ-চিন্তামণি বাচস্পতিমিশ্র-প্রণীত। ইহাতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিধি বিবৃত। বিহারে ইহা প্রমাণ-গ্রন্থ। জীমূতবাহন দায়ভাগের প্রণেতা। উত্তরাধিকারিত্ব ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। ইহা বাঙ্গালার সর্ব্ববাদি-সম্মত প্রমাণ-গ্রন্থ। পোষ্যপুত্র গ্রহণ ও তাহাদের দেওয়ানি

অধিকার বিষয় লইয়া দত্তক-মীমাংসা ও দত্তক-চন্দ্রিকা। মীমাংসা পশ্চিমোত্তরাঞ্চলে এবং চন্দ্রিকা বাঙ্গালায় প্রমাণ-গ্রন্থ।

দায়তত্ত্ব, ব্যবহার-তত্ত্ব এবং অন্যান্য বিষয়ক ছাব্বিশ খানি গ্রন্থ লইয়া অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব। ইহা রঘুনন্দন-প্রণীত। প্রথমোক্ত খানি দায়সম্বন্ধে। দ্বিতীয় খানি আদালতের কার্য্যবিধি সম্বন্ধে। অন্য ছাব্বিশখানি ধর্ম্মানুষ্ঠানসংক্রান্ত। এই শ্রেণীসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের অধ্যাপনা বন্ধ হওয়া উচিত। ইহা যাজনব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগের শিক্ষোপযোগী। ওরূপ গ্রন্থাদি বিদ্যালয়ে অধীত হইবার সম্পূর্ণ অনুপযোগী। অপর পুস্তকগুলি পাঠে কোন প্রতিবন্ধক নাই ও প্রচলিত থাকিতে পারে। উক্ত গ্রন্থাদি অনুশীলনে ভারতবর্ষস্থ যাবতীয় প্রদেশের হিন্দু-আইন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মে।

ন্যায় শ্রেণী।

তর্কশাস্ত্র ও দর্শনবিদ্যা ঘটিত ব্যাপার লইয়াই ন্যায়শাস্ত্র। মধ্যে মধ্যে রসায়ন, দৃষ্টিবিজ্ঞান, গতি-বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধেও উল্লেখ আছে। মীমাংসা ও পাতঞ্জল ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্রসম্বন্ধেও ঐরূপ বলা যাইতে পারে। মীমাংসা ও পাতঞ্জলে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তার বিষয় উল্লিখিত আছে। চারি বৎসর কাল অধ্যয়ন করিতে হয়। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট,—ভাষা-পরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ন্যায়সূত্র, কুসুমাঞ্জলি, অনুমানচিন্তামণি, দীধিতি, শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, পরিভাষা, তত্ত্বকৌমুদী, খণ্ডনা ও তত্ত্ববিবেক। ভাষা-পরিচ্ছেদ শ্রীবিশ্বনাথ পঞ্চানন প্রণীত। ইহা ন্যায়শাস্ত্রের সকল শাখা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ। গ্রন্থকার স্বরচিত ভাষা-পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে একখানি টীকা সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তাহার নাম সিদ্ধান্তমুক্তাবলী। ন্যায়সূত্র গৌতম-ঋষি-প্রণীত। কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পরকাল-সংক্রান্ত বিষয় উল্লিখিত আছে।

ইহাতে যে তর্কপ্রণালীর অনুসরণ হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ আধুনিক ইউরোপীয়গণের প্রণীত গ্রন্থাবলীতে অবলম্বিত তর্কপ্রণালীর তুল্য। ইহার গ্রন্থকর্ত্তার নাম উদয়নাচার্য্য। অনুমানচিন্তামণি বর্ত্তমান ন্যায়-শাস্ত্র-সম্প্রদায়-সম্মত একখানি উপপত্তি (Deduction) বিষয়ক গ্রন্থ। ইহার গ্রন্থকর্ত্তার নাম গঙ্গেশ উপাধ্যায়। ইউরোপের মধ্যযুগের পণ্ডিতদের অবলম্বিত বিচারপ্রণালী সদৃশ এই গ্রন্থকর্ত্তার বিচারপ্রণালী। যাহাকে বেকন "বিদ্যার উর্ণনাভ জাল" বলিয়াছেন, উক্ত গ্রন্থ সেইরূপ।

এই গ্রন্থ অধ্যয়নকালীন বিস্তর কষ্ট অনুভব করিতে হয়। বর্ত্তমান ন্যায়-সম্প্রদায়ের অধিনায়ক রঘুনাথ-শিরোমণি-প্রণীত অনুমানদীধিতি নামে ইহার একখানি টীকা আছে। শব্দশক্তিপ্রকাশিকা বাক্যের অর্থ সংক্রান্ত একখানি গ্রন্থ। ধর্ম্মরাজ-প্রণীত "পরিভাষা" গ্রন্থখানি বৈদান্তিক মতের সমর্থনকারী। বাচস্পতি-মিশ্র-প্রণীত তত্ত্বকৌমুদী গ্রন্থখানি সাংখ্য-দর্শন সম্বন্ধে একখানি বিস্তীর্ণ পুস্তক। শ্রীহর্ষ-প্রণীত গ্রন্থের নাম খণ্ডনা। গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায় এই যে, অন্যান্য সমুদয় দর্শনসম্প্রদায়ের মতগুলি খণ্ডন করিয়া নিজের প্রিয় বৈদান্তিক মতের প্রতিষ্ঠা করা। গ্রন্থখানি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা বর্ণিত বিষয় অতি দুর্ব্বোধ ভাষায় অবতারণা করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য-প্রণীত তত্ত্ববিবেকে নাস্তিকতার বিরুদ্ধে তর্ক সকল উত্থাপিত ও ব্রহ্মাণ্ডের একজন সৃষ্টিকর্ত্তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভাষা যেরূপ দুরূহ, তেমনই অসংলগ্ন।

এক্ষণে আমার নিবেদন এই যে, উক্ত শ্রেণীকে ন্যায় শ্রেণী নামে অভিহিত না করিয়া, দর্শন শ্রেণী নামে অভিহিত করা উচিত। অনুমানচিন্তামণি, দীধিতি, খণ্ডনা ও তত্ত্ববিবেকের অধ্যাপনা বন্ধ হউক ও তাহার পরিবর্ত্তে মীমাংসা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্বলিত নিম্নলিখিত দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধী গ্রন্থগুলি অধীত হউক।

(১) সাঙ্খ্যপ্রবচন। (৩) পঞ্চদশী।
(২) পাতঞ্জলসূত্র। (৪) সর্ব্বসারসংগ্রহ।

সংস্কৃত কলেজে শিক্ষার কাল ১৫ বৎসর মাত্র। তাহাতে এরূপ আশা করা যাইতে পারে যে, এক ব্যক্তি এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যায় উত্তম পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে। ভারতবর্ষে প্রচলিত সমস্ত দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ না করিতে পারিলে কেহই সংস্কৃত বিদ্যায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। ইহা অতি সত্য কথা যে, হিন্দু-দর্শন-শাস্ত্রের অধিকাংশের সহিত আধুনিক সময়ের উন্নত চিন্তার সৌসাদৃশ্য অল্পই লক্ষিত হয়। তথাপি ইহা কখনই অস্বীকার করা যাইতে পারে না যে, এক জন সংস্কৃতাভিজ্ঞের পক্ষে উক্ত দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞান নিতান্তই প্রয়োজন। ইংরাজী বিভাগ সম্বন্ধে আমার মন্তব্যগুলি রিপোর্টের স্থানান্তরে উল্লেখ করিব। যদি কৌন্সিল অব্ এডুকেশন আমার মন্তব্যগুলি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে যে সময়ের মধ্যে ছাত্রেরা দর্শন শ্রেণীতে উন্নীত হইবে, সেই সময়ের মধ্যে তাহাদিগের শিক্ষিত ইংরেজী ভাষাজ্ঞান অনায়াসেই তাহাদিগকে ইউরোপ খণ্ডের দর্শন শাস্ত্রের জটিল বিষয়সমূহ প্রণিধান করিতে সমর্থ করিবে। তাহারা পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের সহিত তাহাদিগের স্বদেশীয় দর্শনশাস্ত্রের তুলনা করিতে সহজেই পারগ হইবে। যুবকেরা এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষিত হইলে, সহজেই প্রাচীন হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রের ভ্রম-প্রমাদাদি প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু যদি তাহাদিগকে হিন্দুদর্শন-শাস্ত্রের জ্ঞান ইউরোপীয়-দিগের নিকট শিক্ষা করিতে হয়, তবে উপরোক্ত সুবিধা তাহাদিগের কখনই ঘটিয়া উঠিবে না। ভারতবর্ষে প্রচলিত যাবতীয় দর্শনশাস্ত্র শিক্ষার ফলে ছাত্রেরা সহজেই অনুভব করিতে পারিবে যে, ভিন্ন ভিন্ন দর্শনশাস্ত্র-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকগণ পরস্পরের ভ্রম-প্রমাদাদি প্রদর্শন করিবার ক্রটী করেন নাই। ছাত্রের পক্ষে এ সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে বিচার করিয়া তথ্য নির্ণয়

করিবার যথেষ্ট সুবিধা রহিয়াছে। তাহার ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রজ্ঞান, বিভিন্ন দর্শন-সম্প্রদায়ের দোষগুণ বিচারের পক্ষে প্রকৃষ্ট পথপ্রদর্শক হইবে।

ইংরেজী বিভাগ।*

যে পদ্ধতি অনুসারে এই বিভাগটী অধুনা ঘটিত, তাহা অতীব অসন্তোষকর। এ বিভাগে কি শিক্ষা করিতে হইবে, তাহা ছাত্রের ইচ্ছাধীন। যখন ইচ্ছা, সে তাহার পাঠ আরম্ভ করে ও ইচ্ছানুসারে তাহা পরিত্যাগ করে। অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার পরেই ব্যাকরণ শ্রেণীতে পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু একেবারে দুইটী নূতন ভাষা শিক্ষা করিতে তাহাদিগকে বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই অধিকাংশ ছাত্রই হয় ইংরেজী কিংবা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় অবহেলা প্রদর্শন করে। প্রায়ই পরীক্ষার পূর্ব্বে অধিকাংশ ছাত্র ইংরেজী বিভাগ হইতে পলাইয়া আইসে। সেই ছাত্রেরাই আবার পর বৎসরের আরম্ভে ভর্ত্তি হইতে আইসে। অন্য একটী কারণে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়।

একটী ইংরেজী বিভাগের শ্রেণীতে অনেক সংস্কৃত বিভাগের শ্রেণীর ছাত্রেরা অধ্যয়ন করে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রগণের বিষয় দেখা যাউক। তৃতীয় শ্রেণীতে ত্রয়োদশটী ছাত্র পাঠ করে। তন্মধ্যে চারিটী স্মৃতি শ্রেণীর ছাত্র, একটী ন্যায় শ্রেণীর, একটী অলঙ্কার শ্রেণীর, তিনটী তৃতীয় ব্যাকরণ শ্রেণীর ও অবশিষ্ট চারিটী চতুর্থ ব্যাকরণ শ্রেণীর ছাত্র। চতুর্থ শ্রেণীতে ৩৩টী বালক অধ্যয়ন করে। তন্মধ্যে ২টী অলঙ্কার শ্রেণীর, ৫টী

---

* ইংরেজী-বিভাগ প্রথমতঃ ১৮২৭ খৃঃ স্থাপিত হয়। ১৮৩৫ খৃঃ নবেম্বর মাসে সাধারণ শিক্ষার জেনারেল-কমিটির আদেশানুসারে ইহা উঠিয়া যায়। পুনরায় ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে উক্ত কমিটির আদেশানুসারে ইহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাহিত্য শ্রেণীর, ২টী প্রথম ব্যাকরণ শ্রেণীর, ৬টী দ্বিতীয়, ১০টী তৃতীয়, ৬টী চতুর্থ এবং ২টী পঞ্চম ব্যাকরণ শ্রেণীর ছাত্র।

বিভিন্ন সংস্কৃত শ্রেণী হইতে ছাত্রেরা ইংরেজী-বিভাগে পাঠ করিতে আইসে। ইহাতে এই কু-ফল উৎপন্ন হয় যে, ছাত্রগণ উক্ত সংস্কৃতশ্রেণীতে নিয়মমত উপস্থিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ ইংরেজী শিক্ষা ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং সংস্কৃত শ্রেণীর অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রই ইংরেজী বিভাগে অধ্যয়ন করে।

এই ছাত্রগণ বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর ছাত্রেরা বিশেষরূপে উভয়বিধ শিক্ষায় এক সময়ে মনোযোগ দিতে অক্ষম। সুতরাং শিক্ষাবিষয়ে তাহাদিগের তাদৃশ উন্নতি দৃষ্ট হয় না।

যদ্যপি ইংরেজী বিভাগ বর্ত্তমান নিয়মে পরিচালিত হয়, তবে ইহার ফল যে নিতান্তই অসন্তোষজনক হইবে, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই। ইংরেজী বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি ঈদৃশ নিয়মে পরিচালিত হওয়াতেই উহা নিতান্ত মন্দফল উৎপন্ন করে ও অবশেষে সাধারণ শিক্ষার জেনারেল কমিটির আদেশে একেবারে উঠিয়া যায়। যদি অপেক্ষাকৃত সুবন্দোবস্ত না করা হয়, তবে পূর্ব্বের ন্যায় ইহা হইতে মন্দফল ফলিবে। তজ্জন্য আমি যে কয়েকটী বন্দোবস্তের অবতারণা করিতেছি, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে নিশ্চয়ই সু-ফল উৎপন্ন হইবে। আমার মন্তব্যগুলি এই,—

ছাত্রেরা সংস্কৃত-ভাষায় কিছু পারদর্শিতা না দেখাইতে পারিলে, তাহাদিগকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিতে দেওয়া উচিত নয়। সংস্কৃত শ্রেণীর ছাত্রেরা সেই সঙ্গে তাহাদিগের নিজের শ্রেণীতে ইংরেজী ভাষাও শিক্ষা করিবে। ইংরেজী শিক্ষা ইচ্ছাধীন না হইয়া অন্যান্য পাঠের ন্যায় অবশ্যপাঠ্য হইবে। কোন ছাত্র যদি ইংরেজী শিক্ষা করিতে নিতান্তই অনিচ্ছা প্রদর্শন করে, তবে তাহার পক্ষে এই নিয়ম বলবৎ হইবে যে, পরে কোন সময়েই সে সংস্কৃতভাষা শিক্ষাকালীন ইংরাজীশিক্ষা আরম্ভ করিতে

পারিবে না। তাহার জন্য অন্য একটী ইংরেজী শিক্ষার শ্রেণী সৃষ্টি করা একেবারে অসম্ভব। সংস্কৃত শিক্ষার প্রস্তাবিত প্রণালী অনুসারে সাহিত্য শ্রেণীর ছাত্রগণ সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হইবে। আমি তজ্জন্য প্রস্তাব করিতেছি যে, অলঙ্কার শ্রেণীতেই ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভ হয়। তাহা হইলে ছাত্রগণ ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা করিতে অন্যূন দ্বিগুণ সময় প্রদান করিতে সমর্থ হইবে এবং তাহাদিগের চিত্ত এক্ষণে সুমার্জ্জিত হওয়াতে তাহাদিগকে সামান্য বিষয় হইতে আরম্ভ করিতে হইবে না। অলঙ্কার শ্রেণী হইতে কলেজের শেষশ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করিতে যাইলে ৭।৮ বৎসর লাগে। সুতরাং উক্ত সময়ের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান্ ও শ্রমশীল ছাত্র অনায়াসেই ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিবে।

আমি আর একটী বিশেষ ঘটনা কৌন্সিলের সমক্ষে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করি। ব্যাকরণের পঞ্চম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন তাঁহার শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতে বিশেষ সমর্থ বলিয়া বোধ হয় না। তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন; সুতরাং নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে অপারগ। অল্পবয়স্ক বালকগণের শ্রেণীতে সুন্দররূপে কাব্য পড়াইতে হইলে, যে কার্য্যতৎপরতা ও দৃঢ়তার প্রয়োজন, তাহা তাঁহার নাই। প্রাচীন বলিয়া তিনি কাহারও উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং তাঁহার শ্রেণীতেই বিশেষ গোলযোগের প্রভাব। তন্নিমিত্ত আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, তাঁহার বর্ত্তমান বেতন মাসিক ৪০৲ টাকা দিয়া তাঁহাকে লাইব্রেরির ভার দেওয়া হয় ও লাইব্রেরির বর্ত্তমান অধ্যক্ষ, এই বিদ্যালয়ের একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে ৩০৲ টাকা বেতনে ব্যাকরণের পঞ্চম শ্রেণীর অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হয়। পরিশেষে সুবিধা ঘটিলে তাঁহার বেতন ৩০৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকায় বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়।

শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উন্নয়ন।

বালকগণের এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উন্নয়ন সম্বন্ধে কলেজের বর্ত্তমান পদ্ধতি এই যে, তাহারা নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত এক শ্রেণীতে পাঠ করে। পরে সময় অতীত হইলেই, তাহাদিগের বিদ্যার পারদর্শিতা লাভ হইল কি না সে বিষয় দৃষ্টি না করিয়া, তাহাদিগকে অন্য শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়। এই পদ্ধতি হইতে এই কু-ফল উৎপন্ন হয় যে, কোন শ্রেণীতে কেহ পাঠ শেষ করিলেও তাহাকে নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত না হইলে, উপরকার শ্রেণীতে উঠিতে দেওয়া হয় না। কিন্তু যদ্যপি অপর কোন ছাত্র, সকল বিষয়ে অনুপযুক্ত হইয়াও কোন শ্রেণীতে নির্দ্দিষ্ট সময় সমাপ্ত করে, তবে তাহাকে উপরকার শ্রেণীতে পাঠ করিতে দেওয়া হয়। আমি তজ্জন্য প্রস্তাব করি যে, গুণানুসারে উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হয়। আরও এই নিয়ম প্রচলিত হউক যে, বৃত্তিসংক্রান্ত নিয়মানুযায়ী সময়ের অতিরিক্ত কাল কেহই কলেজে পাঠ করিতে পারিবে না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, এরূপ বন্দোবস্ত প্রচলিত হইলে মধ্যবিৎ ছাত্রাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ ছাত্রেরা নির্দ্দিষ্ট সময়ের কমেও নিজ নিজ পাঠ শেষ করিতে সক্ষম হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যালয়ে সুবন্দোবস্তের অভাব, সকলেরই বিশেষ পরিচিত। বালকগণের উপস্থিতি, সামান্য কারণে শ্রেণী পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে যাওয়া ও অনাবশ্যক গোলমাল ও কথাবার্ত্তা এবং সর্ব্বপ্রকার গোলযোগ সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অন্যান্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে যেরূপ নিয়মাদি ও সুশৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়, এই বিদ্যালয়ে কেন যে তাহা প্রবর্ত্তিত হইবে না, তাহার কারণ বুঝিতে পারি না। সেইরূপ প্রণালী এ বিদ্যালয়েও প্রতিষ্ঠিত হওয়া নিতান্তই উচিত।

অবশেষে নিবেদন এই যে, কলেজের সুবন্দোবস্তের নিমিত্ত আমি যে প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি, তাহা বহু দিবসের প্রগাঢ় চিন্তা ও

বিবেচনার ফল। আমার বিবেচনায় যে প্রণালীর অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে নিতান্তই প্রয়োজনীয়, আমি কেবল তাহারই উল্লেখ করিয়াছি ও আশা করি যে, যদ্যপি কৌন্সিল আমার প্রস্তাবিত পরামর্শগুলি কার্য্যে পরিণত করেন, তবে অল্পদিনের মধ্যেই অতি সু-ফল উৎপন্ন হয় ও বিদ্যালয়টী পবিত্র ও প্রকৃত সংস্কৃত বিদ্যার আগার স্বরূপ হইবে। বিশেষতঃ ইহা হইতে জাতীয় সাহিত্যের উৎপত্তি ও সুশিক্ষকের সংঘটন হইতে থাকিবে ও এই বিদ্যালয় হইতে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সুদক্ষ শিক্ষকগণ সাধারণের মধ্যে জাতীয় বিদ্যা প্রচার করিয়া দেশের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল সাধন করিতে থাকিবেন।

সংস্কৃত কলেজ
১৬ই ডিসেম্বর
১৮৫০ সাল। } (স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

রিপোর্টে কেবল সহজ শিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবিত নহে; সংস্কৃত কলেজের সমগ্র সংস্কৃত পাঠ্য সংক্ষেপে সমালোচিত হইয়াছে। একাধারে একত্র সংস্কৃত পাঠ্যের এরূপ সমালোচনা আর কোথাও পাওয়া যায় না। ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ-বিরতির প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধর্ম্মপ্রবৃত্তিরও একটা গতিনির্ণয় হয়। রিপোর্টের ইংরেজি সহজ, সরল ও সংযত। প্রয়োজনীয় কথাগুলি বিনা বাক্যাড়ম্বরে সাজাইয়া গুছাইয়া বলা হইয়াছে।

রিপোর্টপাঠে শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষেরা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের লোপাশঙ্কা তাঁহাদের অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল। বস্তুতঃ রিপোর্ট-লেখার গুণে বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষা-বিভাগে যথেষ্ট যশ লাভ করিয়া-

ছিলেন। তাঁহার পর এক ভূদেব বাবু ভিন্ন রিপোর্ট লিখিয়া শিক্ষাবিভাগে এতাদৃশ যশস্বী কেহই হন নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ও ভূদেব বাবুর চরিত্রে ও কর্ম্মে বৈচিত্র্য যতই থাকুক, নানাগুণে তাঁহারা উভয়েই বাঙ্গালায় বরণীয়; পরন্তু শিক্ষা-বিভাগেরও চিরস্মরণীয়। আর কোন কারণ না থাকিলেও, তাঁহারা এক শিক্ষা-তত্ত্ব সম্বন্ধে ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিতেন। রিপোর্ট-লেখার গুণে উভয়েই পদ, সম্পদ, সম্মান, সম্ভ্রম,—এই সকল বিষয়েরই পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। এক রিপোর্ট-ফলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরম পদোন্নতি। সাংসারিক সুখ-শ্রীবৃদ্ধির মূলাধার ইহাই। তিনি রিপোর্টে শিক্ষা-প্রণালীর পথাবলম্বন স্বরূপ যে বাঙ্গালা পাঠ্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহারই অধিকাংশ স্বয়ং প্রণয়ন করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কেবল শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের অনুমোদন মাত্র অপেক্ষা ছিল। উল্লিখিত পুস্তকগুলি একে একে পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে তিনি কেবল পাঠ্য-সঙ্কল্পে জীবন-চরিত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর বা ১২৫৬ সালের ২৬শে ভাদ্র সোমবার জীবন চরিত প্রকাশিত হইয়াছিল। রবার্ট ও উইলিয়ম চেম্বর্স সাহেব কর্ত্তৃক সঙ্কলিত জীবন-চরিতের কতিপয় চরিত্র লইয়া "জীবন-চরিত" লিখিত। এই জীবন-চরিতে কোপর্নিকস্, গালিলেও, নিউটন, হর্শল, গ্রোসিয়স্, লিনীয়স্, ডুবাল, জেঙ্কিন্স, জোন্স, এই কয়টী চরিত অনুবাদিত হইয়াছে।

অনুবাদে কৃতিত্ব পূর্ব্ববৎ। তবে অনুবাদে কোন কোন শব্দের বাঙ্গালা-ভাষায় অসঙ্গতি আছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। নহিলে ভাষা তেজস্বিনী ও হৃদয়গ্রাহিণী।

জীবন চরিতে যে সকল বিজাতীয় ও বিদেশীয় চরিত্রের অবতারণা হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষণীয় গুণ থাকিতে পারে; ফলে কিন্তু অলক্ষ্যে ইহাতেই কেমন একটা কু-শিক্ষা আসিয়া পড়ে। জীবন-চরিতের বিষয়ীভূত চরিত্র পাঠে ধারণা জন্মে, তাঁহারাই মনুষ্যের আদর্শ; সুতরাং তাঁহাদের অন্যান্য আচার, ব্যবহার, শিক্ষা, দীক্ষা প্রভৃতিও অনুকরণীয়। কাজেই সেই সকলের অনুকরণেই প্রবৃত্তি সহজে ধাবিত হয়। মনে হয়, এই সকলের অনুকরণেই সেইরূপ আদর্শে উপস্থিত হওয়া যায়। সত্য সত্য সে সব কিছু আর হিন্দু-সন্তানের শিক্ষণীয় বা অনু-করণীয় নহে। হিন্দুর তাহাতেই অধঃপতন। হিন্দুর অধুনাতন অধঃপতনও ত এইরূপ কারণে। অকাজের অনুকরণ করিতে অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধেরও সহজেই প্রবৃত্তি হয়; সুকুমারমতি বালকদিগের ত কথাই নাই। স্বধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুর অথবা পুরাণান্তর্গত পুণ্যশ্লোক-পবিত্র-চরিত্রাবলীর যে কোন গুণ, যে কোন আকারে প্রকটিত হউক না কেন, তাহাই হিন্দু সন্তানের শিক্ষণীয়। সেই প্রকটিত গুণানুসরণে, হিন্দু সন্তান চরিত্র সৃষ্টির যেখানে গিয়া উপস্থিত হউক না, দেখিবে, হিন্দুর চরিত্র-গঠনোপযোগী উপকরণ তথায় জাজ্বল্যমান। সংস্কৃত-ভাষা-

পারদর্শী ও বহু-শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্যাসাগর মহাশয়ই যে এইরূপ চরিত্র-সংগ্রহে সমর্থ ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাহা হয় নাই; শুদ্ধ দেশের দুরদৃষ্ট-দোষে। শিক্ষার স্রোত তখন বিপথে ধাবিত হইয়াছিল।

শোভাবাজার-রাজ ৺ রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান্ ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইংরেজির শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ বসুজ মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে স্বদেশীয় লোকের জীবনী লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতে সম্মতও হইয়াছিলেন। একবার তিনি এ দেশীয় ব্যক্তিগণের জীবনী লিখিবার জন্য সবিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে অনেক পুস্তকও তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ কার্য্যে তাহা ঘটে নাই। ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বসু এম, বি, মহাশয়ের মুখে আমরা এই কথা শুনিয়াছি। জীবনচরিত লিখিবার জন্য, অমূল্য বাবুই পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

২২

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

রসময় দত্তের কর্ম্মত্যাগ, বিদ্যাসাগরের প্রিন্সিপাল পদ,
কার্য্য-ব্যবস্থা, ছাত্র-প্রীতি, কায়িক-বিধানের
নিষেধাজ্ঞা, রহস্যপটুতা, শিরঃ পীড়া,
বীটন্ স্কুলের সম্বন্ধ ও বোধোদয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা-প্রণালী-সম্বন্ধে রিপোর্ট, শিক্ষা-বিভাগে প্রদত্ত হইলে পর, কলেজের সেক্রেটরী বাবু রসময় দত্ত, কর্ম্ম-ত্যাগের জন্য আবেদন করেন। এই আবেদন করিবার পূর্ব্বে রসময় বাবুর কোন কার্য্য-পর্য্যালোচনা জন্য একটী কমিটি বসিয়াছিল। কমিটীর ফলে, রসময় বাবু বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্য ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃকল্প। তিনি কলেজের অধ্যক্ষ থাকাতেও যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শিক্ষা-প্রণালী-সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে আদিষ্ট হন, তখন তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, কর্তৃপক্ষীয়েরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত করিবেন। এই সকল ভাবিয়াই তিনি কার্য্য পরিত্যাগ করেন। পণ্ডিত রামগতি বিদ্যারত্ন মহাশয়ও লিখিয়াছেন,—

"মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিত হইয়া আসিলে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। মৌয়েট্ সাহেব পীড়াপীড়ি করিয়া ১৮৫১ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ৯০ টাকার বেতনে বিদ্যাসাগরকে এ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ নিয়োগকালে এডুকেশন

কৌন্সিলের মেম্বরেরা সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান অবস্থা এবং উহা উত্তরকালে কিরূপ হওয়া উচিত? তদ্বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ দিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই সেক্রেটরী রসময় বাবু কর্ম্মত্যাগ করিলেন।"—বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ২৩৮ পৃষ্ঠা।

৪ঠা জানুয়ারি, শিক্ষা-বিভাগের সেক্রেটরী মৌয়েট্ সাহেব এক পত্র লিখিয়া, রসময় বাবুর কর্ম্মত্যাগের আবেদন গ্রাহ্য করেন। এই পত্রে রসময় বাবুর কার্য্যদক্ষতার জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছিল। * পরন্তু মৌয়েট্ সাহেব তাঁহার পদত্যাগ মঞ্জুর করিয়া, তাঁহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তে কার্য্যভার অর্পণ করিবার আদেশ করেন। ২০শে জানুয়ারি তাৎকালিক বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অণ্ডর সেক্রেটরী ডবলিউ, সিটনকর সাহেব, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে রসময় বাবুর পদে অধিষ্ঠিত করেন। † এই নিয়োগের পর সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী ও আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী পদ উঠিয়া যায়। এই দুই পদে একপদ হইল,—"প্রিন্সিপাল"। এ পদের বেতন ১৫০৲ টাকা। ‡

সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের শিক্ষা-পরিবর্ত্তনে আত্ম-নিয়োগ করেন। তাৎকালিক

* সংস্কৃত কলেজের এই কয়জন সেক্রেটরী ছিলেন,—"টড্, জি, টি, মার্শেল, কাপ্তেন ফ্য়ার, রামকমল সেন, রসময় দত্ত।

† Letter No 70

‡ Letter No 37

পণ্ডিত-মণ্ডলী ও ছাত্রবৃন্দ, তাঁহার অসাধারণ শ্রমশক্তি অবলোকন করিয়া, বিস্মিত হইতেন।

প্রিন্সিপাল-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া, "প্রিন্সিপালের" কার্য্য ব্যতীত, তাঁহাকে অন্যান্য বহু কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। তিনি তো কখনই, উপজীব্য পদের "লেফাফা-দোরস্ত" কার্য্য করিয়াই, দিনের অবশিষ্ট কাল, স্বভাব-বিলাসী বাঙ্গালীর ন্যায় বিলাস ব্যসনে অতিবাহিত করিতেন না। বিদ্যাসাগর স্বভাবত কর্ম্ম বীর। তাঁহার বিরাম-বিরতি কবে? কলেজের কার্য্য ব্যতীত ক্ষুদ্র দেহে তিনি দেশের ও সমাজের জন্য, কি অমানুষিক শক্তিবলে অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, পাঠক! একে একে তাহার পরিচয় পাইবেন। এই 'প্রিন্সিপাল"-কার্য্যের সময়েই বিদ্যাসাগরের নাম-যশঃ দিগন্তব্যাপী হইয়াছিল। এই "প্রিন্সিপালে"র কার্য্যেও তাঁহাকে যেরূপ অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা প্রকৃতই বিস্ময়াবহ। তিনি শিক্ষা-প্রণালী-সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, কর্তৃপক্ষ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে তদনুসারে কার্য্য করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। সুতরাং সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যসম্বন্ধে তিনি যে সংকল্প করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা কার্য্যে পরিণত করাই, তাঁহার অতি-কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে তিনি পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়নে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে, ফলে যাহাই হউক, কলেজের আভ্যন্তরীণ সংস্কার-সাধনে তাঁহাকে সবিশেষ মনোযোগী হইতে হইয়াছিল।

ছাত্রদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার, আভ্যন্তরীণ সংস্কারের মূলাধার বলিয়াই তাঁহার ধারণা ছিল। ছাত্রদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে, কলেজের নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ও প্রচলিত পাঠ্যে, বালকদিগের মনোভিনিবেশ হইবে, ইহা তিনি বুঝিতেন। এই জন্য তিনি কলেজের ছাত্রদিগের প্রতি পুত্রবৎ ব্যবহার করিতেন।

এই লেখকের সাহিত্য-গুরু, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্যতম শিষ্য এবং বর্ত্তমান দৈনিক সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিয়াছেন,—"আমরা যখন সংস্কৃত কলেজে পড়িতাম, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায়ই সংস্কৃত কলেজেই থাকিতেন।* কলেজের ছুটী হইলে পর অনেক ছাত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। তিনি সেই সু-প্রসন্ন সহাস্য-বদনে সকলকেই যথারীতি সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়া, নানা প্রসঙ্গে নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ ও রহস্যপূর্ণ কথাবার্ত্তা কহিতেন। তাঁহার কাছে যাইলেই, ছাত্রেরা প্রায়ই "রসগোল্লা," "সন্দেশ" খাইতে পাইত। তাঁহার প্রীতিসম্ভাষণে কেহই বিমুখ হইত না। বালকদিগের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরকালই বান্ধব-

---

* রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, "বিধবা-বিবাহে"র আন্দোলন-কালে তিনি প্রায়ই সংস্কৃত কলেজেই রাত্রি যাপন করিতেন; এবং নিজ মত সমর্থনার্থ নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। কলেজের সম্মুখেই শ্যামাচরণ বিশ্বাসের বাটী। রাত্রিকালে কখন কখন তিনি শ্যামাচরণ বাবুর বাটীতে আহার করিতেন; কখন বা কলেজেই থাইতেন। প্রাতে কিন্তু প্রত্যহ রাজকৃষ্ণ বাবুর বাটীতে আহারের ব্যবস্থা ছিল। শ্যামাচরণ বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্যতম অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্ ছিলেন।

ব্যবহার করিতেন,—তা কি সংস্কৃত কলেজে; আর কি স্বকৃত-বিদ্যালয়ে। ছাত্রবর্গকে সর্ব্বদাই মধুর আত্মীয়-সম্ভাষণে "তুই" বলিয়া সম্বোধন করাই তাঁহার স্বভাব ছিল। তাঁহার মুখে সেই অমৃতায়মান "তুই" সম্বোধন শুনিয়া, প্রিয় ছাত্রবর্গ আপনাদিগকে তাঁহার আত্মীয় অপেক্ষা আত্মীয় বিবেচনা করিত। সত্য সত্যই সেই "তুই"টুকু যেন স্বর্গীয় স্নেহের ক্ষীরভরা। যেন সেই "তুই"টুকুরই মধ্যে বিশ্বম্ভরা আত্মীয়তা নিহিত ছিল। বালকদিগের প্রতি যেমন তিনি সততই কোমল ব্যবহার করিতেন, আবার আবশ্যক হইলে, কর্ত্তব্যানুরোধে, তেমনই কঠোর হইতেন। বলা বাহুল্য, স্কুলের বা কলেজের অধ্যাপক, শিক্ষক ও কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ কখন কঠোরতা, কখন বা কোমলতা, কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রয়োজনীয়। কারুণ্য যাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ কঠোরতা তাঁহার কিন্তু অল্পক্ষণ-স্থায়ী। বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তব্যে কঠোর হইতেন বটে; কিন্তু কঠোরতার কারণ দূর হইলেই, কারুণ্যে ভাসিয়া যাইতেন। তখন সেই মুখে কি যেন একটা শোভনীয় সুন্দর স্বর্গীয় শ্রীর আবির্ভাব হইত! প্রসঙ্গক্রমে এইখানেই তাঁহার উত্তরকালীন ছাত্র-প্রীতির একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করি।

এক বার তিনি স্ব-প্রতিষ্ঠিত "মেট্রোপলিটান কলেজে"র শ্যামবাজারস্থ শাখা-বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদিগকে অবাধ্যতাদোষের জন্য তাড়াইয়া দেন। কর্ত্তব্যানুরোধে দ্বিতীয় শ্রেণী একবারে উঠাইয়া দিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ

বিতাড়িত হইয়া. পরদিন প্রাতে, তাঁহার বাদুড়-বাগানস্থিত বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হয় এবং কাতরকণ্ঠে করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে। বালকদিগের কোমল-করুণ মুখ দেখিয়া, দয়ার্ণব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সে দুরন্ত ক্রোধ মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল। তখন তিনি সাদর স্নেহ-সম্ভাষণে বলিলেন,—"যা', আর এ কাজ করিস্ না; এবার মাপ্ কর্‌লেম।" ছাত্রগণ এই কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইল। তখন বেলা ১২ বারটা। বাড়ী ফিরিবার জন্য বিদায় লইয়া, ঠিক্ সিঁড়িতে নামিবার সময়, তাহাদের এক জন হাসিতে হাসিতে অনুচ্চস্বরে বলিল,—"কি কঠোর-প্রাণ! এত-খানি বেলা হ'ল, তা, বল্‌লে না, একটু জল খেয়ে যা।" কথাটা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কানে গেল। তিনি তখন তাড়াতাড়ি সিঁড়িতে নামিয়া আসিয়া, সকলকে বলিলেন,—"ঠিক্ বলেছিস্; আমার কঠোর প্রাণ বটে; অন্যমনস্কে তোদিগে একটু জল খেতেও বলি নাই; আয়্ আয়্, একটু একটু জল খেয়ে যা।" ছাত্রগণ তখন অপ্রস্তুত হইল। কেহ কেহ হাতযোড় করিয়া ক্ষমা চাহিল; কেহ কেহ বা তাড়াতাড়ি পালাইবার চেষ্টা করিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিতে বলিলেন। পরে তিনি সকলকে ধরিয়া উপরে লইয়া গেলেন। উপরে গিয়া সকলকে জল খাইতে হইল। তখন তাঁহার সেই প্রফুল্ল প্রসন্ন বদনখানি দেখিয়া একজন আর একজনকে বলিয়া-ছিল;—"এ লোকের রাগ হয় কেমন করিয়া?"

বিদ্যাসাগর মহাশয়, ছাত্রদিগের কায়িক দণ্ড-বিধানের

একান্ত বিরুদ্ধ ছিলেন। এক দিন তিনি দেখিতে পান, সংস্কৃত কলেজের কোন অধ্যাপক, ক্লাসের ছেলেগুলিকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ অধ্যাপককে অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া, একটু রহস্য করিয়া বলিলেন,—"কি হে! তুমি যাত্রার দল করিয়াছ নাকি? তাই ছোকরাদিগকে তালিম দিচ্ছ? তুমি বুঝি দূতী সাজবে?"

অধ্যাপক একটু অপ্রতিভ হইয়াছিলেন।

আর এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অধ্যাপকের টেবিলে একগাছি বেত দেখিয়া অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করেন,—"বেত কেন হে?" অধ্যাপক মহাশয় বলেন,—"মানচিত্র দেখাইবার সুবিধা হয়।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন,—"রথ দেখা, কলা বেচা দুইই হয়। ম্যাপ দেখানও হয়; ছেলেদের পিঠেও পড়ে।"

বলা বাহুল্য, এই অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রায়ই রহস্যালাপ হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয়, চিরকালই সময় বুঝিয়া, লোক বুঝিয়া, রহস্য করিতেন। তিনি স্বাভাবিক রহস্যপটু ছিলেন।

কর্ম্ম-বীরের গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ চরিত্রে স্বাভাবিক রহস্য-রঙ্গের ভাব বড়ই মনোহর। যেন তরুণ অরুণ-কিরণোদ্ভাসিত প্রভাতের "কাঞ্চন-জঙ্ঘা।" বীরের গাম্ভীর্য্যে, তরলের রঙ্গ-মাধুর্য্য অনেক সময় বিরল বটে; কিন্তু যে চরিত্রে এই দুয়েরই সমাবেশ, তাহা অতি মহান্। 'সুদন'-বীর জেনারেল গর্ডনের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ

বদন-মণ্ডলের বিস্ফারিত নীল-নয়নদ্বয়ে সতত রহস্য-ভাব উদ্ভাসিত হইত। কার্য্যের সময় গর্ডন, গাম্ভীর্য্যে যেন হিমালয়; কিন্তু কার্য্যাবসরে, বিশ্রান্তালাপে যেন আলোক-পুলকিত স্ফুট-কোরক কদম্ব। তিনি যখন গল্প করিতে বসিতেন, তখন তিনি এমনই মিষ্ট করিয়া, উপমা দিয়া, গল্পগুলি সাজাইয়া বলিতেন, সঙ্গে সঙ্গে এমনই রস-তরঙ্গ ছুটাইতেন যে, দিনরাত্রি সে গল্প শুনিলেও শ্রোতৃমণ্ডলীর মুহূর্ত্তের জন্য ধৈর্য্যচ্যুতি হইত না। তাঁহার উপমার গুণে মনে হইত, গল্পের বর্ণিত বিষয়, যেন চিত্রের মত চক্ষুর সম্মুখে প্রতিফলিত হইত।*

গর্ডন রণ-বীর; বিদ্যাসাগর কর্ম্ম-বীর। গর্ডনের জীবনী-লেখক বটলর্ সাহেব, যে ভাষায় গর্ডনের রহস্য চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়াছেন, সে ভাষায় বলিবার শক্তি আমাদের নাই। তবে বট্‌লার্ সাহেব, রণ-বীর গর্ডনের চরিত্র-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমরা কর্ম্ম-বীর বিদ্যাসাগর সম্বন্ধেও তাহাই বলি। গর্ডনের এক জন বন্ধু তৎসম্বন্ধে বলিতেন,—"He was the most cheerful of all my friends," বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে তদীয় বন্ধু আনন্দকৃষ্ণ বাবু ঠিক্ এই কথাই বলেন। আনন্দ বাবু বলেন, "বিদ্যাসাগর আমাদের বাড়ীতে আসিলে, ৭।৮ ঘণ্টার কমে বাড়ী ফিরিতে পারিতেন না। আমরা তাঁহাকে ঘেরিয়া,

---

* Charles George Gordon, by Colonel Sir William F. Butler, P. 83.

বসিয়া তাহার মুখের রহস্য-রসালাপময় গল্প শুনিতাম। কখন হাসিতাম, কখন কাঁদিতাম, কখন ছবির মত তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া থ কিতাম, কখন তাঁহাকে আহ্লাদে আলিঙ্গন করিতাম। তিনি উপমার অক্ষয়-ভাণ্ডার। নিত্য নূতন গল্প, নিত্য নূতন উপমা। গল্পে আমোদ করিতে এমন আর কেহই পারিতেন না।" মধ্যে মধ্যে পাঠক, বিদ্যাসাগরের এই রহস্য-পটুতার পরিচয় পাইবেন।

রহস্য রঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয় কাজ ভুলিতেন না। তিনি পূর্ব্বোক্ত অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত রহস্য-রঙ্গ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না। অধ্যাপক মহাশয়, এই রহস্যেই অবশ্য সাবধান হইয়াছিলেন; কিন্তু অন্যান্য সকলকে সাবধান করিবার জন্য, তিনি শারীরিক দণ্ডবিধান নিষেধ করিয়া, এক স্মরকুলর জারি করিয়াছিলেন।

প্রিন্সিপাল পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার ৫।৬ মাস পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় পীড়ায় আক্রান্ত হন। ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি শীঘ্র আরোগ্য লাভ করেন। এই সময়ে তাঁহার শিরঃপীড়ার সূত্রপাত হয়। তবে তিনি সে সময় বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া, শিরঃপীড়া তাঁহাকে বড় কাতর করিতে পারিত না। দেহে তখন বল এবং শরীরে রক্ত যথেষ্ট ছিল। সকাল সন্ধ্যা তিনি "মুগুর" ভাঁজিতেন; "ডন" ফেলিতেন; এমন কি রীতিমত ব্যায়ামও করিতেন। ইহাতে তাঁহার দেহে এত রক্ত জন্মে যে, ডাক্তারেরা তাঁহার একটা কঠোর পীড়া হইবে বলিয়া আতঙ্কিত

হইয়াছিলেন। তিনি তখন ভাল করিয়া ঘাড় বাঁকাইতে পারিতেন না। কঠোর পীড়ার আশঙ্কা করিয়াই ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায় দুই বার তাঁহার ঘাড়ের ফস্ত খুলিয়া খানিকটা রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। তখনকার সে তেজস্বিনী মূর্ত্তির একখানি প্রতিকৃতি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে এখনও দেখা যায়। সে প্রতিকৃতি দেখিলেই মনে হয়, যেন উন্নত-ললাট, তেজঃপুঞ্জ, সুন্দর পুরুষের গণ্ডস্থলে রক্ত ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

প্রিন্সপাল-পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার কয়েক মাস পরেই, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বীটন্ সাহেবের মৃত্যুজন্য দারুণ মনস্তাপ পাইতে হইয়াছিল। বীটন্ সাহেব ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও শিক্ষা-সমাজের সভাপতি ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষার বহু-বিস্তার উদ্দেশে ইনি কলিকাতায় বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন।* বিদ্যাসাগর, এতৎপক্ষে বীটন্ সাহেবের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বীটন্ সাহেব স্ব-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অবৈতনিক

---

* এই স্কুল অধুনা বেথুন বালিকা-বিদ্যালয় বলিয়া প্রথিত। প্রকৃত নাম কিন্তু "বীটন্"। বাঙ্গালায় বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এই প্রথম নহে। বালিকা-বিদ্যালয়-প্রচারের চেষ্টাও প্রথমে বীটন্ সাহেবের নহে। পূর্ব্বে 'স্কুল সোসাইটী"র চেষ্টায় ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বালিকাদের জন্য কলিকাতার নন্দনবাগানে "যুবনাইল" পাঠশালা নামে এক পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় পঞ্চাশটী স্ত্রী-পাঠশালা হয়। সাকুল্যে ৫০০টী বালিকা শিক্ষা পাইত। রাধাকান্ত দেবপ্রণীত বলিয়া খ্যাত স্ত্রী-

"সেক্রেটরী" করেন। মেয়েদের লেখাপড়া-শিখান কর্ত্তব্য, এ ধারণা ছিল বলিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সম্বন্ধে প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। অনেক বিরুদ্ধবাদীর সহিতও তাঁহাকে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার এ ধারণার মূল কারণ, ধর্ম্মশাস্ত্রের একটী শ্লোক,—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

শিক্ষা বিধায়ক নামক পুস্তকে ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এই সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কলিকাতার "ফিমেল জুবেনাইল সোসাইটী," মিস্ কুক্ বা মিসেস্ উইলসন্ এবং অন্যান্য মিসনরীরা অনেকটা কৃতিত্ব-ভাগী। কোন কোন হিন্দু, খৃষ্টান হওয়ায়, হিন্দু ও খৃষ্টানের মধ্যে সদ্ভাবের খর্ব্বতা হয়। এই জন্য বালিকা-বিদ্যালয়ের অভাব হয়। এই অভাব দূরী-করণ-উদ্দেশেই বীটন্ সাহেব, প্রথমে সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাবু দক্ষিণাচরণ মুখোপাধ্যায়ের বৈঠক খানায় বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে গোলদীঘির দক্ষিণ কোণে হেয়ার সাহেবের স্কুল গৃহে ইহার কার্য্যারম্ভ হয়। পরে ইহা সীমুলিয়াস্থ বর্ত্তমান গৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়। বীটন্ সাহেব সহৃদয় সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। ফলে যাহাই হউক, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, হিন্দু-স্ত্রীলোকদিগকে লেখা-পড়া শিখান, হিন্দুসমাজের উন্নতিসাধনের একটা প্রধান উপায়। যাহাতে তৎপ্রতিষ্ঠিত স্কুলে কোনরূপে খৃষ্টানী ভাবসংপৃক্ত না হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এই সরল বিশ্বাসেই তিনি এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন।

বাঙ্গালী যাহাতে বাঙ্গালা-ভাষার অনুশীলন করেন, তৎপক্ষে বীটন্ সাহেবের সবিশেষ যত্ন ও চেষ্টা ছিল। ইহা তাঁহার সহৃদয়তার পরিচায়ক নহে কি? বালিকা-বিদ্যালয়ের সৃষ্টি ও পুষ্টিসাধনে ব্রাহ্মেরাও অনেকটা সহায় হইয়াছিলেন। বালিকা-বিদ্যালয়ের পুষ্টিতত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ যাঁহারা জানিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু-লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করুন। ইহা ১২৯৯ সালের ফাল্গুন মাসে, ১৩০০ সালের মাঘ ও ফাল্গুন মাসে এবং ১৩০১ সালের ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন, মেয়েদের লেখাপড়া শিখান উচিত; এবং বীটন্ সাহেবকেও বুঝাইয়াছিলেন এইরূপ যে গাড়ী করিয়া মেয়েরা স্কুলে যাতায়াত করিত, তাহাতেও লেখা থাকিত, এই কয়েকটি কথা। আমরা অধম হিন্দু, এখনও এই বুঝি, আমাদের পূর্ব্বতন রমণীরা যে শিক্ষায় অন্নপূর্ণারূপে কীর্ত্তিমতী হইয়া গিয়াছেন, সেই শিক্ষাই এই শ্লোকের উপপাদ্য আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির ধারণা, যাহাতে ইহ-পরকালের কর্ত্তব্য-সাধন হয়, তাহাই হিন্দু-রমণীর শিক্ষণীয়। লেখাপড়া না শিখিয়া হিন্দু রমণীরা যদি সে কর্ত্তব্যসাধন করিতে পারে, তাহা হইলেই বলিব, তাহাদের শিক্ষা হইয়াছে। শাস্ত্রকারেরা সেই শিক্ষায় লক্ষ্য রাখিয়া, এই শ্লোক রচনা করিয়াছেন। কেবল গুরূপদেশ শুনিয়া সীতা দ্রৌপদী যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, সেই শিক্ষাই হিন্দু-রমণীর গ্রহণীয়। যাহাই হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাবিয়াছিলেন, লেখা-পড়া শিখিলে হিন্দুর সংসার সুখময় হইবে। তিনি এইটী ভাল ভাবিতেন, তাই ইহার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাই বীটন্ সাহেবের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া বালকের ন্যায় তিনি ক্রন্দন করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, যাহা ভাবিয়া যাহাই করুন, ফলে মেয়েদের লেখা পড়া-শেখায় এ মুহূর্ত্তে গরল উদ্গীর্ণ হইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় আজ লোকান্তরিত; কিন্তু যদি তাঁহার মত কোন ভাগ্যবান্ তাঁহার প্রতিনিধিরূপে উত্থিত হন, তাহা হইলে, তাঁহাকে নিশ্চিতই বলিতে হইবে,—

"সুখের লাগিয়ে এ ঘর বাঁধিনু, আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনন করিতে সকলি গরল ভেল।"

ফলে যাহাই হউক, তাঁহার উদ্দেশ্যে সাধুতার আরোপ করিতে আপত্তি বোধ হয়, কাহারও হইবে না। তাৎকালিক শাসন-কর্তৃপক্ষেরও সে সম্বন্ধে সন্দেহ কিছুই ছিল না। সেই জন্যই তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সবিশেষ সম্মান করিতেন। বীটন্ সাহেবের সমাধিকালে তদানীন্তন ডেপুটী লাট হেলিডে সাহেব, তাঁহাকে আপন শকটে আরোহণ করাইয়া, সমাধি-ক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছিলেন। বীটন্ সাহেবের মৃত্যুর পর গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী, বীটন্-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। তিনি ৫ পাঁচ বৎসর কাল এতদর্থ ৮০০০ আট হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। "হোম-ডিপার্টমেণ্টে"র তাৎকালিক সেক্রেটারী স্যর সিসিল বিডন্ সাহেব, বিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন।* বিদ্যাসাগর মহাশয়, বীটন্ সাহেবের শোকে এত অধীর হইয়াছিলেন যে, তিনি বিদ্যালয়ের সেক্রেটরী পদ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন,—"যে মহাত্মার অবিচলিত অধ্যবসায়ে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত; যিনি উহার প্রাণ, তিনিই

* ১৮৫৪ সাল অবধি ১৮৬৮ সাল পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয় এ দেশীয় ব্যক্তিদিগের একটী সভার অধীন ছিল। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ, বাবু কালীপ্রসাদ ঘোষ, বাবু হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি এই সভার সভ্য ছিলেন। নব্য-ভারত, ১২৯৯ সাল, ফাল্গুন মাস, ৫৬৬ পৃষ্ঠা।

যখন জন্মের মতন চলিয়া গেলেন, তখন আর এ বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতে প্রবৃত্তি হয় না।" বীটন্ সাহেবের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এতাদৃশ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল বলিয়াই, তিনি তাঁহার প্রতিকৃতি প্রস্তুত করাইয়া আপন বাড়ীতে রাখিয়া দিয়াছিলেন।* কর্তৃপক্ষের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধনিবন্ধন, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেক্রেটরী পদ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই; ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ বা ১২৭৬ সালে পর্য্যন্ত এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তত্ত্বাবধান সময়ে বীটন্ স্কুলের প্রতিষ্ঠা ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। বোম্বাই-অঞ্চলে একজন পারসী কলিকাতার বীটন্ বিদ্যালয়ের মতন একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। সেখানকার সিবিলিয়ন আরস্কিন্ সাহেব সেই পারসী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, বীটন্ বিদ্যালয়ের বাটীর একটি নক্সা পাইবার জন্য সিটনকর সাহেবকে পত্র লিখিয়াছিলেন। সীটনকর সাহেব সে সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সুহৃদ্‌ভাবে পত্র লেখেন।

যত দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় বীটন্ বিদ্যালয়ের সেক্রেটরী ছিলেন, তত দিনই তিনি কায়মনোবাক্যে ইহার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে চেষ্টা করিতেন। বিদ্যালয়ের বালিকাগণকে তিনি কন্যার মত ভাল বাসিতেন। ভালবাসাই ছিল তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ। তিনি কাহাকেও দিদি, কাহাকেও মাসী, কাহাকেও মা,

* এখনও পুত্র নারায়ণ বাবু সেই প্রতিকৃতি সযত্নে রাখিয়া দিয়াছেন।

ইত্যাদিরূপ সম্বোধন করিয়া, সকলেরই সহিত সাদর-সম্ভাষণ করিতেন। এক বার রাজা দিনকর রাও, তাঁহার সহিত বীটন্ বালিকা-বিদ্যালয় দেখিতে গিয়া, বালিকাদিগকে মিঠাই খাইবার জন্য ৩০০৲ তিন শত টাকা দিয়াছিলেন। 'মিঠাই' খাইলে মেয়েদের পেটের পীড়া হইতে পারে, প্রেসিডেণ্ট বিডন্ সাহেবের এই ধারণা ছিল; সুতরাং তিনি মিঠাই খাওয়াইতে নিষেধ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন সেই টাকায় বালিকাদিগকে কাপড় কিনিয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি মাসী, মা, দিদি ইত্যাদি সম্ভাষণে প্রত্যেক বালীকাকে ডাকিয়া, প্রত্যেকের মত চাহেন। অধিকাংশেরই কাপড় লওয়া মত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন ঢাকাই সাড়ি ক্রয় করিয়া বালিকাদিগকে বিতরণ করেন। বীটন্ বিদ্যালয়ের সেক্রেটরী পদ পরিত্যাগ করিবার পরও বিদ্যালয়ের উপর তাঁহার যথেষ্ট স্নেহ ও মমতা ছিল। শুনিতে পাই, বীটন্-বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর পরিচালন-প্রথা তাদৃশ মনোমত না হওয়ায়, তিনি ইহার প্রতি শেষে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন।

১৮৫১ সালের ৬ই এপ্রেল বা ১২৫৭ সালের ২৫শে চৈত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় চেম্বর সাহেবের "Rudiments of knowledge" নামক গ্রন্থের অনুবাদ করেন। ইহারই নাম বোধোদয়। বীটন্-বিদ্যালয়ের পাঠ্য জন্য এই পুস্তক সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত শিশু-শিক্ষা প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগ

প্রচারিত হইয়াছিল। এই জন্য বোধ হয়, বোধোদয়ের প্রথম নাম হইয়াছিল, শিশুশিক্ষা চতুর্থ ভাগ।*

বোধোদয় হিন্দু-সন্তানের সম্যক্ পাঠোপযোগী নহে। বোধোদয়ে বুদ্ধির অনেক স্থলে বিকৃতি ঘটিবারই সম্ভাবনা। "পদার্থ তিন প্রকার,—চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ্"; আর "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ", ইহা বালক ত বালক, কয়জন বিজ্ঞতম বৃদ্ধের বোধগম্য বল দেখি?

গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন,—"সুকুমারমতি বালক-বালিকারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক, এই আশয়ে অতি সরল ভাষায় লিখিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়াছি; কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না।" যত্ন ঠিক সফল হয় নাই। বোধোদয়ের ভাষা স্থানে স্থানে এইরূপ,—"ঔজ্জ্বল্য ব্যতিরিক্ত"; "নূনাধিক্য বশতঃ"; "গম্ভীর শব্দজনক"; "ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য"; "উজ্জ্বলতা অনুসারে তারতম্য" ইত্যাদি। এক এক স্থলে বোধোদয়ের পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ সম্যক হয় নাই। পদার্থ শব্দ ধরুন। বোধোদয়ে ইতস্ততঃ পরিদৃশ্যমান বস্তু সমুদয় পদার্থ আখ্যা পাইয়াছে। পদার্থ শব্দের এরূপ অর্থগ্রহ বড় সঙ্কীর্ণ। সংস্কৃত দর্শনে যাহা কিছু শব্দবাচ্য, তাহাই পদার্থ। জাতি, গুণ, অধিক কি অভাবও পদার্থ।

পক্ষান্তরে, জন্তু শব্দের প্রয়োগ-স্থল বড় বিস্তীর্ণ হইয়াছে।

---

* নব্য ভারত ১২৯৯ সাল, ফাল্গুন মাস, ৫৬৬ পৃষ্ঠা।

বোধোদয়ের মতে পক্ষী, মৎস্য, কীট, পতঙ্গ সকলই জন্তু। আমরা এখন জন্তু শব্দ এরূপ অর্থে ব্যবহার করি না। জীব বা প্রাণী শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকি। বোধোদয়ে আছে জন্তু-গণ মুখ দ্বারা আহারের গ্রহণ করিয়া প্রাণ ধারণ করে। জন্তু অর্থে যদি প্রাণী হয়, তবে এ কথা ঠিক নহে, কারণ এক এক প্রাণীর মুখ নাই; অথচ সে সজীব।

বোধোদয়ে অনেক বিষয় শিখাইবার প্রয়াস হইয়াছে। প্রাণীতত্ত্ব, নীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, অঙ্ক, ব্যাকরণ ইত্যাদি। বিজ্ঞান ও দর্শনের যে অংশ বোধোদয়ে শিক্ষণীয়, তাহা প্রায়ই উপযোগী; কিন্তু স্থানে স্থানে এরূপ কথা আছে যে, তাহা শিশুবুদ্ধির অধিগম্য নহে। যথা;—চন্দ্রসূর্য্য জোয়ার ভাঁটার কারণ; শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণ নহে; কর্ণপটাহে শব্দের প্রতি-ঘাত ইত্যাদি। দুই একটা কথা বোধ হয়, আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত নহে; যথা,—স্বপ্ন সকল অমূল্য চিন্তামাত্র; অভিজ্ঞতা জন্মিলে হিতাহিত বিবেচনা করিবার শক্তি হয়। অঙ্কশাস্ত্রোক্ত সংখ্যা, পরিমাণ, মাপ ইত্যাদি বিষয়ের স্থান বোধ হয়, বোধোদয়ে না হইয়া পাটীগণিতে হইলে ভাল হইত। ব্যাকরণোক্ত কথা সম্বন্ধে ও ঐরূপ বলা যায়। (পূরণ বাচক শব্দ, বিভিন্ন ভাষা ইত্যাদি)।

প্রাণীতত্ত্ব ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক অবশ্য-জ্ঞাতব্য কথা আছে। ছেলেদের সে সকল কথা জানা ভাল। এরূপ গ্রন্থের উদ্দেশ্য শুধু জ্ঞানশিক্ষা না হইয়া, বিজ্ঞানে যে সকল বিস্ময়ের

কথা আছে, যাহাতে শিশুর মন গল্পপাঠের মত উৎসাহী ও উৎফুল্ল হইতে পারে, সে সকল কথার (ইংরেজিতে যাহাকে Romance of Science বলে) অবতারণা থাকা ভাল। বোধোদয়ে সে প্রণালী আদৌ অনুসৃত হয় নাই। ফলে বোধোদয়ের বোধ নীরস, সরস নহে।*

এতদ্ব্যতীত বোধোদয়ের অসঙ্গতি-দোষের যাঁহারা আলোচনা করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মে বা ১২৯৩ সালের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত পঞ্চানন্দ দেখিবার জন্য অনুরোধ করি।

---

* বোধোদয় পাঠ্য-তালিকা হইতে উঠিয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসুর নূতন পাঠ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সংস্কৃত কলেজে শূদ্র ছাত্রগ্রহণের ব্যবস্থা, কলেজের বেতন-ব্যবস্থা, উপক্রমণিকা ব্যাকরণ, বীরসিংহে ডাকাইতি, আত্মরক্ষার কৈফিয়ৎ, ডাকাইতির কারণ, নীতি-বোধের রচনা, ঋজুপাঠ ও কৌমুদী ব্যাকরণ, শিক্ষা-প্রণালীর পরিবর্ত্তন, পাঠ্য-প্রনয়ণ সভা, বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যালয়, বেতন-বৃদ্ধি ও বিদ্যালয়ের ব্যয়।

ভালই হউক, আর মন্দই হউক, বলিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কাজ করিবেন বলিয়া মনে করিতেন, যে কোন প্রকারে হউক, তাহা না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া, তিনি মনে করিতেন, সংস্কৃত কলেজে শূদ্র জাতিরাও শিক্ষা পাইবে না কেন? তখন কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য-জাতিই শিক্ষা পাইতেন। যাহাতে কায়স্থ জাতিও সংস্কৃত-শিক্ষা লাভ করেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রিন্সিপাল-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তৎপক্ষে বদ্ধ-পরিকর হন। তিনি শিক্ষা-সভায় আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। কলেজের প্রধান প্রধান অধ্যাপগণ ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় আপন পক্ষসমর্থনার্থ, স্বকীয়

স্বভাবোচিত দৃঢ়তা সহকারে, নানা বচন-প্রমাণ-প্রয়োগে এবং ইংরেজ কর্তৃপক্ষের মনোরঞ্জক বহুবিধ যুক্তি-তর্কবলে, বিপক্ষ পক্ষের মত খণ্ডন করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছিলেন। * তাঁহাকে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তিনি কোন বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন,—"যদি এ কার্য্যে সিদ্ধিলাভ না করিতে পারি, তাহা হইলে এ ছার পদ পরিত্যাগ করিব।" তাঁহার সৌভাগ্য বলিতে হইবে, তাঁহারই প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত হয়। কর্তৃপক্ষের যাহা মনোগত, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাব তাঁহাদের মনোনীত না হইবে কেন? ইহার পর কায়স্থেতর বর্ণও সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য, কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্র পড়িবার অধিকার প্রাপ্ত হয়।

---

* সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্যতীত অন্য বর্ণের ছাত্র লওয়া যাইতে পারে কি না, শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ তৎসম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে রিপোর্ট লিখিতে বলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, ১৮৫১ খৃঃ অব্দের ২০ মার্চ্চ বা ১২৫৭ সালের ৮ই চৈত্র এক রিপোর্ট লিখেন। রিপোর্টে তিনি মত দেন,—"যখন বৈদ্য কলেজে পড়িতে পারে, তখন কায়স্থ পড়িবে না কেন? বৈদ্য শূদ্র জাতি। আর যখন শোভাবাজারের ৺ রাধাকান্ত দেবের জামাতা হিন্দু স্কুলের ছাত্র অমৃত লাল মিত্র সংস্কৃত কলেজে পড়িবার অধিকার পাইয়াছে, তখন অন্যান্য কায়স্থ পড়িতে পারিবে না কেন? কায়স্থ ক্ষত্রিয়, আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ বাহাদুর তাহার প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কায়স্থেরা অধুনা বাঙ্গলার সম্ভ্রান্ত জাতি। আপাততঃ কায়স্থদিগকে সংস্কৃত কলেজে লওয়া উচিত।" এই রিপোর্টে তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—

"The opinions of the principal professors of this college on this subject are averse to this innovation."

বর্ত্তমান অধ্যক্ষ মহাশয় অবাধে বেদ-পাঠের ব্যবস্থা করিয়া আরও বাহাদুরী লইবার চেষ্টা পাইতেছেন। অধঃপতন ক্রমেই ঘনীভূত হইতেছে কি না। অনধিকারী শূদ্রের বেদ-পাঠে প্রবৃত্তি, কলির চরম পরিণাম; শাস্ত্রের লেখা, ব্যর্থ হইবে কেন? যাহা হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় শূদ্রের সংস্কৃত শিখিবার ব্যবস্থা করিলেন বটে; কিন্তু বেদে অধিকার দিতে পারিলেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা শূদ্র—যে কোন বর্ণের ছাত্র কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিল, তাহার নিকট হইতে বেতন লইবার ব্যবস্থা হয়। সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা হইতে আর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রিন্সিপাল হইবার পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত বেতনের ব্যবস্থা আদৌ ছিল না। গবর্ণমেণ্ট বিনা বেতনে ছাত্রদিগকে পড়াইবার ব্যবস্থা করেন। সেই গবর্ণমেণ্টই শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শানুসারে বেতনের ব্যবস্থা করেন। সংস্কৃত কলেজের ইংরেজ-কর্ত্তৃপক্ষ যাহা করিতে পারেন নাই, বিদ্যাসাগর তাহাই করিলেন।

১৯০৮ সংবত, ১২৫৮ সালে ১লা অগ্রহায়ণ বা ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই নবেম্বর বিদ্যাসাগর মহাশয়, উপক্রমণিকা ব্যাকরণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। বঙ্গের বিদ্যার্থিমাত্রেরই নিকট উপক্রমণিকা পরিচিত। উপক্রমণিকার প্রণালী সংক্ষিপ্ত-সার ব্যাকরণের "কড়চা" হইতে অনুকৃত। অনুকরণ হইলেও কোন কোন বিষয়ে উদ্ভাবনী-শক্তি উপলব্ধ হয়। উপক্রমণিকা

পাঠে ব্যাকরণে অবশ্য তলস্পর্শিনী ব্যুৎপত্তি জন্মে না ; কিন্তু সাধারণের সংস্কৃত শিক্ষার এমন সহজ প্রবেশ-পথ আর দ্বিতীয় নাই।

১৮৫২ সালের ১১ই মে ১২৫৯ সাল ৩০শে বৈশাখ বা মঙ্গলবার বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে ডাকাইতি হইয়াছিল। ৩০।৪০ জন লোক তাঁহার বাড়ীতে পড়িয়া সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ীতে ছিলেন। ডাকাইতি পড়িলে, তিনি পরিবারবর্গসহ খিড়কীর দ্বার দিয়া পলায়ন করেন। এই ডাকাইতি-কালে বিদ্যাসাগর মহাশয় সপরিবারে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছিলেন। তখন পিতা ঠাকুরদাস জীবিত ছিলেন। বাড়ীতে ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গেল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তাহাতে কিছুমাত্র ভাবনা-চিন্তা ছিল না। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি বন্ধু-বান্ধব ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত পরমানন্দে কপাটী খেলিতে-ছিলেন। যে দারোগা তদন্তে আসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন। তিনি যখন শুনিলেন, এই নিশ্চিন্ত যুবা দেশের শাসনকর্ত্তৃপক্ষেরও সম্মানাস্পদ, তখন তাঁহার উন্নত মুণ্ড হেঁট হইয়াছিল। যাহা হউক, তদন্তে ডাকাইতির কোন কিনারা হয় নাই। গ্রীষ্মাবকাশের অবসানে বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এইখানে বলিয়া রাখি, বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই উদ্যোগে ও চেষ্টায় বাঙ্গালার স্কুলসমূহে গ্রীষ্মাবকাশ প্রবর্ত্তিত হয়।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়, তদানীন্তন ছোট লাট হেলিডে সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ছোট লাট বাহাদুর তাঁহার মুখে ডাকাইতির কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন,—"তুমি তো বড় কাপুরুষ; বাড়ীতে ডাকাইতি পড়িল, আর তুমি প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলে ?" এতদুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন,—"এখন আমার প্রতি কাপুরুষতার অভিযোগ আরোপ করিতে পারেন ; কিন্তু এই দুর্ব্বল বাঙ্গালী যুবক যদি একাকী সেই ৩০। ৪০ জন সবল ডাকাইতের সহিত যুদ্ধ করিত, তাহা হইলে নিশ্চিতই ইহাকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইত। তখন বিদ্যাসাগরের নির্ব্বুদ্ধিতারই কলঙ্ক জগতময় রাষ্ট্র হইত। আপনিই হয় তো সর্ব্বাগ্রেই তাহারই রটনা করিতেন। যখন প্রাণ লইয়া, আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিয়াছি, তখন লুণ্ঠিত সর্ব্বস্বের জন্য আর ভাবনা কি বলুন!"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে হঠাৎ ডাকাইতি হইল কেন, এ প্রশ্ন স্বতই উত্থিত হইতে পারে। বাস্তবিকই কি তিনি তখন তাদৃশ বিষয়-বিভবসম্পন্ন হইয়াছিলেন ? এ বিষয়ের সন্ধানে আমরা যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই এইখানে বিবৃত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাড়ীতে যাইলে, বীরসিংহ ও নিকটবর্ত্তী গ্রামের দীন-দরিদ্র অবস্থাহীন ব্যক্তিবর্গকে আপনার সাধ্যমত অর্থসাহায্য করিতেন। সন্ধ্যার পর তিনি চাদরের খুঁটে টাকা বাঁধিয়া, লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া,

গোপনে অর্থ-সাহায্য করিয়া আসিতেন। এইরূপ গোপনে অর্থ-সাহায্য করিবার কারণ এই যে, এই সকল লোক অবস্থা-হীন বটে; কিন্তু ভদ্র পরিবারভুক্ত; সুতরাং প্রকাশ্যে অর্থ-সাহায্যের প্রার্থনা করা নিশ্চিতই তাহাদের পক্ষে ঘোরতর লজ্জাকর।

এইরূপ অকাতরে অর্থ বিতরণ করিতেন বলিয়া, লোকের মনে ধারণা হইয়াছিল যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিবার বিলক্ষণ বিষয়-বিভব-সম্পন্ন। তাৎকালিক দস্যু ডাকাইত-সম্প্রদায়ের মনেও সেই ধারণা হইয়াছিল। কোন কালেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঞ্চয়-বাসনা ছিল না। তাঁহার পিতা-মাতাও পুত্রকেই সঞ্চিত সম্পত্তি মনে করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী, একবার হারিসন্ সাহেবকে স্পষ্টাক্ষরে এই কথাই বলিয়াছিলেন। *

* ১২৬১ সালে বা ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে হারিসন্ সাহেব ইনকম্ ট্যাক্সের তদন্তের জন্য কমিশনর নিযুক্ত হন। বিদ্যাসাগর তখন স্বাধীন। তিনি একদিন হারিসন্ সাহেবকে বীরসিংহের বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। হারিসন্ সাহেব বলেন,—"হিন্দুপ্রথানুসারে বাড়ীর কর্ত্তা বা কর্ত্রী নিমন্ত্রণ না করিলে, নিমন্ত্রণ লইব না।" সুতরাং নিমন্ত্রণ স্থগিত রহিল। সময়ান্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী, হারিসন্ সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। সাহেব, বীরসিংহ গ্রামে গিয়া, হিন্দু-প্রথামতে দণ্ডবৎ হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননীকে প্রণাম করেন। তিনি হিন্দু-প্রথানুসারে আসনপিড়ি হইয়া বসিয়া, আহারাদি সমাপনপূর্ব্বক বিদ্যা-সাগরের জননীকে জিজ্ঞাসা করেন,—"আপনার কত ধন?" জননী সহাস্য বদনে উত্তর করিলেন,—"চারি ঘড়া ধন।" সাহেব বলিলেন,—"এত ধন?"

প্রিন্সিপাল হইবার পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরেজি মরাল্-ক্লাস বুক্ "Moral class book" নামক গ্রন্থের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। উহার নাম নীতিবোধ হইয়াছিল।

সময়াভাব হেতু তিনি রাজকৃষ্ণ বাবুকে পুস্তকখানির স্বত্ব প্রদান করেন। রাজকৃষ্ণ বাবু নীতিবোধের বিজ্ঞাপনে ১৯০৮ সংবতে ৫ঠা শ্রাবণে বা ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ ১৮ই জুলাই তাহা স্বীকার করিয়াছেন,—

"পরিশেষে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনপূর্ব্বক অঙ্গীকার করিতেছি, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি সংশোধন করিয়াছেন বলিয়াই আমি সাহস করিয়া পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, তিনিই প্রথমে এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। পুত্রগণের প্রতি ব্যবহার, পরিবারের প্রতি ব্যবহার, প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন, প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব, বিনয় এই কয়েকটী প্রস্তাব তিনি রচনা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রস্তাবের উদাহরণ-স্বরূপ যে সকল বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের কথাও তাঁহার রচনা; কিন্তু তাঁহার অবকাশ না থাকাতে তিনি আমার প্রতি এই পুস্তক প্রস্তুত করিবার ভারার্পণ করেন; তদনুসারে আমি এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হই।"*

জননী তখন সহাস্য বদনে জ্যেষ্ঠপুত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অপর তিনটী পুত্রের প্রতি অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিয়া বলিলেন,—"এই আমার চারি ঘড়া ধন।" সাহেব বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন,—"ইনি দ্বিতীয় রোমক-রমণী কর্নিলিয়া।"

এই গল্পটী নারায়ণ বাবুর নিকট শ্রুত হইয়াছিলাম।

* ১২৬৫ সালের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ বা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই টেলিমেকসের

উপক্রমণিকার সমসাময়িক সংস্কৃত ঋজুপাঠের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। অধিক কি, একই দিনে (১৯০৮ সংবতে ১লা অগ্রহায়ণে) উভয় পুস্তকের বিজ্ঞাপন লিখিত হইয়াছিল। ইহা সংগ্রহ। সু-সংগ্রহ বটে। ১২৫৯ সালের ১২ চৈত্র বা ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ ঋজুপাঠের দ্বিতীয়ভাগ* প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্কৃতশিক্ষার পক্ষে উভয়ই উপযোগী। উভয়ই প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যপুরাণের সার-সঙ্কলনমাত্র; সুতরাং হিন্দু-পাঠার্থীরও পাঠোযোগী।

এই সকল পুস্তক-প্রণয়ের পর সংস্কৃত কলেজে শিক্ষাবিভাগের আদেশানুসারে পূর্ব্বলিখিত রিপোর্ট অনুযায়ী শিক্ষাপ্রণালীর আরম্ভ হয়।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তৃতীয়ভাগ ঋজুপাঠ মুদ্রিত হইয়াছিল। তৃতীয়ভাগ প্রবেশিকা-পরীক্ষার পাঠ্য ছিল। ইহাও সংগ্রহ-গ্রন্থ; পরন্তু সুসংগ্রহ। প্রাচীন ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিরচিত "পঞ্চতন্ত্র" প্রভৃতি হইতে ইহা সংগৃহীত।

ঐ খৃষ্টাব্দেই বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যাকরণ-কৌমুদীর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করেন। পর বৎসর তৃতীয় ভাগ কৌমুদী মুদ্রিত হয়। কৌমুদী তিন ভাগ উপক্রমণিকার উচ্চতম সোপান। সংস্কৃত মুগ্ধবোধ, পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণ পড়িলে

---

* বিজ্ঞাপনেও রাজকৃষ্ণ বাবু লিখিয়াছেন,—"এস্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসার পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই অনুবাদের আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।"

যে তলস্পর্শিনী শিক্ষা হয়, কয়খানি কৌমুদী পড়িলে, তাহা নিশ্চিতই হয় না।

ইহার পর রিপোর্টানুযায়ী শিক্ষার পূর্ণ প্রচলন হইয়াছিল। এতৎসম্বন্ধে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"পূর্ব্বে ইংরেজি ছাত্রদিগের ঐচ্ছিক পাঠ ছিল, এক্ষণে উচ্চ কয়েক শ্রেণীতে অবশ্যপাঠ্য হইল। সংস্কৃতেও, নিম্নশ্রেণীতে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ উঠিয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা, এবং ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ ব্যাকরণ কৌমুদী অধ্যাপিত হইতে লাগিল। পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, হিতোপদেশ, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি হইতে সঙ্কলনপূর্ব্বক যে তিন ভাগ ঋজুপাঠ প্রস্তুত হইল, তাহাও উহারই সঙ্গে সঙ্গে পঠিত হইতে লাগিল। এই সময়ে কয়েকজন বুদ্ধিমান্ বালক উপক্রমণিকা হইতে সংস্কৃত আরম্ভ করিয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক উচ্চ উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে লাগিল দেখিয়া, ঐ সকল ভাষা-ব্যাকরণ পাঠের পর, সংস্কৃত সিদ্ধান্ত কৌমুদীর পাঠনা হইবে, পূর্ব্বে যে এই প্রস্তাব হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে বিদ্যাসাগর আর বড় মনোযোগ করিলেন না।"

এ অবস্থায় সাধারণের সংস্কৃত শিক্ষা সুবিধা হইল; কলেজও টিকিয়া গেল; কিন্তু কলেজের প্রতিষ্ঠা-উদ্দেশ্য বহুদূর সরিয়া দাঁড়াইল। সংস্কৃতে আর পূর্ব্ববৎ তলস্পর্শিনী শিক্ষা হইত না। এই ব্যবস্থা হইবার পূর্ব্বে কলেজে যাঁহারা শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ন্যায় প্রগাঢ় বিদ্যাশালী এ ব্যবস্থার পর আর কি কেহ হইতেন? না এখনই হইতেছেন?

বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং বাঙ্গালা পাঠ্য রচনা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। যে সকল সভা, পাঠ্য প্রণয়নে ব্রতী ছিল,

তাহাদের কোন কোনটীতেও তিনি যোগ দিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। এই সময় স্কুলবুক-সোসাইটী এবং বর্ণেকিউলার-লিটারেচার-সোসাইটী দ্বারা অনেক পুস্তক প্রচারিত হইত। এই সভাতেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্ত্তৃত্ব ছিল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এই সভা নিয়ম নির্দ্ধারণ করেন যে, মুদ্রাঙ্কণোদ্দেশে কেহ কোন গ্রন্থ রচনা করিলে, তাহার আদর্শ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও পাদরি রবিন্‌সন্ সাহেব দেখিবেন। তাঁহারা মনোনীত করিলে সেই আদর্শ লঙ্ সাহেবের নিকট অর্পিত হইবে। পাদরি লঙ্ তাঁহার গ্রাম্য পাঠশালায় তাহা পাঠ করিয়া নিরূপণ করিবেন, ঐ রচনা গ্রাম্য বালকদিগের বোধগম্য হয় কি না।

কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয় নহেন, তদানীন্তন নিম্নলিখিত খ্যাতনামা ব্যক্তিগণও উক্ত সভার সহিত সম্প্ক্ত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত ওয়াইলি, শ্রীযুক্ত সিটনকার, শ্রীযুক্ত বেলি, শ্রীযুক্ত কালবিন্, শ্রীযুক্ত প্রাট্, শ্রীযুক্ত পাদরি লঙ, শ্রীযুক্ত উডরো, শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব, শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রসময় দত্ত। *

১২৬০ সালে বা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় বীরসিংহ গ্রামে একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এ বিদ্যালয়ে রাত্রিকালে কৃষকপুত্রেরা লেখা-পড়া শিক্ষা করিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়, নিজের অর্থে বিদ্যালয়ের জমী

---

* নব্যভারত—১৩০০ সাল, মাঘ ও ফাল্গুন মাস, ৫৪৬ পৃষ্ঠা।

ক্রয় করেন। বিদ্যালয়ের বাটী-নির্ম্মাণও তাঁহারই অর্থে হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং কোদাল ধরিয়া গৃহনির্ম্মাণের জন্য প্রথমেই মৃত্তিকা খনন করিয়াছিলেন। এই সময়ে একটী বালিকা-বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই বিদ্যালয়ের ব্যয়-ভার তিনি সকলই স্বয়ং বহন করিতেন। এ ব্যয়-ভার-বহনের একটা সুবিধাও উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি সংস্কৃত কলেজে যে শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ অনুমোদিত হইয়াছিল। তাঁহার সংস্কার-ফলে কলেজে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সংখ্যায় ছাত্র হইয়াছিল। ইহাকে শিক্ষাপ্রণালীর সুফল ভাবিয়া কর্তৃপক্ষেরা আপন ইচ্ছায় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি বা ১২৬০ সালের পৌষ মাসে তাঁহার ১৫০ দেড় শত টাকা হইতে ৩০০ তিন শত টাকা বেতন করিয়া দেন।

প্রতি মাসে বীরসিংহের বিদ্যালয়ে শিক্ষকাদির বেতনে ৩০০৲ তিন শত টাকা ও শ্লেট পুস্তক প্রভৃতিতে ১০০৲ একশত টাকা মাসিক ব্যয় হইত। বালিকা-বিদ্যালয় ও নৈশ-বিদ্যালয়ের ব্যয় মাসে ৪০৲—৪৫৲ চল্লিশ হইতে পঁয়তাল্লিশ টাকার কমে হইত না। এই সময় গ্রামের দীন-দরিদ্রের চিকিৎসার্থ দাতব্য ঔষধালয় স্থাপিত হয়। সকলেই বিনা মূল্যে ঔষধ পাইত। বিনা দর্শনীতে ডাক্তার, চিকিৎসা করিতেন। একান্ত অবস্থাহীন দীন-দরিদ্র লোককে সাগু, বাতাসা প্রভৃতি দিবার ব্যবস্থা ছিল। তাহাতেও মাসিক

১০০৲ একশত টাকা খরচ পড়িত। বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজে ৩০০৲ তিনশত টাকামাত্র বেতন পাইতেন; কিন্তু পুস্তকাদি-বিক্রয়ে তাঁহার ৪০০। ৫০০ চারি পাঁচ শত টাকা আয় হইত। তবে সঞ্চিত কিছুই থাকিত না। এইরূপে দান-কার্য্যেই আয়ের পর্য্যবসান হইত। স্বভাব-দাতা কি সঞ্চয়ের প্রত্যাশা রাখেন? বৃহত্তর হৃদয়ে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি প্রায়ই স্থান পায় না।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

স্কুল ইন্‌সপেক্টরী পদ প্রাপ্তি, নর্ম্মাল স্কুল, সফরে সহৃদয়তা, মাতৃনামে উচ্ছ্বাস, জননীর দয়া, অনুগত-পালন, বন্ধুর আদর, সংগ্রহে আগ্রহ, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব, দান-পদ্ধতি, সংস্কৃত কলেজে ইংরেজির প্রসার ও শকুন্তলা।

১২৬২ সালে বা ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে যখন গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে মফস্বলে বাঙ্গালা ও ইংরেজি বিদ্যালয় সংস্থাপিত করা রাজ-পুরুষদের অভিপ্রেত হয়, তখন হালিডে সাহেব, বিদ্যাসাগরকে তাঁহার মতে যে প্রণালীতে বাঙ্গালা শিক্ষা হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে এক রিপোর্ট দিতে বলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় রিপোর্ট লেখেন। কর্তৃপক্ষেরা তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে আসিষ্টাণ্ট-স্কুল-ইন্‌স্পেক্টরী পদ দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্রিন্সিপালের পদ ছাড়া ইন্‌স্পেক্টরের পদও প্রাপ্ত হইলেন। এ পদের বেতন ২০০৲ দুই শত টাকা। মোট বেতন হইল ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা। হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া ও মেদিনীপুর জেলায় স্কুল স্থাপন ও পরিদর্শন করাই ইনস্পেক্টরের কার্য্য হইল।

উক্ত অব্দেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় নর্ম্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। নর্ম্ম্যাল স্কুলে পড়িয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, অন্যান্য স্কুলে শিক্ষকতা করিবার অধিকার জন্মিত।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে প্রথমে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং পরে পণ্ডিত রামকমল ভট্টাচার্য্য নর্ম্মাল স্কুলের হেড মাষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

নর্ম্মাল স্কুলের কাজ প্রথমে প্রাতঃকালে সংস্কৃত কলেজের প্রশস্ত ভবনেই সম্পন্ন হইত।

বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্ষয়কুমার বাবুর ভাষা সংশোধন করিয়াই নিরস্ত হন নাই। তিনিই নর্ম্মাল-স্কুলের হেড্ মাষ্টারের পদ, অক্ষয়কুমার বাবুকে প্রদান করেন। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন—

"যে অপরিহার্য্য কারণে এবারে অক্ষয় বাবুকে কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্যে ব্রতী হইতে হয়, এ স্থলে তাহার নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। শ্রীনাথ বাবু ও অমৃতলাল বাবুর অভিমতানুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্ষয় বাবুকে ঐ কর্ম্ম দিবার জন্য শিক্ষা-বিভাগের তদানীন্তন ডিরেক্টার ইয়ঙ্ সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া ফেলেন। পরে অমৃতলাল বাবু ইহাঁকে ঐ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে ইনি বলিলেন, 'আমি এই কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তত্ত্ববোধিনীর কার্য্য পরিত্যাগ করিলে, পত্রিকাখানি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব আমি এ কার্য্য গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। আপনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এ কথা বলিবেন।' পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্ষয় বাবুর ঐ কার্য্য-গ্রহণের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিলেন, তাহাতে অক্ষয় বাবু বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, 'কেন? অমৃত-লাল বাবু কি আপনাকে কোন কথা বলেন নাই? আমি ও-কার্য্য গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। ও কার্য্য গ্রহণ করিলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাখানি

একবারে নষ্ট হইয়া যাইবে।' তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বিমর্ষভাবে বলিলেন, 'এ বিষয়ের যে সমস্ত প্রায় নিরূপিত হইয়া গিয়াছে। এরূপ হইলে আমাকে সাহেবের নিকট অপ্রতিভ হইতে হয়। আমি যে লোকের জন্য অনুরোধ করিয়াছি, বাস্তবিক সে ব্যক্তি সেই কর্ম্মের প্রার্থী নহেন, সাহেব এ কথা শুনিলে আমাকে অপদস্থ হইতে হইবে। যিনি কর্ম্ম করিবেন, তাঁহার মত না লইয়া এরূপ করা আমার ভাল হয় নাই, এখন বুঝিতেছি।' অক্ষয় বাবু পরে বলিলেন,—'এখনও যদি ঐ বন্দোবস্ত পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা থাকে, তদ্বিষয়ে যত্নের কোনরূপ ত্রুটি করা না হয়।' বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাতে অগত্যা সম্মত হইলেন। কিন্তু শেষে জানা গেল, পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রস্তাব করিবামাত্র ঐ কার্য্য অক্ষয় বাবুকে দিবারই ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং ইঁহাকে ঐ পদ গ্রহণ করিতে হইল।" অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত। ৫২ ও ৫৩ পৃষ্ঠা।

তাঁহার [illegible] ইনস্পেক্টর হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়, হুগলী, বর্দ্ধমান এবং নদীয়া জেলার অনেক গ্রামে বাঙ্গালা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং অনেক স্থানের সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন লোকদিগকে স্কুল-প্রতিষ্ঠায় পরামর্শ দেন।* তাঁহাকে তখন প্রায়ই মফস্বল-পরিদর্শনে যাইতে হইত। পরিভ্রমণ কালে পথে কোন পীড়িত চলৎশক্তিহীন লোককে পড়িয়া থাকিতে দেখিলে, তিনি

* এই সময় উত্তরপাড়ার জমীদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহারা ঘনিষ্ঠতা হয়। মুখোপাধ্যায় মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে স্কুল-প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও অনেক স্কুলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ও স্বগ্রামে (খানাকুল-কৃষ্ণনগরান্তঃপাতী রাধানগরে) বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।



জমীদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

আপনি পাল্কী হইতে অবতরণ করিয়া, সেই আতুর লোককে পাল্কীর ভিতর তুলিয়া দিতেন এবং স্বয়ং পদব্রজে চলিয়া যাইতেন; পরে কোন চটি পাইলে, পীড়িত ব্যক্তিকে সেই চটিতে রাখিয়া, চটির কর্ত্তাকে টাকা-কড়ি দিতেন। পরিভ্রমণ কালে তিনি সঙ্গে টাক, আধুলি, সিকি প্রভৃতি রাখিয়া দিতেন; দরিদ্র লোককে অবস্থানুসারে তাহা দান করিতেন। দয়ার সীমা নাই! অভাব জানাইয়া কেহ কখন বিমুখ হইত না। কত অভিভাবকহীন বালককে যে তিনি পুস্তক, বস্ত্র, বেতন প্রভৃতি দান করিয়াছিলেন, তাহার কি গণনা হয়? কোথাও গিয়া যদি শুনিতেন, অন্নাভাবে বা অর্থাভাবে কাহারও লেখাপড়া হইতেছে না, তিনি তখনই তাহাকে আপনার বাসায় আনাইয়া অথবা অন্য কোন রকম বন্দোবস্ত করিয়া, তাহার লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। শুনিয়াছি, একবার পরিদর্শন কালে ২৪ চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত নিবাধই-দত্তপুকুরনিবাসী কালীকৃষ্ণ দত্তের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। সেই সময় একটী দীন-হীন অনাথ ব্রাহ্মণ-সন্তান, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, কাতর-কণ্ঠে ক্রন্দন করিতে করিতে আপনার অভাব ও দুঃখের কথা নিবেদন করে। তাহার অবস্থার কথা শুনিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়, বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তিনি পরে সেই ব্রাহ্মণ সন্তানকে আপনার বাসায় আনাইয়া, তাহার লেখা পড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। এইরূপ কত জনের অন্নসংস্থান ও অভাব মোচন

হইয়াছে, তাহা কত বলিব? কলিকাতার বাসায় এবং বীরসিংহগ্রামের বাড়ীতে প্রত্যহ শতাবধি লোক অন্ন পাইত। অনেকেরই লেখা-পড়া শিখাইবার ব্যয়-ভার তিনিই বহন করিতেন। তাই বলি, তাঁহার দয়ার তুলনা হয় না।

কেহ বিদ্যাসাগরের নিকট ভিক্ষা করিতে যাইয়া, প্রায় রিক্ত-হস্তে ফিরিত না। কেহ যদি ভিক্ষা করিতে গিয়া বলিত,—"আমার মা নাই", তাহা হইলে, বিদ্যাসাগরের চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইত। মাতৃপরায়ণ বিদ্যাসাগর, তখন শতকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, সেই মাতৃহীন ভিক্ষুককে যাচ্ঞাতীত সাহায্য করিতেন। "মা নাই" শুনিলে বিদ্যাসাগর বিচারাচার করিতেন না। এ কথা অনেকেই জানিতেন। তাঁহার একজন প্রতিবেশী মুদী একবার একটী ভিক্ষুককে শিখাইয়া দিয়াছিল,—"বলিস্ আমার মা নাই।" বস্তুতঃ তাহার মা ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন কারণে জানিতে পারেন, ভিক্ষুকের কথা মিথ্যা। সে যে মুদী দ্বারা শিক্ষিত হইয়াছিল, তাহাও তিনি জানিতে পারেন। ভিক্ষুককে তিনি বঞ্চিত করেন নাই; পরন্তু পুনরায় এরূপ মিথ্যা বলিতে নিষেধ করিয়া দেন। প্রকৃতই অনেকেই মা নাই বলিয়া, তাঁহার নিকট ফাঁকি দিয়া, অর্থ লইত।

"মা" নামে বিদ্যাসাগর মন্ত্রমুগ্ধ হইতেন। "মা"ই যে তাঁহার জীবনের সাধ্য মন্ত্র ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গান-বাজনায় বড় সখ ছিল না। তবে কেহ কখন "মা" "মা" বলিয়া গান গাহিলে, তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। গায়ককে তিনি

যেন বুকের কলিজার ভিতর পূরিয়া রাখিতেন। একজন অন্ধ মুসলমান ভিক্ষুক, বেহালা বাজাইয়া শ্যামা-সঙ্গীত গাহিত। সে সঙ্গীতে 'মা' 'মা' থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাহাকে ডাকাইয়া, প্রায়ই তাহার গান শুনিতেন। গান শুনিতে শুনিতে তিনি অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিতেন না। এই মুসলমান ভিক্ষুক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সময় সময় যথেষ্ট সাহায্য পাইত। একবার ইহার ঘর পুড়িয়া গিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, গৃহনির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয় দিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বৈবাহিক (কনিষ্ঠ কন্যার শ্বশুর ৺জগদুল্লভ চট্টোপাধ্যায়) ভাল গাহিতে পারিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহাকে প্রায়ই বাড়ীতে আহ্বান করিয়া তাঁহার গান শুনিতেন; অন্য গান শুনিতেন না; কেবল যে গানে "মা" "মা" থাকিত, সেই গানই শুনিতেন। গানে সখ্ ছিল না; কিন্তু মাতৃ-নামপূর্ণ গানে প্রাণ মাতিয়া উঠিত। মাতৃ-ভক্তের এমনই প্রাণ বটে!

বিদ্যাসাগর যেমন পুত্র, তাঁহার পিতা মাতাও তদ্রূপ। অন্নদানে পিতার অপার আনন্দ। প্রতিপাল্য অন্নার্থীদিগের জন্য তিনি প্রত্যহ স্বয়ং বাজার-হাট করিয়া আনিতেন। আর অন্নপূর্ণারূপিণী বিদ্যাসাগর-জননী, অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া, পরিবেশন করিতেন। এ সম্বন্ধে, অনেক কথাই শোনা যায়। নারায়ণ বাবু বলিয়াছেন,—"ঠাকুর মা গ্রামের অবস্থাহীন চাষাভুষো লোককে টাকা কড়ি ধার দিতেন। যাহারা

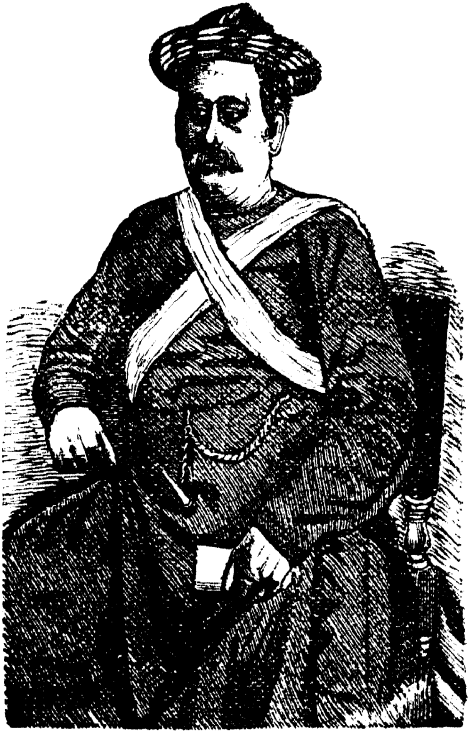
সহজে ধার শুধিতে পারিত না, তিনি স্বয়ং তাহাদের বাড়ীতে টাকা আদায় করিতে যাইতেন; কখন কখন খুব চটিয়া গিয়া টাকা চাহিতেন; বলিতেন,—'তোরা যদি টাকা না দিবি, তবে আমি আর কি করে টাকা ধার দিব?' তাঁহাকে রাগিতে দেখিয়া, কেহ কেহ তাঁহাকে নানা কথায় তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত; কেহ বা দু-ফোটা চক্ষের জল ফেলিয়া দুঃখের কথা জানাইত; আর কেহ বা বিদ্যাসাগরের নাম করিয়া, ভগবানের কাছে, তাঁহার মঙ্গল কামনা করিত। তখন ঠাকুর-মার রাগ থাকিত না। আগুন জল হইয়া যাইত। তিনি তখন বলিতেন,—'ভাল ভাল, যখন সুবিধা হ'বে, তখন দিস্। আজ কিন্তু আমার বাড়ীতে চারিটী প্রসাদ পাস্।' কৃষক-কন্যারা তাঁহাকে আদর করিয়া মুড়ি, নারিকেল, বাতাসা, প্রভৃতি জলখাবার দিলে, তিনি তাহা আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া আসিতেন। ঠাকুর-মা প্রত্যহ মধ্যাহ্নে রন্ধনাদি সমাপন করিয়া এবং আশ্রিত অতিথিদিগকে আহারাদি করাইয়া, বাড়ীর দরজার নিকট দাঁড়াইয়া থাকিতেন। হেটোরা হাট হইতে ফিরিবার সময় দরজার সম্মুখ দিয়া যাইলে, তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া খাওয়াইতেন। কাহারও মুখখানি শুকনো দেখিলে তিনি বলিতেন—'আহা! আজ বুঝি তোর খাওয়া হয় নি? আয়, আয়, আমার বাড়ীতে খাবি আয়।' ঠাকুর মা বড় বড় মাছ ভালবাসিতেন। মাছ কুটিয়া রাঁধিয়া খাওয়াই-বেন, এই তাঁর সাধ। এই জন্য ঠাকুর-মা কখন কখন ঠাকুর-

দাদার উপর রাগ করিলে, ঠাকুরদাদা বড় বড় মাছ আনিয়া তাঁর মান-ভঞ্জন করিতেন। কোন দিন যদি ঠাকুর-মা রাগ করিয়া ঘরের দরজা দিয়া শুইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে ঠাকুরদাদা যেখান হইতেই হউক, একটা বড় মাছ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ঘরের দরজায় মাছটাকে আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিতেন। ঠাকুর-মা ঘরের ভিতর হইতে মাছ আছড়ানির সাড়া পাইয়া তখনই খিল খুলিয়া বাহিরে আসিতেন এবং হাসিতে হাসিতে আপনি মাছ কুটিতে বসিতেন।”

যাহাকে যেরূপ সাহায্য করিলে উপকার হইত, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার জন্য তাহাই করিতেন। বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় অনেক পাঠকেরই পরিচিত। ইনি হিন্দু-স্কুল হইতে ৪০৲ চল্লিশ টাকার বৃত্তি পাইয়া, কলেজের শিক্ষক হইয়াছিলেন। সে কার্য্যে সুবিধা না হওয়ায়, তিনি কর্ত্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে পদত্যাগ করেন। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে আপনার বাসায় আনেন এবং পরে কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়া, হিন্দুস্কুলে তাঁহার একটী চাকুরী করিয়া দেন। এই প্রসন্নবাবু পরে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল এবং অবশেষে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা সংঘটিত হইয়াছিল। প্রসন্নকুমার বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বীরসিংহ গ্রামে গিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় অধিক বয়সেও প্রসন্ন বাবুর নিকট হইতে ইংরেজী শিখিতেন।

কি আত্মীয়-পরিজন, কি ভ্রাতা-ভগিনী, কি বন্ধু-বান্ধব, সকলের প্রতিই বিদ্যাসাগর মহাশয় সমান প্রীতিমান্ ছিলেন। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চেয়ারম্যান শ্যামাচরণ বিশ্বাস, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। ইহাঁর বাড়ী সংস্কৃত কলেজের সম্মুখেই ছিল। ইহাঁর পৈতৃক বাসস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত পাঁইতেল গ্রাম। উহা কলিকাতা হইতে ৮। ৯ আট নয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্যামাচরণ বাবুর অনুরোধে একবার জগদ্ধাত্রী পূজার সময় পাঁইতেল গ্রামে গিয়াছিলেন। লেখকের পিতৃ-মাতুলালয় এই পাঁইতেল গ্রামে। পূজনীয় পিতার মুখেই শুনিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় পাঁইতেলে গিয়া তত্রত্য অনেক দীন-দরিদ্রকে দান করিয়াছিলেন। পাঁইতেল ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিবার জন্য দলে দলে বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। পাঁইতেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি জ্বররোগে আক্রান্ত হন। জ্বরের সঙ্গে নানা রোগেরও সঞ্চার হয়। শোনা যায়, এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়, নস্য ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু কয়েক বৎসর পরে তিনি নস্য ছাড়িয়া দেন। তিনি ৩০। ৩২ ত্রিশ বত্রিশ বৎসর বয়সে তামাক ধরিয়াছিলেন। সে বৃত্তান্ত এই,—

নারায়ণ বাবু বলেন;—"বারাসত-নিবাসী ডাক্তার নবীনচন্দ্র মিত্রের সহিত বাবার অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ ছিল। ইহাঁর সহোদর কালীকৃষ্ণ বাবুও বাবার বন্ধু ছিলেন। নবীন বাবু কলিকাতায়



শ্যামাচরণ বিশ্বাস ।

ঝামাপুকুরে থাকিতেন। বাবা প্রায়ই তাঁহার বাসায় যাই-তেন। নবীন বাবু বড় তামাকপ্রিয় ছিলেন। একদিন তিনি বাবাকে তামাক খাইবার জন্য অনুরোধ করেন। বাবা কিছুতেই তামাক খাইতে সম্মত হন নাই; কিন্তু নবীন বাবু তাঁহাকে একবার তামাক না টানাইয়া ছাড়িলেন না। পরদিন নবীন বাবুকে আর তামাক খাইবার কথা বলিতে হয় নাই। বাবা স্বয়ংই হুকুম করিয়া তামাক আনাইলেন। বন্ধু নবীন বাবু কিন্তু সে তামাকের কলিকা পাইলেন না। এই সময় হইতে বাবা তামাকে অভ্যস্ত হন। তিনি তামাক ও পান বড় ভাল-বাসিতেন। বাবা তামাক খাইতেন বটে; কিন্তু ইহার জন্য চাকর-চাকরাণীকে কখন বিরক্ত করিতেন না। চাকরগুলো ঘুমাইয়া পড়িলে বা ক্লান্ত হইলে, তিনি কাহাকেও না ডাকিয়া, স্বয়ং তামাক সাজিয়া খাইতেন। কেবল তামাক কেন, তিনি পানও স্বহস্তে সাজিয়া খাইতেন। পানের সুপারি কাটা থাকিত; খয়ের চুণ প্রভৃতি অন্যান্য মসলা থাকিত; তিনি পান চিরিয়া সাজিয়া খাইতেন। উদ্বৃত্ত সুপারির কুঁচিগুলি শিশির ভিতর পূরিয়া রাখিতেন। এখনও সুপারির কুঁচি-ভরা অনেক শিশি আছে। কেবল সুপারির কুঁচি কেন, টুকরো দড়ি, টুকরো কাগজ, কোন জিনিসই তিনি ফেলিতেন না। তিনি প্রায়ই বলিতেন,—"যাকে রাখ, সেই থাকে।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে বীটন্ সাহেবের স্মরণার্থ "বীটন্-সোসাইটী" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভায় তল্লিখিত সংস্কৃত

ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্র বিষয়ক প্রবন্ধ পঠিত হয়। * এই প্রবন্ধ ১৯১৩ সংবতের ১৪ই চৈত্রে বা ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ১৮ই এপ্রিলে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল ;—সংস্কৃত ভাষা,—সাহিত্যশাস্ত্র,—(মহা-কাব্য)—রঘুবংশ, কুমার সম্ভব, কিরাতার্জ্জুনীয়, শিশুপালবধ, নৈষধ-চরিত, ভট্টিকাব্য, রাঘবপাণ্ডবীয়, গীত-গোবিন্দ ; (খণ্ড-কাব্য)—মেঘদূত, ঋতুসংহার, নলোদয়, সূর্য্যশতক ; (কোষ-কাব্য)—অমরুশতক, শান্তিশতক, নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক, বৈরাগ্যশতক, আর্য্যাসপ্তশতী ; (চম্পূকাব্য)—কাদম্বরী, দশ-কুমার-চরিত, বাসবদত্তা ; (দৃশ্যকাব্য)—অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, বীরচরিত, উত্তর-চরিত, মালতী-মাধব, রত্নাবলী, নাগানন্দ, মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস, বেণীসংহার ; (নীতি-গ্রন্থ)—পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ এবং কথাসরিৎসাগর।

১২ পেজি ডিমাই আকারে ৮৯ পৃষ্ঠায় পুস্তক খানি সম্পূর্ণ। বিষয়-বিবেচনায় আলোচনা যে অতি সংক্ষিপ্তসার হইয়াছে, এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

"এই প্রস্তাব, প্রথমতঃ, কলিকাতাস্থ বীটন সোসাইটি নামক সমাজে পঠিত হইয়াছিল। অনেকে, এই প্রস্তাব মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ অনুরোধ করাতে, আমি, তৎকালীন সভাপতি মহামতি শ্রীযুক্ত ডাক্তার

* শুনা যায়, ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এই প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করিয়াছিলেন।

মোয়েট মহোদয়ের অনুমতি লইয়া, দুই শত পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করি।

"যে প্রস্তাব যে সমাজে পঠিত হয়, সে প্রস্তাব সে সমাজের স্বত্বাস্পদীভূত হইয়া থাকে; এজন্য, আমি উক্ত ডাক্তার মহোদয়ের নিকট প্রস্তাবের অধিকার ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি, অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্ব্বক, আমাকে বিনা মূল্যে সেই অধিকার প্রদান করেন। তদনুসারে, আমি এই প্রস্তাব পুনরায় মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।

"আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, এরূপ গুরুতর প্রস্তাব যেরূপ সঙ্কলিত হওয়া উচিত ও আবশ্যক, কোনও রূপেই সেরূপ হয় নাই। বস্তুতঃ এই প্রস্তাবে বহুবিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রের অন্তর্গত কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নামোল্লেখ মাত্র হইয়াছে। বীটন সোসাইটিতে, এক ঘণ্টা মাত্র সময়, প্রস্তাব পাঠের নিমিত্ত, নিরূপিত আছে; সেই সময়ের মধ্যে যাহাতে পাঠ সম্পন্ন হয়, সে বিষয়েই অধিক দৃষ্টি রাখিয়া, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সম্বন্ধে সবিস্তর আলোচনা করিয়া পুস্তক প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু অনবকাশ-হেতু সঙ্কল্প, কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই, ইহা বঙ্গের দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকেও ভাষা-প্রাঞ্জলতার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া অবধি, বিদ্যাসাগর মহাশয়, অনেক দুঃস্থ ও নিঃস্ব ব্যক্তির মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, বিদ্যাসাগর ও তৎপিতার আশ্রয়দাতা জগদ্দুর্ল্ভ সিংহের মৃত্যুর

পর, সিংহপরিবারের শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তৎপুত্র ভুবনমোহন সিংহের ৩০৲ টাকা মাসহারার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ভুবন বাবুর মৃত্যুর পর, তাঁহার পত্নী সেই বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ভুবন সিংহের জামাতার প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যথেষ্ট অনুগ্রহ ছিল। জামাতা প্রায়ই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আসিয়া সাহায্য গ্রহণ করিতেন। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্যামাচরণ ঘোষাল নামক এক আত্মীয়ের ১০৲ দশ টাকা মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া দেন। মাসহারা বন্দোবস্ত অনেকেরই ছিল। মাসহারা ব্যতীত অনেকে অন্য প্রকারে সাহায্য পাইত। সকল জানিবার উপায় নাই। কেননা পাছে লজ্জা পায় বলিয়া, অনেককেই তিনি গোপনে গোপনে সাহায্য করিতেন। নারায়ণ বাবু বলেন,—"বাবা অনেককেই সাহায্য করিতেন বটে; দেখিতাম, অনেকেই তাঁহার নিকট সাহায্য লইতে আসিতেন; কিন্তু তাঁহাদের অনেকেরই নামধাম জানিতাম না; এমন কি, অনেক দানের কথা খাতায় খরচ পর্য্যন্ত লেখা হইত না। তবে যাঁহাদের মাসিক-বন্দোবস্ত ছিল, তাঁহাদের নাম পাওয়া যায়।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজে প্রিন্সিপাল-পদে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন কলেজে ইংরেজি পড়িবার ব্যবস্থা ছিল বটে; কিন্তু তাহার তাদৃশ প্রাদুর্ভাব ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্ন ও চেষ্টায় তাহারই প্রাদুর্ভাব হয়। নিয়ম হইল,

সংস্কৃত পরীক্ষার যেরূপ নম্বর রাখিতে হয়, ইংরেজিতে সেরূপ নম্বর রাখিতে হইবে। কাজেই তখন ছাত্রগণ ইংরেজি-শিক্ষায় পূর্ব্বাপেক্ষা মনোনিবেশ করিলেন। সেই সময় হইতেই রীতিমত ইংরেজি শিক্ষা হইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় উন্নত প্রণালীতে ইংরেজি শিক্ষা চালাইবার উদ্দেশ্যে, ভাল ভাল ইংরেজি শিক্ষিত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীনাথ দাস, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ইংরেজি-বিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তিগণ তাঁহার সময় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে সংস্কৃত শিক্ষা স্রোত অনেকটা তেজোহীন হয়। সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাকালে আপত্তি তুলিয়া, যিনি ইহাকে ইংরেজি-স্কুলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় তাঁহার প্রেতাত্মার অর্দ্ধাধিক তৃপ্তি হইয়াছিল; অধুনা প্রায় পূর্ণ।*

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব সচিব শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, নীলাম্বর ভবিষ্যতে বড়লোক হইবে। †

---

* সংস্কৃত কলেজের পরিণাম স্মরণে দুঃখ করিয়া একদিন ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কলঙ্কার বলিয়াছিলেন,—"হায়! সংস্কৃত বিদ্যালয়ের সেই সুখের সময় এবং বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন স্মরণ করিলে প্রাণ কেমন করিয়া উঠে! কি. শোচনীয় পরিণাম।" শ্রীযুক্ত রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ৺প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের জীবন-চরিত। ৭৮ পৃষ্ঠা।

† নীলাম্বর বাবু উচ্চপদ পাইয়াও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ভুলিয়া যান

পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজে লীলাবতী ও বীজগণিত পড়ান হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাহার স্থানে ইংরেজিতে অঙ্ক শিখাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তাৎকালিক বীজগণিতের অধ্যাপক পণ্ডিত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে সিবিল আইন শিক্ষা করেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই চেষ্টায় ও যত্নে ভট্টাচার্য্য মহাশয় মুন্সেফ পদ পাইয়াছিলেন।

১৮ ৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর বা ১২৪৭ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাঙ্গালা "শকুন্তলা" মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইহা সংস্কৃত "অভিজ্ঞান-শকুন্তলে"র অনুবাদ। এ অনুবাদ অবশ্য নাটকাকারে নহে। অনেক স্থলে অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ; অনেক স্থলে ভাবানুবাদ। বলা বাহুল্য, শকুন্তলার এমন অনুবাদ পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ নহেন, তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "শকুন্তলা" পড়িয়া "অভিজ্ঞান-শকুন্তলে"র মাহাত্ম্য অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

এই শকুন্তলার দোষগুণ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা সংক্ষেপে এইখানে বলিব,—অভিজ্ঞান শকুন্তলের বহু কবিত্বসৌন্দর্য্য পরিত্যক্ত হইলেও, গল্পাংশের সঙ্গতি-সৌন্দর্য্য অব্যাহত আছে।

নাই। তিনি সেখান হইতে প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্রাদি লিখিয়া নানা বিষয়ের পরামর্শ লইতেন। পদত্যাগের সময় নীলাম্বর বাবু পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শ লইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি অনেক স্থলে অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ ; অনেক স্থলে ভাবানুবাদ। ভাবানুবাদের দুই চারিটীর উল্লেখ করিলাম,—সর্ব্ব প্রথমেই নান্দী, প্রস্তাবনা ও পাত্র প্রবেশ পরিত্যাগ করিয়া, তাহার স্থানে "অতি পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে দুষ্যন্ত নামে সম্রাট ইত্যাদি আছে।" ১২ পৃঃ ৭ পংক্তি হইতে ৮।৯ পংক্তি। ১৭ পৃঃ শকুন্তলার নামকরণটী মহাভারত হইতে গৃহীত। না হইলে মিষ্ট হয় না। ১৯ পৃঃ ১১ পংক্তি। ২য় পরিচ্ছদে ২২ পৃঃ প্রথমাবধি ৮ পংক্তি পর্য্যন্ত। ৩য় পরিচ্ছেদে প্রথমাবধি ১০ পংক্তি। স্থূলতর এই গুলি দেখাইলাম। নাটকের গৌরব রক্ষার্থ যাহা লেখা হয়, তাহা নাটকেই ভাল লাগে। এমন বিষয় অনেক পরিত্যক্ত হইয়াছে। দুই একটী দেখাই,—"যদালোকে সূক্ষ্মং—" ইত্যাদির অনুবাদ। ষষ্ঠ অঙ্কে মিশ্রকেশীর অবতারণা ইত্যাদি।" অনুবাদের কৃতিত্ব বুঝাইবার জন্য দুই একটী দৃষ্টান্ত দিলাম,—

"নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ
প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্তএবোপলাঃ।
বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগা-
স্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিস্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ॥"

অভিজ্ঞান-শকুন্তলং প্রথমোঙ্কঃ।

অনুবাদ,—"কোটরস্থিত শুকের মুখভ্রষ্ট নীবার সকল তরুতলে পড়িয়া রহিয়াছে ; তপস্বীরা যাহাতে ইঙ্গুদীফল ভাঙ্গিয়াছেন, সেই সকল উপলখণ্ড তৈলাক্ত পতিত আছে ; ঐ

দেখ, কুরুভূমিতে হরিণশিশু সকল নির্ভয়চিত্তে চরিয়া বেড়াইতেছে এবং যজ্ঞীয় ধূমের সমাগমে, নব-পল্লব সকল মলিন হইয়া গিয়াছে।”

কি সুন্দর মধুর অনুবাদ। এমনই সুন্দর অনুবাদ সর্ব্বত্রই। এ অনুবাদের তুলনা নাই। অভিজ্ঞান-শকুন্তলের সংস্কৃত যেমন মধুর, এই শকুন্তলার বাঙ্গালা তেমনই মধুর। এক কথায় বলি, অভিজ্ঞানশকুন্তলা পড়িয়া যাহা বুঝি নাই, ইহাতে তাহা বুঝিয়াছি। শকুন্তলার দুষ্মন্তভবনে গমনকালে, শকুন্তলা, মহর্ষি কণ্ব ও সখিদ্বয়ের শোকভাব এমনই সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে যে, পড়িতে পড়িতে চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যায়। মহর্ষি কণ্বের মর্ম্মস্পর্শিনী বাণী,—বৈক্লব্যং মমতাবদীদৃশমিদং— কি মর্ম্মান্তিক করুণ ভাবে অনুবাদিত হইয়াছে!

দুই একস্থানে পরিবর্ত্তনে অসাবধানতা ঘটিয়াছে। এক স্থানের পরিহারে হিন্দু-সন্তানের আক্ষেপ করিবার কথা আছে।

শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের সম্মিলনসময়, গৌতমী যখন শকুন্তলাকে অসুস্থ ভাবিয়া দেখিতে আসেন, তখন রাজা সরিয়া গিয়া আত্মগোপন করেন। অভিজ্ঞান-শকুন্তলে, এই কথাটী আছে,—“আত্মনামাবৃত্য তিষ্ঠতি”। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই খানে লিখিয়াছেন,—“লতাবিতানে ব্যবহিত হইয়া শকুন্তলাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।” এই খানে অসাবধানতা। শকুন্তলাকে নিরীক্ষণ করিতে হইলে, গৌতমীকেও ত নিরীক্ষণ করা যায়। গৌতমীকে নিরীক্ষণ করান অসঙ্গত। কেননা, এই গৌতমী

শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তালয়ে গিয়াছিলেন। অভিশাপ-প্রভাবে রাজা শকুন্তলাকে যেন ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সঙ্গী ঋষিশিষ্যদ্বয় শার্ঙ্গরব ও শারদ্বতকে রাজা কখন দেখেন নাই। সুতরাং রাজা তাঁহাদিগকে যেন চিনিতে পারিলেন না। গৌতমীকে রাজা দেখিয়াছিলেন; তাহার সম্বন্ধে ত কোন অভিশাপ ছিল না; রাজা তাঁহাকে না চিনিবেন কিসে? কবি কালিদাস, ভবিষ্যতের এই অসঙ্গতি বুঝিয়া কেবল বলিয়া রাখিয়াছিলেন, রাজা আত্মগোপন করিয়াছিলেন; "নিরীক্ষণে"র কথা বলেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় কেন অসাবধান হইলেন, বলিতে পারি না।

শকুন্তলা যখন দুষ্মন্তপুরে যাইবার উদ্যোগ করেন, তখন তাঁহাকে সজ্জিত করিবার জন্য, কবি কালিদাস দেব-প্রদত্ত অলঙ্কারের স্থষ্টি করিয়াছেন। ঋষিশক্তি বুঝাইবার জন্য কালিদাসের এই স্থষ্টি। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। হিন্দুসন্তানের ইহা আক্ষেপের বিষয় নহে কি?

ষোড়শ অধ্যায়।

বিধবা-বিবাহ।

এইবার সেই বিরাট ব্যাপার। যাহাতে হিন্দুসমাজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘোরতর অখ্যাতি; এবং অহিন্দু ও অহিন্দু-ভাবাপন্ন সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি; সুতরাং যাহার জন্য তাঁহার নাম বিশ্বব্যাপী; এবার সেই "বিধবা-বিবাহে"র কথা আসিয়া পড়িল। এ সম্বন্ধে এ ক্ষেত্রে সবিস্তর সমালোচনার স্থান হইবে না; তবে এইখানে এই পর্য্যন্ত বলাই পর্য্যাপ্ত যে, তিনি এতদর্থ যেরূপ অটুট অধ্যবসায়-সহকারে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হন নাই। এ অহিন্দু আচার হিন্দুসমাজে যে অনুপ্রবিষ্ট হয় নাই, ইহা হিন্দুসমাজের সম্যক্ সৌভাগ্যেরই পরিচয় বলিতে হইবে। কারুণ্য-প্রাবল্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় আত্মসংযমে সক্ষম হন নাই। তাই তিনি ভ্রান্তবিশ্বাসের বশে এই অকীর্ত্তিকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহার্থ শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্য অনেকে তাঁহাতে শাস্ত্রানুরাগিতা আরোপিত করেন; কিন্তু অনেকেই তাহা স্বীকার করেন না। শেষোক্তের মতে তিনি স্বেচ্ছাক্রমে শাস্ত্রের কদর্থ করিয়াছিলেন। আমাদের মতে, তিনি স্বেচ্ছামতে ও সজ্ঞানে অকার্য্য করিবার লোক নহেন। ভ্রান্তবিশ্বাসই মূলাধার। সারল্য ও কারুণ্যের পরিচয় পদে পদে।

বাল্য-বিধবার দুঃখে বিদ্যাসাগর মহাশয় বড়ই ব্যথিত

হইতেন তাই তিনি বাল্যকাল হইতেই বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন।

বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের প্রবৃত্তি কেন হইল, তৎসম্বন্ধে স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার স্বগ্রামবাসী স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সিংহ মহাশয়কে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এইখানে উদ্ধৃত হইল,—

"বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটী বাল্য-সহচরী ছিল। এই সহচরী তাঁহারই কোন প্রতিবেশীর কন্যা। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। বালিকাটী বাল্যকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সর্ব্বদাই থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কলিকাতায় পড়িতে আসেন, তখন বালিকার বিবাহ হয়; কিন্তু বিবাহের কয়েক মাস পরে তাহার বৈধব্য ঘটে। বালিকাটী বিধবা হইবার পর, বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের ছুটীতে বাড়ীতে গিয়াছিলেন। বাড়ী যাইলে তিনি প্রত্যেক প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, কে কি খাইল? ইহাই তাঁহার স্বভাব ছিল। এবার গিয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার বাল্য সহচরী কিছু খায় নাই; সে দিন তাহার একাদশী; বিধবাকে খাইতে নাই। এ কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার সঙ্কল্প হইল, বিধবার এ দুঃখ মোচন করিব; যদি বাঁচি, তবে যাহা হয়, একটা করিব। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বয়স ১৩।১৪ বৎসর মাত্র হইবে।

আনন্দকৃষ্ণ বাবু বলেন,—"কোন বালিকা বিধবা হইয়াছে শুনিলে, বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া আকুল হইতেন। এই জন্য তাঁহাকে বলিতাম, তুমি কি ইহার কোন উপায় করিতে পার না? তাহাতে তিনি বলিতেন, শাস্ত্রপ্রমাণ ভিন্ন বিধবা-বিবাহ-প্রচলন দুষ্কর। আমি শাস্ত্রপ্রমাণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি।"

শাস্ত্রানুসারে বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা সপ্রমাণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু প্রথমতঃ শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। রাজকৃষ্ণ বাবু বলেন;—"১২৬০ সালের বা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এক দিন রাত্রিকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও আমি একত্র বাসায় ছিলাম। আমি পড়িতেছিলাম। তিনি একখানি পুঁথির পাতা উল্টাইতেছিলেন। এই পুঁথিখানি পরাশরসংহিতা। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ তিনি আনন্দবেগে উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন,—'পাইয়াছি, পাইয়াছি।' আমি জিজ্ঞাসিলাম,—'কি পাইয়াছ?' তিনি তখনই পরাশরসংহিতার সেই শ্লোকটী আওড়াইলেন *—

* ১২৯৮ সালের ৬ই ভাদ্র বা ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট হিতবাদীতে ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু লিখিয়াছেন,—"তিনি স্কুল পরিদর্শনে কৃষ্ণনগরে গমন করেন। তথাকার রাজবাটীতে বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে কথা উঠে। সেই আদর্শ-ফলেই 'পরাশর-কৃত' এই বচনটী শুনিতে পাইলেন।" অমূল্য বাবু স্বয়ং টীকা করিয়া লিখিতেছেন,—"এ বিষয় কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে বা অন্য সূত্রে শুনিয়াছিলাম, আমার ঠিক স্মরণ নাই। সুতরাং ইহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না।" এরূপ অবস্থায় রাজকৃষ্ণ বাবুর কথাই প্রমাণ।

'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥'

বিধবা-বিবাহের ইহাই অকাট্য প্রমাণ ভাবিয়া, তিনি তখন লিখিতে বসিলেন। সারা রাত্রিই লিখিয়াছিলেন। তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পরে মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন। *

সহরে আগুন জলিয়া উঠিল। চারি দিকেই বাদ-প্রতিবাদের ধুম লাগিয়া গেল। বস্তুতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় গুরুতর পরিশ্রম-সহকারে নানা ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন। এক একটী শ্লোকের অর্থ নির্ণয় করিতে সারা রাত্রি কাটিয়া গিয়াছিল। ১২৬০ সালের ১৬ই মাঘ বা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না' নামক ২২ পৃষ্ঠায় একখানি পুস্তিকা লিখিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন।

'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না' পুস্তিকায় বিদ্যাসাগর মহাশয় লিপিচাতুর্য্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। এক সপ্তাহ কালের মধ্যে এই পুস্তিকার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়।"

অতঃপর যে আলোচনা হইয়াছিল, আনন্দকৃষ্ণ বাবু তৎসম্বন্ধে এইরূপ বলেন,—"বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কি না, এই সম্বন্ধে পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া, বিদ্যাসাগর আমাদের

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক বাবু অক্ষয়কুমার দত্তজ, ঐ পত্রিকায় উহার আদ্যন্ত মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

বাড়ীতে আসেন। তাঁহার পুস্তিকার সুন্দর লিপিচতুরতা ও তর্ক-প্রখরতা দেখিয়া আমরা বিমোহিত হইয়াছিলাম। আমরা বলিলাম,—“এখন তুমি পুস্তিকা প্রচার করিয়া, তোমার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা কর।” বিদ্যাসাগর বলিলেন,—‘যখন এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন ইহার জন্য প্রাণান্ত পণ জানিও। ইহার জন্য যথাসর্ব্বস্ব দিব। তবে তোমার মাতামহ যদি সহায় হন, তবে এ কার্য্য অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ও সহজে সিদ্ধ হইবে। সমাজে ও রাজ-দরবারে তাঁহার যেরূপ সম্মান, তিনি সহায় হইলে, সমাজে সহজে আমার প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবে।’ * আমি বলিলাম,—‘দাদা মহাশয়ের সম্মুখীন্ হইয়া, এ কথা বলিতে সাহস হয় না। তিনি আমাদিগকে যথেষ্ট ভালবাসেন সত্য; কিন্তু তাঁহার নিকট এরূপ সামাজিক কথার উত্থাপন করাকে ধৃষ্টতা মনে করি। তুমি স্বয়ং একখানি পত্র লিখিয়া একখণ্ড পুস্তক তাঁহার নিকট প্রেরণ কর।’ বিদ্যাসাগর আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, পত্রসহ এক খণ্ড পুস্তিকা মাতামহ মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন। মাতামহ মহাশয় তাঁহার পুস্তিকা পড়িয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ডাকাইয়া বলেন,—‘দেখ, তুমি

* বাস্তবিকই সমাজে ও রাজদরবারে তখন রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুরের যেরূপ সম্মান ছিল, সেরূপ আর কাহারও ছিল না। তাঁহার পিতামহ রাজা নবকৃষ্ণ গোষ্ঠীপতি হইয়া সমাজে যথেষ্ট সম্মানিত হইয়াছিলেন। এইজন্য সমাজে রাজা রাধাকান্তদেবেরও যথেষ্ট সম্মান ছিল। তিনি নিজ বিদ্যাবুদ্ধিবলে রাজদরবারেও সম্মান পাইতেন।

যে প্রণালীতে পুস্তিকা লিখিয়াছ, তাহা অতি মনোরম। তবে আমি বিষয়ী লোক, এ সম্বন্ধে কোনরূপ বিচার আমার সাধ্যাতীত এবং অসঙ্গত। একদিন পণ্ডিতমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া, এ সম্বন্ধে বিচার করাইবার ইচ্ছা করি। তুমি যদি সম্মত হও, তাহা হইলে, দিন ধার্য্য করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীকে আহ্বান করি।' বিদ্যাসাগর সম্মত হইলেন। নির্দ্ধারিত দিনে অনেক পণ্ডিত ও বিদ্যাসাগর আমাদের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সে দিন কোন মীমাংসা হয় নাই বটে; তবে বিদ্যাসাগরের তর্কপ্রণালীতে মাতামহ মহাশয় পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে একখানি সাল উপহার দিয়াছিলেন।* বিদ্যাসাগরকে পুরস্কৃত হইতে দেখিয়া, তাৎকালিক সমাজপতিরা সিদ্ধান্ত করিলেন, রাজা রাধাকান্তদেব বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের পক্ষপাতী। একদিন বড়বাজারের গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের প্রধান ব্যক্তি প্রমুখ সমাজপতিরা মাতামহ মহাশয়ের নিকট আসিয়া বলিলেন,—'আপনি কি সর্ব্বনাশ করিলেন। আপনি কি হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহরূপ পাপপ্রথার প্রচলন করিতে চাহেন? নহিলে বিদ্যাসাগরকে পুরস্কৃত করিলেন কেন?' ইহাতে মাতামহ মহাশয় উত্তর দিলেন,—'আমি বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের পক্ষপাতী নহি। আমার তাহাতে অধিকার কি? আমি বিষয়ী লোক, শাস্ত্র-বিচারেরই বা কি জানি। তবে বিদ্যা-

* বার্দ্ধক্যে স্মৃতিহ্রাস জন্য এই সাল-উপহারের কথা আনন্দ বাবু দৃঢ় করিয়া বলেন নাই।

সাগরের তর্ক-প্রণালীতে তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে সাল পুরস্কার দিয়াছিলাম। ভাল, এতৎসম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর সভা করিয়া, আর একদিন বিচার করাইলেই হইবে।' অতঃপর আমাদের বাড়ীতে আর একদিন পণ্ডিতমণ্ডলীর সভা হইয়াছিল। ঐ দিন নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন উপস্থিত ছিলেন। এ দিনও বিচারে কিছুই মীমাংসা হয় নাই। বিচারকালে কেবল একটা গণ্ডগোল হইয়াছিলমাত্র। এ দিন মাতামহ মহাশয়, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়কে সাল পুরস্কার দিয়াছিলেন। অতঃপর বিদ্যাসাগর বুঝিয়াছিলেন, মাতামহ মহাশয়ের নিকট তিনি কোনরূপ সাহায্য পাইবেন না। তাহাতেও ব্রাহ্মণ বিচলিত হন নাই। তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া, অটুট বিক্রমে, অটল সাহসে, আপন কর্ত্তব্য-সাধনে আত্মসমর্পণ করেন। সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলন করাই, তাঁহার অটল প্রতিজ্ঞা। সে বিরাট পুরুষের সে প্রতিজ্ঞা কে ভঙ্গ করিতে পারে? ব্যূহ-বেষ্টিত অভিমন্যুর ন্যায় বিদ্যাসাগর সংসার-সংগ্রামে বিপক্ষ-বেষ্টিত হইয়া, অসমসাহসে অকুতোভয়ে শত্রু-পক্ষের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের তাৎকালিক ভীষণ-সংগ্রামমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া আমরা বাস্তবিকই বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়, ইহার পর বিদ্যাসাগর আমাদের বাটীতে বড় আসিতেন না। মাতামহ মহাশয় তাঁহার এ জীবনব্রতের সহায় না হইলেও, তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন।"

বিধবা-বিবাহ-সংক্রান্ত প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হইবার পর, চারিদিকেই নানা পণ্ডিত-সমাজ হইতে ইহার প্রতিবাদ-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। মুরশিদাবাদের বৈদ্য-প্রধান গঙ্গাধর কবিরাজ প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন। সে সময়ে যে সকল প্রতিবাদ-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সকল সংগ্রহ করিতে পারি নাই, যে কয় খানি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাদের নাম এইখানে প্রকাশ করিলাম,—

"বিধবা-বিবাহের নিষেধক। বিচারঃ। শ্রীউমাকান্ত-তর্কালঙ্কার-সংশোধিতঃ। আঁটপুরনিবাসিদর্শনশাস্ত্রাধ্যপক-শ্রীশ্যামাপদ-ন্যায়ভূষণপ্রণীতঃ পুনঃ প্রকাশিতশ্চ।" "বিধবা-বিবাহ-নিষেধক-প্রমাণাবলী। দ্বিতীয়া। কাশীপুরবাসি-শ্রীশশিজীবন-তর্করত্ন-শ্রীজানকীজীবন-ন্যায়রত্ন-সংগৃহীতা। সপ্তক্ষীরাবাসি-শ্রীযুক্ত-বাবু-পার্ব্বতীনাথ-রায়চতুর্ধুরীণাদেশতঃ।" "পৌনর্ভব-খণ্ডনম্ অর্থাৎ শ্রীমদীশ্বরবিদ্যাসাগরেণ কলৌ বিধবা-বিবাহ-প্রচলিতার্থ-নির্ম্মিত-নিবন্ধস্য প্রত্যুত্তরম্। শ্রীমৎকালিদাস-মৈত্র-বিরচিতম্।" "শ্রীযুক্ত-ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগরকল্পিত-বিধবা-বিবাহ-ব্যবস্থার বিধবোদ্বাহবারকঃ। শ্রীযুক্ত সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য্যের মতানুসারে কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মৈত্রেয় কর্তৃক সংগৃহীত।" "বিধবাবিবাহ-প্রতিবাদ। শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন কর্তৃক সঙ্কলিত।" "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত নহে।" "শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক ভ্রমমূলক পত্রাবলীর কাশীস্থ পণ্ডিতসম্মত প্রত্যুত্তর।" "ধর্ম্মমর্ম্ম-

প্রকাশিকা সভা হইতে বিধবা-বিবাহবাদ প্রথম খণ্ড।" "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাবের উত্তর। শ্রীল শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সভাসদ্‌গণ কর্তৃক শ্রুতি-স্মৃত্যাদি প্রমণাবলী সঙ্কলন পূর্ব্বক লিখিত। "বিধবা-বিবাহ হওয়া উচিত নহে।" "বিচিত্র স্বপ্নবিবরণ। শ্রীপীতাম্বর কবিরত্ন বিরচিতম্।" "বিধবা-বিবাহ নিষেধ-বিষয়ক ব্যবস্থা।" *

যশোহর হিন্দুধর্ম্ম রক্ষিণী সভা ও কলিকাতা ধর্ম্ম-সভা হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃত বিধবা বিবাহ প্রস্তাবের প্রবল প্রতিবাদ হইয়াছিল। যশোহর হিন্দু-ধর্ম্মরক্ষিণী সভার চতুর্থ সাংবৎসরিক অধিবেশনের সময় নানাদেশীয় মহা-মহোপাধ্যায় আহূত হন। সকলেই বিধবা-বিবাহ অশাস্ত্রীয় ও অকর্ত্তব্য বলিয়া বক্তৃতা করেন। ইতিমধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষ-সমর্থন করিয়া উপযুক্ত ভাইপো প্রণীত "ব্রজবিলাস" এবং উপযুক্ত ভাইপো সহচর প্রণীত "রত্নপরীক্ষা" নামক দুই খানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই দু-খানি পুস্তকের প্রকৃত গ্রন্থকারের নাম নাই। রাষ্ট্র এইরূপ, স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার প্রণেতা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র নারায়ণ বাবু আমাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

* গবর্ণমেণ্টে প্রদত্ত হয়, এই অভিপ্রায়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক, তাঁহার বিধবা-বিবাহ-বিষয়িণী পুস্তিকা ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়া সোসাইটীতে প্রেরিত হইয়াছিল। ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়া সোসাইটীর তাৎকালিক সম্পাদক উইলিয়ম থিওবোল্ড ইহার যাথার্থ্যাযাথার্থ্য নির্ণয়ার্থ ধর্ম্ম-সভার মত চাহেন। ধর্ম্মসভা তদুত্তরে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই লইয়া এই পুস্তিকা।

রচিত সমুদায় পুস্তক উপহার দিয়াছেন। তাহার মধ্যে রত্ন-পরীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি। "ব্রজবিলাস" ও "রত্ন-পরীক্ষা"য় পণ্ডিতগণের প্রতি আক্রমণ হইয়াছে। ইহাদের ভাষা-ভাব বদরসিকতায় পূর্ণ। যদিও রাষ্ট্র, ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় বিজ্ঞ-গম্ভীর-চরিত্র লোক এরূপ চপলতা প্রকাশ করিবেন, ইহা প্রত্যয় করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

যশোহর-ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় বিধবা-বিবাহের প্রতিবাদ করিয়া যে বক্তৃতা হইয়াছিল, তাহারই প্রতিবাদ করিয়া বিনয়-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকারের নাম নাই। রাষ্ট্র, ইহাও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত। ইহাতে নবদ্বীপের পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতদিগকে আক্রমণ করা হইয়াছে। ইহার ভাষা ও ভাব আলোচনা করিলে, ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত বলিয়া বিশ্বাস হয় না। ইহাও চপলতা দোষে সম্পূর্ণ কলঙ্কিত। তবে নারায়ণ বাবুর নিকট হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত বলিয়া যে সব পুস্তক উপহার পাইয়াছি, তাহার মধ্যে এ পুস্তকও ছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ-বিষয়িণী পুস্তিকা প্রচারিত হইবার পর, তৎপ্রতিবাদে যে সব পুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশেই গভীর যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্র-বাক্যের সমাবেশ ছিল। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তিকা যেরূপ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইয়াছিল এবং তাঁহার যুক্তিখ্যাপন

যেরূপ সহজ প্রণালীতে সমাবেশিত হইয়াছিল, এ সব পুস্তকে সেরূপ হয় নাই। যথার্থ শাস্ত্রদর্শী শাস্ত্রশাসিত ব্যক্তিদিগের নিকট এ সব পুস্তকের আদর হইয়াছিল। তবে বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী তাৎকালিক ইংরেজি-শিক্ষিত লোকেরা এই সব পুস্তক উপেক্ষা করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই জয়ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেই জয়ঘোষণা রাজপুরুষদিগের কর্ণপটহে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। রাজপুরুষদের সঙ্গে তাৎকালিক ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই ঘনিষ্ঠতা ছিল কিনা।

এই সময় সমাজে তিন সম্প্রদায়ের সংঘর্ষণ চলিয়াছিল। প্রথম সম্প্রদায়,—শাস্ত্রানুশাসিত ব্রাহ্মণপরিচালিত হিন্দু। ইঁহারা বিধবা-বিবাহের ঘোর প্রতিবাদী ছিলেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায়,—ইংরেজিশিক্ষিত প্রৌঢ় হিন্দু-সন্তান। ইঁহারা বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন ; কিন্তু প্রকাশ্যে পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তৃতীয় সম্প্রদায়,—ইংরেজিশিক্ষিত ইংরেজি সভ্যতানুপ্রাণিত হিন্দু-সন্তান। ইঁহারা বিধবা-বিবাহের প্রগাঢ় পক্ষপাতী। ইঁহাদেরই দুন্দুভিনাদে বিদ্যাসাগরের জয়বার্তা বিঘোষিত হইয়াছিল। এখনও এইরূপ তিন সম্প্রদায়ের সংঘর্ষণ চলিতেছে।

তবে এখনকার ইংরেজিশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেককে শাস্ত্র-পথে চলিতে দেখা যায়। এরূপ মতিগতি বেশী দিন থাকিবে না। একদিন শাস্ত্রাচারের বিলোপ হইবে, ইহা শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণী। তবে এখনও সমাজ যে ভাবে চলিতেছে,

তাহাতে বিধবা-বিবাহ যে শীঘ্র প্রচলিত হইবে না, তাহা বুঝা যাইতেছে। তখন ব্রাহ্মণপরিচালিত হিন্দুর প্রাধান্য জন্য বিধবা-বিবাহ হিন্দু-সমাজে প্রচলিত হয় নাই; এখনও হইবে না; যতদিন হিন্দুর প্রাধান্য থাকিবে, ততদিন হইবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের আন্দোলন প্রথম উত্থাপিত করেন, এমন নহে; তাঁহারও প্রায় ১৯ কি ২০ বৎসর পূর্ব্বে মধ্যপ্রদেশ-নাগপুরের এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ এ বিষয়ের আন্দোলন তুলিয়াছিলেন। সে আন্দোলনে ফল হয় নাই। প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে ঢাকার রাজা রাজবল্লভ বিধবা-বিবাহ চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনিও কৃত-কার্য্য হন নাই। বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হইলে, রাজ-বল্লভের ন্যায় শক্তিশালী পুরুষ কি চালাইতে পারিতেন না? সে সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় কোন কোন ভ্রান্ত পণ্ডিত বিধবা-বিবাহের পক্ষসমর্থনে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ঠিক এই সময় কোটার রাজাও বিধবা-বিবাহ চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও-ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছিলেন। যখন একজন শক্তিশালী রাজা ব্যর্থমনোরথ, তখন অন্য পরে কা কথা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ-বিষয়িণী পুস্তিকা প্রকাশিত হইবার ২০ বৎসর পূর্ব্বে মাদ্রাজের এক ব্রাহ্মণ এতৎ-সম্বন্ধে আইন করাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টাও ফলবতী হয় নাই। দশ বৎসর পুর্ব্বে ইহার আন্দোলন হইয়াছিল। এ আন্দোলনও নিস্ফল হয়। সুবর্ণ-বণিক

জাতীয় কলিকাতা সহরের প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য মতিলাল শীল বিধবা-বিবাহ প্রচলনের উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ইহার জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হন নাই।* দুই বৎসর পূর্ব্বে পটলডাঙ্গানিবাসী শ্যামাচরণ দাস নামক কর্ম্মকার জাতীয় এক ধনাঢ্য ব্যক্তি আপনার বিধবা কন্যার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণ এ বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন,—কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস চূড়ামণি, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ। পরে ইঁহাদের অনেকেরই জাতি দূর হইয়াছিল; শ্যামাচরণ দাস বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে পারেন নাই।

যাহা শাস্ত্রসম্মত নহে, যাহা দেশাচারবহির্ভূত, তাহা কোটি কোটি অর্থব্যয়েও সাধারণে প্রচলিত হয় কি? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্যে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি সহায় হইয়াছিলেন।† প্রলোভনে বা ভ্রান্তিবশে কোথায় হয়ত কেহ বিধবা-বিবাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু বিধবা-বিবাহ কি সমাজে চলিল? যতদিন সমাজের বন্ধন-গ্রন্থি দৃঢ় থাকিবে, ততদিন বিধবা-বিবাহ হিন্দু-সমাজে প্রচলিত হইবে না।

---

* সংবাদ প্রভাকর, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ, ১০ই ফেব্রুয়ারী।

† যুগলনেতুনিবাসী কালীপ্রসন্ন সিংহ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি প্রথম বিধবা বিবাহ করিবেন, তাঁহাকে এক সহস্র টাকা পারিতোষিক প্রদান করিব। সংবাদ প্রভাকর, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ ২৭শে নবেম্বর।

বিধবা-বিবাহের সমর্থনী পুস্তিকার প্রতিবাদ-সমূহ প্রকাশিত হইলে পর, বিদ্যাসাগর মহাশয়, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বা ১২৬১ সালের কার্ত্তিক মাসে "বিধবা-বিবাহ হওয়া উচিত কিনা" নামক দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করেন। যে সকল পণ্ডিত বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন, এ পুস্তকে তাহাদের অধিকাংশেরই মতখণ্ডনের প্রয়াস আছে। নিম্নলিখিত পণ্ডিতদের মতখণ্ডন এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য,—আগড়পাড়ানিবাসী মহেশচন্দ্র চূড়ামণি, কোননগর-নিবাসী দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, কাশীপুর-নিবাসী শশিজীবন তর্করত্ন, জানকীজীবন ন্যায়রত্ন, আরিয়াদহনিবাসী শ্রীরাম তর্কালঙ্কার, পুটিয়ানিবাসী ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, সয়দাবাদনিবাসী গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণমোহন ন্যায়-পঞ্চানন, রামগোপাল তর্কলঙ্কার, মাধবরাম ন্যায়রত্ন, রাধাকান্ত তর্কালঙ্কার, জনাইনিবাসী জগদীশ্বর বিদ্যারত্ন, আন্দুলীয় রাজসভার সভাপণ্ডিত রামদাস তর্কসিদ্ধান্ত, ভবানীপুরনিবাসী প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, নন্দকুমার কবিরত্ন, আনন্দচন্দ্র শিরোমণি, গঙ্গানারায়ণ ন্যায়বাচস্পতি, হারাধন কবিরাজ, ভাটপাড়ানিবাসী রামদয়াল তর্করত্ন, শ্রীরামপুরনিবাসী কালিদাস মৈত্র, মুরশিদাবাদনিবাসী রামধন বিদ্যাবাগীশ।

এই সকল পণ্ডিতের মতখণ্ডন জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় নানা শাস্ত্রের বচনোদ্ধার করিয়াছেন।

এ পুস্তকের ভাষাও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। ইহার গাম্ভীর্য্যানুসন্ধিৎসুতা

আলোচনা করিলে, কে সহজে বিশ্বাস করিবে, বিদ্যাসাগর নাম ভাঁড়াইয়া ব্রজবিলাস, রত্নপরীক্ষা * প্রভৃতি পুস্তকে বালসুলভ বদরসিকতার পরিচয় দিবেন? রত্নপরীক্ষার ভাষা-ভাবের একটু নমুনা দেখুন,—

"তিনি, নিতান্ত ম্লান বদনে কহিলেন, দেখুন, আমি, ব্রজবিলাস লিখিয়া, বিদ্যারত্ন খুড়র মানবলীলাসংবরণের কারণ হইয়াছি। মদীয় বিষময়ী লেখনীর আঘাতেই, তদীয় জীবনযাত্রার সমাপন হইয়াছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। আমাদের সমাজে, গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা অতি উৎকট পাপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে, ব্রজবিলাস লিখিয়া, কোন পাপে লিপ্ত হইয়াছি, বলিতে পারি না। এ অবস্থায়, আর আমার মধুবিলাস লিখিতে সাহস ও প্রবৃত্তি হইতেছে না। মধুবিলাস লিখিলে, হয়ত, আমায় পুনরায় ঐরূপ পাপে লিপ্ত হইতে হইবেক। বিশেষতঃ, স্মৃতিরত্নখুড়ী বুড়ী নহেন; তাঁহাকে, ইদানীন্তন প্রচলিত প্রণালী অনুসারে, দীর্ঘ কাল, ব্রহ্মচর্য্যপালন করিতে হইবেক, সেটীও নিতান্ত সহজ ভাবনা নহে। যদি বল, আমরা উদ্যোগী হইয়া পুনঃসংস্কার সম্পন্ন করিব; সে প্রত্যাশাও সুদূরপরাহত। এই সমস্ত কারণবশতঃ, আর আমার, কোনও মতে, এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে, সাহস হইতেছে না।"

* ইহা একরূপ সর্ব্বজনবিদিত, যিনি উপযুক্ত ভাইপোরূপে ব্রজবিলাস লিখিয়াছেন, তিনি উপযুক্ত ভাইপোসহচর বলিয়া, "রত্নপরীক্ষা" লিখিয়াছেন। এই উভয়ই স্বয়ং বিদ্যাসাগর বলিয়া রাষ্ট্র। ব্রজবিলাসে ব্রজনাথ বিদ্যারত্নকে ও রত্নপরীক্ষায় মধুসূদন স্মৃতিরত্নকে আক্রমণ আছে। ভাষা ও বিরামচিহ্নাদির আলোচনায় সহজে ধারণা হইতে পারে, ইহা বিদ্যাসাগরের লিখিত। সত্য সত্য যদি ইহা তাঁহারই লিখিত হয়, তাহা হইলে, তাঁহার কলঙ্কেরই কথা বলিতে হইবে।

যাহা হউক, বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তকে বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পূর্ণ পরিচয়, সন্দেহ নাই। তবে মত-খণ্ডন কিরূপ হইয়াছে, তাহার বিচারে আমার অধিকারও নাই; শক্তিও নাই। পণ্ডিতগণ তাহার বিচার করিবেন। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, সেই সময় প্রধান প্রধান স্থানের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। ৺কাশীধামের খ্যাতনামা বহু পণ্ডিত ইহার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করিয়াছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব কলিকাতার শক্তিশালী সর্ব্বোন্নত সমাজপতি। তিনি বিধবা-বিবাহের অযৌক্তিকতা প্রমাণ জন্য বহুবিখ্যাত পণ্ডিতের ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাৎকালিক ধর্ম্মসভা হিন্দুসমাজের প্রধান প্রতিনিধিস্বরূপ ছিলেন। এই সভার পণ্ডিতমণ্ডলী বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, আপন মতসমর্থনকারীদের মধ্যে এই কয়টী পণ্ডিতের নামোল্লেখ করিয়াছেন,—পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, তারানাথ বাচস্পতি ও গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। ইহাঁরা তাঁহার মতপোষক কতকগুলি বচন উদ্ধার করিয়া, সাহায্য করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইহাঁরা তৎকালে সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধীনে চাকুরী করিতেন।

জনকতক ভ্রান্ত পণ্ডিত, ইংরেজি-শিক্ষিত নব্য বঙ্গীয় যুবক এবং ধনাঢ্য জমীদার বিধবা-বিবাহের পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন মাত্র। বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত হইলে, দেশের এত বড় বড়

বিজ্ঞ, পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য মহোদয়গণ কখন কি ইহার বিপক্ষবাদী হইতেন? শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ-শাসিত হিন্দুও বুঝে, বৈধব্য পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল; ব্রহ্মচর্য্যই বিধবার পালনীয়। যাঁহারা মনে করেন এবং বলেন, বিধবা কন্যা বা ভগিনী, পিতা বা ভ্রাতাকে বনিতাসুখ-সম্ভোগ করিতে দেখিয়া, তপ্তশ্বাস পরিত্যাগ করেন; এবং বিধবা কন্যা ও ভগিনীর আজীবন কঠোরতার ব্যবস্থা করিয়া, আপন সুখ-সাধনে লালায়িত, তাঁহারা প্রকৃতই হিন্দুর কৃপা-পাত্র। বিধবা কন্যা বা ভগিনীর বৈধব্য, পিতা বা ভ্রাতার মর্ম্মান্তিক ক্লেশকর, সন্দেহ কি? তবে ইহ-পরকালবিশ্বাসী হিন্দুর শোক-সান্ত্বনা কর্ম্মাকর্ম্মের ফলাফলস্মরণে।

বিধবা-বিবাহের দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইবার পরও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবিতাবস্থায় অনেক প্রতিবাদ-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দানিয়াড়ি মহাশয়ের পুস্তক উল্লেখযোগ্য। হিন্দু-পাঠকগণকে সে পুস্তক পড়িতে অনুরোধ করি। তবে দানিয়াড়ী মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর যে কাপট্য আরোপিত করিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তিনি বলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়, আপন মতসমর্থনার্থ অনেক গ্রন্থের প্রকৃত পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহার বিচার অবশ্য পণ্ডিতজনই করিবেন; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন-চরিত সমালোচনা করিলে, এ কাপট্যাচরণ আরোপিত করিতে প্রকৃতই প্রবৃত্তি হয়না। বোধ হয়, গ্রন্থে প্রকৃতই পাঠান্তর আছে

বিদ্যাসাগর কপট, এ কথা স্বপ্নেও আসে না। ভট্টপল্লীনিবাসী পণ্ডিতবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়, বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও হিন্দু-সন্তানের পাঠ্য। বঙ্গবাসী হইতে যে পরাশরসংহিতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তর্করত্ন মহাশয়ের মতপ্রকাশ পাইয়াছে।

"নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥"

তর্করত্ন মহাশয় এই শ্লোকের এইরূপ বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন,—

"যে পাত্রের সহিত বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া আছে, তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হইবে, তবে ঐ ভাবী পতি যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয়, বা পতিত হয়, তবে এই পঞ্চপ্রকার আপদে, ঐ কন্যা পাত্রান্তরে প্রদান বিহিত।"

এইরূপ অনুবাদ করিয়া, তর্করত্ন মহাশয় ইহার এইরূপ টীকা করিয়াছেন,—

"যে অনুবাদ প্রদত্ত হইল, ইহাই বহু পণ্ডিতসম্মত। আরও একটী যুক্তি-পূর্ণ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইতেছে। এতদ্দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবে যে, বিধবা-বিবাহ এখনকার প্রচলনীয় নহে। "স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয়, বা পতিত হয়, তাহা-হইলে নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিবে।" * এ বচনের ইহাই অনুবাদ; কিন্তু এই বচনের অনুমতি-রক্ষা বর্ত্তমান সময়ে নিষিদ্ধ। যথা পরাশর ভাষ্যধৃত আদিপুরাণ।

* মূল শ্লোকের এইরূপ অনুবাদ করিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ প্রচলনের আন্দোলন করিয়াছিলেন।

"দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ————
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তা-কন্যা প্রদীয়তে।
কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ ॥
দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ।
শূদ্রেষু দাসগোপাল কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাম্ ॥
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য————
এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ ॥"

অর্থাৎ কলি-প্রারম্ভের পর, মহাত্মা পণ্ডিতগণ পূর্ব্বপ্রচলিত এই সকল কর্ম্ম সমাজরক্ষার্থ ব্যবস্থাপূর্ব্বক নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যথা দীর্ঘ-কাল ব্রহ্মচর্য্য, দেবর দ্বারা পুত্র উৎপাদন, পরিণীতা নারীর পত্যন্তর গ্রহণ, অসবর্ণাকন্যার সহিত দ্বিজাতিগণের বিবাহ, দত্তক ও ঔরস ভিন্ন ক্ষেত্রজ প্রভৃতিকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ এবং গৃহস্থের দাস, গোপাল কুলমিত্র, অর্দ্ধ-সীরী শূদ্রজাতির মধ্যে ইহাদিগের অন্নভোজন ইত্যাদি কলিযুগারম্ভের পরেও এই বচন নিষিদ্ধ কতিপয় কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখাইয়া এবং স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধে স্মৃতির বলবত্তা শাস্ত্র-সম্মত এই প্রমাণে কেহ কেহ এই বচনের অগ্রাহ্যতা প্রতিপাদন করেন। আমরা বলি তাহা নহে। ঐ সকল কর্ম্ম কলিযুগ প্রারম্ভের পরে যে নিষিদ্ধ হয়, ইহা ঐ বচন প্রদর্শনেই সপ্রমাণ হইয়া থাকে। তবে ঠিক কোন্ সময়ে যে ঐ নিষেধবিধি প্রচলিত হয়, তাহা বলা কঠিন। যাহা হউক, যতদিন ঐ নিষেধ প্রচারিত হয় নাই, ততদিন কলিযুগেও ঐ সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, অতএব পরাশর-সংহিতা কেবল কলিযুগে ধর্ম্মনির্ণায়ক হইলেও ক্ষতি নাই। কেন না পরাশরের মত কলিতে কিছুদিন প্রচলিত ছিল, একেবারে স্থিতি-শূন্য হইতেছে না। পরাশরমতে ইতিপূর্ব্বে চতুর্ব্বিধ পুত্র উক্ত হইয়াছে। ভবিষ্যতে দাস, গোপালক, কুলমিত্র ও অর্দ্ধসীরী-শূদ্রদিগের

অন্ন-ভোজন বিহিত হইবে, এইরূপ সকল মতের উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত কলিযুগের এই ধর্ম্ম এইরূপ স্থির করিলে, আদিপুরাণ প্রভৃতির বচন স্থিতিশূন্য হইয়া পড়ে। প্রবলমতের সঙ্কোচ করিয়াও অপ্রবল মতের স্থিতি-শূন্যতা দোষ পরিহার করা চিরপ্রচলিত শাস্ত্রকারীর ব্যবস্থা। আর সামাজিক নিয়মও দেখ, এক্ষণে ঔরস ও দত্তক ব্যতীত পুত্র নাই। কেহই দাস প্রভৃতির অন্ন ভোজন করে না। অতএব সর্ব্বজনপরিগৃহীত আদি-পুরাণাদি বচনের অগ্রাহ্যতা প্রতিপাদনপ্রয়াস সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য। ইত্যাদি বিবিধ কারণে বিধবা-বিবাহ যে এখনকার অপ্রচলনীয়, ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত।" পরাশরসংহিতার বঙ্গানুবাদ, ৭ পৃষ্ঠা।

বিধবা-বিবাহ-সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর যে সব প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার আর প্রতিবাদ করেন নাই।

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচার বহুপ্রকারই হইয়াছে। সে বিচারবিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। আমি কেবল ইহার কতক ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রকাশ করিলাম। শাস্ত্রীয় বিচার ভিন্ন অন্যপ্রকার বিচারও অনেক হইয়া গিয়াছে। এখনও হইতেছে। ১২৮৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের বঙ্গদর্শনে বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের বিপক্ষে যে মত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সমাজহিতাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা উচিত। সে প্রবন্ধের এই কয়টী কথা স্মরণীয়,—

"অনেকে বলেন, বঙ্গ বিধবাগণ চিরদুঃখিনী। তাহাদের কোন কার্য্যেই সুখ নাই, কোন প্রকার আমোদে তাহারা মিশিতে পারে না, মনের দুঃখে তাহারা সর্ব্বদাই দুঃখিত। তাহাদিগকে আজন্ম এইরূপ কষ্টে রাখা অতি নৃশংসের কার্য্য, যাহার দয়া নাই, মায়া নাই, যে স্নেহমমতা

কাহাকে বলে জানে না, পরের দুঃখে যাহার মন গলিয়া না যায়, সেই এইরূপ নিষ্ঠুরতাচরণ করিতে সমর্থ। কিন্তু বিধবাদিগের দুঃখ যে অসহ্য এমত আমাদের বোধ হয় না। যদি বাস্তবিক অসহ্য হয় অথচ তাহাতে সমাজের উপকার থাকে, তবে তাহা মোচন করিবার আবশ্যক কি? পাঁচ জন বিধবার জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদে, সমাজস্থ সহস্র সহস্র লোকের জন্য, তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাওয়া উচিত, যিনি এক জনের অঙ্গে সূচ ফোটা দেখিতে পারেন না, তিনি শত শত লোকের বলিদান কি রূপ দেখিবেন? যদি পাঁচ জন বিধবার দুঃখ মোচন না করিলে নিষ্ঠুরতা হয়, তবে বিধবা বিবাহ চালাইয়া সমাজের সহস্র ব্যক্তির অপকার করা চণ্ডলতা—; গোরু মেরে জুতা দান ধর্ম্ম নহে। বিধবা যদি দুশ্চরিত্রা হইবার আশঙ্কা থাকে বিবাহ দিলেও সে আশঙ্কা একেবার নির্ম্মূল হয় না। অনেক সধবাও দুশ্চরিত্রা হয়। আমরা নরম প্রকৃতির লোক, এই জন্য কেবল দয়া করিতে শিখিয়াছি,—ন্যায়পরতার উগ্রমূর্ত্তি আমরা সহ্য করিতে পারি না। সুতরাং ন্যায়ের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া শুদ্ধ অনুভব শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা মতামত প্রকাশ করিয়া থাকি। ইহাকে স্পেন্‌সার সাহেব Emotional Bias অর্থাৎ আনুভাবিক পক্ষপাত বলিয়াছেন।"

বিচারফলে যাহা হউক, বিধবা-বিবাহের প্রচলন-প্রসঙ্গে একটা তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইয়াছিল। বাত্যাবিক্ষোভিত বারিধিবৎ সমগ্র বঙ্গভূমি বিচলিত হইয়াছিল। ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান্, মূর্খ, স্ত্রী, বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলেরই মুখে দিবারাত্র এতৎসম্বন্ধে অবিরাম জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছিল। হিন্দুর গৃহে প্রকৃতই একটা বিস্ময়-বিভীষিকার আবির্ভাব হইয়াছিল। পক্ষে বিপক্ষে কত রকম ছড়া, গান রচিত হইয়াছিল, তাহার

ইয়ত্তা নাই। পথে, ঘাটে, মাঠে সর্ব্বত্রই নানারূপ গান গীত হইত। গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইতে হাঁকাইতে, কৃষক লাঙ্গল চালাইতে চালাইতে, তাঁতি তাঁত বুনিতে বুনিতে গান গাহিত। শান্তিপুরে বিদ্যাসাগর-পেড়ে নামক এক রকম কাপড় উঠিয়াছিল। তাহার পাড়ে এই গান লেখা ছিল,—

"সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে।
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে॥
কবে হবে শুভদিন, প্রকাশিবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরবে হুকুম—
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধূম,
মনের সুখে থাকব মোরা মনোমত পতি লয়ে।
এমন দিন কবে হবে, বৈধব্য-যন্ত্রণা যাবে,
আভরণ পরিব সবে, লোকে দেখবে তাই—
আলোচাল কাচকলার মুখে দিয়ে ছাই,—
এয়ো হয়ে যাব সবে বরণডালা মাথায় লয়ে॥"

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই পদ্য রচনা করিয়াছিলেন,—

"বাধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে, বাজিয়াছে ঢোল॥
কত বাদী, প্রতিবাদী, করে কত রব।
ছেলে বুড়ী আদি করি, মাতিয়াছে সব॥
কেহ উঠে শাখাপরে, কেহ থাকে মূলে।
করিছে প্রমাণ জড়ো, পাঁজি-পুঁতি খুলে॥

এক দলে যত বুড়ো, আর দলে ছোঁড়া।
গোঁড়া হয়ে মাতে সব, দেখেনাকো গোড়া॥
লাফালাফি, দাপাদাপি, করিতেছে যত।
দুই দলে থাপা-থাপি, ছাপাছাপি কত॥
বচন রচন করি, কত কথা বলে।
ধর্ম্মের বিচার-পথে, কেহ নাহি চলে॥
"পরাশর" প্রমাণেতে, বিধি বলে কেউ।
কেহ বলে এযে দেখি, সাগরের ঢেউ॥
কোথা বা করিছে লোক, শুধু ঘেউ ঘেউ।
কোথা বা বাঘের পিছে, লাগিয়াছে ফেউ॥
অনেকেই এই মত, লতেছে বিধান।
'অক্ষত যোনির' বটে, বিবাহ-বিধান॥
কেহ বলে ক্ষতাক্ষত, কেবা আর বাছে?
একেবারে তরে যাক, যত রাঁড়ী আছে॥
কেহ কহে এই বিধি, কেমনে হইবে?
হিঁদুর ঘরের রাঁড়ী, সিঁদুর পরিবে!
বুকে ছেলে, কাঁকে ছেলে, ছেলে ঝোলে কোলে।
তার বিয়ে বিধি নয়, উলু উলু বোলে॥
গিলে গিলে ভাত খায়, দাঁত নাই মুখে।
হইয়াছে আঁত-খালি, হাত চাপা বুকে॥
ঘাটে যারে নিয়ে যাব, চড়াইয়া খাটে।
শাড়ী-পরা, চুড়ি হাতে, তারে নাকি খাটে?
শুনিয়া বিয়ের নাম, "কোনে" সেজে বুড়ো।
কেমনে বলিবে মুখে, "খুড়ী খুড়ী খুড়ী"?

পোড়া-মুখ পোড়াইয়া, কোন পোড়া-মুখী।
'দুখী' 'সুখী' মেয়ে ফেলে, কেঁচে হবে খুকী?
ব্যাটা আছে যার ভরে, বেলগাছ এঁচে।
তুড়ী মেরে থুড়ো বলে, সে বসিবে কেঁচে!
গমনের আয়োজন, শমনের ঘরে।
বিবাহের সাধ সেকি, মনে আর করে?
যেখানে সেখানে শুনি, এই কলরব।
বালার বিবাহ দিতে, রাজি আছে সব॥
সকলেই এইরূপ, বলাবলি করে।
ছুঁড়ীর কল্যাণে যেন, বুড়ী নাহি তরে॥
শরীর পড়েছে ঝুলি, চুলগুলি পাকা!
কে ধরাবে মাছ তারে, কে পরাবে শাঁখা?
জ্ঞানহারা হয়ে যাই, নাহি পাই ধ্যানে।
কে পাড়িবে 'সৎবাপ', মায়ের কল্যাণে?"

কবিতাসংগ্রহ, দ্বিতীয়ভাগ, ৭৯—৮১ পৃষ্ঠা।

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে কবি দাশরথী রায় অনেক ছড়া ও গান রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্য হইতে একটী ছড়া ও একটী গান উদ্ধৃত হইল,—

"বিধবার বিবাহ কথা, কলির প্রধান স্থান কলিকাতা,
নগরে উঠেছে অতি রব।
কাটাকাটি হচ্ছে বাণ, ক্রমে দেখছি বলবান,
হবার কথা হয়ে উঠেছে সব॥
ক্ষীরপাই নগরে ধাম, ধন্য গণ্য গুণধাম,
ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামক।

তিনি কর্ত্তা বাঙ্গালির, তাতে আবার কোম্পানীর,
হিন্দু কালেজের অধ্যাপক।
বিবাহ দিতে ত্বরায়, হাকিমের হয়েছে রায়,
আগে কেউ টের পায় নাই সেটা।
তারা কল্লে অর্ডর, যেতে করে অর্ডর,
চটীকে বুদ্ধি আটিকে রাখিবে কেটা॥
হাকিমের এই বুদ্ধি, ধর্ম্ম বৃদ্ধি প্রজা বৃদ্ধি,
এ বিবাহ সিদ্ধি হলে পরে।
বিধবা করে গর্ভপাত, অমঙ্গল উৎপাত,
তাতে রাজার রাজ্যে হতে পারে॥
হিন্দু ধর্ম্মে যারা রত, প্রমাণ দিয়ে নানা মত,
হবে না বলে করিতেছেন উক্ত।
ইহাদের যে উত্তর, টিকিবে নাকো উত্তর,
উত্তীর্ণ হওয়া অতি থাক্ত॥

গীত।

তোমরা ঈশ্বরের দোষ ঘটাবে কি রূপে।
রাখিতে ঈশ্বরের মত, হইয়ে ঈশ্বর দূত,
এসেছেন ঈশ্বর বিদ্যাসাগর রূপে॥
রাজ আজ্ঞায় দূতে আসি, কাটে মুণ্ড দিয়ে অসি,
রসি বেন্ধে ফেলে অন্ধ কূপে।
তা বলে দূতে কখন
দূষী হয় না সেই পাপে।
কি আর ভাব সকলেতে, হবে যেতে জেত্তে হতে,
জেতের অভিমান সাগরে দাও ঝঁাপে।

এক কর্ম্ম প্রায় জগত, ভারত আদি পুরাণ মত,
ভারতে চলিবে না কোন রূপে।
যথন করেছে এ ভারত
অধিকার ইংরেজ ভূপে ॥

পল্লীগ্রামে চাষা-ভূষার মধ্যে বিদ্যাসাগরের নাম,—"বিধবার বিয়ে দেওয়া বিদ্যাসাগর" হইয়াছিল।

দেশ জুড়িয়া আন্দোলন হইয়াছিল। রাজপুরুষদের কর্ণগোচর করাইতে না পারিলে, প্রকৃত কার্য্য হওয়া দুষ্কর ভাবিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়, "বিধবা-বিবাহ হওয়া উচিত কিনা" পুস্তকের ইংরেজি অনুবাদ করেন। আনন্দকৃষ্ণ বাবু, শ্রীনাথ বাবু প্রভৃতি অনেকেই অনুবাদে সাহায্য করিয়াছিলেন। অনুবাদ মুদ্রিত হইবার সময় প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়, ইহার প্রুফ সংশোধন করিয়া দেন।

ইংরেজি অনুবাদ হওয়ায়, বাস্তবিকই সবিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে আইন-বিষয়ক অনেক অন্তরায় ছিল। সেই অন্তরায় দূর করিবার অভিপ্রায়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় একটা আইন করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ইংরেজি অনুবাদ পড়িয়া, হিন্দু বিধবাদের বড় কষ্ট, হিন্দু-বিধবাদের বিবাহ হওয়া উচিত, এতৎসম্বন্ধে আইন-সংক্রান্ত অন্তরায় দূরীকৃত হওয়া উচিত, রাজপুরুষদের মনে এইরূপ একটা সুদৃঢ় ধারণা হইয়া যায়। ইংরেজি অনুবাদ প্রচারিত হইবার পর, বিদ্যাসাগর মহাশয় আইন করাইবার জন্য তাৎকালিক প্রধান

প্রধান রাজপুরুষদের সহিত পরামর্শ করিতেন। তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথায় মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদেরই পরামর্শে বিদ্যাসাগর মহাশয়, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর বা ১৮৬২ সালের ১৯শে আশ্বিন মাসে এক হাজার লোকের স্বাক্ষরিত, এক আবেদন-পত্র ব্যবস্থাপক সভায় পেষ করেন। আবেদন ইংরেজিতে হইয়াছিল। তাহার মর্ম্মানুবাদ এই,—

"ভারতের মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের সভা-সমীপেষু।—

"বঙ্গদেশস্থ নিম্ন স্বাক্ষরকারী হিন্দু প্রজাদিগের সবিনয় নিবেদন এই যে,—

"বহুদিন প্রচলিত দেশাচারানুসারে হিন্দু বিধবাদিগের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ।

"আবেদনকারিগণের মত এবং দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই নিষ্ঠুর এবং অস্বাভাবিক দেশাচার নীতিবিরুদ্ধ এবং সমাজের বহুতর অনিষ্টকারক। হিন্দুদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রচলন আছে। অনেক হিন্দু-কন্যা চলিতে বলিতে শিখিবার পূর্ব্বেও বিধবা হয়। ইহা সমাজের ঘোরতর অনিষ্টকারী।

"আবেদনকারীদিগের মত এবং দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই দেশাচার-প্রবর্ত্তিত প্রথা শাস্ত্রসঙ্গত নয়, কিংবা হিন্দু-অনুশাসনবিধির প্রকৃত অর্থ-সঙ্গতও নয়।

"বিধবা-বিবাহে আবেদনকারিগণের এবং অন্যান্য হিন্দুর এমন কোন বাধা নাই, যাহা বিবেকবুদ্ধির বিরুদ্ধ। এবম্প্রকার বিবাহে, সমাজ-প্রচলিত অভ্যাসহেতু এবং শাস্ত্রের কদর্থ জন্য ভ্রমাত্মক বিশ্বাসহেতু যে বাধা বিঘ্ন হইতে পারে, তাহা তাঁহারা অগ্রাহ্য করেন।

"আবেদনকারিগণ অবগত আছেন যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর আদালতসমূহে প্রচলিত হিন্দু-আইনবিধি অনুসারে

উক্তপ্রকার বিবাহ আইনবিরুদ্ধ এবং উক্তপ্রকার বিবাহে যে সমস্ত সন্তান-সন্ততি হইবে, তাহারা বিধিসম্মত সন্তান-সন্ততি মধ্যে পরিগণিত হইবে না।

"যে হিন্দুরা এরূপ বিবাহ বিবেকবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করেন না এবং সামাজিক এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভ্রমসংস্কার সত্ত্বেও যাঁহারা উক্তপ্রকার বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা উপরোক্ত হিন্দু-আইন প্রচলন কারণ এই প্রকার বিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে অক্ষম।

"এবম্প্রকার গুরুতর সামাজিক অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাইবার পক্ষে যে সব আইনসঙ্গত বাধা আছে, তাহা দূর করা ব্যবস্থাপক সভার কর্ত্তব্য। এই অনিষ্ট দেশাচার-অনুমত হইলেও, বহুতর হিন্দুর পক্ষে ইহা অত্যন্ত কষ্টের কারণ এবং ইহা হিন্দু অনুশাসনবিধির প্রকৃত মর্ম্মবিরুদ্ধ।

"এই বিবাহের আইনসঙ্গত বাধা অন্তর্হিত হওয়া, স্বধর্ম্ম-পরায়ণ আস্থাবান বহুসংখ্যক হিন্দুর একান্ত অভিপ্রেত ও অনুমত। যাঁহারা বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ বলিয়া স্থির বিশ্বাস করেন, যাঁহারা বিশেষ বিশেষ কারণে (কারণগুলি যদিও ভ্রান্তিপরিপূর্ণ) এইরূপ ব্যবস্থা সমাজের মঙ্গলজনক বলিয়া পোষকতা করেন, আইনসঙ্গত বাধা অন্তর্হিত হইলে, তাঁহাদের ভ্রমসংস্কার-বিরুদ্ধ বলিয়া বিস্ময়ের কারণ হইলেও, কোন-প্রকার অনিষ্টের কারণ হইবে না।

"এরূপ বিবাহ স্বভাববিরুদ্ধ নয় কিংবা অন্য কোন দেশে দেশাচারে বা আইনে নিষিদ্ধও নয়।

"যাহাতে হিন্দু বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ পক্ষে বাধা না থাকে এবং সেই বিবাহজাত সন্তান-সন্ততি যাহাতে বিধিসম্মত সন্তান-সন্ততি বলিয়া পরি-গৃহীত হয়, তাহার জন্য আইন প্রচলন করিবার সঙ্গতিবিষয়ে মহামান্য ব্যবস্থাপক সভা আশু বিবেচনা করুন।"

পরে এতৎসম্বন্ধে আইনের এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বর বা ১২৬২ সালের ২রা অগ্রহায়ণ ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য গ্রাণ্ট সাহেব, আইনের যে পাণ্ডুলিপি পেশ করেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ এই,—

এতদ্দ্বারা সকলে অবগত আছেন যে, ইষ্টিণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীনে, ভারতের দেওয়ানী আদালতসমূহে প্রচলিত আইন-অনুসারে, হিন্দু বিধবারা, দুই এক স্থলবিশেষ ব্যতিরেকে, একবার বিবাহ হইয়াছে বলিয়া, দ্বিতীয় বার আইনসঙ্গত বিবাহ করিতে পারেন না এবং যদি করেন, তাহা হইলে সেই বিবাহজাত সন্তান-সন্ততি বিধিসম্মত সন্তান-সন্ততি মধ্যে পরিগণিত হয় না। কিন্তু অধিকাংশ হিন্দুর বিশ্বাস এই যে, ইহা যদিও দেশাচার-অনুমত, তথাপি শাস্ত্রসম্মত নয়। তাঁহাদের ইচ্ছা এই যে, বিবেকবুদ্ধি-প্রবর্ত্তিত হইয়া যদি কোন হিন্দু এইরূপ বিধবা-বিবাহ দেন, তাহা হইলে আদালতপ্রচলিত আইন যেন সে বিবাহে বাধা না দেয় এবং এইরূপ বাধার জন্য যে সকল হিন্দু কষ্ট পাইতেছে, তাহাদের কষ্ট নিবারণ করাই উচিত। হিন্দু বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ পক্ষে আইনসঙ্গত বাধা রহিত হইলে, হিন্দুদিগের ভিতরে সুনীতি স্থাপিত হইবে এবং তাহাদের অনেক মঙ্গলের কারণ হইবে। সেই জন্য আইন করা যাইতেছে যে—

(১) মৃতভর্তৃকা হিন্দু কন্যা, কিংবা যাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু যে ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহার মৃত্যু হওয়াতে বিবাহ হয় নাই, এমন অবস্থায় কোন হিন্দু-কন্যা যদি বিবাহ করেন, তাহা হইলে সেই বিবাহ আইনে অসঙ্গত বলিয়া ধরা হইবে না; এবং সেই বিবাহ হইতে যে সন্তান-সন্ততি হইবে, তাহারা বিধিসম্মত সন্তান-সন্ততি বলিয়া অস্বীকৃত হইবে না। দেশাচারপ্রবর্ত্তিত প্রথা এবং হিন্দু-অনুশাসনবিধি এই আইনবিরুদ্ধ হইলেও, এই আইন নামঞ্জুর হইবে না।

(২) মৃত স্বামীর বিষয়সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারসূত্রে কিম্বা খোরাক-পোষাকসূত্রে যে কোন দাবী-দাওয়া, তাহা দ্বিতীয়বার বিবাহে রদ হইয়া যাইবে এবং সেই কন্যা তাঁহার প্রথম স্বামীর পক্ষে মৃত বলিয়া পরিগৃহীত হইবেন। তাঁহার মৃত স্বামীর অবর্ত্তমানে যে উত্তরাধিকারী, সেই ঐ স্বামীর বিষয়ের অধিকারী হইবে। কিন্তু ইহাও নিয়ম করা যাইতেছে যে, স্বামী ভিন্ন অন্য উত্তরাধিকারসূত্রে কোন বিধবার কোন সম্পত্তিতে যে দাবী-দাওয়া, কিম্বা স্ত্রী-ধন বলিয়া কোন বিষয় সম্পত্তির উপর যে দাবী দাওয়া, কিম্বা স্বামীর জীবদ্দশায় কিম্বা তাঁহার মৃত্যুর পর স্বোপার্জ্জিত বলিয়া কোন বিষয়-সম্পত্তিতে যে দাবী-দাওয়া থাকিবে, পুনর্বিবাহ করিলেও তাঁহার সেই দাবী-দাওয়া অব্যাহত রহিবে।

গ্রাণ্ট সাহেব আইনের যে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ এই,—

"১৮৫৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতাস্থ এবং কলিকাতার নিকটস্থ সম্ভ্রান্ত বংশীয় আন্দাজ সহস্র হিন্দু দ্বারা স্বাক্ষরিত এই আবেদন পেশ হয়। আবেদনের উদ্দেশ্য এই যে, এমন কোন আইন করা হউক, যাহাতে হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ আইনসঙ্গত যে বাধা, তাহা রদ হইবে এবং এরূপ নিয়ম হউক যে, ঐ বিবাহজাত সন্তান-সন্ততি বিধিসম্মত সন্তান-সন্ততি বলিয়া গৃহীত হইবে।

আবেদনকারিগণ বলেন, বহুদিন প্রচলিত প্রথা অনুসারে এরূপ বিবাহ নিষিদ্ধ। এই প্রকার দেশাচার কিন্তু নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক, অস্বাভাবিক, নীতিবিরুদ্ধ এবং অনিষ্টজনক। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, এই প্রচলিত প্রথা প্রকৃত শাস্ত্রসঙ্গত নয়; সুতরাং এই প্রথা তাঁহারা বিবেকবুদ্ধিপ্রবর্ত্তিত হইয়া গ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু আদালতের চলিত আইন অনুসারে হিন্দু বিধবার পুনর্ব্বিবাহ আইনসঙ্গত নয় কিম্বা এইরূপ বিবাহ-

জাত সন্তান-সন্ততিগণ বিধিসম্মত সন্তান-সন্ততি বলিয়া পরিগণিত হয় না। একারণ ব্যবস্থাপক সভাসমীপে তাঁহাদের প্রার্থনা এই যে, উক্ত সভা পুনঃবিবাহনিবারক বিধি রদ করিয়া তাঁহাদিগকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করুন। আইন রদ হইলে, তাঁহাদের বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী হিন্দুগণেরও কোন ক্ষতির কারণ হইবে না। তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভাকে ইহাও বিশেষ করিয়া জানাইতেছেন, যে আইন তাঁহাদিগের এই দুঃখ মোচন করিবে, তাহা বহুসংখ্যক স্বধর্ম্মরত হিন্দুর অনুমত ও অভিপ্রেত, তাহার আর সন্দেহ নাই।

যাঁহারা আবেদন করিয়াছেন, যাঁহারা এক্ষণে তাঁহাদের মতাবলম্বী এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা তাঁহাদের মতাবলম্বী হইবেন, তাঁহাদের কষ্ট মোচন করাই, এই আইনের উদ্দেশ্য। ইহাতে অন্য কাহারও অনিষ্ট হইবে না।

সকলেই অবগত আছেন যে, সতীদাহ প্রথা যখন উঠিয়া গিয়াছে, তখন হিন্দু শাস্ত্রানুসারে হিন্দু কন্যারা, বিধবা হইলে, সহগমন করিতে পারেন না। তাঁহাদিগকে অবশিষ্ট জীবন কষ্টকর বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যাঁহারা আবেদনকারিগণের মতাবলম্বী, তাঁহারা বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ অপেক্ষা হিন্দু বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ মঙ্গলজনক বিবেচনায় তাহার পোষকতা করেন। যাঁহারা তাঁহাদের বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী, তাঁহারা বিধবার বৈধব্যপ্রথার পক্ষপাতী। প্রচলিত আইন কিন্তু কোন পক্ষই সমর্থন করে না।

অবেদনপত্রে যে সমস্ত কথার আলোচনা হইয়াছে, তাহা যে সত্য, তাহার আর সংশয় নাই। যে সকল হিন্দু বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী, তাঁহারা এদেশপ্রচলিত মিউনিসিপাল আইনের জন্য তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে পারেন না। যে হিন্দু বিধবা-বিবাহ প্রচ[illegible] বিশেষ উৎসাহী, এই মিউনিসিপাল আইনের দরুণ তাঁহারা প[illegible]দ বাধা পান।

সাধারণত দেখিতে গেলে, এই বিধবা-বিবাহ-নিবারক আইন দ্বারা সুনীতি স্থাপিত এবং লোকের কোন সুখ সাধিত হওয়া দূরে থাকুক, ইহা সুনীতিকে পদদলিত করিতেছে এবং লোকের ভয়ানক ক্লেশের হেতু হইয়াছে। একারণ মোটের উপর এই দেখা যাইতেছে যে, দেওয়ানী কার্য্য-বিধির এই বিধিটী প্রচলিত থাকা, আর কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নয়।

ইহাও বলা উচিত যে, অনেকের বিশ্বাস, যে প্রথা বিধবা-বিবাহের বিরোধী, তাহা শাস্ত্রানুমোদিত এবং তাহা তাঁহাদের বিশেষ শ্রদ্ধেয়; সুতরাং তাঁহাদের মতে সুনীতিপরিচায়ক। এরূপ হইলেও যে মিউনিসিপাল আইন, সমাজে দুর্নীতির অবতারণা করে ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করে, তাহার কোন সার্থকতা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না। যখন দেখা যায় যে, এই আইন প্রচলিত থাকাতে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস না করেন, বরং ভাবেন, যে সমস্ত লোক উহাকে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া মানে, সে সমস্ত লোক ভ্রান্ত ও শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ, তাঁহাদের বিশেষ পীড়ার কারণ হইতেছে, তখন ইহার সার্থকতা কোথায়? যদি কোন হিন্দু পিতা শাস্ত্রজ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেকের অনুবর্ত্তী হইয়া, তাঁহার কন্যাকে আমৃত্যু কষ্টভোগ কিম্বা ব্যভিচার হইতে রক্ষা করিতে চাহেন, তাহা হইলে কোন আইনে যেন তাঁহাকে বাধা না দেয়। কোন খৃষ্টান কিম্বা মুসলমানকে বিধর্ম্মী বলিয়াই জোর করিয়া তাঁহার কন্যাকে চিরজীবনের জন্য দুঃখের কঠোর ক্রোড়ে অর্পণ করিতে বলাই যে ঘৃণাজনক, তাহা নহে, যে হিন্দু, শাস্ত্রের এই ভয়ানক ভ্রম-পরিপূর্ণ অপ্রকৃত অর্থ অবিশ্বাস্য বলিয়া অগ্রাহ্য করেন, তাঁহাকেও ঐরূপে কন্যাটীকে চিরকাল দুঃখ ভোগ করিবার জন্য বাধ্য করা, কিছু কম ঘৃণার বিষয় নয়।

যে বিল এক্ষণে ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হইয়াছে, তাহা মিউনিসিপাল আইনের দোষ সংশোধন করিবে। কিন্তু ইহা আবেদনকারিগণের ও বিরুদ্ধমতাবলম্বীদিগের কোন অনিষ্টের কারণ হইবে না। বিবাহ সম্বন্ধে

শাস্ত্রের কোন্ প্রমাণটী যথার্থ, কোনটী অযথার্থ কিংবা এই দুই বিরুদ্ধ মতের কোনটী অনুসরণ করা উচিত, ইহাতে তাহা প্রতিপন্ন করা হইতেছে না। ইহাতে এমন কোন বিষয় থাকিবে না, যাহাতে ইহা কোন লোকের মতের বিরুদ্ধাচরণ করে। কিন্তু যদি কোন হিন্দু আপনার মতের পোষকতা করিতে গিয়া কোন বিভিন্ন মতাবলম্বী বা অপেক্ষাকৃত হৃদয়বান প্রতিবেশিবর্গের দুঃখের কারণ হন কিংবা তাঁহাদের মধ্যে ব্যভিচার বিষ বপন করেন, তাহা হইলে ইহা তাহাই নিবারণ করিবে।

১২৬২ সালের ২রা অগ্রহায়ণ বা ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বর, পাণ্ডুলিপি প্রথম পঠিত হয়। গ্রাণ্ট সাহেব, এই পাণ্ডুলিপির পক্ষসমর্থনার্থ যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ শুনিলে, প্রকৃত হিন্দু-সন্তানকে কর্ণে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। ওয়ার্ড সাহেবের নজীর তুলিয়া গ্রাণ্ট সাহেব বলিয়াছিলেন,—"These young widows, being forbidden to marry, almost without exception, become prostitutes" অর্থাৎ হিন্দু বাল-বিধবারা প্রায়ই বেশ্যা হয়। শিব! শিব!

এই গ্রাণ্ট সাহেবই বলিয়াছিলেন,—"The Hindu practice of Brahmacharia was an attempt to struggle against nature, and like all other attempts to struggle against nature was entirely unsuccessful" অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য প্রকৃতির বিরুদ্ধ। এ প্রকৃতিবিরুদ্ধ-ব্রহ্মচার্য্য-পালনে হিন্দু অকৃতকার্য্য। এই কি প্রকৃত কথা?

এই গ্রাণ্ট সাহেবই বলিয়াছিলেন,—"৩। ৪ তিন চারি শত

বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত রঘুনন্দন আপনার বিধবা কন্যার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। এই রঘুনন্দনের ধর্ম্ম-শাস্ত্র-সংগ্রহমতে সমস্ত বঙ্গ পরিচালিত।"

যে রঘুনন্দন বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধ-মতপোষক বচন উদ্ধার করিয়া, বিধবা-বিবাহের বিধি নিষিদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তিনি আপন বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, গ্রাণ্ট সাহেব এ সব কোথায় পাইলেন, তাহার নির্ণয় নাই। হিন্দু-সমাজ অবশ্য এ কথা বিশ্বাস করিবেন না।

স্যর জেম্‌স কল্‌ভিলও গ্রাণ্ট সাহেবের প্রস্তাবের পোষকতা করেন।

১২৬২ সালের ৭ই মাঘ বা ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারি পাণ্ডুলিপি দ্বিতীয়বার পঠিত হয়। এই দিনই পাণ্ডুলিপি সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হয়।*

১২৬২ সালের ৫ই চৈত্র বা ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ্চ আইনের বিরুদ্ধে রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ ছত্রিশ হাজার সাত শত তেষট্টি জন লোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন-পত্র পেশ হয়।

ইহার পর আইনের বিরুদ্ধে নদীয়া, ত্রিবেণী, ভাটপাড়া, বাঁশবেড়িয়া, কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানের বহু পণ্ডিতমণ্ডলীর

---

* স্যর জেমস্ কল্‌ভিল্, মিঃ ইলিয়ট, মিঃ সি, জেইট এবং মিঃ গ্রাণ্ট সিলেক্ট কমিটীর সভ্য ছিলেন।

স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র পেশ হয়। ইহাঁরা সকলই বলিয়াছিলেন, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত নহে।

১২৬৩ সালের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ বা ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে সিলেক্ট কমিটী রিপোর্ট দাখিল করেন। ১২৬৩ সালের ৫ই শ্রাবণ বা ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই পাণ্ডুলিপি তৃতীয়বার পঠিত হয়। ১২৬৩ সালের ১২ই শ্রাবণ বা ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই আইন পাশ হইয়া যায়।

এই আইনের বিরুদ্ধে, ৫০।৬০ সহস্র ব্যক্তির স্বাক্ষরিত ৪০ খানির উপরও আবেদন-পত্র পেশ হইয়াছিল। ইহার পক্ষে হইয়াছিল, ৫ সহস্র লোকের স্বাক্ষরিত ২৫ খানি আবেদন পত্র।

তবুও আইন পাশ হইল। না হইবে কেন, ভারতের ভাগ্যবিধাতা বিধানকর্ত্তা রাজপুরুষেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, কেবল সিদ্ধান্ত কেন, স্পষ্টই বলিয়াছিলেন,—"হিন্দু-বৈধব্য বড়ই নিষ্ঠুর কাণ্ড; ইহা প্রকৃতির বিরুদ্ধ; এ নিষ্ঠুর কাণ্ড নিবারণের জন্য বিধবা-বিবাহের প্রয়োজন; পুনর্ব্বিবাহে বিধবা যাহাতে আইনসম্মত অধিকার হইতে বঞ্চিত না হয়, তাহার জন্য আইন করা প্রয়োজন; সেই প্রয়োজনবশতঃ এই আইন হইল; এ আইনের জন্য যে সকল লোক আবেদন করিয়াছেন, তাঁহারা গণ্য, মান্য ও বুদ্ধিমান্।" *

* এই আইন-সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ হইয়াছিল, তাহার মর্ম্মপ্রকাশ করিতে গেলেও, একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হয়। এই জন্য পাঠকবর্গকে

বিধান-বিধাতাদের কলমের আঁচড়ে ৫০ হাজার মান্যগণ্য হিন্দুর আবেদন উপেক্ষিত হইল। ইংরেজ-রাজ স্বদেশে সংখ্যানুপাতে সকল কাজ করিয়া থাকেন; পরাধীন পরদেশবাসী হিন্দু প্রজার পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিলেন। আত্ম-সম্ভ্রম রক্ষার জন্য, দেশের ৫০। ৬০ হাজার হিন্দুর কথা, নগণ্য বলিয়া উপেক্ষিত হইল! সদস্য কলভিল্ স্পষ্টতঃ বলিয়াছিলেন;—"এ আইনে ফল হইবে, আমার এই ধারণা; যদি না হয়, তাহা হইলে ইংরেজ নামের জন্য এই আইন পাশ করা উচিত।" *

ইহার উপর আর কথা কি? যুক্তি সকল সময়ই এইরূপ। "সতীদাহের" আইনে যে যুক্তি, বিধবা-বিবাহের আইনে সেই যুক্তি, আবার সহবাস-সম্মতি আইনের সেই যুক্তি। বিধবা-বিবাহের আইনে ৫০। ৬০ হাজার হিন্দু অগণ্য হইয়াছিল; সহবাস-সম্মতি আইনে কোটি কোটি হিন্দু অগণ্য হইয়াছে। বিদেশী বিধর্ম্মী রাজ যাহাকে কর্ত্তব্য ভাবিয়াছেন, তাহাই সাধন করিয়াছেন। দুরদৃষ্ট হিন্দুর। হিন্দু-সন্তানেরাই আপন পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিয়াছে।

পণ্ডিত নারায়ণকেশব বৈদ্য সঙ্কলিত "A collection containg the procedings which led to the passing of Act XV. of 1856" পড়িতে অনুরোধ করি।

* A collection containing the proceedings which led to the passing of Act XV of 1856.

আইন যাহা হইয়াছিল, তাহার অনুবাদ এই,—

উপক্রমণিকা।

যেহেতু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকৃত এবং শাসনাধীন দেশসমূহের দেওয়ানি আদালতে প্রচলিত আইন অনুসারে সাধারণতঃ হিন্দু বিধবাগণ একবার বিবাহ করিয়াছে বলিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে অক্ষম এবং এই সকল বিধবার পুনর্ব্বিবাহলব্ধ সন্তান জারজ ও পৈত্রিকসম্পত্তির অনধিকারী বলিয়া পরিগণিত হয়; এবং যেহেতু অনেকানেক হিন্দু বিশ্বাস করেন যে, চিরাগত আচারসম্মত হইলেও এই কল্পিত বৈধ প্রতিবন্ধকতা তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ এবং নিজ ধারণার অনুকূল ভিন্নাচার অবলম্বনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ ভবিষ্যতে আর ধর্ম্মাধিকরণের দেওয়ানি আইন কর্তৃক কোনরূপ বাধা না পান, ইহাই তাঁহাদিগের ইচ্ছা এবং যেহেতু উক্ত হিন্দুগণকে তাঁহাদিগের আপত্তি অনুসারে আইনের এই প্রতিবন্ধকতা হইতে উদ্ধার করা ন্যায়ানুমোদিত এবং হিন্দুবিধবার বিবাহে সমস্ত বাধা নিরাকৃত করিলে সুনীতির বিস্তার ও জনসাধারণের হিতানুষ্ঠান হইবে, আইন নিম্নলিখিতরূপে বিধিবদ্ধ করা যাইতেছে;—

হিন্দু বিধবার বিবাহ বৈধকরণ।

১। কোনরূপ বিরুদ্ধ আচার এবং হিন্দু-'লয়ের' কোনরূপ বিরুদ্ধ মর্ম্ম থাকিলেও যে বিবাহকালে স্ত্রীর পূর্ব্বকৃত বিবাহের পতি কিংবা পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত বিবাহের বর পরলোক-গত, হিন্দুদিগের মধ্যে সম্পাদিত সেইরূপ কোন বিবাহ অবৈধ হইবে না এবং সেইরূপ কোন বিবাহের সন্তান জারজ হইবে না।

পুনর্ব্বিবাহে পূর্ব্বপতির সম্পত্তিতে বিধবার স্বত্বাধিকার লোপ।

২। ভরণ-পোষণসূত্রে, পতি কিম্বা তাহার কোন উত্তরাধিকারীর উত্তরাধিকারসূত্রে কিংবা কোন উইল অথবা লিখিত বন্দোবস্ত দ্বারা

পুনর্ব্বিবাহের প্রকাশিত অনুজ্ঞা ব্যতীত পতির সম্পত্তিতে হস্তান্তর-ক্ষমতা-বিবর্জ্জিত কেবল সীমাবদ্ধ অধিকার প্রাপ্তিসূত্রে পরলোকগত পতির সম্পত্তিতে বিধবা যে কোন অধিকার বা স্বত্ব পাইবে, তাহা বিধবার পরলোকপ্রাপ্তির পর যেরূপ নষ্ট হয়, পুনর্ব্বার বিবাহ করিলেও সেইরূপ নষ্ট হইবে; এবং তাহার মৃত পতির তৎপর-ওয়ারিসান্ কিংবা তাহার মৃত্যুর পর যে কোন ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তিতে অধিকারী হওয়া বিধেয়, সেই অধিকারী হইবে।

বিধবার পুনর্ব্বিবাহে মৃত পতির সন্তানদিগের অভিভাবকতা।

৩। মৃত পতির উইল বা লিখিত বন্দোবস্ত দ্বারা যদি তাহার বিধবা স্ত্রী অথবা অন্য কোন ব্যক্তি তাহার (মৃত পতির) সন্তানদিগের অভিভাবক নিযুক্ত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে হিন্দু বিধবার পুনর্ব্বিবাহের পর মৃত পতির পিতা কিংবা পিতামহ, অথবা মাতা কিংবা পিতামহী অথবা মৃত পতির কোন আত্মীয় পুরুষ মৃত পতির মৃত্যুকালীন্ আইনসঙ্গত বাসস্থানের আদিম বিভাগসম্পন্ন উচ্চতম দেওয়ানি আদালতে উক্ত সন্তানদিগের ন্যায্য অভিভাবক নিযুক্ত করিবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন; এরূপস্থলে উক্ত আদালতের বিবেচনানুসারে উক্ত প্রকারের অভিভাবক নিযুক্ত করা আইনসঙ্গত হইবে; আর উক্ত অভিভাবক নিযুক্ত হইলে উক্ত সন্তানদিগের অথবা তাহাদিগের মধ্যে কোনটির নাবালক থাকা পর্য্যন্ত তাহাদের মাতার পরিবর্ত্তে রক্ষণাবেক্ষণের অধিকারী হইবে। অভিভাবাক নিযুক্তিকল্পে এস্থলে আদালত পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রচলিত আইন অনুসারে চালিত হইবেন।

কিন্তু উক্ত সন্তানদিগের নাবালককাল পর্য্যন্ত ভরণপোষণ এবং ন্যায্য শিক্ষার উপযোগী সম্পত্তি না থাকিলে মাতার অনুমতি ভিন্ন উক্ত প্রকারের অভিভাবক নিযুক্ত হইবে না। তবে সন্তানদিগের নাবালকত্ব

কাল পর্য্যন্ত ভরণপোষণ এবং ন্যায্য শিক্ষা নির্ব্বাহ করিবার প্রমাণ প্রস্তাবিত অভিভাবক কর্তৃক প্রদত্ত হইলে অভিভাবক নিযুক্ত হইবে।

এই আইনের কোন মর্ম্মানুসারে নিঃসন্তান বিধবা উত্তরাধিকার-
সূত্রে সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে না।

৪। এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি সম্পত্তি রাখিয়া পরলোক গমন করিলে কোন নিঃসন্তান বিধবা উক্ত সম্পত্তির অনধিকারিণী বলিয়া যেরূপ পরিগণিত হইত, এই আইনের কোনও মর্ম্মানুসারে উক্ত ব্যক্তি সম্পত্তি রাখিয়া পরলোক গমন করিলে, উক্ত নিঃসন্তান বিধবা উক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

পূর্ব্ব তিনটি ধারার (২, ৩ এবং ৪) নির্দ্ধারিত বিষয় ভিন্ন পুনর্ব্বিবাহ-
কারিণী বিধবার অন্য স্বত্ব রক্ষা।

৫। পূর্ব্ব তিনটি ধারার নির্দ্ধারিত বিষয় ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তি বা স্বত্বে কোন বিধবার অধিকারিণী হওয়া বিধেয় হইলে, সে পুনর্ব্বিবাহ হেতু তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে না, এবং পুনর্ব্বিবাহকারিণী বিধবা প্রথম পরিণীতার ন্যায় উত্তরাধিকার স্বত্বের অধিকারিণী হইবে।

বর্ত্তমান আইনসঙ্গত বিবাহে যে সমস্ত ক্রিয়া প্রযোজ্য তাহা বিধবা-
বিবাহে প্রযুক্ত হইলে সেইরূপ কার্য্যকারিণী হইবে।

৬। অপূর্ব্ব-পরিণীতা হিন্দু স্ত্রীর বিবাহে যে সমস্ত মন্ত্র উচ্চারিত ক্রিয়া-কলাপ আচরিত কিংবা নিয়ম প্রতিজ্ঞাত হয়, কিংবা যে সমস্ত ব্যবহার আইনসঙ্গত বিবাহের জন্য যথেষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়, হিন্দু বিধবার বিবাহে সেই সমস্ত উচ্চারিত, আচরিত কিংবা প্রতিজ্ঞাত হইলে ফলও তদ্রূপ হইবে; এবং ঐ সমস্ত মন্ত্র ক্রিয়াকলাপ কিংবা নিয়ম বিধবার সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে, এইরূপ আপত্তিতে কোন বিবাহ আইন বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

অপ্রাপ্তবয়স্কা বিধবার পুনর্ব্বিবাহে অনুমতি।

পুনর্ব্বিবাহোদ্যতা বিধবা অপ্রাপ্তবয়স্কা অক্ষতযোনি হইলে, পিতার, পিতার অবর্ত্তমানে পিতামহের পিতামহের অবর্ত্তমানে, মাতার, ইহাদিগের অবর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠ সহোদরের কিম্বা জ্যেষ্ঠ সহোদরেরও অবর্ত্তমানে তৎপর নিকট আত্মীয় পুরুষের অনুমতিতে পুনর্ব্বিবাহ করিবে।

এই ধারা-বিরুদ্ধ বিবাহে সহকারিতার দণ্ড।

যে সমস্ত ব্যক্তি এই ধারার মর্ম্মবিরুদ্ধ বিবাহে জ্ঞাতসারে সহকারিতা করিবে, তাহারা এক বৎসরের অনতিরিক্ত কাল কারাবাস, কিংবা জরিমানা কিম্বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

এইরূপ বিবাহের পরিণাম।

এবং এই ধারার মর্ম্মবিরুদ্ধ বিবাহ আদলত কর্ত্তৃক অবৈধ বলিয়া অস্বীকৃত হইতে পারে।

কিন্তু এই ধারার মর্ম্মবিরুদ্ধ বিবাহে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইলে বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। এবং ঐরূপ বিবাহের পর পতিসহবাস হইয়া গেলে আর তাহা অবৈধ বলিয়া অগ্রাহ্য হইবে না।

প্রাপ্তবয়স্কা বিধবার পুনর্ব্বিবাহে সম্মতি।

প্রাপ্তবয়স্কা ক্ষতযোনি বিধবার পক্ষে তাহার আত্মসম্মতিমাত্র পুনর্ব্বিবাহ আইনসঙ্গত এবং গ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার করিবার জন্য যথেষ্ট হইবে।

গবর্ণমেণ্টকে সামাজিক ব্যপারে হস্তক্ষেপ করিতে দেখিয়া হিন্দুমাত্রেই মর্ম্মাহত হইয়াছিল। সেই সময় প্রভাকর সম্পাদক মর্ম্মাহত হইয়া, যে কবিতাটী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এইখানে প্রকাশ করিলাম;—

"হিন্দু-বিধবার বিয়া, আছে অপ্রচার।
বহুকাল হতে যার, নাহি ব্যবহার॥
সে বিষয়ে ক্ষতাক্ষত, না করি বিশেষ।
করিলেন একেবারে, নিয়ম নির্দ্দেশ॥
শত শত প্রজা তায়, ব্যথা পায় প্রাণে।
তাদের আর্দ্দাশ নাহি, শুনিলেন কাণে॥
গ্রাণ্ট করি, গ্রাণ্টের সকল অভিলাষ।
কালবিল, কাল বিল করিলেন পাস॥
না হইতে শাস্ত্রমতে, বিচারের শেষ।
বল করি করিলেন, আইন আদেশ॥
যাহাদের ধর্ম্ম এই, আর দেশাচার।
পরস্পর তারা আগে, করুক বিচার॥
বিধি কি অবিধি তারা, ধর্ম্মেতে বুঝিবে।
যা হয় উচিত, তাই শেষেতে করিবে॥
করিছে আমার ধর্ম্ম, আমাতে নির্ভর।
রাজা হয়ে পরধর্ম্মে, কেন দেন কর?
আগে ভাগে রাজাদেশ, করিতে প্রচার।
এত কেন মাথাব্যথা, হইল রাজার?
যদ্যপি বিধান হয়, বিধবার বিয়ে।
আপনারা করুক, আপন দল নিয়ে॥
যুক্তি আর বিচারেতে, যে হয় বিহিত।
দেশেতে চলিত করা, তাহাতো উচিত॥
অনিয়মে করি একি, নিয়মের ছল।
ভূপতি তাহাতে কেন, প্রকাশেন বল?

কোলে কাঁকে ছেলে ঝোলে, যে সকল রাঁড়ী।
তাহারা সধবা হবে, প'রে শাঁকা শাড়ী॥
এ বড় হাসির কথা, শুনে লাগে ভয়।
কেমন কেমন করে, মনের ভিতর॥
শাস্ত্র নয়, যুক্তি না, হবে কি প্রকারে?
দেশাচারে, ব্যবহারে, বাধো বাধো করে॥
যুক্তি বোলে বিচার, করুন শত শত।
কোন মতে হইবেনা, শাস্ত্রের সম্মত॥
বিবাহ করিয়া তারা, পুনর্ভবা হবে।
সতী বলে সম্বোধন, কিসে করি তবে?
বিধবার গর্ভজাত, যে হয় সন্তান।
"বৈধ" বোলে কিসে তার, করিবে প্রমাণ?
যে বিষয় সর্ব্ববাদী সম্মত না হয়।
সে বিষয় সিদ্ধ করা, শক্ত অতিশয়॥
কলে আর ছলে বলে, যত পার কর।
ফলে সে কিছুই নয়, মিছে বকে মর॥
শ্রীমান্ ধীমান্, নীতি-নির্ম্মাণ কারক।
যাঁরা সবে হ'তে চান, বিধবাতারক॥
নত ভাবে নিবেদন, প্রতি জনে জনে।
আইন বৃক্ষের ফল, ফলিবে কেমনে?
বিধবার বিয়ে দিতে, যাহারা উদ্যত।
তার মাঝে বড় বড়, লোক আছে যত॥
যারে ইচ্ছা তারে হয় ডাকিয়া আনিয়া।
ঘরেতে বিধবা কত, পরিচয় নিয়া॥

গোপনেতে এই কথা, বলিবেন তারে।
জননীর বিয়ে দিতে, পারে কিনা পারে ?
যদি পারে, তবে তারে, বলি বাহাদুর।
এখনি করিলে সব, দুঃখ হয় দূর ॥
সহজে যদ্যপি হয়, এরূপ ব্যাপার।
করিতে হবে না তবে, আইন প্রচার ॥
যদি কেহ নাহি পারে, সাহস ধরিয়া।
বিফল কি ফল তবে, আইন করিয়া ?
পরস্পর আড়ম্বর, মুখে কত কয়।
কেহ আর মাথা তুলে অগ্রসর নয় ॥
গোলে-মালে হরিবোল, গণ্ডগোল সার।
নাহি হয় ফলোদয়, মিছে হাহাকার।
বাক্যের অভাব নাই, বদন ভাণ্ডারে।
যত আসে তত বলে, কে দূষিবে কারে ?
সাহস কোথায় বল, প্রতিজ্ঞা কোথায় ?
কিছুই না হতে পারে, মুখের কথায় ॥
মিছা-মিছি অনুষ্ঠানে, মিছে কাল হরা।
মুখে বলা, বলা নয়, কাজে করা করা ॥
সকলেই তুড়ি মারে, বুঝে নাকো কেউ।
সীমা ছেড়ে নাহি খ্যালে, সাগরের ঢেউ ॥
সাগর যদ্যপি করে, সীমার লঙ্ঘন।
তবে বুঝি হতে পারে, বিবাহ ঘটন ॥
নচেৎ না দেখি কোন, সম্ভাবনা আর।
অকারণে হই হই, উপহাস সার ॥

কেহ কিছু নাহি করে, আপনার ঘরে।
যাবে যাবে, যায় শক্র, যাক্ পরে পরে ॥
তখন এরূপ করে, হ'লে ব্যতিক্রম।
"ফাটায় পড়েছে কলা, গোবিন্দায় নম ॥"
রাজার কর্ত্তব্য কথা, করিতে বর্ণন।
এরূপ লিখিয়া আর, নাহি প্রয়োজন ॥
এইমাত্র শেষ কথা, কহিব নিশ্চয়।
এ বিষয়ে বিধি দেওয়া, রাজধর্ম্ম নয় ॥
মরুক মরুক বাদ, প্রজায় প্রজায়।
কোন্ কালে রাজার কি হানি আছে তায়? *

কবিতাসংগ্রহ, দ্বিতীয়ভাগ, ৮—৮৫ পৃষ্ঠা।

আইন পাশ হউক, বিধবা-বিবাহ হিন্দু-সমাজ-সম্মত নহে। আইন পাশ হইবার পর ৬০। ৭০টী মাত্র বিধবা-বিবাহ হইয়াছে। এরূপ বিবাহে লিপ্ত ব্যক্তির প্রতি হিন্দুর সহানুভূতি নাই। বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া হিন্দু সমাজে স্বীকৃত হয় নাই। Asiatic Quarterly Review নামক পত্রিকায় Child widow নামক প্রবন্ধলেখক এই কথা লিখিয়াছেন,—

"It has prov d a dead letter. Not only does it fail to secure to a widow her civil rights to property inherited from her husband, but it has not in the

* বিধবা-বিবাহের আন্দোলন কালে বাঙ্গালা ভাষায় কিরূপ অবস্থা ছিল, এই সব পদ্যও তাহার কতক পরিচায়ক।

least degree mitigated the religious abhorrence with which orthodox Hindus regard such remarraige." *

বিধবা-বিবাহের আইন পাশ হইল; কিন্তু আইনে বিধবার পুনর্বিবাহে, মৃত স্বামীর বিষয়াধিকার রহিল না। তা না থাকুক, বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতীরা বিধবাবিবাহ প্রচলন পক্ষে এই আইনটীকে একটী মহদাশ্রয়রূপে অবলম্বন করিলেন। আইন পাশ হইবার পর, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর বা ১২৬৩ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে ও উদ্যোগে, শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া ষ্ট্রীটস্থ ভবনে, প্রসিদ্ধ কথক ৺রামধন তর্কবাগীশের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিধবাবিবাহ করেন। † এই বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে তৎকালে সংবাদ প্রভাকরে যে বিবৃত বিবরণ প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাই এইখানে প্রকাশিত হইল,—

"গত ২৩ অগ্রহায়ণ রবিবার বিধবার বিবাহপক্ষ ব্যক্তিব্যূহের বিশেষ স্মরণীয় হইবেক, প্রতি বৎসর তাঁহারা ঐ দিবস পর্ব্বাহ দিবসের ন্যায় বিবেচনা করিয়া আমোদপ্রমোদ করিলেও করিতে পারেন, যেহেতু উক্ত দিবা-

---

* The woman of India, P. 127.

† ১৫ই অগ্রহায়ণ বিবাহের কথা ছিল। কিন্তু শ্রীশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মাতৃপ্রতিবন্ধকের ছল ধরিয়া, বিধবা-বিবাহ করিতে অসম্মত হন। এই কথা লইয়া, তৎকালে ২৭শে নবেম্বর তারিখের ইংলিশম্যান বিদ্রূপ করেন। ইহার পর শ্রীশচন্দ্র পুনরায় বিবাহ করিতে সম্মত হন। শ্রীশচন্দ্রের যে দিন বিবাহ হয়, সে দিন নবদ্বীপাধিপতি রাজা শ্রীশচন্দ্র লোকান্তরিত হন।
সংবাদ প্রভাকর।

যামিনীযোগে তাঁহারা বিবিধ প্রকার প্রতিবন্ধকতা প্রতিসংহারপূর্ব্বক আপনাদিগের দলস্থ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ন্যায়রত্নের সহিত লক্ষ্মীমণি নাম্নী কোন অবীরার বিধবা-কন্যার উদ্বাহ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, ঐ বিবাহের কন্যাযাত্রিদিগের নিকটে উক্ত অবীরা যে রক্তাকার পত্র প্রেরণ করেন তাহা এই ;—

"শ্রীশ্রীহরিঃ।
শরণং।

শ্রীলক্ষ্মীমণি দেব্যাঃ—

সবিনয়ং নিবেদনম্।

২৩ অগ্রহায়ণ রবিবার আমার বিধবা কন্যার শুভ বিবাহ হইবেক মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক কলিকাতার অন্তঃপাতী সিমুলিয়ার সুকেসষ্ট্রীটের ১২ সংখ্যক ভবনে শুভাগমন করিয়া শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন, পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। ইতি তারিখ ২১ অগ্রহায়ণ, শকাব্দাঃ ১৭৭৮।"

জগৎকালীর দ্বিতীয়োদ্বাহের এই রক্তময় পত্র প্রাপ্ত হইয়া বাবু নীল-কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু দিগম্বর মিত্র, বাবু প্যারিচাঁদ মিত্র, বাবু নৃসিংহচন্দ্র বসু, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভাস্কর সম্পাদক, প্রভৃতি অনেক লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহার মধ্যে বিদ্যালয়ের বালক ও কৌতুকদর্শি লোক সংখ্যাই অধিক বলিতে হইবেক, রক্ততৎপর লোক-সমারোহে রাজপথ আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সারজন সাহেবেরা পাহারওয়ালা লইয়া জনতা নিবারণ করেন, রাত্রি অনুমান ১১ ঘটিকাকালে বর বাহাদুর শকটারোহণে সমাগত হইয়া সভাস্থ হইলে সকলে সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করেন, দুই এক টাকা বিদায় পাইবার প্রত্যাশাপন্ন হইয়া প্রায় শতাধিক লোক লাল বনাতাবৃত ভট্টাচার্য্য ও রামগতি প্রভৃতি কয়েকজন ঘটক ও পঞ্চুভাট প্রভৃতি কয়েকজন ভাট

উপস্থিত থাকিয়া গোল করিয়া হাট বসাইয়াছিল, অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

বিবাহ সময়ে বরবাহাদুর আসনোপবিষ্ট হইলে উভয় পক্ষের পুরোহিতেরা বিবাহমন্ত্র পাঠ করেন, তাহার কিছুই রূপান্তর করেন নাই, লক্ষ্মীমণি কন্যাদান করেন, দান সামগ্রী অলঙ্কার সকলই ছিল, পরে বর স্ত্রী-আচারস্থলে গমনকালে এদেশের প্রচলিত প্রথানুসারে "দ্বারষষ্ঠী ঝাঁটাকে" প্রণাম করেন, ও স্ত্রী-আচারস্থলে উলু উলুধ্বনি, নাকমলা, কানমলা ও "কড়ি দে কিনলেম্, দড়ি দে বাঁদলেম্, হাতে দিলাম্ মাকু একবার ভ্যা করত বাপু।" রমণীগণের একান্ত প্রার্থনায় বর বাহাদুর ভ্যাও করিয়াছিলেন।

এইরূপে উদ্বাহ নির্ব্বাহ হইলে আহারের ধুম পড়িয়া যায়, প্রায় ছয় শত লোক রঙ্গ দেখিয়া মোণ্ডা ভাঙ্গিয়া গোল করিয়া ঢোল পিটিয়া পাড়া তোলপাড় করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন, বাসর ঘরের ব্যাপার আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই, যাহা হউক এই বিবাহে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহ পবিত্র হইয়াছে, অঙ্গনাগণও বিলক্ষণ আমোদ প্রমোদ করিয়াছেন, দম্পতির উভয় কুল পরিশুদ্ধ হইল, "যেমন হাঁড়ি তেমনি সরা" মিলিল, বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তদনুসঙ্গে বিধবার বিবাহ রঙ্গিগণের ভাবভঙ্গি দেখিয়া অনেকেই তাঁহাদিগের সাধুবাদ করিয়াছেন।

পাঠকগণ! আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি এবং এইক্ষণেও লিখিতেছি যে হিন্দু বিধবার এই প্রথম বিবাহ কোন ক্রমেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে বাচ্য হইতে পারে না, যেহেতু বিবাহস্থলে দম্পতির পরিবার বা জ্ঞাতি কুটুম্ব কেহই উপস্থিত হয় নাই, এবং কন্যার খুড়া কিম্বা ভ্রাতা ইত্যাদি কেহই তাঁহাকে পাত্রস্থ করেন নাই, তাঁহার জননী চক্রাকার রূপচাঁদের মোহন মন্ত্রে মুগ্ধা হইয়া তাঁহাকে সম্প্রদান করিয়াছেন, বর-পাত্রও কেবলমাত্র রাজদ্বারে প্রিয়পাত্র হইবার প্রত্যাশায় এতদ্রূপে ত্রিকুল পবিত্র করিলেন,

পরিশেষে কি হয় তাহা অনির্ব্বচনীয়, যাহা হউক তিনি প্রথমতঃ সাহসিক-রূপে বুক বাঁন্ধিয়া এতদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়াতে বিধবার বিবাহ পক্ষগণ অবশ্য তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিবেন।

*   *   *   *   *

"অপিচ এই নূতন বিবাহের কথা অধুনা সর্ব্বত্রই বাহুল্যরূপে আন্দোলন হইতেছে, এবং কত লোকে কত প্রকার আকাশভেদি কথার উত্থাপন করিতেছেন তাহার সংখ্যা হয় না, কেহ বলিতেছেন যে মান্যবর মেং-হালিডে সাহেব বিবাহসমাজে সমাগত হইয়া দম্পতিকে মূল্যবান অঙ্গুরী যৌতুক দিয়াছেন, কেহ বা কৌতুকতৎপর হইয়া বলিতেছেন যে কৌন্সেলের বিজ্ঞবর মেম্বর মেং গ্রাণ্ট প্রভৃতি কয়েকজন ইংরাজ সভাস্থ হইয়াছেন, লর্ড কেনিং বাহাদুরের আসিবার কথা ছিল কেবল কার্য্য-প্রতিবন্ধকতা জন্য তিনি আগমন করিতে পারেন নাই, এইরূপ বাজার গল্প বিস্তর, কিন্তু ইহার একটী কথাও সত্য নহে, বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তাঁহার সঙ্গিগণ অতি সুবিবেচনাপূর্ব্বক হিন্দু-বিধবার এই প্রথম বিবাহে সাহেব নিমন্ত্রণ করেন নাই, কারণ সাহেবেরা আগমন করিলেই সাধারণে শ্রীশচন্দ্রের এই বিবাহকে সাহেব বিবাহ বলিবেন, অধ্যাপকদিগকে আহ্বান করিয়া কাহাকে দুই টাকা কাহাকেও বা চারি টাকা বিদায় দিয়াছেন, এবং পুস্তকে তাঁহাদিগের নাম স্বাক্ষর করাইয়া লইয়াছেন, আর পূর্ব্বে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই নূতন প্রকার বিবাহের নিমন্ত্রণে আগমনপূর্ব্বক যাঁহারা উৎসাহ প্রদানের ইচ্ছা করেন তাঁহারা তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের নিকটে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইয়াছিল, অতএব আমরা বোধ করি যে এই বিবাহ বিবরণ যখন সর্ব্ব সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ হইবেক তখন সভাস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অপরাপর ব্যক্তি-দিগের নাম প্রকাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। *   *   *

৩০

"শুনিলাম উক্ত বৈধব্যদশাবিগতা সধবাদশাপ্রাপ্তা রমণীর বয়ঃক্রম ১৫।১৬ বৎসর হইবেক।"

সেই সময় শ্রীগোপীমোহন মিত্র এই স্বাক্ষর করিয়া এক ব্যক্তি এতৎসম্বন্ধে সংবাদ প্রভাকরে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহারও কয়েকটী কথা পাঠকগণের অবশ্য-মনোযোগ্য বলিয়া উদ্ধৃত হইল,—

"অনেক স্বধর্ম্ম-পরায়ণ ভদ্র হিন্দু সন্তানগণ আশ্চর্য্য ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কিরূপে চিরকালাপ্রচলিত ও সনাতন-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বিধবা বিবাহের মন্ত্রাদি পাঠ হয়, এবং কন্যার শ্বশুর-কুল অথবা পিতৃকুল কিম্বা মাতৃকুলের মধ্যে কেহই বা সম্প্রদান করে, ইত্যাদি বিবিধ প্রকার বিচিত্র স্বপ্নবৎ অভাবনীয় রঙ্গ দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। সভায় দুই সহস্র লোক উপস্থিত ছিল যথার্থ বটে, কিন্তু তন্মধ্যে অধিকাংশ অনিমন্ত্রিত রঙ্গদর্শক। ইহাঁরা কেহই তথায় ভোজন করেন নাই এবং বিধবাবিবাহ বৈধ বলিয়া নাম স্বাক্ষরও করেন নাই; সুতরাং ইহাঁদিগকে তন্মতাবলম্বি বলা যাইতে পারে না। ইংরাজগণের বিবাহ অথবা সমাধি দর্শনে অনেক ক্রিয়াকলাপ-বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত হিন্দু গমন করিয়া থাকেন, অনেকে অগত্যা কসাই টোলায় গোহত্যাও দর্শন করিয়া থাকেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের কোন দোষ আইসে না। এক্ষণে আমি গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বিনয় বচনে জিজ্ঞাসা করি গত রবিবাসরীয় নিশাতে শ্রীশচন্দ্রের বিবাহ অনিশ্চিত থাকাতে আর দুই তিন বর বিবাহস্থলে উপস্থিত ছিল কি? *

---

* এই সময় সমাচার-চন্দ্রিকা, সংবাদ-প্রভাকর ও ভাস্কর প্রধান সংবাদপত্র ছিল। ৺গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ভাস্করের সম্পাদক ছিলেন। ভাস্করে বিধবা-বিবাহের পক্ষসমর্থন হইয়াছিল। ভাস্করে প্রভাকরে প্রতিদ্বন্দ্বীতা চলিত।

এই বিবাহ যে সাধারণ হিন্দু-সমাজ-সম্মত হয় নাই, তাহার আর সন্দেহ কি? এই বিবাহ-সংস্পর্শ জন্য সমাজচ্যুতি-দৃষ্টান্তও বিরল নহে। নিম্নলিখিত পত্রখানি তাহার অন্যতম প্রমাণ।

শ্রীঃ—]

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

সোদরাধিকেষু—

ভ্রাতঃ!

লক্ষ্মীমণির বিধবা কন্যার বিবাহে আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণী ঘটকতা করিয়াছিল এই অভিযোগ দিয়া বহিরগাছি ধর্ম্মাদহ প্রভৃতি গ্রামের লোকেরা ইহাঁদিগকে নিমন্ত্রণামন্ত্রণাদি তাবত ব্যাপারে বর্জ্জিত করিয়া একঘরিয়া করিয়াছে। এ নিমিত্ত আমার বৃদ্ধ শ্বশুর ও শ্বশ্রূঠাকুরাণীর মনে যে মর্ম্মান্তিক দারুণ যাতনা দুঃখ জন্মিয়াছিল, সেই গ্লানি দূর করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে রামসিংহ দুই শত টাকা ব্যয় করিয়া দেশের সেই দলাদলি মিটাইয়া দেয়। আমি উহাকে তৎকালে এরূপ আশাভরোসা দিয়া কহিয়াছিলাম যে বিধবাবিবাহের সহকারিতা করিয়া তুমি এই দায়ে পতিত হইলে, অতএব বিদ্যাসাগর ভায়া অবশ্যই কোন না কোন কিনারা করিয়া দিবেন। তিনি কোন মতে অবিবেচনা করিবেন না।

অভিন্ন-হৃদয়

শ্রীমদনমোহন শর্ম্মণঃ।

বিধবা-বিবাহ করিয়া এবং বিধবা-বিবাহের সম্পর্কে থাকিয়া, অনেককেই এইরূপ পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সাহায্য লইতে হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও অকাতরে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায়

কয়েকটী মাত্র বিধবা-বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু ইহার সাহায্যার্থ তাঁহাকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। ঋণ ৪০।৫০ সহস্র টাকার কম নহে।*

তাহাতেও বিদ্যাসাগর ক্ষণমাত্র বিচলিত হন নাই। প্রতিজ্ঞায় বিদ্যাসাগর ভীষ্মের ন্যায় অটল। অকার্য্যেও চরম আত্মোৎসর্গ। ভ্রমেও লাঞ্ছনা-তাড়নায় ভ্রূক্ষেপ ছিল না। প্রকৃতই অনেকে তাঁহাকে এ ব্যাপারে প্রথমতঃ উৎসাহ দিয়া, পরে ভ্রম বুঝিয়াই হউক, আর যে কোন কারণেই হউক, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া, স্বয়ং একাকী বিশ্ববিজয়ী বীরের ন্যায় যুঝিয়াছিলেন।

হিন্দু-সন্তানকে বলি, বিদ্যাসাগরের ভ্রমে ভুলিও না। তাঁহার দৃঢ়তা, একাগ্রতা, আত্মনির্ভরতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা শিখিয়া লও। ভগবদিচ্ছায় একটু সু-বাতাস ফিরিয়াছে। ইংরেজিশিক্ষিত অনেক হিন্দু-সন্তানের মতিগতিও ফিরিয়াছে। ইংরেজি শিক্ষার প্রথম উদ্যোগে যতটা উচ্ছৃঙ্খলতা ঘটিয়াছিল, এখন ততটা নাই। স্রোতস্বতীর উৎপত্তি-স্থলে প্রথম জলোচ্ছ্বাস উত্তাল তরঙ্গে পাহাড় ভাঙ্গিয়া দুকূল ভাসাইয়া লইয়া যায় পরে নদীরূপে স্রোতপ্রবাহে সে উচ্ছৃঙ্খলতা থাকে না। ইংরেজি

* শুনিয়াছি, বিধবা-বিবাহের সম্বন্ধে কোটার রাজা ১৪ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। যিনি বিধবা কন্যা বিবাহ দিবেন এবং যিনি বিবাহ করিবেন, তাহাদিগের প্রত্যেককে দশ হাজার টাকা দিব বলিয়া, ধনকুবের মতিলাল শীল সঙ্কল্প করিয়াছিলেন মাত্র।

শিক্ষা-স্রোতের এখন কতক সেই ভাব। শাস্ত্র-শিক্ষা প্রচার-বাহুল্য জন্য ইংরেজিশিক্ষিত ব্যক্তিগণের উচ্ছৃঙ্খলতা কতক প্রশমিত। বিধবা-বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা এখন অনেকেই স্বীকার করেন।

বিধবা-বিবাহের জন্য বিদ্যাসাগরকে অনেক লাঞ্ছনা ও তাড়না সহিতে হইয়াছিল। কেহ কেহ তাঁহার প্রাণনাশেরও সঙ্কল্প করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর তাহাতেও বিচলিত হন নাই। তাড়না ও লাঞ্ছনা সম্বন্ধে ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু ১২৯৮ সালের ২০শে ভাদ্রের হিতবাদীতে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

"বিদ্যাসাগর পথে বাহির হইলে চারিদিক হইতে লোক আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিত; কেহ পরিহাস করিত, কেহ গালি দিত। কেহ কেহ তাঁহাকে প্রহার করিবার—এমনকি মারিয়া ফেলিবারও ভয় দেখাইত। বিদ্যাসাগর এ সকলে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। একদিন শুনিলেন, মারিবার চেষ্টা। কলিকাতার কোনও বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি, বিদ্যাসাগরকে মারিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। দুর্বৃত্তেরা প্রভুর আজ্ঞাপালনের অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে। বিদ্যাসাগর কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইলেন না। যেখানে বড়মানুষ মহোদয় মন্ত্রিবর্গ ও পারিষদগণে পরিবৃত হইয়া প্রহরীরক্ষিত অট্টালিকায় বিদ্যাসাগরের ভবিষ্যৎ-প্রহারের উদ্দেশে কাল্পনিক সুখ উপভোগ করিতেছিলেন, বিদ্যাসাগর একেবারে সেইখানে গিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সকলেই অপ্রস্তুত ও নির্ব্বাক্ হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ গত হইলে একজন পারিষদ বিদ্যাসাগরের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন, 'লোকপরম্পরায় শুনিলাম, আমাকে মারিবার জন্য আপনাদের নিযুক্ত লোকেরা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আমার সন্ধানে ফিরিতেছে ও

খুঁজিতেছে; তাই আমি ভাবিলাম, তাহাদিগকে কষ্ট দিবার আবশ্যক কি, আমি নিজেই যাই? এখন আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করুন। ইহার অপেক্ষা উত্তম অবসর আর পাইবেন না।' লজ্জায় সকলে মস্তক অবনত করিলেন।"

বিধবা-বিবাহের বিপক্ষবাদীদের মধ্যে কেহ কেহ ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অজস্র গালিমন্দ দিত। এতৎসম্বন্ধে এইরূপ একটা গল্প আছে,—"একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় গাড়ীর যে কামরায় ছিলেন, পাণ্ডুয়া ষ্টেশনে সেই কামরায় একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত উঠিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরকে জানিতেন না। তিনি বিদ্যাসাগরকে উদ্দেশ করিয়া গালিমন্দ দিয়াছিলেন। পরে হুগলী ষ্টেশনে নামিয়া তিনি জানিতে পারেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাক্ষাতেই বিদ্যাসাগরকে গালি দেওয়া হইয়াছে। অকস্মাৎ এই ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া ব্রাহ্মণ কেমন যেন সংজ্ঞাহীন হইয়া, ষ্টেসনের প্ল্যাটফরমে পড়িয়া গিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার শুশ্রূষা করেন এবং পথ্যের স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করেন।"

বিধবা-বিবাহের প্রতিবাদ সম্বন্ধে অমূল্য বাবু হিতবাদীতে এই রহস্যজনক গল্প লিখিয়াছিলেন,—"স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর প্রাট সাহেব, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার পুস্তকের যে সব প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে

কাহার প্রতিবাদ ভাল? যে ব্যক্তি বেশী গাল দিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়, রহস্য কহিয়া তাঁহার নাম করেন। গ্রাট সাহেব, কথাটা সত্য ভাবিয়া, তাহার নাম টুকিয়া লন। পরে তিনি সেই ব্যক্তিকে ডিপুটী ইন্‌স্পেক্টর পদে নিযুক্ত করেন। সেই ব্যক্তি এক দিন প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলেন,—"যাহা হইবার হইয়াছে, দেখিবেন যেন চাকুরিটী না যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া বলেন,—তাহা হইলে আর চাকুরী হইত না।"

কেহ কেহ বলেন, বীরসিংহগ্রামে একবার একটী বালিকার বৈধব্য সংঘটনে ব্যথিত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী, শাস্ত্রীয় মতে বিধবার বিবাহ হইতে পারে কি না, পুত্রকে প্রশ্ন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই দিন হইতেই শাস্ত্রীয় প্রমাণ-সংগ্রহ করিতে থাকেন। এ কথা কতদূর সত্য, তা জানি না; তবে নারায়ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননীর ধারণা ছিল, তাঁহার পুত্র এ বিষয়ে অভ্রান্ত। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল বিধবা-বিবাহ দিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী তাহাদের কাহারও কাহারও সহিত আহার করিতেন। এক দিন নারায়ণ বাবু বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর মা! তুমি যে ইহাদের সহিত আহার করিতেছ? ইহাতে যে জাতি যাইবে।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী উত্তর দিলেন,—"দোষ কি? ঈশ্বর বহুশাস্ত্রজ্ঞ; ঈশ্বর কি অন্যায় কাজ করিতে পারে?"

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতার কি মত ছিল, তৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। কেহ বলেন,—তাঁহার মত ছিল না; বিধবা-বিবাহের সম্পর্ক হেতু নানা সামাজিক লাঞ্ছনা ও তাড়না সহিতে হইয়াছিল বলিয়া, তিনি কাশীবাসী হন। কেহ বলেন,—"তাহার মত ছিল। বিধবা-বিবাহ যদি শাস্ত্র সম্মত হয়, পুত্র যদি তাহা প্রমাণ করিতে পারে, তাহা হইলে বিধবা-বিবাহে ক্ষতি কি, এইরূপ তাঁহার মত ছিল। বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে পুস্তিকা প্রকাশিত হইলে পর, পিতা ঠাকুর দাস পুত্রকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছিলেন।"

শ্রীযুক্ত শ্যামলধন মিত্র মহাশয়কে, বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং বলিয়াছিলেন,—"পিতা মাতার মত না থাকিলে, অন্ততঃ তাঁহাদের জীবদ্দশায় এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না।" শ্যামলধন বাবু হিতবাদীতে এই কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

পিতৃ মাতৃ-ভক্ত বিদ্যাসাগরের একথা বিচিত্র কি? পিতা ঠাকুর দাসের ভ্রান্তি হওয়াই বা বিচিত্র কি? বিশেষ পুত্রকে যখন তাঁহার শাস্ত্রদর্শী বলিয়া বিশ্বাস, আর পুত্রও যখন শাস্ত্র-মতে বিধবা-বিবাহ-প্রচলনে প্রয়াসী, তখন পিতার তাহা অসঙ্গত বোধ না হইতেও ত পারে। মাতা সম্বন্ধেও অন্য কথা কি?

পিতামাতার অমত হইলে, বিদ্যাসাগর হয়ত, হয়ত কেন, নিশ্চিতই, তাঁহাদের জীবদ্দশায় বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের প্রয়াসে বিরত হইতেন। পিতামাতাই যে তাহার উপাস্যদেবতা ছিলেন। তিনি প্রায়ই বন্ধু বান্ধবকে বলিতেন,—"পিতামাতাই ঈশ্বর।"

পিতামাতার তুষ্টি-সাধনই তাঁহার জীবনের চরম কামনা ছিল। নিজের বিশ্বাস থাকুক বা নাই থাকুক, পিতামাতার যাহাতে তুষ্টি, তৎসাধন পক্ষে তিনি কখন কোনরূপ ত্রুটী করিতেন না। এক বার বীরসিংহ গ্রামে জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে তাঁহার পিতা ও মাতার মধ্যে মতাবরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। পিতার ইচ্ছা, পূজা উপলক্ষে বাদ্যবাজনা ধুমধাম হয়; মাতার ইচ্ছা এ সব না করিয়া, কেবল গরীব কাঙ্গালীদের খাওয়ান হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়, কলিকাতা হইতে, বীরসিংহ গ্রামে গমন করিলে, পিতামাতা উভয়েই আপনাদের মনোগত অভিপ্রায় তাঁহাকে বিদিত করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু হাসিয়া বলেন,—"উভয়েরই কথা থাকিবে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় উভয়েরই মনস্তুষ্টি-সাধক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পিতামাতার প্রতি যাঁহার এরূপ ভাব, তিনি তাঁহাদের অসম্মতিক্রমে কোন কার্য্যই করিতে পারিতেন না। পিতামাতা ব্যতীত তিনি জগতের আর কোন ব্যক্তির মুখাপেক্ষী হইয়া, অনুষ্ঠিত কার্য্য হইতে পশ্চাৎপদ হইতেন না।

এই বিধবা-বিবাহ ব্যাপারে, তাঁহার শিক্ষাগুরু প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের মত ছিল না; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাহাতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। এতৎসম্বন্ধে তাঁহাদের উভয়েরই যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা এইখানে উদ্ধৃত হইল,—

"এক দিন তর্কবাগীশ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলেন,—'ঈশ্বর। বিধবা-বিবাহের অনুষ্ঠান হইতেছে বলিয়া প্রবল জনরব। কতদূর

কি হইয়াছে জানি না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই যে, দেশের বিজ্ঞ ও বৃদ্ধমণ্ডলীকে স্বমতে আনিতে কৃতকার্য্য হইয়াছ কি না? যদি না হইয়া থাক, তবে অপরিণামদর্শী নব্যদলের কয়েকজনমাত্র লোক লইয়াই এইরূপ গুরুতর কার্য্যে তাড়াতাড়ি হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা করিবে।' বিদ্যাসাগর বলিলেন,—'মহাশয়! আপনার প্রশ্নভঙ্গীতে আমার উদ্যমভঙ্গের আশঙ্কা দেখিতেছি; আপনাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, নচেৎ আপনাকে'—তর্কবাগীশ তাঁহার কথা শেষ না হইতেই বলিলেন, 'নচেৎ আমাকে এই আসন হইতে এখনি উঠাইয়া দিতে। ঈশ্বর! তুমি এই কার্য্যে যেরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প এবং একাগ্রচিত্ত হইয়াছ, তাহাতে আমি এইরূপ উত্তর পাইব বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি। ইহাতে অণুমাত্র ক্ষুব্ধ নহি। বিদ্যাসাগর বলিলেন, আমি তত সাহসের কথা বলিতেছিলাম না। আপনি বিজ্ঞ ও বৃদ্ধমণ্ডলী বলিয়া যাহা কহিতেছেন, ইহাতে কলিকাতার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রভৃতি আপনার লক্ষ্য কি না? আমি উহাঁদের অনেক উপাসনা করিয়াছি, অনেককেই নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াছি, সকলেই ক্ষীণবীর্য্য ও ধর্ম্মকঞ্চুকে সংস্কৃত বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি; যাঁহারা মুক্তকণ্ঠে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছি। মহাশয়! আমি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি, এখন আমায় আর প্রতিনিবৃত্ত করিবার কথা বলা না হয়।' তর্কবাগীশ বলিলেন,—ঈশ্বর! বাল্যাবধি তোমার প্রকৃতি ও অদম্য মানসিক শক্তির প্রতি আমার লক্ষ্য রহিয়াছে, তোমায় ভগ্নোদ্যম ও প্রতিনিবৃত্ত করা আমার সঙ্কল্প নহে।* তুমি যে কার্য্যটিকে লোকের হিতকর বলিয়া

---

* বিদ্যাসাগর বাল্যাবস্থা কাল হইতেই তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রীতির পাত্র হন। তর্কবাগীশ মহাশয়ও তাঁহাকে পুত্রবৎ ভালবাসিতেন। ইহার একটা দৃষ্টান্ত দিই,—তর্কবাগীশ মহাশয় সাহিত্য দর্পণ নামক অলঙ্কার

জ্ঞান করিতেছ এবং যাহার অনুষ্ঠান বিষয়ে প্রগাঢ় চিন্তা করিয়াছ, সেই কার্য্যের মূলবন্ধন সম্যক্‌রূপে দৃঢ়তর হয় এবং তাহা অৰ্দ্ধসম্পন্ন হইয়াই বিলীন না হয়, ইহাই আমার উদ্দেশ্য। কেবল কলিকাতার কয়েকটী বৃদ্ধ আমার লক্ষ্য নহে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, বোম্বে, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে যথায় হিন্দুধর্ম্ম-প্রচলিত—তত্তদূর দৌড়িতে হইবে; ধর্ম্মবিপ্লব ও লোক-মর্য্যাদার অতিক্রম করা হইতেছে বলিয়া যাঁহারা মনে করিতেছেন, তাঁহা-দিগকে সম্যক্‌রূপে বুঝাইতে হইবে; সকলকে বুঝান সহজ নহে সত্য; প্রধান প্রধান স্থানের সমাজপতিদিগকে অন্ততঃ স্বমতে আনিতে হইবে। এইরূপে সমাজসংস্কার করা কেবল রাজার সাধ্য। অন্য লোকে এরূপ কার্য্যে হাত দিতে গেলে বিপুল অর্থ ও লোকবল আবশ্যক। বিজাতীয় রাজপুরুষ দ্বারা এইরূপ সংস্কারের সম্ভাবনা নাই। বিধবাগর্ভজাত সন্তান

গ্রন্থের টীকা স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন। ছাত্রেরা পুঁথির পাতা বাহির করিয়া লইয়া বাসায় যাইত। অধ্যাপনা সময়ে কখন কখন আবশ্যক হইলে পাতা মিলিত না। তর্কবাগীশ মহাশয় পুঁথির পাতা বাসায় লইয়া যাইতে নিষেধ করেন। বিদ্যাসাগর তখন অলঙ্কার-শ্রেণীতে পড়িতেন। তিনি একদিন অপরাহ্লে পুঁথির পাতা চুপি চুপি লইয়া বাসায় যাইতেছিলেন। বৃষ্টি হওয়ার দরুণ তিনি পড়িয়া গিয়াছিলেন। পাতাগুলি ভিজিয়া গিয়া-ছিল। বিদ্যাসাগর এক ভুনোওয়ালার দোকানে প্রবেশ করিয়া জ্বলন্ত চুলার পাশে পাতাগুলি রাখিয়া শুকাইতে দেন। হঠাৎ তর্কবাগীশ মহাশয় সেইখান দিয়া যাইতে যাইতে ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিতে পান। তিনি ঈশ্বর-চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া আনুপূর্ব্বিক সকল বিষয় অবগত হন। ঈশ্বরচন্দ্র বড় অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ভিজিয়া গিয়াছে তর্কবাগীশ মহাশয় দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হন। তিনি পুঁথির কথা কিছু না বলিয়া, তাঁহাকে আপনার চাদরখানি পরিতে দেন। ঈশ্বরচন্দ্র চাদর পরিতে ইতস্ততঃ করেন। তখন তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহাকে একখানি গাড়ী করিয়া আপন বাসায় লইয়া যান। অনুতপ্ত ঈশ্বরচন্দ্রকে তর্কবাগীশ মহাশয় বিবিধরূপে সান্ত্বনা করেন।

দায়ভাক্ হইবে বলিয়া যে বিধি হইয়াছে, তাহাই পর্য্যাপ্ত জ্ঞান করিতে হইবে। যখন তুমি রাজপুরুষদের সাহায্যে এই বিধি প্রচলিত করাইতে সমর্থ হইয়াছ, তখন পূর্ব্বকথিত দেশবিভাগের সমাজপতিদিগের সহায়তা লাভে যে কৃতকার্য্য হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতেছে না। ইহাতে যেমন কালবিলম্ব ঘটিবে, তেমন সময়ের স্রোত তোমারই অনুকূলে বহিবে। লোকবলের নিকটে অর্থাভাব অনুভূত হইবে না। ত্বরায় প্রয়োজন দেখি না। হিন্দুসমাজ এ পর্য্যন্ত অনেক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। দুই চারিটী বিধবা বিবাহ দিলে আর একটী থাক বাড়ান মাত্র হইবে; সমাজ-বন্ধন এইরূপে আরও শিথিল করিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর! যাহা বক্তব্য বলিলাম। তুমি বড় ব্যস্ত দেখিতেছি, চলিলাম, বিবেচনা করিও।" প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের জীবন-চরিত, ৬১-৬২ পৃষ্ঠা।

ইহা বিদ্যাসাগরের অটল দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও ঐকান্তিক একাগ্রতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হায়! হিন্দুর করণীয় কার্য্যে এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা,—এই একাগ্রতা পরিচালিত হইলে, আজি হিন্দু-সমাজ যে অধঃপতনের মুখে অগ্রসর হইতেছে, তাহার অনেকটা গতিরোধ হইত!

সপ্তদশ অধ্যায়।

বর্ণপরিচয়, চরিতাবলী, বিশ্ব-বিদ্যালয়, হেলিডের নিকট প্রতিষ্ঠা, ইয়ঙ সাহেবের সহিত মনান্তর ও পদত্যাগ।

বহু কঠোরতর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও বিদ্যাসাগর মহাশয়, পাঠ্য-পুস্তক-প্রণয়নে নিবৃত্ত ছিলেন না। ১২৬২ সালের ১লা বৈশাখ বা ১৮৫৫ সালের ১৩ই এপ্রেল এবং ১২৬২ সালের (১৯১২ সংবতে) ১লা আষাঢ় বা ১৮৫৫ সালের ১৪ই জুন বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ এবং দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বর্ণপরিচয়েও বিদ্যাসারের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগে বাঙ্গালা বর্ণবিচারে প্রবৃত্ত হন। এ বিচারে তিনিই প্রথম। এ সম্বন্ধে আমাদের মতবিরোধ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি, তিনি বাঙ্গালা স্বরবর্ণে "ৠ"র ব্যবহার করেন নাই। সংস্কৃত প্রয়োগানুসারে বাঙ্গালায়ও "ৠ"র ব্যবহার হইতে পারে। যথা—"পিতৄণ"। এ বর্ণবিচার সম্বন্ধে ঢাকার বান্ধব-সম্পাদক বহুযশস্বী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও ভট্টপল্লীনিবাসী পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করা কর্ত্তব্য।

এক দিন প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্ ৺ প্যারীচরণ সরকারের চোরবাগানস্থিত বাটীতে নির্দ্ধারিত হয়, প্যারী

বাবু ইংরেজি শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ্যসমূহ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা পাঠ্যসমূহ প্রণয়ন করিবেন। প্রকৃত পক্ষে দুই জনই এই ভার লইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, মফস্বলে স্কুল-পরিদর্শনে যাইবার সময় পাল্কীতে বসিয়া বর্ণ-পরিচয়ের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতেন। প্রথম প্রকাশে বর্ণ-পরিচয়ের আদর হয় নাই। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিরাশ হন; কিন্তু ক্রমে ইহার আদর বাড়িতে থাকে।

১২৬৩ সালে মাঘ মাসে বা ১৯১৩ সংবৎ ১ লা শ্রাবণ বা ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই চরিতাবলী মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। দরিদ্র ও হীন অবস্থা হইতে স্বকীয় অধ্যবসায়ে লোকে কিরূপে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহা প্রদর্শন করাই চরিতাবলী-রচনার উদ্দেশ্য। এই জন্যই এই গ্রন্থে ডুবাল, উইলিয়ম, রস্কো প্রভৃতি বৈদেশিক খ্যাতনামা ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনাভাস প্রকটিত হইয়াছে। জীবন চরিত সম্বন্ধে আমাদের যে মত, চরিতাবলি সম্বন্ধেও সেই মত।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার অন্যতম সভ্য হন। এই সময় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংস্কৃত শিক্ষা উঠাইবার প্রস্তাব হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় একাই সিনেটের অন্যান্য সভ্যদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া, এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। অবশেষে তাঁহারই জয় হয়। বিদ্যাসাগর মহাশ "সেন্‌ট্রাল কমিটির" সভ্য হইয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে উত্তীর্ণ

হইয়া, সিবিলিয়ানেরা কার্য্যে নিযুক্ত হইলে পর, এই "সেণ্ট্রাল কমিটী"র নিকট এদেশীয় ভাষার পরীক্ষা দিতেন। এই কমিটি বড় লাট বাহাদুর লর্ড ডালহৌসী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৮৫৬ খৃঃ অব্দে "এডুকেশন কৌন্সিলে"র স্থানে বর্ত্তমান "পবলিক ইনষ্টিটিউশনে"র প্রতিষ্ঠা হয়। বর্ত্তমান ডাইরেক্টরের পদ-সৃষ্টিও এই সময় হইল। গর্ডন ইয়ঙ সাহেব প্রথম ডাই-রেক্টরি পদে নিযুক্ত হন। ইয়ঙ সাহেব তখন নবীন সিবিলিয়ান। ছোট লাট হেলিডে সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয়, মাসকয়েক ইঁহাকে শিক্ষা-বিভাগের কার্য্যে শিক্ষা দেন।

ছোট লাট হেলিডে সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যথেষ্ট সম্মান করিতেন। এমন কি, ছোট লাট বাহাদুর তাঁহাকে পরমাত্মীয় বন্ধু ভাবিতেন। প্রতি বৃহস্পতিবার বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোট লাট বাহাদুরের বাটীতে গিয়া নানা বিষয়ের পরামর্শ করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন কারণে নির্দ্ধারিত দিনে যাইতে না পারিলে, হেলিডে সাহেব, তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইতেন। একবার হেলিডে সাহেবের সহিত ৺রাজেন্দ্রলাল মল্লিক সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সে দিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যাইবার কথা ছিল; কিন্তু তিনি যাইতে পারেন নাই। হেলিডে সাহেব রাজেন্দ্র বাবুকে অনু-রোধ করেন, সেই দিনই যেন তিনি বিদ্যাসাগরের নিকট যাইয়া, তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন। রাজেন্দ্র বাবু সেই দিন

রাত্রিকালে, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে হেলিডে সাহেবের অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পর দিন হেলিডে সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এক দিন বহু সম্ভ্রান্ত লোক ছোট লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তাঁহারা যাইলে পর, বিদ্যাসাগর মহাশয় তথায় গিয়া উপস্থিত হন। ছোট লাট বাহাদুর সর্ব্বাগ্রেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, ছোট লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, চটিজুতা পায়ে এবং মোটা চাদর গায়ে দিয়া। ছোট লাট বাহাদুর তাঁহাকে চোগা, চাপকান ও পেণ্টুলন পরিয়া যাইতে বলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহার কথামতে দিন কয়েক মাত্র চোগা-চাপকান পরিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে তিনি লজ্জা ও কষ্ট বোধ করিতেন। সেই জন্য তিনি সে বেশ পরিত্যাগ করেন। ইহার পর জীবনে তিনি আর এ পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন নাই।

১২৬৪ সালে বা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়, হেলিডে সাহেবের আদেশে বহুস্থানে বহু বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সব বিদ্যালয়ের শিক্ষক-পণ্ডিতগণ মাসিক বেতনের জন্য বিল করিয়া, বেতন প্রার্থনা করিলে, তদানীন্তন শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টর ইয়ঙ সাহেব তাহা মঞ্জুর করেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়, যখন ইন্‌স্পেক্টর-পদে নিযুক্ত হন, তখন হইতেই, ইয়ঙ্ সাহেবের সহিত মতান্তর হওয়ায়, একটা মনোবাদ হয়। বর্ত্তমান বিল নামঞ্জুরী সূত্রে সেই মনোবাদ

প্রবলতর হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোট লাট বাহাদুরকে এ কথা জানাইলেন। ছোট লাট বাহাদুর নালিষ করিয়া টাকা আদায় করিতে বলেন। বিদ্যাসার মহাশয় নালিষের চির-বিরোধী; কাজেই তিনি স্বয়ং ঋণ করিয়া টাকা দেন। * ক্রমেই মনান্তর গুরুতর হইয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে মনান্তরের কারণ এইরূপ,—"বিদ্যাসাগর মহাশয় হুগলি, বর্দ্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুর, এই চারি জেলার স্কুল-সমূহের এস্পেসিয়াল

বিশ্বকোষ অভিধানে লিখিত আছে,—"সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনা সময়, তৎকালীন গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটরী হালিডে সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগরের আলাপ পরিচয় হয়। তিনি নানা বিষয়ের পরামর্শ করিবার জন্য প্রতি সপ্তাহে এক দিন করিয়া, বিদ্যাসাগরকে লইয়া যাইতেন, অনেক সময়ে তিনি বিদ্যাসাগরের সৎপরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তাঁহারই যত্নে বিদ্যাসাগর 'স্কুল-ইনস্পেক্টর' হইয়াছিলেন। তৎকালে বাঙ্গলা বিভাগের চারিটী জেলায় সর্ব্বশুদ্ধ ২০ কুড়িটী মডেল স্কুল স্থাপিত ছিল। ঐ সময়ে কুড়িটী বিদ্যালয়ের পরিদর্শনভার, বিদ্যাসাগরের উপর ন্যস্ত হয়। এই সময়ে বেথুন সাহেবের মৃত্যু হইলে তৎপ্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে যাইল। ঐ সময়ে বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ইনি স্ত্রী-শিক্ষা-সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন করিতেন। এই সময় ইনি হালিডে সাহেবের উৎসাহ বাক্যে উৎসাহিত হইয়া বাঙ্গালার স্থানে স্থানে প্রায় ৫০।৬০টী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গবর্ণমেণ্ট এই বৃহৎ কার্য্যে মনোযোগ করিলেন না। কিছু দিন পরে বিদ্যাসাগর ঐ সমস্ত বালিকা-বিদ্যালয়ের খরচ পত্রাদির বিল করিয়া পাঠাইলে, গবর্ণমেণ্ট ঐ টাকা দিতে সম্মত হইলেন না। যাঁহার উৎসাহে ঐ সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, সেই হালিডে সাহেব তখন নিরুত্তর রহিলেন। তখন বিদ্যাসাগর নিজ হইতে ঐ সমস্ত টাকা দিয়া বিদ্যালয়গুলি কিছু দিন চালাইয়াছিলেন।"

ইনস্পেক্টর হইয়াছিলেন। জেলাচতুষ্টয়ের বিদ্যালয়গুলির তিনি যেরূপ উন্নতি অবলোকন করেন, তদনুরূপ রিপোর্ট করিতেন। তন্নিবন্ধন তদানীন্তন ডিরেক্টর (শিক্ষাসমাজের কর্ত্তা) বিদ্যাসাগরকে বলেন, "এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট রিপোর্ট করিবে, অর্থাৎ গুছাইয়া লিখিবে; নচেৎ সাধারণের নিকট গৌরব হইবে না।" তিনি বলিলেন, "যেমন দেখিব, তেমই লিখিব; বাড়াইয়া লেখা আমার কর্ম্ম নহে। যদি ইহাতে সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে আমি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি।" তেজস্বী বিদ্যাসাগরের ইহা অসম্ভবই বা কি!

ইয়ঙ সাহেবের সহিত মনোবাদের আরও একটা কারণ শুনিতে পাই। ইয়ঙ সাহেব সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি করিতে চাহেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাহার প্রতিবাদ করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন বিদ্যাসাগর মহাশয়, অতি সতেজে পত্র লিখিয়া, ইয়ঙ সাহেবের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন—"সংস্কৃত কলেজের বেতন বাড়াইলে, কলেজ থাকিবে না। ভারতের শিক্ষা সম্বন্ধে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে যে কাগজ-পত্র আসে, তাহাতে সংস্কৃত কলেজের বেতন-বৃদ্ধি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। আমি সেই উপদেশ পত্রের অনুসারে কাজ করিব।" ইয়ঙ সাহেব কলেজে বেতন পাঁচ টাকা করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহার পর ইয়ঙ সাহেবের সহিত মনান্তর ঘোরতর হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তেজস্বিতার সহিত ইয়ঙ সাহেবকে পত্র লিখিতেন।

বাগ্মীবর রামগোপাল ঘোষ পত্রলেখা সম্বন্ধে অনেকটা সাহায্য করিতেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রায়ই বিদ্রূপ করিতেন,—"সিবিলিয়ান্ সাহেবকে জোর করিয়া পত্র লেখা চাল-কলা-খেগো ব্রাহ্মণেরর কর্ম্ম নয়।"

রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় ইয়ঙ সাহেবের নামে ছোট লাট বাহাদুরের নিকট অনেক বারই অভিযোগ করিয়াছিলেন। ছোট লাট বাহাদুর, ডিরেক্টর মহাশয়ের সহিত সম্প্রীতি রাখিয়া কাজ করিতে পরামর্শ দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তৎপক্ষে চেষ্টাও করিয়াছিলেন; কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ইয়ঙ সাহেবের সহিত সম্প্রীতি হইল না; অথচ ছোট লাট বাহাদুর কোন সদুপায় করিলেন না; অগত্যা রাগে দুঃখে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রিন্সিপাল ও ইন্‌স্পেক্টর পদ পরিত্যাগ করেন।

তেজস্বী বিদ্যাসাগর এক কথায় সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল এবং স্কুল-ইন্‌স্পেক্টরের পদ পরিত্যাগ করেন। ৫০০ পাঁচশত টাকা বেতনের মোহাবরণ, কার্য্য-বীরের সে অটুট দর্পের সুতীক্ষ্ণ কৃপাণাঘাতে মুহূর্ত্তে খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গেল।

ইয়ঙ সাহেবের ব্যবহারে, বিদ্যাসাগর মহাশয় দারুণ মনঃসংক্ষোভে মাস্ত ছোট লাট বাহাদুর হেলিডে সাহেবকে পদ-পরিহারকল্পে পত্র লিখেন। পত্র পাইয়া, বঙ্গেশ্বর বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর যে সহসা ৫০০ টাকা বেতনের পদটা অম্লান বদনে পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইবেন, এটা কখনই

তিনি ভাবেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহার নিকট ইয়ঙ সাহেব সম্বন্ধে অনেকবারই অনুযোগ করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রেরিত শিক্ষাসম্বন্ধে "ডেসপ্যাচের" মর্ম্মার্থ লইয়া ইয়ঙ সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগরের কতকটা মনোবাদ চলিতেছিল, তাহাও তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন; তবে সে মনোবাদ পরিণামে যে এত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে; এবং তাহারই ফলে অবশেষে বিদ্যাসাগর যে পদপরিত্যাগে সংকল্প করিবেন, তাহা তিনি মনে করেন নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, ছোট লাটের নিকট অনুযোগ করিতেন;—"শিক্ষা-সংপ্রসারণ সম্বন্ধে, বিলাত-প্রেরিত 'ডেস্‌-প্যাচে'র যে মর্ম্ম, আমি সেই মর্ম্মানুসারেই কার্য্য করি; কিন্তু ইয়ঙ্‌ সাহেব, তাহার বিপরীত মর্ম্মগ্রহণ করিয়া, পদে পদে আমার কার্য্যের প্রতিবাদ ও প্রতিবন্ধকতা করিয়া থাকেন; এরূপ অবস্থায় আমার চাকুরী করা দায়।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুযোগ শুনিয়া, বঙ্গেশ্বর তাঁহাকে ইয়ঙ্‌ সাহেবের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পরামর্শ দিতেন; এবং ইয়ঙ সাহেবকে এতৎসম্বন্ধে সুপরামর্শ দিবেন বলিয়া, আশ্বাস প্রদান করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ছোট লাট বাহাদুরের আশ্বাস বাক্যানুসারে মিলিয়া-মিশিয়া সদ্ভাবে সপ্রণয়ে কার্য্য-নির্ব্বাহের চেষ্টা করিতেন; কিন্তু তিনি বুঝিলেন যে, ছোট লাট বাহাদুরের নিকট পুনঃপুনঃ অনুযোগেরই প্রয়োজন হয়; অথচ অনুযোগ করা বৃথা। ছোট লাট বাহাদুরের আশ্বাসানু-

সারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও ইয়ঙ্ সাহেবের মতিগতি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধারণা অন্যরূপ হইল না। যে ইয়ঙ সাহেবকে তিনি হাতে করিয়া, শিক্ষা-বিভাগের সকল কাজ শিখাইয়াছেন, সেই ইয়ঙ্ সাহেবই তাঁহার সকল কার্য্যের বিরোধী এবং প্রতিবাদী; অথচ তৎ-প্রতীকারেরও আর পথ নাই; এইরূপ ভাবিয়াই তিনি ছোট লাট বাহাদুরকে পদ-পরিত্যাগের পত্র লিখিয়াছিলেন।

ছোট লাট বাহাদুর, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন নিশ্চিতই। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন; এবং পত্র প্রত্যাখ্যান করিয়া লইবার জন্যও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন। পত্র প্রত্যাখ্যান করিয়া লইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাভাজন হইবেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোট লাট বাহাদুরের নিকট এ আশ্বাসও পাইয়াছিলেন।

সে আশ্বাস-বাণীতে কিন্তু বিদ্যাসাগর বিচলিত হইলেন না। তখনও তাঁহার হৃদয় দারুণ মর্ম্মবেদনার প্রচণ্ড উগ্র তাপে জর্জ্জরিত। তিনি পত্র-প্রত্যাখ্যানে বা পুনরায় পদগ্রহণে কিছুতেই আর সম্মত হইলেন না। তিনি হেলিডে সাহেবকে স্পষ্টই বলেন,—"সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়াছি; আর ফিরিবার পথ দেখি না; ক্ষমা করুন, আমি আর চাকুরী করিব না; আমার আর তাহাতে প্রবৃত্তি নাই।" ছোট লাট বাহাদুর, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এইরূপ তেজস্বিতা দেখিয়া, বাস্তবিকই

বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া, অগত্যা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদ-পরিহার মঞ্জুর করেন। *

১২৬৫ সালের ১১ই কার্ত্তিক বা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ৩রা নবেম্বর বিদ্যাসাগর মহাশয় তদানীন্তন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক কাওয়েল সাহেবকে কার্য্যভার অর্পণ করিয়া বিদায় লন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পদ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া, তাঁহার মাতা, পিতা, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব সকলেই সংক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার কোন বন্ধু স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর বলিয়াছিলেন,—"বিদ্যাসাগর! তুমি ভাল কাজ করিতেছ না। দেখ, আজ কালিকার বাজারে পাঁচ শত টাকা বেতনের পদ

* স্কুলসমূহের ভূতপূর্ব্ব ডিপুটী ইন্‌স্পেক্টর ও "দৈনিকের" বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি,—সিপাহী-বিদ্রোহের সময় অনেকগুলি আহত সিপাহী সংস্কৃত কলেজে আশ্রয় লইয়াছিল। এই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ডাইরেক্টরের অনুমতি না লইয়াও সংস্কৃত কলেজ বন্ধ রাখিয়াছিলেন। সিভিলিয়ান্ ইয়ং সাহেবের সহিত মনোবাদের ইহাও একটী কারণ।

কোথাও কোথাও এরূপ জনরব শুনা যায়, ইয়ং সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর বিরক্ত হইয়া, তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য তাঁহার দোষান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শেষে তিনি এই দোষ পান যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় সরকারী "লেফাফার" ভিতর আপনার পুস্তক পুরিয়া, স্থানান্তরে পাঠাইয়াছিলেন। এ কথা ছোট লাটকে অবগত করা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় এ কথা জানিতে পারিয়া আপনি পদত্যাগ করেন। আমি বহু চেষ্টা করিয়াও এ কথা প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এই জন্য এ কথায় আদৌ বিশ্বাস হয় না। বিশেষ বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে ইহা একেবারে অবিশ্বাস্য। কি করিয়া এমন কথা উঠিল, ভগবানই জানেন।

দুর্লভ; বিশেষ তোমার মতন এক জন বাঙ্গালীর পণ্ডিতের পক্ষে। তুমি পদ পরিত্যাগ করিলে বটে; কিন্তু তোমার চলিবে কিসে?”

বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—“আমি জানি, মানুষের সম্ভ্রমই জগতে দুর্লভ; চলিবার কথা কি বলিতেছ? আমি যখন সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, তখন আমার কি ছিল? এখন তবুও আমার প্রণীত ও প্রকাশিত পুস্তকের কতক আয় আছে।”

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ পদ পরিত্যাগে, তাঁহার পরিচিত সরকারী কর্ম্মচারিবর্গ বড় ব্যথিত হইয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখিত হইয়াছিলেন, তাৎকালিক সেক্রেটরী সিসিল বিডন সাহেব। বিডন সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস করিতেন। বাঙ্গালীর মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায়, আর কেহই বিডন সাহেবের বিশ্বাস-ভাজন ছিলেন না। তাহার একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই,—বিধবা-বিবাহের আইন পাশ হইবার পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে লোমহর্ষণ সিপাহী-বিদ্রোহ সংঘটিত হয় কোন কোন অঞ্চলে বিধবা-বিবাহের আইনটী এই সিপাহী-বিদ্রোহের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। সে কথা লইয়া এখানে তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন নাই। ভগবৎকৃপা সে বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে পর, মহারাণীর অভয়বাণী ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়। সেই ঘোষণা পত্র নানা ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। বিডন সাহেব, সেই ঘোষণা-পত্র

বাঙ্গালায় অনুবাদ করাইবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদত্যাগ করিবার একমাস পূর্ব্বে বিডন সাহেব নিম্নলিখিত মর্ম্মে পত্র লিখেন,—"আমার ইচ্ছা, আপনি ঘোষণাপত্র বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। আগামী কল্য ১১টার সময় আফিসে আসিলে ভাল হয়। কাগজ-পত্র পাঠাইবার নিয়ম নাই; নতুবা পাঠাইতাম। এ চিঠির মর্ম্ম কাহাকেও বলিবেন না। আপনি যে ইহার তর্জ্জমা করিতেছেন, এ কথা কেহ যেন জানিতে না পারে।" ১২৬৫ সালের ৭ই কার্ত্তিক ১৮৫৮ সালের ২২শে অক্টোবর এই পত্র লিখিত হয়।

ইহাতেই বুঝা যায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়, বিডন সাহেবের কিরূপ বিশ্বাস-ভাজন ছিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

স্বাধীন জীবনের আভাস, ওকালতীর প্রবৃত্তি ত্যাগ, পিতামহীর মৃত্যু, পিতামহীর শ্রাদ্ধ মন্ত্র গ্রহণে অপ্রবৃত্তি, আচার অনুষ্ঠান, সংস্কৃত যন্ত্র ও ডিপজিটরী, পরোপকার ও উপকারে অকৃতজ্ঞতা।

সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল-পদ-পরিত্যাগ বিদ্যাসাগরের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ হইল। পরবর্ত্তী জীবন-ঘটনা তাহার প্রমাণ। পর পদ-সেবায় মানব-জীবনের আত্মোৎকর্ষসাধন সহজ-সম্ভব-পর নয়। রুদ্ধদ্বার পিঞ্জরে আবদ্ধ সুন্দর শুকের যে অবস্থা, পরপদ-সেবী মানুষের অবস্থা তদতিরিক্ত নয় তো। স্বাধীন প্রাণে স্বাধীন ভাবে কার্য্য-প্রসারণে কার্য্যবীরের যে সুবিধা, পরাধীন প্রাণে সে সুবিধা নাই। স্বাধীন প্রাণ মুক্তপথে প্রধাবিত হয়। মানব-জীবনের উৎকর্ষ ও উন্নতি তাহাতেই; তা যিনি যে পথে যাউন না কেন? মানুষ আপন বুদ্ধিবশে, এক পথ দিয়া গিয়া স্বাধীন জীবনপ্রবাহে পার্থিব সুখের চরম সীমায় পৌঁছিতে পারে; আবার অন্য পথে গিয়া অপার্থিব সুখের অন্তিম পর্য্যন্ত পাইতে পারে। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সি-পাল-পদ পরিত্যাগ করিবার পর হইতে, বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বাধীন প্রাণে কার্য্য করিবার শত পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সে সকল পথ ঐহিক প্রীতি-প্রতিষ্ঠার সম্যক্ অভিমুখীন্।

স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় আধুনিক সভ্য সমাজে পূর্ণ-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। যাবৎ এ জগৎ, তাবৎই তাঁহার প্রতিষ্ঠা। সে প্রতিষ্ঠার একে একে পরিচয় লউন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতা বিদ্যারত্ন মহাশয় নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটী লিখিয়াছেন,—

"যে সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রিন্সিপাল পদ পরিত্যাগ করেন, সে সময় কলিকাতা সুপ্রিম-কোর্টের প্রধান বিচারক কল্‌বিন্ সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উকীল হইবার জন্য পরামর্শ দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার পরামর্শানুসারে উকীল হওয়া যুক্তিসঙ্গত কি না, তাহা স্থির করিবার জন্য প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যার সময়, তাৎকালিক প্রধান উকীল দ্বারকানাথ মিত্রের কার্য্যাবলী দেখিবার জন্য তাঁহার বাটীতে যাইতেন। তিনি তথায় গিয়া দেখেন যে, টাকার জন্য হিন্দুস্থানী মোক্তারদের সহিত হুড়াহুড়ি করিতে হয়। দেখিয়া শুনিয়া ওকালতী কর্ম্মে, তাঁহার ঘৃণা জন্মে। পরে তিনি কল্‌বিন্ সাহেবকে গিয়া আপনার অভিমত প্রকাশ করেন। কল্‌বিন্ সাহেব বলেন, 'তোমার মত পণ্ডিত লোককে টাকার জন্য মোক্তারদের সঙ্গে হুড়াহুড়ি করিতে হইবে না। তুমি ওকালতী কর।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সে কার্য্যে প্রবৃত্তি হইল না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রামবাসী তদীয় পরম স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সিংহ মহাশয় আমাকে বলিয়াছেন,—

"দ্বারকানাথ মিত্র কেবল মোক্কেলদের কাগজ-পত্র লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার পড়াশুনার সময় থাকিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। মোকদ্দমা লইয়া থাকিলে পড়াশুনা হইবে না ভাবিয়া, তাঁহার ওকালতী করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই।"

আধুনিক আদালতের অনেক উকীলকেই যে টাকার জন্য হুড়াহুড়ি মারা-মারি করিতে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় এক জন শান্তিপ্রিয় ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি যে সেটাকে ঘৃণা করিবেন, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু দ্বারকানাথ মিত্রের ন্যায় প্রতিষ্ঠাবান্ উকীল কি টাকার জন্য মোক্তারদের সঙ্গে ঐরূপ হুড়াহুড়ি করিতেন? এ কথাটা মনে স্থান দিতে কোনমতেই সহজে প্রবৃত্তি হয় না। শশি বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় অসীম সাহসে সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিলেন। তাঁহার পুস্তকের কতকটা আয় ছিল বটে; কিন্তু ঋণও বিস্তর ছিল। দানের তো ত্রুটী হয় নাই। ঋণেও বিদ্যাসাগরের অদ্ভুত তেজস্বিতার পরিচয়।

সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল-পদ পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতামহীর ৺গঙ্গা লাভ হয়। পিতামহীকে পীড়িতাবস্থায় বীরসিংহ গ্রাম হইতে আনয়ন করা হইয়াছিল। এখানে ভাগীরথীতীরে সালিখা ঘাটে ২০ বিশ দিন মাত্র গঙ্গাজল পান করিয়া তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছিল।

এতৎসম্বন্ধে বিদ্যারত্ন লিখিয়াছেন,—

"তাঁহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে বিধবা-বিবাহের প্রতিবাদিগণ অনেকে শত্রুতা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শ্রাদ্ধোপলক্ষে এ প্রদেশের

বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণের সমাগম হইয়াছিল। অনেকে মনে করিয়াছিল, বিদ্যাসাগরের পিতামহীর শ্রাদ্ধে কোনও ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে আসিবেন না; তাহা হইলেই পিতৃদেব মনোদুঃখে দেশত্যাগী হইবেন। যাঁহারা এরূপ মনে করিয়াছিল, তাহারা অতি নির্ব্বোধ, কারণ অগ্রজ মহাশয় দেশে অবৈতনিক ইংরেজি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রায় চারি পাঁচ শত বালককে বিনা বেতনে শিক্ষা ও সমস্ত বালককে পুস্তক কাগজ শ্লেট প্রভৃতি প্রদান করিতেন। ইহা ভিন্ন বাটীতে প্রত্যহ ৬০টী বিদেশস্থ সম্ভ্রান্ত ও অধ্যাপকদের বিদ্যার্থী সন্তানগণকে অন্ন-বস্ত্র প্রদান করিয়া অধ্যয়ন করাইতেন। মধ্যে মধ্যে অনেক ভিন্ন গ্রামের ছাত্রগণের চাকরি করিয়া দিতেন। দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ডাক্তার বিনা ভিজিটে গ্রামের ও সন্নিহিত গ্রামবাসীদিগের ভবনে চিকিৎসা করিতে যাইত। নাইট স্কুলের ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই কলিকাতার বাসায় অন্নবস্ত্র পাইয়া মেডিকেল কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া চিকিৎসক হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অনেকেই অর্থাৎ কি ধনশালী কি মধ্যবিত্ত কি দরিদ্র সকল সম্প্রদায়ের লোক বিপদাপন্ন হইয়া আশ্রয় লইলে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইত। চাঁদা প্রদান করিয়া বিস্তর বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সাধারণের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। এবংবিধ লোকের পিতামহীর শ্রাদ্ধে কেমন করিয়া শত্রুপক্ষ বিঘ্ন জন্মাইতে পারে?”

শ্রাদ্ধে বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা না হইয়াছিল যে এমন নহে; কিন্তু উক্ত অংশের কথাগুলি অত্যন্ত সন্দেহোদ্দীপক, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। কোন সূত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট বাধ্য নহেন, এমন কোন প্রকৃত ধর্ম্মাচারী শাস্ত্রদর্শী খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে

আহার করিয়াছিলেন কি না, লোকে ইহাই জানিতে ইচ্ছুক হয়। যাহাই হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতামহীর সপিণ্ড উপলক্ষেও পিতাকে অনেক অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় আত্মীয় পরিবারের স্ব-বিশ্বাসানুচিত কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানে কোনরূপ ব্যাঘাত করিতেন না; বরং আবশ্যকমত অর্থ সাহায্য করিতেন। এরূপ কার্য্যের ফলাফল-সম্বন্ধে তাঁহার মতামত কেহই জানিতে পারিতেন না; কিন্তু কোনরূপ ব্যাঘাত দেওয়া যে অকর্ত্তব্য, তাহা তিনি অনেক সময়ই বলিতেন।

পিতামহীর মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বড় শোকাকুল হইয়াছিলেন। পিতামহী তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। তিনিও পিতামহীকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। বাল্য কালে কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পীড়া হইলে, এই পিতামহী বীরসিংহ হইতে ছুটিয়া আসিয়া, সেবা-শুশ্রূষা করিতেন; এবং রোগ অসাধ্য হইলে, সঙ্গে করিয়া বাড়ী লইয়া যাইতেন। যৌবনে কার্য্যাবস্থায়ও এই ভাব ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় যা কিছু আদর-আবদার, তাঁহারই নিকট করিতেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে এত ভাল বাসিতেন যে, কোন গুরুতর বিষয়ের অবাধ্য হইলেও, তিনি বিদ্যাসাগরের উপর রাগ করিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বংশে নিয়ম ছিল,—পিতা, মাতা, পিতামহ বা পিতামহী মন্ত্র-দীক্ষা দিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দুই একবার

মন্ত্র দিবার প্রস্তাব করিয়া, বড় সুবিধা বিবেচনা করেন নাই। সুতরাং তিনি সে বিষয়ে ক্ষান্ত হন। পরে তাঁহার জননী বিদ্যাসাগরকে মন্ত্র দিবার প্রস্তাব করেন। বিদ্যাসাগর বিবেচনা করিয়া লইব বলিয়া, স্বীকার করেন। একদিন পিতামহী পীড়াপীড়ি করাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় মন্ত্রগ্রহণের একান্ত অব্যাহতি নাই ভাবিয়া, পিতামহীকে নানা যুক্তি প্রদর্শন করিবার প্রয়াস পান। মন্ত্রগ্রহণে বিদ্যাসাগরের ইচ্ছা বা মত নাই বুঝিয়া, পিতামহী আর মন্ত্র লইবার কথা বলেন নাই। বেশী বলিলে, পাছে প্রিয়তম পৌত্রের প্রাণে কষ্ট হয় বলিয়া স্নেহ-বাৎসল্য-বঞ্চিতা বৃদ্ধা পিতামহী ক্ষান্ত হইলেন। এমনই বাৎসল্য-বিমোহন! *

প্রসঙ্গক্রমে এইখানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আচারানুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে দুই এক কথা বলি। তিনি তো পিতামহীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন নাই; পরন্তু সন্ধ্যাহ্নিক পূজাদিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তবে অপর কাহারও সন্ধ্যাহ্নিকক্রিয়া দেখিয়া, তিনি নাসিকা সঙ্কুচিত করিতেন না। আপন পরিবারের মধ্যে কাহারও প্রতি তৎসম্বন্ধে তাঁহার নিষেধও ছিল না। ব্রত-স্বস্ত্যয়নাদি ক্রিয়ায় কেহ কখন তাঁহার নিকট বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। সন্ধ্যাহ্নিক-আচারানুষ্ঠানে বিরত থাকিলেও, হিন্দুর আচার-সম্মত খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে তিনি অনেকটা বিচার করিতেন। মুরগী, মদ প্রভৃতি অখাদ্য-ভোজী তাঁহার সৌহার্দ-

* ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বসু মহাশয়ের মুখে এই বিষয়টী শুনিয়াছি।

সৌভাগ্য লাভ করিলেও, তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া, কখন নিজের বাড়ীতে খাওয়াইতে পারিতেন না। রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, কোন এক জন শক্তিশালী ব্যক্তি, শ্যামাচরণ বাবু ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধু ছিলেন। তিনি অখাদ্য খাইতেন বলিয়া, শ্যামাচরণ বাবু ও বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহার বাড়ীতে কখন নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতেন না।

এইবার বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জনের পথ অবলম্বন করিলেন। তাঁহার সংস্কৃত যন্ত্র ও সংস্কৃত ডিপজিটরী তখন প্রধান ভরসা-স্থল। প্রেসে পুস্তক মুদ্রিত এবং ডিপজিটরীতে নিজের ও অপরের পুস্তক বিক্রীত হইত। বলা বাহুল্য, এই প্রেসে ও ডিপজিটরীতে অনেক লোকই প্রতিপালিত হইত। কিন্তু ক্রমে তিনি কোন কোন প্রতিপালিত কর্ম্মচারীর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন। কার্য্যে বিশৃঙ্খলতা বিলক্ষণ হইয়াছিল এবং হিসাব পত্রেও যথেষ্ট গোলযোগ ঘটিয়াছিল। এই সব দেখিয়া, তিনি রাজকৃষ্ণ বাবুকে ডিপজিটরীর কার্য্য পরিদর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। রাজকৃষ্ণ বাবু তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ৮০ আশী টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে তিনি ১২৬৬ সালের ৪ঠা পৌষ বা ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে ৬ছয় মাসের অবসর গ্রহণ করিয়া, ডিপজিটরীর কার্য্য তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হন। এই ৬ ছয় মাসের মধ্যে অসীম অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, তিনি ডিপজিটরীর

সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খলা স্থাপন করেন। তখন হিসাবপত্রও এরূপ সুশৃঙ্খল হইয়াছিল যে, আবশ্যকমতে সকল সময় আয়-ব্যয়ের অবস্থা জানিতে ক্ষণমুহূর্ত্ত বিলম্ব হইত না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা, রাজকৃষ্ণ বাবুর কার্য্য-প্রণালী সন্দর্শনে এতাদৃশ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পরিত্যাগ করিয়া, ডিপজিটরীরই কার্য্যে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইতে অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহাকে সেই পরামর্শ দেন। অগত্যা রাজকৃষ্ণ বাবু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পরিত্যাগ করেন। এ কার্য্যে তাঁহার বেতন হইল ১৫০৲ দেড় শত টাকা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সৌভাগ্যে এবং রাজকৃষ্ণ বাবুর প্রগাঢ় যত্নে প্রেস ও ডিপজিটরীর কার্য্য সবিশেষ সুশৃঙ্খলায় পরিচালিত হইয়া অনেকটা লাভজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু কেবল পরোপকারার্থ তাঁহাকে পরে এ প্রেসও বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। সে কথা যথাস্থানে বলিব।

রাজকৃষ্ণ বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আ-যৌবন সুহৃদ্। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের মূলই বিদ্যাসাগর মহাশয়। কৃতজ্ঞতা-প্রকটনের ইহা অন্যতম প্রমাণ। যে রাজকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্তরতম আত্মীয়ের ন্যায় আহার, শয়ন প্রভৃতি নিত্য ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন, যে রাজকৃষ্ণ বাবু তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন, যে রাজকৃষ্ণ বাবুর একটী শিশুকন্যার মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর মহাশয়

মৃতকল্প হইয়াছিলেন।* যে রাজকৃষ্ণ বাবুর জননী বিদ্যাসাগরকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, সেই রাজকৃষ্ণ বাবুর উন্নতি বিধান করা, বিদ্যাসাগরের বিচিত্র কি? কেবল রাজকৃষ্ণ বাবু কেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় কত লোকের চাকুরী করিয়া দিয়াছেন, তাহার গণনা হয় কি? রাজকৃষ্ণ বাবু তো ঘনিষ্ঠ-আত্মসম্পর্কীয়, কত দূর সম্পর্কীয় অজানিত লোক তাঁহারই প্রসাদে চাকুরী পাইয়া, অন্নসংস্থান করিয়া লইত।

দুঃখের বিষয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রসাদে যাঁহারা চাকুরী লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অকৃতজ্ঞ। এমন কি অধুনা কোন উচ্চপদস্থ যশস্বী ব্যক্তি, তাঁহার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে লজ্জা ঘৃণায় মর্ম্মাহত হইতে হয়। এক ব্যক্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে চাকুরীর জন্য ধরিয়াছিল। তখন ঐ যশস্বী ব্যক্তি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী। এই উচ্চ পদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রসাদেই প্রাপ্ত। তাঁহার অধীনে চাকুরী খালি ছিল। যে লোকটী চাকুরীর জন্য ধরিয়াছিল, সে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট

---

* রাজকৃষ্ণ বাবুর এই কন্যাটীর মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর মহাশয় শোকোচ্ছ্বাস পূর্ণ হৃদয়ে, একটী গদ্য-প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। সে রচনাটী তৃতীয় বর্ষের বৈশাখ মাসের "সাহিত্যে" প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা "প্রভাবতী-সম্ভাষণ" নামে পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। গদ্যে ইহা করুণাত্মক কাব্য। পড়িতে পড়িতে চক্ষের জল সংবরণ করা যায় না। প্রভাবতী কি করিত, কি বলিত, কি খাইত ইত্যাদি কবিত্বময় ভাষায় লিখিত। ইহা কাব্য-রচনা-শক্তিমত্তার পরিচয়।

হইতে উচ্চপদস্থ বাবুর নামে এক সুপারিস্ চিঠি লইয়া, একদিন বাবুর চাকুরীস্থানে, তাহার বাসায় যাইয়া উপস্থিত হন। তখন বাবু ইয়ারবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, সোফায় বসিয়া, আলবোলায় তামাক খাইতেছিলেন। লোকটী সেই সময় তাঁহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত চিঠিখানি দেন। বাবু তামাক টানিতে টানিতে একটু মৃদু হাসিলেন। ইয়ারবর্গ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? বাবু বলিলেন, "ব্যাপার আর কি, বিদ্যাসাগর ব্যবসায় ধরিয়াছে। চাকুরী ক'রে দাও।" বাবুর কথা শুনিয়াই উমেদার অবাক্। কোন কথাটী না বলিয়াই তিনি তথা হইতে চলিয়া আসেন; কিন্তু লজ্জায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আর সাক্ষাৎ করেন নাই। সহসা একদিন সাক্ষাৎ হয়। সেই সাক্ষাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাবুর অকৃতজ্ঞতার পরিচয় পান।

অন্য এক সময়, কোন সরকারী আফিসে চাকুরী খালি হইয়াছিল। আফিসের যে বিভাগে চাকুরী খালি ছিল, বাগবাজারের ৺প্রিয়নাথ দত্ত সেই বিভাগের বড় বাবু ছিলেন। পূর্ব্বে যে ব্যক্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে উচ্চপদস্থ বাবুর নামে চিঠি লইয়াছিলেন, ইনি এক্ষণে এই চাকুরীর জন্য প্রিয় বাবুর নামে চিঠি লইবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট যান। প্রিয় বাবুর সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদৌ আলাপ-পরিচয় ছিল না। সেই জন্য তিনি পত্র দিতে ইতস্ততঃ করেন। কিন্তু লোকটীর নিতান্ত পীড়াপীড়িতে পত্র না দিয়া

থাকিতে পারেন নাই। লোকটী চিঠি লইয়া, প্রিয় বাবুর নিকট যান। আফিসে পাঁচটী চাকুরী খালি ছিল। কিন্তু এই কয়টী চাকুরীর জন্য পরীক্ষা দিবার নিয়ম হইয়াছিল। প্রিয় বাবু লোকটীকে পরীক্ষা দিতে বলেন। লোকটী সম্মত হন। পরীক্ষায় কিন্তু তিনি সপ্তম হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা রক্ষা হয় না ভাবিয়া, প্রিয় বাবু অত্যন্ত কাতর হন। অবশেষে কর্ত্তৃপক্ষকে বলিয়া কহিয়া, তিনি আর দুইটী নূতন পদ বাড়াইয়া লন। ইহার একটী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লোক প্রাপ্ত হন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় পরে এই সংবাদ পাইয়া বলেন,—"বিচিত্র সংসার! আমি যাহার প্রকৃত উপকার করিয়াছি, সে আমার কথা রাখিল না, আর উপকার করা ত দূরের কথা, যাঁহার সহিত আলাপমাত্র নাই, তিনি আমার মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন।"

এই কথা বলিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয়, তদ্দণ্ডেই বাগবাজারে গিয়া, প্রিয় বাবুর সহিত আলাপ করেন। *

আর একবার বিদ্যাসাগর মহাশয় একটী লোকের চাকুরী করিয়া দিবার জন্য একটী লোককে অনুরোধ করিতে যান। এই ব্যক্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই চেষ্টায় একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনু-

* শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের নিকট এই কথা শুনিয়াছি। ইহাঁরই নিকট সন্ধান লইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রিয় বাবুর সহিত আলাপ করিতে যান।

রোধ শুনিয়াই, ইনি বলিয়াছিলেন,—"এমন অনুরোধ করিবেন না। এখন আমি সম্পাদক, আমি যদি সাহেব-সুভোকে অনুরোধ করি, তাহা হইলে, স্বাধীনভাবে আর লেখা চলিবে না।" বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কথা শুনিয়াই চলিয়া আসেন। তিনি যখন অনুরোধ করিতেছিলেন, সেই সময় তথায় কোন সওদাগর আফিসের সদর মেট উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় চলিয়া আসিলে, এই সদর-মেট বাবুটীও তাঁহার সঙ্গে চলিয়া আসেন। ইনি পথিমধ্যে অতি বিনয়-বাক্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলেন,—"মহাশয়! লোকটীর ২০ টাকা মাহিনার চাকুরী হইলে চলিবে কি? তাহা যদি হয়, আমার অধীনে একটী চাকুরী আছে, আমি তাহা আপনার লোককে দিতে পারি।" *

সদর-মেটের সৌজন্যে বিদ্যাসাগর বিস্মিত হইয়া, উপকৃতের অকৃতজ্ঞতা স্মরণে একটু হাস্য করিলেন। তিনি সদর-মেটের মহত্ত্বের প্রশংসা করিয়া, তাঁহারই কথামতে আপনার লোকটীকে তাঁহারই আফিসে পাঠাইতে সম্মত হন।

এরূপ অকৃতজ্ঞতার বহু প্রমাণই পাওয়া যায়। কেহ নিন্দা করিয়াছেন শুনিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন,—"সে কি রে, আমার নিন্দা! আমি ত তাঁহার কোন উপকার করি নাই।"

---

* পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মুখে এ কথা শুনিয়াছি।

তিনি প্রায় বলিতেন,—তিনি যাঁহার যত উপকার করিয়াছেন, তাহার নিকট তত অধিক প্রত্যপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। *

উপকারীর প্রত্যুপকার করা দূরের কথা, উপকারীর অপকার করার দৃষ্টান্ত, এ কলুষময় কলিকালে চারিদিকে দেদীপ্যমান।

---

* সাবিত্রী লাইব্রেরীর চতুর্দ্দশ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম' এ, বি, এল্ মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধ।

একোনবিংশ অধ্যায়।

বিধবা-বিবাহে ঋণ, বিধবা-বিবাহ নাটক, দান-দাক্ষিণ্য, ইংরেজী স্কুল, কৃতজ্ঞতা, হিন্দু পেটরিয়ট, সোম-প্রকাশ, বর্দ্ধমানরাজের সহিত ঘনিষ্ঠতা, সোম-প্রকাশে বিদ্যাভূষণ ও সংবাদ-পত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বৎসর সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল-পদ পরিত্যাগ করেন, সেই বৎসর তিনি হুগলী জেলার মধ্যে কতকগুলি গ্রামে নিজ ব্যয়ে ১৫ পোনেরটী বিধবার বিবাহ দি া-ছিলেন। অনেক পুনর্ব্বিবাহিত বিধবাদের ভরণ এবং সংরক্ষণ জন্য তাঁহাকে অনেক অর্থব্যয় করিতে হয়। ইহার জন্য তাঁহাকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। ঋণ করিয়াও তিন দীন-হীন ঋণীর ঋণ পরিশোধ করিতেন, স্বয়ং ঋণগ্রস্ত বটেন; কিন্তু দানে যে তিনি মুক্ত-হস্ত। দয়া বা দানে এতাদৃশ অসংযম বিজ্ঞজনসম্মত নহে; অধিকন্তু ইহা সংসারীর সন্ত্রাস-কারী। অসংযম কিছুতেই ভাল নহে। বিদ্যাসাগরের ন্যায় বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যে তাহা বুঝিতেন না, তা কেমন করিয়া বলিব? কিন্তু তাঁহার দান ও দয়া এইরূপই ছিল। হয়তো তিনি কোন নৈসর্গিক শক্তিবলে বুঝিতেন, ঋণ যতই হউক, পরিশোধের পথ পরিষ্কার করিব; অথবা স্বভাব-দাতার পথ ভগবৎকৃপায় আপনি পরিষ্কৃত হইয়া পড়ে; বস্তুতঃ বিদ্যা-

সাগরের দান ও দয়ার কথা ভাবিলে কি যেন একটা ঐন্দ্র-জালিক ব্যাপার মনে হয়।

এই সময়েও বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন চলিয়াছিল। এই আন্দোলন সতত প্রজ্বলিত রাখিবার জন্য নানা দিকে নানা উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে হাই-কোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺উমেশচন্দ্র মিত্র "বিধবা-বিবাহ" নাটক রচনা করেন। এই সময় অর্থাৎ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ইহার অভিনয় হয়। ৺কেশবচন্দ্র সেন এই অভিনয়ে "ষ্টেজ ম্যানেজার" এবং বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ৺কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতি অভিনেতা ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের থিয়েটর দেখিবার প্রবৃত্তি ছিল না। একবার একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, তিনি বেলগাছিয়ায় পাইকপাড়া রাজ-বংশ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নাট্যাভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ নট-কবি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বপ্রণীত সীতার বনবাস বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করিয়া, তাহার অভিনয় দেখাইবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি বিধবা-বিবাহের অভিনয় একাধিক বার দেখিয়াছিলেন এবং এ সম্বন্ধে উৎসাহ দিতেন। অভিনয় দেখিতে দেখিতে চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। *

* The pioneer and father of the widow-marraige

বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের জন্য যিনি প্রাণান্তপণ, বিধবা-বিবাহের আন্দোলনোদ্দীপক অভিনয় বলিয়াই ত তাঁহার এত সহানুভূতি ছিল।

কলেজের চাকুরী নাই, আয়েরও নূতন উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই; অথচ ঋণ অনেক; এমন অবস্থায় বৈঁচিনিবাসী গোকুলচাঁদ এবং গোবিনচাঁদ বসু নামক দুই ভাই আসিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন—"নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় * আমাদের বসতবাটী ক্রোক করিতে সংকল্প করিয়াছেন; আপনি রক্ষা করুন।" বিদ্যাসাগর শরণাগতের কাতর ক্রন্দনে ব্যথিত হইলেন। তিনি তখনই নীলকমল বাবুকে ১০০০৲ এক সহস্র টাকা দিয়া বসু-পরিবারের বাস্তুভিটার উদ্ধার করিয়া দেন। রাজকৃষ্ণ বাবু আমাকে বলিয়াছেন, তিনি ডিপজিটরীর কার্য্য পরিত্যাগ করিলে পর, বিদ্যাসাগর মহাশয় গোকুলচাঁদ বাবুকে ৫০ পঞ্চাশ টাকা বেতনে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় গোকুলচাঁদের মত কত বিপন্ন ব্যক্তির দায়োদ্ধার করিয়াছেন, তাহার সঠিক্ সংবাদ সংগ্রহ করা বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার; কেন না তিনি ঢক্কা-শব্দে গগন-মেদিনী

---

movement Pandit Iswar Chandra Vidyasagar came more than once and tender-herated as he is, was moved to floods of tears. Life and Teachings of Keshub Chunder Sen. by P. C. Mozumder. P. 114—116.

* নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ বাবুর ভ্রাতা।

কাঁপাইয়া, দান করিতেন না; অনেক সময়, তিনি অনেককেই এক কালেই দান করিতেন; কিন্তু সে সব প্রায়ই লিপিবদ্ধ করিতেন না। তবে রাজকৃষ্ণ বাবুর ন্যায় বন্ধু এবং ভ্রাতৃবর্গ যে সব দানের কথা জানিতে পারিতেন, তাহা সময়ে সময়ে লোকপরম্পরায় প্রকাশিত হইয়া পড়িত।

যে সময় গোকুলচাঁদের বাস্তুভিটার উদ্ধারসাধন হয়, সেই সময় শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির ৫০০ পাঁচ শত টাকার দেনার দায়ে বাটী নীলাম হইবার উপক্রম হইয়াছিল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উপস্থিত দায় জানাইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষণবিলম্ব না করিয়া, তাঁহাকে ৫০০ পাঁচ শত টাকা দান করেন।

একটা মহত্তর দান ও দয়ার পরিচয় এইখানে দিই। রাজকৃষ্ণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেও, তিনি ইহার মূলতত্ত্ব স্মরণ করিয়া বলিতে পারেন নাই। ইহার বিস্তৃত বিবরণ, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের লিখিত জীবনচরিতে বিবৃত আছে।

"আমাদের বাটীর সন্নিহিত * রাধানগরনিবাসী জমিদার ৺ বৈদ্যনাথ চৌধুরী এ প্রদেশের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ও মান্যগণ্য জমিদার ছিলেন। বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের নিকট ইনি জমিদারী বন্ধক রাখিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ইহাঁর পুত্রও † ২৫ পঁচিশ হাজার টাকা লইয়াছিলেন। এই পঁচাত্তর হাজার টাকার কিস্তিবন্দী করিতে যাইয়া বাবু শিবনারায়ণ

---

* এই রাধানগর ক্ষীরপাই-রাধানগর বলিয়া খ্যাত।—গ্রন্থকার।

† হরিনারায়ণের পুত্রের নাম শিবনারায়ণ চৌধুরী।—গ্রন্থকার।

চৌধুরী, কলিকাতায় রায় মহাশয়ের দপ্তরখানায় পক্ষ প্রাপ্ত হন। উঁহার পুত্রদ্বয় রমাপ্রসাদ বাবুর নিকট কাঁদিয়া পদানত হইলেও উক্ত রায় মহাশয়ের অন্তঃকরণে দয়ার উদ্রেক হইল না। অনন্তর ক্ষীরপাই রাধানগর-নিবাসী মৃত শিবনারায়ণ চৌধুরীর পুত্রদ্বয় এবং মৃত সদানন্দ ও শিবনারায়ণ চৌধুরীর বিধবা পত্নী, ইহাঁরাও কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট যাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ইহাঁদের রোদনে অগ্রজ মহাশয়েরও চক্ষে জল আসিল। ইহাঁরা রমাপ্রসাদ বাবুর ভয়ে তাঁহার বাটী পরিত্যাগ করিয়া, খিদিরপুরস্থিত পদ্মপুকুরের ধর্ম্মদাস কেরাণীর ভবনে গুপ্তভাবে প্রায় চারি মাসকাল অবস্থিতি করেন। অগ্রজ ইহাঁদিগকে ঋণজাল হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করেন। যাঁহার নিকট টাকার স্থির করেন, রমাপ্রসাদ বাবু তাঁহাদিগকে টাকা দিতে নিবারণ করিয়া দিতেন। তজ্জন্য কলিকাতার মধ্যে কোন মহাজন টাকা ধার দিতে অগ্রসর হয় নাই। অবশেষে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের আত্মীয় বাবু কালিদাস ঘোষ মহাশয়ের নিকট পঞ্চাশ হাজার টাকা ও অন্য এক ব্যক্তির নিকট পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া টাকা দিলেন; কিন্তু মহাজন উক্ত রায় মহাশয়, টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। কারণ, তিনি তাঁহাদের জমিদারী লইবার দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিলেন, সুতরাং অগ্রজ মহাশয় স্মিথ্‌সন কোম্পানীর বাটীতে গতিবিধি করিয়া অবিলম্বে টাকা জমা দিয়া, উহাদিগকে রমাপ্রসাদ বাবুর নিকট ঋণদায় হইতে অব্যাহতি করিয়া দেন। অগ্রজ মহাশয় রাধানগরের চৌধুরী বাবুদের জমিদারী রক্ষার জন্য ক্রমিক ছয় মাস কাল নানা স্থানে নিজের প্রায় দুই সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনিও রমাপ্রসাদ বাবুর হস্ত হইতে উহাদিগকে পরিত্রাণ করিয়া দেশস্থ সাধারণের নিকট বিলক্ষণ প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু এই জন্য তদবধি বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত অগ্রজের মনান্তর হইয়াছিল। অতঃপর কয়েক বৎসর চৌধুরী বাবু পরম সুখে কালাতিপাত করেন।

দুঃখের বিষয় এই, ভ্রাতৃবিরোধ ও বন্দোবস্ত না হওয়াতে দুই এক মহাজন পরিবর্ত্তের পর ঐ সম্পত্তি ক্রোকে নীলামে বিক্রয় হয়। তন্নিবন্ধন উঁহাদের কষ্ট উপস্থিত হইল। মৃত শিবনারায়ণ চৌধুরীর পত্নী ও সদানন্দ চৌধুরীর পত্নীকে মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থে অগ্রজ মহাশয় প্রতি মাসে প্রত্যেককে সমান ভাবে ৩০ টাকা মাসহারা প্রেরণ করিতেন। কিছুদিন পরে মোনপুরের কাশীনাথ ঘোষ ৮০০ শত টাকার জন্য উক্ত চৌধুরীদের নামে অভিযোগ করিয়া নালিস করিলে আমি উক্ত মহাশয়দের অনুরোধে কাশীনাথ ঘোষের সহিত ১৫০ টাকায় রফা করিয়া, দাদার নিকট ঐ টাকা লইয়া উক্ত বিষয় খোলসা করিয়া দিয়াছিলাম।"

কলেজের চাকুরীকালে কর্ত্তব্য ভাবিয়া শিক্ষার উন্নতিকল্পে বিদ্যাসাগর প্রাণপণ করিতেন। চাকুরি পরিত্যাগ করিয়াও তৎপক্ষে এক মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই। বরং সে সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার প্রশস্ততর পথ প্রাপ্ত হইয়া, দ্বিগুণতর উৎসাহ ও উদ্যমে আত্ম-উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইংরেজী শিক্ষার সুবিস্তর সংপ্রসারণে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন হয়, এটা অবশ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুদৃঢ় ধারণা ছিল। সেই জন্য কি পরাধীন অবস্থা, কি স্বাধীন অবস্থা, সর্ব্বাবস্থাতেই তিনি ইংরেজী শিক্ষার সংপ্রসারণ-সংকল্পে আত্মপ্রাণ নিয়োজিত করিতেন। ইংরেজী আদর্শে গঠিত চরিত্রবান্ অনেকেই ইংরেজী শিক্ষা-বিস্তারে চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু বিদ্যাসাগরের মত কৃতকার্য্য কয় জন? চাকুরীকালে তিনি যেমন নানা স্থানে নানা স্কুলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, চাকুরী যাইবার পরও তাঁহার যত্নে এবং অর্থব্যয়ে নানা স্থানে স্কুল

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আপন আর্থিক উন্নতি সাধন অপেক্ষা এ কার্য্যকে তিনি জীবনের অধিকতর কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেন। তাহারও পরিচয় পদে পদে পাইবেন। চাকুরী পরিত্যাগ করিবার পর প্রথমতঃ ১২৬৫ সাল ২১শে চৈত্র শুক্রবার বা ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে ও উদ্যোগে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কান্দীগ্রামে একটী ইংরেজী ও সংস্কৃত স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। কান্দীগ্রাম পাইকপাড়া রাজবংশীয় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের জন্মস্থান। রাজা বাহাদুরেরাই আপন ব্যয়ে স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন; কিন্তু বিদ্যাসাগরের সম্পূর্ণ উত্তেজনায়। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় এই স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এই সময়ই রাজা প্রতাপনারায়ণের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সবিশেষ সদ্ভাব সংস্থাপিত হয়। সিংহ-রাজপরিবারও এক সময় বিদ্যাসাগরের নিকট যথেষ্ট উপকার ও সাহায্য পাইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের স্বভাবসিদ্ধ সরলতার এমনই মোহকরী আকর্ষণী শক্তি যে, একবার তাঁহার সহিত যাঁহার আলাপ-পরিচয় হইত, তিনি তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া থাকিতেন।

এই সময়ে, এই কান্দীগ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্ব-আশ্রয়দাতা ৺জগদ্দুর্লভ সিংহের কন্যা শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি দাসীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। ক্ষেত্রমণি রাজ-পরিবারের রাজবাটীর ভাগিনেয়-বধূ। রাজবাটীর ভাগিনেয় লালমোহন ঘোষ তাঁহার স্বামী। বিদ্যাসাগর বাটীতে গিয়াছেন শুনিয়া, শ্রীমতী

ক্ষেত্রমণি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। নানা কারণে ক্ষেত্রমণির অবস্থা বড়ই হীন হইয়াছিল। বহু দিনের পর সেই দীনহীনা ক্ষেত্রমণিকে দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় চক্ষের চলে ভাসিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ক্ষেত্রমণির প্রার্থনায় মাসিক দশ ১০ দশ টাকা বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দেন।

বিদ্যাসাগর গুণী ও গুণগ্রাহী। ইহ-সংসারে সকল গুণীরই গুণনির্ণয়ে শক্তি থাকে না। সে শক্তি যে অন্তর্ভেদিনী সূক্ষ্ম-দৃষ্টির অন্তর্ভূতা। বিদ্যাসাগরের সে শক্তি অতুলনীয়। চাকুরী-কালে তাহার বহু পরিচয় পাইয়াছি। স্বাধীন অবস্থায় হিন্দুপেটরিয়টের সম্পাদক-নিয়োগেও তিনি সে শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। ১২৬৮ সালের ১লা আষাঢ় বা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন শুক্রবার বেলা ৯ নয়টার সময় হিন্দুপেট্রিয়টের স্বত্ত্বাধিকারী ও সম্পাদক সুলেখক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। ঐ বৎসরে ১২৬৮ সালের ১১ই শ্রাবণ বা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই পেটিয়ট কার্য্যালয় ভবানীপুর হইতে কলিকাতায় উঠিয়া আইসে। বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা দিয়া হিন্দুপেটরিয়টের সত্ত্ব ক্রয় করিয়া, ইহা পরিচালিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ অবস্থায় তিনি বেশী দিন রাখিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে হিন্দুপেট্রিয়টের ভারার্পণ করেন। এই সময় বাবু কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়, "বৃটিস ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনে"র কেরাণী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়

তাঁহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, হিন্দুপেটরিয়টের সম্পাদক-পদে নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণদাস পাল কেবল সম্পাদক নহেন; স্বত্বাধিকারীও হইলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে হয় নাই। উদীয়মান লেখক কৃষ্ণদাসের প্রতি বিদ্যাসাগরের এরূপ অসম্ভব বিশ্বাস-প্রীতি দেখিয়া সেই সময় অনেকেই চমকিত হইয়াছিলেন। দীর্ঘদর্শী বিদ্যাসাগরই বুঝিয়াছিলেন, কৃষ্ণদাস এক জন শক্তিশালী প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ। কৃষ্ণদাসের অশেষ শক্তিসম্পন্নতার অনুভবে বিদ্যাসাগর যে আপনারই সুতীক্ষ্ণ শক্তিসম্পন্নতারই পরিচয় দিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরাও তাহা বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু পরে কৃষ্ণদাসের অসীম শক্তিশীলতার অকাট্য প্রমাণে তাঁহাদিগকেও লজ্জায় মস্তক অবনত করিতে হইয়াছিল।

প্রিন্সিপাল-পদ পরিত্যাগ করিবার বৎসর দুই পূর্ব্বেও বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল পরপোকারার্থ "সোমপ্রকাশ" প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক দিন সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট আসিয়া সজল-নয়নে বলিলেন, —"মহাশয়! রক্ষা করুন। সংসার চলে না।" সারদাপ্রসাদ সংস্কৃত কলেজের শিক্ষিত ছাত্র ছিলেন। তিনি ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দৈব-বিড়ম্বনায় তাঁহার শ্রুতি-শক্তি নষ্ট হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার দুঃখে বিগলিত হইয়া, তৎপরিবার-প্রতিপালনের



অনারেবল কৃষ্ণদাস পাল

সদুপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি সারদা-প্রসাদেরই উপকারার্থ "সোমপ্রকাশ" প্রকাশ করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে সারদাপ্রসাদ পরে বর্দ্ধমান-রাজবাটীতে মহাভারতের অনুবাদ কার্য্যে এবং লাইব্রেরিয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত হন। বর্দ্ধমানরাজ মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন। ১২৫৪ সালে বা ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত মহারাজের প্রথম সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়। সেই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়, বাবু-রামগোপাল ঘোষ ও ভূকৈলাসের রাজা সত্যশরণ ঘোষালের সহিত বর্দ্ধমান-দর্শনার্থ গমন করেন। তাঁহারা তিন জনেই এক বাসায় ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজবাটীর সিদায় উদর পূর্ণ করিতে অসম্মত হইয়া, অপর কোন বন্ধুর বাড়ীতে ভোজন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন। মহারাজ এ সংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে বাড়ীতে আনাইবার জন্য লোক প্রেরণ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম যাইতে সম্মত হন নাই; কিন্তু নানা সাধ্যসাধনায় আর অনুরোধ এড়াইতে পারেন নাই। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়া, মহারাজ, আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। বিদায় লইবার সময়, মহারাজ তাঁহাকে উপহার স্বরূপ ৫০০ পাঁচ শত টাকা ও একজোড়া শাল দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু ইহা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, "আমি কাহারও দান লই না;

কলেজের বেতনই আমার স্বচ্ছন্দে চলে ; চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণ এইরূপ বিদায় পাইলে অনেকটা উপকৃত হইতে পারেন।" রাজা বিস্মিত হইলেন। সেই সময় হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়, যখনই বৰ্দ্ধমান যাইতেন, তখনই মহারাজ, তাঁহাকে সসম্ভ্রমে আদর অভ্যর্থনা করিতেন। বৰ্দ্ধমানাধিপতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এমনই শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন যে, বীরসিংহ গ্রামকে তাঁহার তালুক করিয়া দিবার জন্য তিনি স্বয়ং স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

এ প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন,—"আমার যখন এমন অবস্থা হইবে যে, আমি সমুদয় প্রজার খাজনা দিতে পারিব, তখন তালুক লইব।" *

এই বৰ্দ্ধমানরাজই বিধবা-বিবাহ-বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। বিধবা-বিবাহের আইন জন্য যে আবেদন হইয়াছিল, তাহাতে বৰ্দ্ধমান-রাজের স্বাক্ষর ছিল।

যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বৰ্দ্ধমান-রাজের এত ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা, তাঁহার অনুরোধমাত্রেই যে সারদাপ্রসাদ, বৰ্দ্ধমান-রাজবাটীতে কর্ম্ম পাইবেন, তাহা আর বেশী কথা কি? সারদাপ্রসাদের সংসার-পরিচালন সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিশ্চিন্ত হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং সোমপ্রকাশে লিখিতেন। সুলেখক মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের দুই

* এ কথা উত্তরপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি।

একটী প্রবন্ধও মধ্যে মধ্যে ইহাতে প্রকাশিত হইত। ক্রমে কিন্তু প্রতি সোমবারে নিয়মিত সোমপ্রকাশ বাহির করা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে কিছু ভারস্বরূপ হইয়া পড়িল। সময়াভাব-প্রযুক্ত তিনি ইহাতে আর সম্যক্ মনোযোগী হইতে পারিতেন না। এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় স্পষ্টই বলেন,—"একেতো আমার সময় নাই; তাহার উপর যথানিয়মে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ বাস্তবিকই চাকুরী অপেক্ষাও কষ্টকর।" অগত্যা এক জন সুদক্ষ সম্পাদকের অনুসন্ধান হইতে লাগিল। তিনি পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে উক্ত কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহারই হস্তে সোমপ্রকাশকে সমর্পণ করেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই সোমপ্রকাশের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হইলেন।

অধুনা যে প্রণালীতে ও যে প্রকরণে ইংরেজী সংবাদপত্র পরিচালিত হইয়া থাকে, বিদ্যাভূষণ মহাশয় সেই প্রণালীতে ও সেই প্রকরণে সোমপ্রকাশ পরিচালিত করেন। বিদ্যাভূষণ, বিদ্যাসাগরের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সোমপ্রকাশ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে অনেক বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সব সংবাদপত্রের অধিকাংশেই সমাজ ও ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়েরই আলোচনা অধিক পরিমাণে হইত। রাজনীতির আলোচনা হইত না, এমন নহে; তবে সোমপ্রকাশের ন্যায় উচ্চতর গভীর প্রণালীতে নহে। ভাষার পুষ্টি-সাধন সম্বন্ধে সোমপ্রকাশ উচ্চতর আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহা

বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে যে ভাষা-পুষ্টিকারিতার উচ্চতর সোপানই প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে সোমপ্রকাশের পূর্ব্বে যে সব সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহারাও বাঙ্গালা ভাষায় পুষ্টিসাধন জন্য বাঙ্গালীমাত্রেরই বরণীয়। প্রকৃতই বাঙ্গালা-গদ্যের পুষ্টি প্রারম্ভ বাঙ্গালা সংবাদপত্রে। প্রথম সংবাদপত্রে পুষ্টি-সঞ্চার; পরে তাহার ক্রমবিকাশ। সোমপ্রকাশের পূর্ব্বে যে সব সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হয়, প্রভাকরের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় দ্বিতীয় বর্ষের দ্বাদশ-সংখ্যক "নবজীবনে" * "বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইতিহাস" নামক একটী গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া, তাহাদের অধিকাংশের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে সংক্ষেপে এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম,—

অনেকের ধারণা, মিসনরীরা প্রথমে বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন; কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। ১২২২ সালে বা ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য নামক এক জন পণ্ডিত কলিকাতা সহরে সর্ব্বপ্রথম "বাঙ্গালা-গেজেট" নামে সংবাদপত্র প্রচার করেন। ১২২৪ সালে শ্রীরামপুরের পাদরী সাহেবেরা "সমাচার-দর্পণ" নামে সংবাদপত্র প্রচার করেন। ১২২৭ সালে কলুটোলা-নিবাসী তাঁরাচাঁদ দত্ত এবং ৺ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক "সংবাদ কৌমুদী" নামক সংবাদপত্র প্রকাশিত

* শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত মাসিক-পত্র।

হয়। রাজা রামমোহন রায় এই সংবাদপত্রে সতীদাহ প্রচার-বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে ভবানী বাবু ইহার সম্পাদকীয়তা ত্যাগ করেন। ১২২৮ সালে ভবানী বাবু সমাচার-চন্দ্রিকা নামে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ইহা পরে প্রাত্যহিক হয়। এক্ষণে ইহা বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত দৈনিক নামক প্রাত্যহিক পত্রের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। চন্দ্রিকা প্রকাশিত হইবার পর মৃজাপুর-নিবাসী কৃষ্ণমোহন দাস "সংবাদ-তিমির-নাশক" সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। কয়েক বর্ষ পরে এখানি উঠিয়া যায়। তিমির নাশক প্রকাশ হইবার পর রাজা রামমোহন রায়, বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে "বঙ্গদূত"-নামক সংবাদ-পত্রের সৃষ্টি হয়। ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ শুক্রবার সংবাদ-প্রভাকর প্রকাশিত হয়। পাথুরিয়াঘাটার ৺যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর সংবাদ-প্রভাকর প্রকাশের প্রধান উদ্যোগী। ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইহার সম্পাদক হইয়াছিলেন। ১২৩৩ সালে যোগেন্দ্র বাবু মানবলীলা সংবরণ করেন। প্রভা-করের প্রচারও বন্ধ হয়। এই বর্ষে গুপ্ত মহাশয় "সংবাদ-রত্নাবলী" নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক হন। কিছু দিন পরে তিনি ইহার সম্পাদকীয়তা পরিত্যাগ করেন। পরে ১২৪৩ সালে ২৭শে শ্রাবণ তিনি আবার সংবাদ-প্রভাকর প্রকাশ আরম্ভ করেন। এই সময় প্রভাকর সপ্তাহে তিন দিন প্রকাশিত হইত। ১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ় প্রাত্যহিক হয়। ১২৪২

সালে পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রকাশিত হয়। ইহা প্রথমে প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইত। ১২৪৩ সালে সাপ্তাহিক ও কয়েক বৎসর পরে প্রাত্যহিক হয়। ১২৩৭ সাল হইতে ১২৫৯ সাল পর্য্যন্ত যে সকল সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, গোপাল বাবু তাহার একটী তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। সে তালিকায় প্রকাশকের এবং সম্পাদকের নাম অ.ছে। কোন সংবাদপত্রের কত দিনে আরম্ভ, তাহারও উল্লেখ আছে। গণনায় ৮৯ খানি হইবে। "সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী" নামক একখানি সংবাদ-পত্রের বিজ্ঞাপন হইতে সংবাদ পর্য্যন্ত পদ্যে লিখিত হইত। প্রবন্ধ, অনুবন্ধ, সংবাদ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ভাষা, রুচি ও ভাব সম্বন্ধে সোমপ্রকাশ পূর্ব্ব প্রকাশিত সংবাদপত্র অপেক্ষা উন্নততর।

বিংশ অধ্যায়।

মহাভারতের অনুবাদ, সীতার বনবাস, অমায়িকতা, যৌবনের বিক্রম, গুরুভক্তি, রাজা ৺ঈশ্বরচন্দ্র, মধুরে-কঠোরে, ৺রমাপ্রসাদ রায়, ও আর্ত্ত-ত্রাণ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুবাদিত ভারতের যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল, ১৯১৬ সংবতে (১২৬৭ সালে) ১লা মাঘে বা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জানুয়ারিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। অন্যান্য পুস্তকের মত এ পুস্তক তত লাভজনক হয় নাই।

মহাভারতের অনুবাদাংশ লাভজনক না হইলেও, বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৯১৮ সংবতে (১২৬৮ সালে) ১লা বৈশাখে বা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রেল "সীতার বনবাস" প্রকাশ করেন। "সীতার বনবাসের" প্রতিপত্তিপরিচয় আর দিতে হইবে না। ভবভূতিপ্রণীত উত্তরচরিত অবলম্বনে সীতার বনবাস লিখিত। অবশ্য উত্তরচরিতের সর্ব্বাংশেই সীতার বনবাসের সামঞ্জস্য নাই। বিয়োগান্ত নাটক সংস্কৃত অলঙ্কারবিরুদ্ধ বলিয়া ভবভূতিকে উত্তরচরিতের উপসংহারে "রামসীতা" সম্মিলন সাধন করিতে হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়, "বিয়োগান্তেই" সীতার বনবাসের উপসংহার করিয়াছেন। ভবভূতিলিখিত ছায়াসীতার অপূর্ব্ব কল্পনা বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাসে অনুসৃত হয় নাই।

ছায়াসীতার দৃশ্যে রামসীতার অমানুষিকত্ব প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। এতৎপ্রতিপাদন বোধ হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিপ্রেত ছিল না। ভাষা-শিক্ষাকল্পে সীতার বনবাস বাঙ্গালা সাহিত্যের উপাদেয় পদ্যগ্রন্থ। বিদ্যাসাগর মহাশয় চারি দিনে "সীতার বনবাস" লিখিয়া সমাপ্ত করেন। দিবাভাগে নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, লিখিবার অবসর পাইতেন না; রাত্রি ২॥০ আড়াইটার সময় হইতে পরদিন বেলা ১০ দশটা পর্য্যন্ত লিখিতেন। একবার লিখিয়া পুনরালোচনা করিবার সময় ছিল না।

এস্থলে তাঁহার অমায়িকতা, সরলতা ও সদাশয়তার একটী দৃষ্টান্ত দিই। চাকুরীর অবস্থায় বিদ্যাসাগর মহাশয় অবসর পাইলেই বীরসিংহগ্রামে যাইতেন। স্বাধীন অবস্থায় অবশ্য যাইবার সময় ও সুবিধা অনেকটা হইয়াছিল। তিনি কলিকাতায় থাকিলেও, জন্মভূমি বীরসিংহ, তাঁহার মনোমধ্যে জাগরূক থাকিত। বীরসিংহ গ্রামে যাইলে, পূর্ব্ববৎ তিনি স্বগ্রামস্থ ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের অবস্থাহীন ও অবস্থাপন্ন সকল অধিবাসীরই তত্ত্ব লইতেন; আবশ্যকমতে অবস্থাভেদে আকাঙ্ক্ষিমাত্রকেই প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন; আগন্তুক অভ্যাগত জনকে সাদরসম্ভাষণে আদর-অভ্যর্থনা করিতেন; এবং যে যাহাতে সন্তুষ্ট হইত, তিনি তাহাকে তাহাতেই সন্তুষ্ট রাখিতেন। একবার তিনি বাড়ী যাইলে, তাঁহার মাতার মাতুলালয় পাতুলগ্রামনিবাসী রাঘব রায় নামক এক জন

বাগ্দী আসিয়া, তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল এবং প্রাণামান্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বলিল,—"কিহে আমাকে চিনিতে পার; তোমায় আমায় এক পাঠশালায় লিখিতাম; গুরু মহাশয়ের হাত থেকে তোমায় কতবার বাঁচয়েছি।" বিদ্যা-সাগর মহাশয় পুরাতন সহপাঠী রাঘবকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন;—"তুমি তো রাঘব?" রাঘব একটু বিমর্ষ হইয়া কর্ণে হস্ত প্রদান করিল। তখন এক জন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কানে কানে বলিয়া দিল,—"উহাকে কৃষ্ণ রায় বলুন; রাঘব আপনাকে বগ্‌ড়ি কৃষ্ণরায় দেবতা বলিয়া মনে করে; উহার উন্মাদের অনেকটা ছিট আছে; ও ব্রাহ্মণের চালে চলিয়া থাকে; ও বাগ্দীর অন্ন খায় না; এমন কি, ক্ষুধায় মরিয়া যাইলেও বৈষ্ণব-জাতীয় পৈতাধারীদিগেরও অন্ন গ্রহণ করে না।" বিদ্যাসাগর মহাশয় সকল ব্যাপার বুঝিলেন। তিনি সাহাস্যবদনে রাঘবকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া, আনন্দ-গদ্গদ-স্বরে বলিলেন—'তুমি কৃষ্ণ রায়'। রাঘবের আর আনন্দের সীমা রহিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যত দিন বাড়ীতে ছিলেন, তত দিনই রাঘবকে আপনার সম্মুখে সর্ব্বক্ষণই বসাইয়া রাখিতেন এবং তাহার সহিত তাহার তুষ্টিজনক কথাবার্ত্তা কহিতেন।

এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয়, বীরসিংহগ্রামে আপন ঘরের "দাওয়ায়" বসিয়াছিলেন, এমন সময় মটুক ঘোষ নামক এক সদ্গোপ তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে সাদর-সম্ভাষণ করিয়া, উপরে উঠিয়া বসিতে

বলিলেন। সে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখনই তাহাকে সেই 'দাওয়ার' উপর হইতে দুই হাত দিয়া বলপূর্ব্বক তুলিয়া, উপরে লইয়া বসাইলেন।

এখানে সদাশয়তার দৃষ্টান্ত উপলক্ষে যৌবনের বল-বিক্রমের কথা কিছু বলিয়া লই। বিদ্যাসাগর মহাশয়, বাল্যাবস্থার ন্যায় যৌবনেও ভীমপরাক্রম ছিলেন। তিনি বাল্যকালে কপাটী খেলিতে খেলিতে অতি বলবান যুবককেও ধরিয়া নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখিতেন। একটা গল্প শুনা যায়, গদাধর পাল নামক এক অতি-অমানুষিক বল-বিক্রমশালী যুবক বীরসিংহ গ্রামে বাস করিত। একবার এই গদাধর গঙ্গাপার হইতে হইতে নৌকামজ্জনে জলমগ্ন হয়। গদাধর তখন দুই জন অপর লোককে বগলে পূরিয়া সাঁতার দিতে দিতে নিকটবর্ত্তী একখানি ষ্টীমারের নিকট যাইয়া উপস্থিত হয়। ষ্টীমারের লোকেরা দড়ি ফেলিয়া, অপর দুই জন লোককে একেবারে তুলিয়া লয়; কিন্তু গদাধরকে তুলিতে দারুণ কষ্ট হইয়াছিল। এমন কি, প্রথম বার ষ্টীমারের লোকেরা তাহাকে একবার খানিকটা তুলিয়াই ফেলিয়া দিয়াছিল। এই বীর গদাধর কপাটী খেলিতে খেলিতে বিদ্যাসাগরের নিকট জব্দ হইত। সেই বিদ্যাসাগরই যৌবনে পুষ্টদেহ মটুক ঘোষকে শূন্যে তুলিয়া দাওয়ায় বসাইয়াছিলেন। বাল্যের সহৃদয়তা ও বলবত্তা, বিদ্যাসাগরের যৌবনেও পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। বাল্য-যৌবনে দেহ-মনের একাধারে এমন শক্তিসম্পন্নতার পূর্ণ বিকাশ অতি বিরল নহে কি?

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বাড়ী যাইতেন, তখনই প্রায় তাঁহার সঙ্গে ৫০০।৬০০ পাঁচ শ, ছয় শ, টাকা থাকিত। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রায় ৪০০।৫০০ চারি পাঁচ শ, টাকার বস্ত্র লইতেন। টাকা ও কাপড় দীনদুঃখীকে বিতরিত হইত। সর্ব্বদাই কলিকাতার বাটীতেও বিবিধপ্রকারের অনেক টাকার কাপড় মজুত থাকিত। তিনি যথাপাত্রে যথাযোগ্য বস্ত্র বিতরণ করিতেন।

১২৬৯ সালে বা ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি একবার বীরসিংহ গ্রামে গিয়াছিলেন। এক দিন মধ্যাহ্ন-ভোজনকালে দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে একটী বর্ষীয়সী রমণী ও একটী যুবতী দাঁড়াইয়া রোদন করিতেছেন। তিনি অবগত হইলেন যে, বর্ষীয়সী তাঁহার গুরুমহাশয়ের স্ত্রী এবং যুবতী,—কন্যা। গুরুমহাশয়ের বহুবিবাহ। তিনি এই স্ত্রী এবং তদীয় কন্যার ভরণপোষণের ভার বহন করেন নাই। তাঁহাদের দুই বেলা অন্ন জোটে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখনই গুরুমহাশয়কে ডাকাইয়া, স্ত্রী ও কন্যার ভার গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। গুরুমহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথায় সম্মত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইতিপূর্ব্বে গুরুমহাশয়কে বীরসিংহ গ্রামের স্কুলে পণ্ডিতপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার জন্য তাঁহাকে মাসে মাসে ৪ চারি টাকা দিতে স্বীকার করেন। কেবল স্বীকার নহে, তখনই তিন মাসের অগ্রিম দিলেন এবং তিন মাসের করিয়া অগ্রিম দিবেন বলিয়া

প্রতিশ্রুত হন। তাঁহাদের বস্ত্র সরবরাহের ভারও বিদ্যাসাগর মহাশয় লইয়াছিলেন। কিন্তু কিছু দিন পরে, গুরুমহাশয় স্ত্রী ও কন্যাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে কথা শুনিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে করিতে পারেন নাই; গুরু-মহাশয়কে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন বলিয়া তাঁহাকেও কিছু বলিতে পারেন নাই।

১৮৬৬ সালের ২২শে মাঘ বা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি কলিকাতা পাইকপাড়াস্থ রাজবংশের অন্যতম বংশধর রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মানবলীলা সংবরণ করেন। ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্পূর্ণ গুণগ্রাহী এবং কর্ম্মানুরাগী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুষ্ঠিত সকল কার্য্যেই রাজা বাহাদুরের সবিশেষ সমবেদনা ছিল। রাজা বাহা-দুরের বিয়োগে বিদ্যাসাগর মহাশয় বড়ই কাতর হইয়াছিলেন। রাজা বাহাদুরের মৃত্যুসময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার নিকটে উপস্থিত ছিলেন। পাইকপাড়া-রাজবংশ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট নানা কারণে কৃতজ্ঞ।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন দীন-দয়াল, তেমনই সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গেরও সহায়-সুহৃদ্ ছিলেন। কাহারও নিকট তিনি একটী পয়সারও প্রত্যাশা করিতেন না; কিন্তু সকলেরই উপকারার্থ দেহ-প্রাণ উৎসর্গ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না; এমন কি, অনেক সময় বিপন্ন কুবেরকুলেরও বিপদুদ্ধারার্থ, অকাতরে নিজের অর্থব্যয় করিতেন এবং অবিশ্রান্ত স্বেদভারে



রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ।

কখন মুহূর্ত্তের জন্যও কাতর হইতেন না। আবার, কাহা দ্বারা কোনরূপ কর্ত্তব্য-ত্রুটি দেখিলে, অথবা কাহা দ্বারা কোনরূপে আত্মসম্ভ্রমের ত্রুটি দেখিলে, তিনি তদ্দণ্ডেই বজ্রাদপি কঠোরহৃদয়ে কুবেরসম কোটিপতি সুহৃদেরও সুদৃঢ় সৌহার্দ্দ-স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিতেন। ঘৃণায় আর তাঁহার পানে তিনি মুখ তুলিয়াও চাহিয়া দেখিতেন না। তখন রাজকুলেরও সেই সৌধহর্ম্ম্যাবলী তাঁহার চক্ষে ভীষণ নরকাররূপে প্রতীয়মান হইত। যেমন বাহিরে, তেমনই ঘরে। স্বভাবস্নেহে আত্মীয়-স্বজন ও সুহৃদ্-সন্তানের প্রতি যেমন ক্ষীরধারের অনন্ত স্রোত ছুটিত; আবার কাহারও কর্ত্তব্য ত্রুটি দেখিলে, তেমনই দারুণ মনঃক্ষোভে সহস্র সূর্য্যের সুতীক্ষ্ণ জালাময় তীব্রতাপ ফুটিয়া উঠিত। প্রকৃতই বিদ্যাসাগরের হৃদয়,—"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।"

১২৬৯ সালে বা ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ৺ রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র, হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল রমাপ্রসাদ রায়ের দেহান্তর হয়। রমাপ্রসাদ বাবুই প্রথমে হাইকোর্টের বিচারপতি-পদে অধিষ্ঠিত হইবার আজ্ঞাপত্র পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে হাইকোর্টের সে পবিত্র আসনোবেশন-সুখ ভোগ করিতে হয় নাই। রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত বিদ্যাসাগরের প্রগাঢ় সখ্যতা ছিল; কিন্তু বিধবা-বিবাহের আন্দোলন-কালে একটা মনোমালিন্য সংঘটিত হয়। শুনিতে পাই, বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের আন্দোলনে প্রথমতঃ রমাপ্রসাদ রায়ের

নিকট হইতে সবিশেষ সহানুভূতি পাইয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্য-কালে সাহায্য পাওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাকে দুই একটী মর্ম্মান্তিক কথা শুনিতে হইয়াছিল। * বিদ্যাসাগর মহাশয় ৺রমাপ্রসাদ রায়ের বাড়ী প্রায়ই যাইতেন; কিন্তু ইহার পর গতিবিধি একরূপ বন্ধ হইয়াছিল। রমাপ্রসাদ রায়ের মৃত্যু-সংবাদে কিন্তু বিদ্যাসাগর অশ্রু-সংবরণ করিতে পারেন নাই।

---

* এই কথা সম্বন্ধে মতবিরোধ আছে। সঞ্জীবনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল,—"শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সর্ব্বপ্রথম বিধবা বিবাহ হয়। তখন কলিকাতার অনেক বড় লোক এবিষয়ে সাহায্য করিতে এবং বিবাহ-স্থলে উপস্থিত হইতে প্রতিশ্রুত থাকিয়া একখানি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন। লজ্জার বিষয় এই যে,কেহই উপস্থিত হন নাই। এই বিবাহের পূর্ব্বে তিনি স্বাক্ষরকারিগণের মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। রমাপ্রসাদ রায় বলিলেন, 'আমি ভিতরে ভিতরে আছিইত, সাহায্যও করিব, বিবাহস্থলে নাই গেলাম?' এই কথা শুনিয়া ঘৃণা এবং ক্রোধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কিয়ৎক্ষণ কথা বাহির হইল না। তাহার পর দেওয়ালে স্থিত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ছবির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'ওটা ফেলে দাও, ফেলে দাও'। এইরূপ বলিয়া চলিয়া গেলেন।"

এতৎসম্বন্ধে পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় প্রকৃতি নামক সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন,—"আমার পিতৃদেব গোপীনাথ রায় চূড়ামণি মহাশয় বলিয়াছিলেন, তিনি (রমাপ্রসাদ) বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কহিয়া-ছিলেন, 'আমার পিতা, সমাজসংস্কারের কসুর করেন নাই। তাতেতো কোনই ফল ফলে নাই। অতএব আর চেষ্টা পাওয়া বৃথা'; এই বলিয়া বিধবা বিবাহের সভায় যাইতে অস্বীকৃত হন। বিদ্যাসাগর ও রমাপ্রসাদ বাবুর কথোপকথন সময়ে বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, পণ্ডিত কালিদাস তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃতি অন্যান্য অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের নিকটও এই কথাই শুনিয়া আসিতেছিলাম।"

শক্তিসম্পন্ন পুরুষ, শক্তিপূজকের চিরকালই পূজনীয়। বিদ্যাসাগর প্রকৃত শক্তি-সেবী; রমাপ্রসাদ রায়ও প্রকৃত শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন।

এই খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সিমলা অঞ্চলে একটী বিধবা-বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বর-কন্যা উভয়ই ব্রাহ্মণ। ইহার পর অন্যান্য স্থানে আরও কতকগুলি বিধবা-বিবাহ হইয়াছিল।

পুস্তক-বিক্রয়ে ও ছাপাখানার কাজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আয় অনেকটা বাড়িয়াছিল বটে; কিন্তু বিধবা-বিবাহের ব্যয়ে ও অন্যান্য বহুবিধ দান-ব্যাপারে তাঁহার ঋণও বিলক্ষণ হইয়াছিল। কখনও কেহ তাঁহার নিকট হাত পাতিয়া কো বিমুখ হইত না। বিপন্ন ও শরণাগত জন সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে, বিদ্যাসাগর স্থির থাকিতে পারিতেন না। হস্তে এক কপর্দক নাই; কিন্তু দশ হাজার টাকা দিয়া, এক জন বিপন্নকে রক্ষা করিতে হইবে। অর্থ নাই; কিন্তু বিপন্নের জন্য প্রাণ ব্যাকুল। সে ব্যাকুলতা আমরা হৃদয়হীন কি বুঝিব বল? সে ব্যাকুলতার বেগরোধ বিদ্যাসাগরের অসাধ্য হইত। কাজেই ঋণভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। ঋণ করিয়া দুঃখীর দুঃখমোচন করা, বিদ্যাসাগরের বাল্যাবস্থা হইতে অভ্যাস। যখন কলেজে পড়িতেন, তখন কাহারও বস্ত্রাভাব বা অন্নাভাবের কথা শুনিলে, তিনি দ্বারবানের নিকট চারি পয়সা সুদ দিয়া ধার লইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন, দ্বারবানেরা জানিত, আমি নিঃসম্বল; তবু যে তারা আমাকে কেন ধার দিত, বলিতে

পারি না। বিদ্যাসাগরের জীবনে প্রায় অর্দ্ধ লক্ষাধিক টাকা ঋণ হইয়াছিল; কিন্তু তিনি মৃত্যুকালে এক কপর্দ্দক ঋণ রাখিয়া যান নাই। দশ হউক, আর দশ হাজারই হউক, প্রার্থনার প্রকৃত প্রয়োজন বুঝিলেই, যেখান হইতেই হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা সংগ্রহ করিয়া দিতেন। মাইকেল মধুসূদনকে তিনি ১০,০০০ দশ সহস্র মুদ্রা অকাতরে দিয়াছিলেন। এই ১০,০০০ দশ সহস্র টাকা তাঁহাকে ঋণ করিতে হইয়াছিল। এই টাকা তিনি প্রথমতঃ হাইকোর্টের মৃত জজ অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট ঋণ করিয়াছিলেন। পরে পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে টাকা লইয়া, তিনি অনুকুল বাবুর টাকা পরিশোধ করেন। এই শ্রীশবিদ্যারত্নই বিদ্যাসাগরের মতের প্রথম বিধবা-বিবাহকারী। এই দেনা শোধের নিমিত্ত এই টাকা আবার তাঁহাকে ছাপাখানার অংশ বিক্রয় করিয়া দিতে হয়। সে বৃত্তান্ত পরে যথাস্থানে প্রকটিত হইবে।



মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

একবিংশ অধ্যায়।

মাইকেল ও বিদ্যাসাগর।

১২৬৯ সালে বা ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। কলি-কাতার কোন প্রসিদ্ধ উকীলের যোক্তায় তাঁহার জমী-জমার পত্তনী লইয়াছিলেন। কোন কায়স্থ রাজা বাহাদুর, সেই পত্তনীদারের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া মাইকেলকে বিলাতে পাঠাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাইকেল বার কতক টাকা পাইয়াছিলেন মাত্র; তার পর বারবার পত্র লিখিয়াও টাকা পাওয়া দূরের কথা, পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত পান নাই। অর্থাভাবে তাঁহার কষ্টের সীমা ছিল না; এমন কি, কারাবাসের উপক্রম হইয়াছিল। তিনি নিরুপায় হইয়া, সকরুণ বাক্-বিন্যাসে পত্র লিখিয়া, বিদ্যাসাগরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও, সত্য সত্যই মাই-কেলের সেই পত্র পাঠ করিতে করিতে রুদ্ধকণ্ঠে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।* হস্তে এক কপর্দ্দকও ছিল না; কিন্তু

* মাইকেল ফরাসি-রাজ্য হইতে যে সব পত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলি আমার হস্তগত হইয়াছে। সেই সব পত্রের প্রত্যেকেই প্রায় টাকার প্রার্থনা ও প্রাপ্তিস্বীকার। সে সব পত্র প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন। যে সব পত্র লিখিয়া মাইকেল, বিদ্যাসাগরকে দ্রবীভূত করিয়াছিলেন, তাহারও অধিকাংশ মাইকেলের জীবন-চরিতে প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং তাহারও প্রকাশ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

৬০০০ ছয় সহস্র টাকা ঋণ করিয়া তিনি তদণ্ডেই মাইকেলকে পাঠাইয়া দেন। টাকার প্রয়োজন হইলে, তিনি প্রায়ই বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট হইতে কোম্পানী কাগজ লইয়া, বন্ধক দিতেন; পরে সময় মত টাকা সংগ্রহ করিয়া, সুদে-আসলে সব পরিশোধ করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে, মাইকেলকে নিশ্চিতই অনাহারে মরিতে হইত।

মৃতকল্প মাইকেল, অবশ্য আদৌ মনে করেন নাই যে, তিনি একেবারে এত সাহায্য পাইবেন। বলা বাহুল্য, এ সাহায্যে তাঁহার মৃত দেহে জীবন সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি তখনই জীবনদাতা বিদ্যাসাগরকে হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আনন্দ-বিগলিত-চিত্তে, অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া, পত্র লিখিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতা কেবল পত্রে নহে; কবির অমর "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে" জলন্ত দিব্যাক্ষরে এখনও জাজ্বল্যমান। বিদ্যাসাগরের দাতৃত্ব ও মহত্ত্ব কবির মর্ম্মে মর্ম্মে উচ্ছ্বসিত। সে মর্ম্মোচ্ছ্বাস চৌদ্দ ছত্রের অক্ষরে অক্ষরে উৎসারিত। বিদ্যাসাগরের সহস্র গুণ সত্য; কিন্তু মাইকেল, দাতৃত্বের পূর্ণ পরিচয় পাইয়াছিলেন, প্রথমেই বিদেশ বিলাতভূমে— অতি-বড় শঙ্কটে। তাই কৃতজ্ঞ কবি, সে "দাতৃত্বের" যেন একটা বিরাট সজীব মূর্ত্তি সম্মুখে গড়িয়া, তাহাতেই তন্ময় হইয়া, কাতরকণ্ঠে সপ্ত সুর চড়াইয়া, মুক্তপ্রাণে মুক্তোচ্ছ্বাসে গাহিয়াছিলেন,—

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে ;
দীন যে, দীনের বন্ধু! উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্যবলে! পেয়ে সে মহাপর্ব্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ! কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!—
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী ;
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘশির তরুদল, দাসরূপ ধরি ;
পরিমল ফুল-কুল দশ দিশ ভরে,
দিবসে শীতলশ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে।"

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, ৮৬ পৃষ্ঠা।

১২৭৩ সালে ফাল্গুন মাসে বা ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে মাইকেল বিলাত হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। তখনও তিনি নিঃস্ব ; এক রকম নিরন্ন বলিলেও বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। মাইকেল বিলাত হইতে আসিবার পুর্ব্বে বিদ্যাসাগরকে পত্র লিখিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহার জন্য একটা তেতলা বাড়ী সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়াছিলেন। মাইকেল আসিয়া কিন্তু একটা হোটেলে থাকেন। বিদ্যাসাগর

মহাশয়, তাঁহাকে সেই হোটেল হইতে তুলিয়া লইয়া আসেন। "বারিষ্টারী" কার্য্যে প্রবেশ করিবার পক্ষে মাইকেলের একটা অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্যে এ অন্তরায় দূরীকৃত হইতে পারে, মাইকেলের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্দ্ধমানে ছিলেন। মাইকেল বর্দ্ধমানে গিয়া কাতরকণ্ঠে সাহায্য প্রার্থনা করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার অথাদ্র কলিকাতায় আসিয়া, নানা যোগাড়-যন্ত্র করিয়া, মাইকেলকে "বারিষ্টারী" কার্য্যে প্রবেশ করাইয়া দেন। মাইকেল, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পিতার মত ভক্তি করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহাকে পুত্রবৎ ভাল বাসিতেন। বারিষ্টার হইলেও, মাইকেল পরিবার-পালনোপযোগী উপার্জ্জনে অক্ষম হইয়াছিলেন। স্বপ্রকাশিত পুস্তকের কতকটা আয় থাকিলেও তিনি পানদোষে অমিতব্যয়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। এ কারণ তাঁহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে মধ্যে মধ্যে সাহায্য লইতে হইত। হস্তে এক কপর্দ্দকও নাই, মাইকেল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, থাকে থাকে টাকা সাজান; দু-দশটা লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন; "নিস্ নে, নিস্ নে" করিতে করিতে, মুঠো ভরিয়া তুলিয়া লইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার এরূপ কার্য্যে বিরক্ত হইতেন না।

সহস্র স্বভাব-দোষসত্ত্বেও, মাইকেল বুদ্ধি-প্রতিভা-বলে বিদ্যাসাগরের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। মাইকেলের

"প্রতিভা" জগতের পূজনীয়া; প্রতিভার পূর্ণাকর বিদ্যাসাগরের প্রেমপ্রীতি যে আকর্ষণ করিবে, তার বিচিত্র কি? প্রতিভার পূজা প্রতিভার কাছে; প্রতিভার রাজ্যে প্রেমের প্রস্রবণ ছুটে; প্রতিভা মানুষের দোষ ঢাকিয়া রাখে; প্রতিভা মানুষকে অন্ধ করে; জগতের ইতিহাসে,—প্রেমের সংসারে, এমন সহস্র দৃষ্টান্ত পাইবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় মাইকেলের প্রতিভায় এতাদৃশ বিমোহিত ছিলেন যে, অনেক সময় মাইকেল কথার অবাধ্য হইলেও, তিনি তাহাতে রাগ করিতেন না। জামাতৃপুত্রেরও অশিষ্টতা, অবাধ্যতা, কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখতা এবং দুষ্কৃতিপোষকতা যে বিদ্যাসাগরের অসহ্য হইত; এমন কি, তাঁহাদের মুখাবলোকনেও যাঁহার প্রবৃত্তি হইত না; সেই বিদ্যাসাগর মাইকেলের শত অপরাধ বুক পাতিয়া লইতেন। প্রতিভা-পূজার প্রকৃত পরিচয় ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? মাইকেলের সাহায্যার্থ বিদ্যাসাগরকে অন্ততঃ চারি সহস্র টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। মাইকেল এক কপর্দ্দকও ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন নাই।

এতদ্ব্যতীত মাইকেলের আরও অনেক টাকার ঋণ ছিল। নিম্নলিখিত পত্রে ও তালিকায় তাহার প্রমাণ ;—

ঈশ্বরঃ

শরণম্।

পিতঃ!

পঞ্চকোটের মহারাজার নিরতিশয় আগ্রহাতিশয়ে বাধ্য হইয়া, অদ্য রাত্রিতেই

আমাকে পুরুলিয়ায় যাত্রা করিতে হইল। সুতরাং মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অক্ষম হইলাম। ভরসা করি, আগামী সোমবারে পুনরায় শ্রীচরণ-সন্নিধানে উপস্থিত হইতে পারিব।

দত্তজ মহাশয়ের ঋণদাতৃগণের নামসম্বলিত ঋণের "তালিকা" এই সঙ্গে পাঠাইলাম। মহাশয়ের শ্রীচরণ-কমলে বিনীত ভাবে আমি এই প্রার্থনা করি যে, যেরূপে পারেন, বিপন্ন দত্তজকে এবারে রক্ষা করিয়া স্বীয় অপার করুণার আরো সুপরিচয় প্রদান করিবেন। ফলতঃ মহাশয়ের অনুগ্রহ ভিন্ন বর্ত্তমানে দত্তজার আর উপায়ান্তর নাই। নিবেদন ইতি,

১০ই আশ্বিন, রাত্রি। | পদানত দাস শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের দেনার হিসাব।

ট্রেড্‌স্ এসোসিয়াসন ৫০০০, বাবু কালীচরণ ঘোষ ৫০০০, টালিগঞ্জের মথুর কুণ্ডু ৪০০০, গোবিন্দচন্দ্র দে বহুবাজার ৩০০০, দ্বারকানাথ মিত্র ২৫০০, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত শ্যামবাজার ১১০০, হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খিদিরপুর ১৩০০, রাজেন্দ্র দত্ত ডাকতর চন্দননগর ২০০, কেদার ডাকতর ২০০, গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী ১০০০, লালা বড়বাজার ৮৫০০, গয়েজ্ সাহেব ৬০০, বিশ্বনাথ লাহা, ১০০, দে কোম্পানী ১০০, মানভূম ৫০০, মনিরুদ্দিন্ ৪০০, আমিরন্ আয়া ২০০, ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানী ৩৬০০, বেণারসের রাজা ১৫০০, মতিচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০০, উমেশচন্দ্র বসু ও মুনসীর মাহি আনা ৫০০, গাড়ি ভাড়া ৩৪০, চাকরানের মাহিআনা ৭০০।

ঋণ-সমুদ্র হইতে মাইকেলকে উদ্ধার করা বিদ্যাসাগর মহাশয় দুঃসাধ্য ভাবিয়াছিলেন। ১২৭৯ সালের ১৫ই আশ্বিন বা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে, তিনি মাইকেলকে

ইংরেজীতে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছিলেন,—"তোমার আর আশা-ভরসা নাই। আমি কি আর কেহই তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তালি দিয়া আর চলিবে না।"

কোনরূপ দুরভিসন্ধি-বশে মাইকেল যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঋণ পরিশোধ করেন নাই, তাহা নহে; প্রকৃত পক্ষেই তিনি ঋণ পরিশোধে অপারগ ছিলেন। এই অপারগতার মূল কারণ অতীব অমিত-ব্যয়িতা। একে অমিতব্যয়ী, তাহার উপর উপার্জ্জনে তিনি সম্পূর্ণ অমনোযোগী ছিলেন। শুনিয়াছি, অনেক সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে জোর-জবরদস্তী করিয়া আদালতে পাঠাইয়া দিতেন। এইরূপ না হইলে, তাঁহাকে অকালে আলিপুরের দাতব্য হাসপাতালে দীনহীন কাঙ্গালের মত, দারুণ মনস্তাপে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে কেন? * মাইকেল ঋণ পরিশোধে অপারগ ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তজ্জন্য আদৌ চিন্তা করিতেন না। যাঁহার জন্য মলিন মাতৃভাষার এতাদৃশ মুখ উজ্জ্বল, তাঁহার

* ১২৮০ সালের ১৬ই আষাঢ় বা ১৮৭৩ সালের ২৯শে জুন রবিবার বেলা ২টার সময় মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দুই এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে মাইকেল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বক্ষঃস্থল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। তিনি নিজের স্বভাবের দোষাতিরেকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিষ্ণুতার সীমা মধ্যে স্থির হইয়া থাকিতে পারেন নাই। মাইকেল শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আদৌ সদ্ব্যবহার করেন নাই। একবার বিদ্যাসাগর মহাশয় মাইকেলকে বাবু সম্বোধন করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। মাইকেল সে পত্র প্রত্যাখান করেন। অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয় বিলাত-ফেরত বাঙ্গালীকে বড় প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না।

সাহায্যার্থ অর্থব্যয় করিয়া, সে অর্থের প্রতিশোধ প্রত্যাশা না করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় মাতৃভূমির কৃতজ্ঞ পুত্রের কার্য্য করিয়াছিলেন। ঋণ পরিশোধ না হউক, কাব্যে সাহিত্য-সংসারে মাইকেল মাতৃভূমির বহু ঋণ পরিশোধ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

অধমর্ণের ব্যবহার ও অযাচিত দান।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, ঋণ করিয়া, যে সব ঋণগ্রস্ত অধমর্ণকে উত্তমর্ণদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহাকেও একটী দিনের জন্য টাকার তাগাদায় বিরক্ত করিতেন না। অনেক ঋণগ্রস্ত অধমর্ণ, তাঁহার কৃপায় উদ্ধার লাভ করিয়াও, ঋণ পরিশোধ করে নাই। কেহ কেহ ক্ষমতা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ করেন নাই; কেহ কেহ বা সত্য-সত্যই ঋণ-পরিশোধে অক্ষম ছিলেন। এমন কত ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, তাঁহার কৃপায় মুক্তিলাভ করিয়াছিল, তাহার নিরূপণ নাই। তদীয় ভ্রাতা বিদ্যারত্ন মহাশয়, যে কয়টী উদাহরণের উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা পাঠকবর্গের পরিতৃপ্ত্যর্থ তাহারই পুনরুল্লেখ এইখানে করিলাম;—

(১) রাধানগর-নিবাসী রামকমল মিশ্র এবং গঙ্গাদাসপুর-নিবাসী গোরাচাঁদ দত্ত, গঙ্গাদাসপুর-নিবাসী তারাচাঁদ সরকারের ৫০০ টাকা ধারিতেন। তারাচাঁদ উভয়েরই নামে নালিস করিয়া "ডিক্রী" পান। পরে ঐ দুই জন দেনাদায়, ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। ইহাঁরা কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তখন ৺শ্যামাচরণ দে মহাশয়ের বাড়ীতে ছিলেন। তাঁহার নিকট তখন টাকা ছিল না। তিনি তথায় রাখাল মিত্র নামক

এক ব্যক্তির নিকট খত লেখাইয়া এবং স্বয়ং সাক্ষী হইয়া ৫১০ টাকা তাঁহাদিগকে দিয়াছিলেন। তাঁহারা কিন্তু ইহার পর আর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। রাখাল বাবুর মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহার স্ত্রীকে সুদ-সহ টাকা দিয়া, খত খোলাস করেন।

(২) একবার পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ৫০০ টাকার জন্য বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কাঁদিয়া কাটিয়া পড়েন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ৫০০ টাকা ধার করিয়া তাঁহাকে দিয়াছিলেন। ইহার পরে তর্কালঙ্কারের সহিত আর তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই।

(৩) এক সময় জাহানাবাদের নিকট কোন গ্রামনিবাসী ভট্টাচার্য্য, দুই শত টাকা ঋণ করিয়া, পুত্র-পরিজন প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি এ ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন নাই। পাওনদার মহাজন, তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আসিয়া গদগদশ্রু-লোচনে কাতরকণ্ঠে আপনার দুঃখের কথা জানাইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহাকে দুই শত টাকাই দান করিয়াছিলেন।

পাঠক! একবার ভাব,—গৃহস্থ বিদ্যাসাগরের একি অপার করুণা এবং অশ্রুতপূর্ব্ব অসমসাহস। বিদ্যাসাগরের এ দাতৃত্ব-পরিচয়ে কোটিপতি ধনকুবেরকেও সবিস্ময়ে সহস্র বার মস্তক অবনত করিতে হয়। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ

পারসীক,—যে কেন হউক না, বিদ্যাসাগরের নিকট হাত পাতিয়া কখন কেহ বঞ্চিত হয় নাই।

ভাটপাড়া-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট চতুষ্পাঠীর সাহায্যার্থ প্রার্থনা করিয়া মাসিক ১০ টাকা বৃত্তি চারি বৎসর কাল পাইয়াছিলেন। পরে তিনি উপায়ক্ষম হইয়া বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেন। মাসিক বৃত্তি ব্যতীত ন্যায়রত্ন মহাশয় আরও নানারূপ সহায্য পাইতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, কেবল সাহায্যপ্রার্থীমাত্রেরই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না। কোথায় কাহার কিরূপ কষ্ট, কে কোথায় অর্থাভাবে দারুণ দারিদ্র্য-নিষ্পেষণে বিপদাপন্ন অথবা অন্নাভাবে ভীষণ জঠরানলে অবসন্ন, তাহারও সন্ধান লইয়া, তিনি স্বকীয় সাধ্যমত আর্ত্তত্রাণোপযোগী সাহায্য করিতেন। যখনই তিনি বাহির হইতেন, তখনই টাকা আধুলী, দুয়ানী, পয়সা সঙ্গে করিয়া লইতেন। সেগুলি প্রায়ই ফিরিয়া আসিত না। শুনিয়াছি, সময়ে সময়ে, রাত্রিকালে বাড়ী ফিরিবার সময়, কোন অভাগিনী বেশ্যাকে উপার্জ্জন-আশায় কষ্টভোগ করিতে দেখিলে, তিনি তাহাকে টাকা পয়সা দিয়া, সে রাত্রির জন্য তাহাকে ঘরে ফিরিয়া যাইবার পরামর্শ দিতেন। এক সময়ে কলিকাতা সহরে এক অতি দরিদ্র দুঃস্থ মান্দ্রাজী, স্ত্রী ও বহু সন্তান সন্ততি লইয়া, অতি নীচ জঘন্য সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিতেছিল। তাহাদের দুঃখের পার

ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাহাদের সে শোচনীয় অবস্থার কথা শুনিয়া, স্বয়ং তাহাদের আলয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয়, একটী বন্ধুর সহিত কলিকাতায় সিমলা-হেদুয়ার নিকট পাদচরণ করিতেছিলেন। সেই সময় একটী ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করিয়া অতি বিষণ্ণ ভাবে তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণের চক্ষে জল পড়িতেছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আপনি কাঁদিতেছেন কেন?" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চটি জুতা ও মোটা চাদর দেখিয়া, সামান্য লোকবোধে, ব্রাহ্মণের কোন কথাই বলিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পীড়াপীড়িতে তিনি বলেন,—"আমি এক ব্যক্তির নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া, কন্যাদায় হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছি; কিন্তু সে টাকা পরিশোধ করিতে অক্ষম। ঋণদাতা আদালতে আমার নামে নালিস করিয়াছে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় জিজ্ঞাসিলেন,—"মোকদ্দমা কবে?" ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"পরশ্ব।" ক্রমে ক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয়, মোকদ্দমার নম্বর, ব্রাহ্মণের নাম, ধাম প্রভৃতি একে একে সব জানিয়া লইলেন। ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে পর, তিনি সঙ্গী বন্ধুটীকে মোকদ্দমার প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে বলেন। তথ্যানুসন্ধানে ঠিক হয়, ব্রাহ্মণের কথা সত্য; দেনা তাঁর

সুদে আসলে ২৪০০ টাকা। বিদ্যাসাগর মহাশয়, ২৪০০ টাকাই আদালতে জমা দেন। তিনি আদালতের উকীল-আমলাকে বলিয়া রাখেন,—"আমার নাম যেন প্রকাশ না হয়; নাম প্রকাশের জন্য ব্রাহ্মণ যে পুরস্কার দিতে প্রস্তুত হইবে, আমি তাহা দিব।" ব্রাহ্মণ মোকদ্দমার দিন উপস্থিত হইয়া বুঝিলেন, কোন পুরুষোত্তম, তাঁহার দেনা পরিশোধ করিয়াছেন। তিনি বহু চেষ্টায়ও উদ্ধার-কর্তার নাম জানিতে না পারিয়া, বিষাদ-পুলকে বাড়ী ফিরিয়া যান। কিছু দিন পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধুটীর সহিত ব্রাহ্মণের এক দিন সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের ঋণ পরিশোধ হইয়াছে, বন্ধু ব্রাহ্মণের মুখে তা শুনিয়াছিলেন; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় যে তাঁহার উদ্ধার-কর্তা, তিনি তাহা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করেন নাই। ব্রাহ্মণ সহরের অনেক ধনীর নিকট দুঃখের কথা জানাইয়াও যে এক কপর্দ্দক কাহারও নিকট পান নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয়, ব্রাহ্মণের মুখে তাহা পূর্ব্ব-সাক্ষাতে শুনিয়াছিলেন। *

কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী। একটী মিথ্যা কহিয়া ধর্ম্মবতার যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অসীম

---

* এ দান-বিবরণটী আমরা ভট্টপল্লীর খ্যাতনামা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি।

দাতৃত্বগুণে সে কর্ম্মফল খণ্ডিত হইবে না নিশ্চতই। তবে তিনি তাঁহার দাতৃত্বকার্য্যের অনুরূপে ও অনুপাতে, পরকালে পরম সুখফলভোগী হইবেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

পুনঃ কার্য্য-প্রার্থনা, ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউসন ও শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা।

১২৬৯ সালে বা ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ব্যাকরণ-কৌমুদীর চতুর্থ ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, সরকারের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু সরকার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সরকারী বৈতনিক কার্য্যে তিনি আর আত্ম-নিয়োগ করেন নাই। তবে বিধবা-বিবাহ-প্রচলন জন্য ব্যয়-নিবন্ধন নানা প্রকারে ঋণ-জালে জড়িত হইয়া, তিনি আর একবার সরকারী কর্ম্মের প্রার্থী হইয়াছিলেন। তাঁহার এ কার্য্য প্রার্থনা ইহ-সংসারে একান্ত বিস্ময়াবহ ব্যাপার নহে। অবস্থার আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনে ইহা অসম্ভবপরও নহে। রাজপুতনার বীর প্রতাপসিংহ, পরিবার সহ পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন; তবুও মুসলান সম্রাটের হস্তে আত্ম-বিসর্জ্জন করেন নাই। কিন্তু যে দিন তিনি দেখিলেন, তাঁহার প্রাণ-প্রিয়তম শিশুগণ ঘাসের রুটি খাইতেছে; আর সে রুটি বিড়ালে মুখ হইতে কাড়িয়া লইতেছে; সেই দিন সে দৃশ্য তাঁহার অসহ হইয়াছিল। আর সহিতে না পারিয়া, তিনি সম্রাট আকবরকে আত্ম-বিসর্জ্জন-কল্পে পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু

প্রকৃত পক্ষে তিনি আত্ম-বিসর্জ্জন করেন নাই। প্রতাপসিংহের ন্যায় তেজস্বী দেশভক্ত আর কে আছে? যখন অবস্থাভেদে তাঁহারও আত্ম-ত্রুটি, তখন অন্য পরে কথা কি?

বিদ্যাসাগর মহাশয়, ঋণ-নিষ্পীড়নে পুনরায় সরকারী কর্ম্মের প্রার্থী হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু ইহ-জগতের অধিকতর মঙ্গল-জনক কার্য্য-সাধন জন্য তাঁহাকে পুনরায় সরকারী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয় নাই। তবে সরকারের অনুরোধে, সাধারণের হিতার্থে, তাঁহাকে অনেক অবৈতনিক সরকারী কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল। ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউসনের পরিদর্শন-কার্য্য তাহার অন্যতম।

১২৬৯ সালের ৭ই ফাল্গুন বা ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, সরকার বাহাদুর, তাঁহাকে ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউসনের পরিদর্শন-কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য, নিম্নলিখিত মর্ম্মে পত্র লিখেন;—

"গবর্ণমেণ্ট ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউসনের জন্য চারি জন কি পাঁচ জন এ দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোককে পরিদর্শন-কার্য্যে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন। বৎসরের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে নির্দ্ধারিত মাসে এই পরিদর্শকগণকে ইনিষ্টিটিউসন পরিদর্শন করিতে হইবে। ইহার উন্নতিকল্পে যে পরিবর্ত্তন ও প্রবর্ত্তন তাঁহারা যুক্তিসঙ্গত মনে করিবেন, তাহা গবর্ণমেণ্টকে অবগত করাইতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট জানেন, বিদ্যাসাগর স্বদেশবাসীর সকল উন্নতিজনক কার্য্যে মনোযোগী হন। সেই জন্য ছোট লাট বাহাদুরের

একান্ত ইচ্ছা, বিদ্যাসাগর মহাশয় ইনষ্টিটিউসনের পরিদর্শন-কার্য্যভার গ্রহণ করেন।”

অভিভাবকহীন না-বালক জমীদার-পুত্রগণকে সরকার বাহাদুরের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়াই এই ইনষ্টিটিউসনের কার্য্য। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া এবং স্বদেশবাসী জমিদারসন্তানবর্গের উপকার হইবে ভাবিয়া, ১২৭০ সালের অগ্রহায়ণ বা ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউসনের পরিদর্শক নিযুক্ত হন। ইনষ্টিটিউসনের উন্নতি-কামনায় তিনি নানা পরিবর্ত্তন-প্রস্তাব করিয়া গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজীতে যে সব স্মারক-লিপি ও রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্য হইতে নিম্নলিখিত স্মারক-লিপি ও রিপোর্টের বঙ্গানুবাদ প্রয়োজনবোধে প্রকাশ করিলাম।—

স্মারক-লিপি

(১)

ইনষ্টিটিউসনের ভিতরকার বন্দোবস্ত দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু এক বিষয়ে কিছু পরিবর্ত্তন করিবার দরকার। তাহা এই,—বর্ত্তমান বন্দোবস্তমতে সমস্ত না-বালক এক ঘরে জড় হইয়া এক টেবিলের চতুর্দ্দিকে পাঠ করিতে বসে। আমি প্রথম দিনই দর্শন করিয়া, ইহা অত্যন্ত অসন্তোষজনক বোধ করি এবং উত্তরোত্তর দর্শন করিয়া অসন্তোষই দৃঢ়মূল হইয়াছে। জমীদার-পুত্রগণ ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসে পড়ে। স্পেলিং বুক হইতে এন্‌ট্রান্স কোর্স পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন বালকের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট আছে। এরূপ স্থলে ঐ ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসগুলি এক টেবিলের চতুর্দ্দিকে

বসিবার দরুণ, বড়ই গোলযোগ উপস্থিত করে এবং পরস্পরের বড় ক্ষতি হয়। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা মনঃসংযোগী নহে, তাহারা পাঠে একেবারেই অবহেলা করে। প্রাতঃকালে ডাইরেক্‌টার ঐ স্থলে বসেন এবং বালকগণ স্কুলের জন্য পাঠ তৈয়ারি করিয়াছে কি না, তাহা দেখেন। কিন্তু ঐ সময়ে ঐখানে তাঁহার অধিষ্ঠান আরও গোলযোগের কারণ হয়। যেহেতু সে সময়ে তাঁহার নিকট বাহিরের লোক সদাসর্ব্বদা যাওয়া আসা করে।

এক জন গৃহশিক্ষক সমস্ত বালকগণকে সন্ধ্যাকালে পড়াইয়া থাকেন। ইহা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া বোধ হয়। কারণ ইহা এক জনের পক্ষে অসম্ভব। তিনি এক জন বালককে ১৫ মিনিটের অধিক কাল দেখিতে পারেন না; সুতরাং ইহাতে তাহাদিগের উপকার হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। ইহার ফল এই হয় যে, বালকগণ সন্তোষজনকরূপে লেখা-পড়ায় অগ্রসর হইতে পারে না।

এই সকল দোষ সংশোধন করিবার নিমিত্ত কতকগুলি পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

১ম। প্রত্যেক ক্লাসের একটী করিয়া ভিন্ন টেবিল এবং ভিন্ন স্থান থাকা উচিত।

২য়। প্রত্যেক ক্লাস এক এক জন ভিন্ন গৃহশিক্ষকের তাঁবে থাকা উচিত।

৩য়। নিম্ন ক্লাসসমূহে শিক্ষকগণের সকাল বিকাল হাজির হওয়া উচিত এবং উপর ক্লাসসমূহে তাঁহারা হয় সকালে, নয় বিকালে, হাজির হইবেন।

বালকগণকে ভাল রকম সাহায্য করিবার জন্য আমি এই ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষকের কথা উত্থাপন করিলাম। কারণ বর্ত্তমান সময়ে স্কুলে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে ভাল রকম সাহায্য ব্যতীত সাধারণত

বালকগণ কিছুই শিখিতে পারে না। এক জন লোক এক কিম্বা ছুই ঘণ্টা কাল এতগুলি লোককে শিক্ষা দিলে ভাল শিক্ষার আশা করা যাইতে পারে না। না-বালক জমীদার-পুত্রগণ যাহাতে সম্পূর্ণ মাত্রায় সাহায্য প্রাপ্ত হয়, ইহা একান্তই বাঞ্ছনীয়।

যদি পূর্ব্বোক্ত সংস্কারসকল কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে গোলযোগের সমস্ত কারণই বিদূরিত হইবে। অন্যমনস্কদিগের পাঠে অবহেলা কমিয়া আসিবে। ভবিষ্যতে আরও সুফল ফলিবার সম্ভাবনা হইবে।

পুনশ্চ,—এই সংস্কৃত বন্দোবস্ত অনুসারে ডাইরেক্‌টারকে আর প্রত্যহ বালকগণের পাঠ দেখিতে হইবে না। সে বিরক্তিজনক কার্য্য হইতে তাঁহাকে অবসর দিয়া, আমি তাঁহাকে বালকগণের মানসিক উন্নতিসাধনে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি। এইরূপ কার্য্য তাঁহার উচ্চ গুণগ্রামের উপযুক্ত হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে যদিও তিনি এই কার্য্য কতকটা করেন; কিন্তু তাঁহাকে এই বিরক্তিজনক কার্য্য হইতে বিশ্রাম দিলে, এই কার্য্য আরও ভালরূপে সুসম্পন্ন হইবে।

না-বালক জমীদার-পুত্রগণকে সহরে আনিবার উদ্দেশ্য, তাহাদিগের মনের ভাল রকম শিক্ষা দেওয়া। তৎসাধনে যত্নবান হওয়া উচিত।

ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা,
৪ঠা এপ্রেল, ১৮৬৪ খৃঃ।

রিপোর্ট।

আর্, বি, চাপমান্ স্কোয়ার,
রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী
মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়!

ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউসনের গত বৎসরের কার্য্যপ্রণালীর পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট দিবার জন্য অনুজ্ঞা করিয়া ১৮ই নবেম্বরে ৪৮৩ নং যে পত্র প্রেরণ করিয়া-

ছিলেন, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই রিপোর্ট দিবার পূর্ব্বে মহাশয়কে জ্ঞাত করিতে চাই যে, পরিদর্শকবৃন্দের রিপোর্টের সহিত এই রিপোর্টও পাঠান হইবে, ইহাই প্রথমে সঙ্কল্প করা হইয়াছিল; কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের সহিত মতদ্বৈধ হওয়ায়, আমি একটী আলাহিদা রিপোর্ট পাঠাইতেছি। এই রিপোর্ট পাঠাইতে, উক্ত কারণে যে বিলম্ব হইয়াছে, তাহার জন্য আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

ছাত্র সংখ্যা। গত ৩০শে এপ্রেল তারিখে রেজেষ্ট্রীতে ছাত্র সংখ্যা ১২ জন।

শিক্ষোন্নতি। দুই একটী শিক্ষণীয় বিষয় ব্যতীত বালকেরা যেরূপ উন্নতি করিয়াছে, তাহা সন্তোষকর না হওয়ায়, সেইগুলির পুনরালোচনা আবশ্যক। এই বিষয়ের বিশেষ বিবরণ পরে বিবৃত হইবে।

ব্যায়ামশিক্ষা। ব্যায়ামশিক্ষার প্রণালী অতি সুন্দর হইয়াছে। স্কুলের বালকবৃন্দ রীতিমত নির্দ্ধারিত প্রণালী অনুসারে ব্যায়ামশিক্ষা করিয়াছে।

স্বাস্থ্য। সাধারণতঃ বালকবৃন্দের স্বাস্থ্য ভালই ছিল।

খাদ্য। খাদ্য দ্রব্যাদি যত দূর আমি তত্ত্বাবধান করিয়াছি, তাহা অতি উৎকৃষ্ট ও স্বাস্থ্যকর। তাহাদের নিজের নিজের লোক দ্বারা খাদ্য স্বতন্ত্র রন্ধনাগারে প্রস্তুত হইত।

ব্যয়। বাৎসরিক মোট ব্যয় ৩১৫২৪৵১০ পাই অর্থাৎ গড়পড়তা প্রতি বালকের প্রতি বাৎসরিক ২৬২৭ টাকা অথবা ২১৯ টাকা মাসিক। বালকদিগের যেরূপ অবস্থা অর্থাৎ তাহারা যেরূপ ধনাঢ্য এবং কলিকাতায় থাকা যেরূপ ব্যয়সাধ্য, তাহাতে বাৎসরিক উক্ত ব্যয় আমার বিবেচনায় অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয় না।

দর্শকবৃন্দের পরিদর্শন। রেভিনিউ বোর্ডের দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া ১৮৬৩ তারিখে নবেম্বর হইতে গত বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত উক্ত ইনিষ্টিটিউসনটি

পাঁচবার পরিদর্শন করি। প্রথম হইতে আমার ধারণা হয় যে, ওয়ার্ড-দিগের শিক্ষাপ্রণালী সম্পূর্ণ সুচারু নয় এবং তাহার সংস্করণ হওয়া আবশ্যক। আমি গত ৪ঠা এপ্রেল তারিখে একখানি স্মারকলিপি প্রেরণ করি। তাহাতে উক্ত প্রণালীর যে যে দোষ আছে, তাহা দেখাইয়াছি এবং যে যে উপায় অবলম্বন করিলে আমার বিবেচনায় সেই দোষের সংশোধন হইতে পারে, তাহারও উল্লেখ করিয়াছি। তাহার পর উক্ত প্রণালীর সংস্কারের মধ্যে কেবল একটী উপরন্তু প্রাইভেট শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু আমি মহাশয়কে সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, আমি ইহার পর যে কয়েকবার পরিদর্শন করিয়াছি, তাহাতে শিক্ষাপ্রণালীর বিশেষ কোন উন্নতি দেখিতে পাই নাই।

উল্লিখিত স্মারকলিপি প্রেরণ করিবার পরে আমি সাতিশয় মনোযোগের সহিত এই বিষয়টীর পর্য্যালোচনা করি এবং বোর্ডকে জ্ঞাত করিবার জন্য আমার নিজ মত প্রকটিত করিবার এই সুযোগ অবলম্বন করিয়াছি। আমার মতে ওয়ার্ডগণের শিক্ষা-প্রণালীর আদ্যোপান্ত সংস্করণ হওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ ওয়ার্ডদিগকে এই ইনিষ্টিটিসেনে ৪ হইতে ৬ বৎসর রাখা হয় এবং যদি ওয়ার্ডদিগকে সাধারণ স্কুলে পাঠান হয় ও সেই খাম-কার প্রণালী মত পড়ান হয়, তাহা হইলে এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদের বিশেষ শিক্ষোন্নতি আশা করা যাইতে পারে না। ঐ সকল বিদ্যালয়ে বর্ণপরিচয় হইতে ইউনিভার্সিটির প্রবেশিকা-পরীক্ষার উপযুক্ত শিক্ষা পাইতে গেলে, সাধারণতঃ বালকবৃন্দের নয় বৎসর লাগে; কিন্তু শিক্ষার্থী পরীক্ষায় উপযুক্ত হইলেও তাহার ইংরেজীতে এরূপ দখল জন্মায় না, যেরূপ দখল তাহার পাঠাভ্যাসকালের পর অত্যাবশ্যক। অতএব ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, যে ছাত্রেরা প্রবেশিকা-পরীক্ষার উপযুক্ত শিক্ষাও না পাইয়া, ইতিমধ্যেই পাঠাভ্যাস ত্যাগ করে, তাহাদের শিক্ষা কতদূর হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ ওয়ার্ডদিগের শিক্ষা এই

প্রকারের হইয়া থাকে এবং যত দিন সাধারণ স্কুলে তাহাদের পাঠাভ্যাসের বন্দোবস্ত থাকিবে, তত দিন এইরূপই হইতে থাকিবে। যাহা হউক, যখন ইহা বাঞ্ছনীয় যে, ওয়ার্ডগণ ইনিষ্টিটিউসনটী পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কার্য্যোপযোগী জ্ঞান লাভ করে, তখন আমি বিনয়পুরঃসর নিবেদন করি যে, তাহাদের শিক্ষা-প্রণালীর নূতন বন্দোবস্ত করা হয়।

১। এই ইনিষ্টিটিউসনটী এক্ষণে শুদ্ধ ওয়ার্ডগণের বাসস্থান বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে। ইহাকে বোর্ডিং বিদ্যালয়ে (এই স্থানে বালকগণের বাসস্থান এবং পাঠাভ্যাস এই উভয় ব্যবস্থাই হয়) পরিণত করা উচিত।

২। ওয়ার্ডদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয় স্বতন্ত্র শিক্ষা-পুস্তক সকল প্রণয়ন করা হউক।

৩। তাহাদের শিক্ষা দিবার উপযুক্ত আবশ্যকমত সুযোগ্য শিক্ষক সকল নিযুক্ত করা হউক।

সাধারণ বিদ্যালয়ের পদ্ধতি অনুসারে তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার অপেক্ষা এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দেওয়া যে কত সুবিধাজনক, তাহার প্রমাণ স্বতঃসিদ্ধ এবং তাহার বিস্তারিত বর্ণনা করা বাহুল্য মাত্র।

সাধারণতঃ বিদ্যালয়সমূহে প্রত্যেক শিক্ষককে অন্যূন ৩০ জন বালককে শিক্ষা দিতে হয়। সুতরাং কোন শ্রেণীতে নির্দ্ধারিত পাঠ্য-পুস্তক হইতে কয়েক ছত্র মাত্র পড়ান সম্ভব। এই কয়েক ছত্র মাত্র শিক্ষা করিবার জন্য ওয়ার্ডগণকে প্রতিদিন ৬ ছয় ঘণ্টা করিয়া বিদ্যালয়ে থাকিতে হইবে এবং সেই টুকু পাঠ অভ্যাস করিতে প্রাতঃসন্ধ্যা দুই ঘণ্টা করিয়া ৪ ঘণ্টা কাল বাটীতে অধ্যয়ন করিতে হইবে। কিন্তু উদ্ভাবিত নিয়ম অনুসারে দুই ঘণ্টার মধ্যে তাহারা ততটুকু পাঠ যথারীতি অভ্যাস করিতে পারিবে। ফলতঃ দেখা যাইতেছে যে, ওয়ার্ডগণ এই ইনিষ্টিটিউসনে যে অল্প সময় অবস্থান করে, সেই সময়ের মধ্যে ইংরেজী ভাষাতে বিশেষ বুৎপন্ন হইতে পারিবে এবং অনেক বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবরণ জ্ঞাত হইতে

পারিবে এবং পরে সমাজের গণ্যমান্য লোক বলিয়া পরিগণিত হইতে সক্ষম হইবে। কিন্তু প্রবর্ত্তিত প্রথা অনুসারে চলিলে, এরূপ ফলের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না; এবং এই প্রথা যদ্যপি প্রচলিত থাকে ও ওয়ার্ডগণকে এইরূপ অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানলাভ করিয়া যদি ইনিষ্টিটিউসন পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে আমার বিবেচনায় তাহাদিগকে গৃহ এবং আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে পৃথক করিবার যে উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য সফল হইল না।

এই ইনিষ্টিটিউসনে ওয়ার্ডগণকে শাসন করিবার যে নিয়মাবলী আছে, তাহার একাদশ নিয়মটী বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে চাই। ঐ নিয়মটীর তাৎপর্য্য এই যে "কোনপ্রকার গুরুতর অপরাধ না হইলে ওয়ার্ডগণকে শারীরিক দণ্ড দেওয়া হইবে না"। কিন্তু অর্ডারবুক দৃষ্টে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রতিমাসে বালকদিগকে ৪ হইতে ১২ পর্য্যন্ত বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে। যে যে অপরাধে তাহারা উক্তরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা একটী ব্যতীত অন্য কোনটী কোনরূপই "গুরুতর অপরাধ" বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না এবং সেটীরও বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু আমি ইহা সবিনয়ে প্রকাশ করিতে চাহি যে, অপরাধ যে প্রকারের হউক না কেন, ওয়ার্ডগণকে শাসন করিতে শারীরিক দণ্ড একেবারে রদ করিয়া দেওয়া হয়। শারীরিক দণ্ডবিধানের অনিষ্টকর ফলের জন্য তাহা অপর সাধারণ সমস্ত বিদ্যালয় হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শত শত বালক বেত্রযষ্টির সাহায্য ব্যতীত শাসিত হইতেছে; সুতরাং ওয়ার্ডস্ ইনিষ্টিটিউসনে ইহার প্রচলন কিপ্রকার অনুমোদনীয়। ওয়ার্ড ইনিষ্টিটিউসনের বালকবৃন্দ যে এইপ্রকার রূঢ় ও কঠিন ব্যবহারের উপযুক্ত, ইহা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি কিছুতেই ধারণা করিতে পারে না। বালকদিগের শাসন বিষয়ে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে এবং আমার স্থির বিশ্বাস এই যে, শারীরিক দণ্ড-বিধানের ফল অনিষ্টকর হওয়ায় তাহার দ্বারা দণ্ডিত

ব্যক্তির চরিত্র সংশোধিত হওয়া দূরে থাকে, আরও জঘন্য হইয়া পড়ে। আমি এ কারণ এ বিষয়ে মহাশয়কে জ্ঞাত করিতেছি যে, সে নিয়মটী শীঘ্র রদ হইয়া যাউক।

আর একটী বিষয়ে আমি মহাশয়ের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে ইচ্ছা করি। এক্ষণে অধিকাংশ ওয়ার্ড এক-তলা গৃহে অবস্থান করে এবং শয়ন করে। কিন্তু কলিকাতার অস্বাস্থ্যকর আব-হাওয়ায় ঐরূপ এক-তলায় গৃহে বাস করিলে স্বাস্থ্যহানি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। সুতরাং যদি কোনপ্রকারে সুবিধা করা যাইতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের দ্বিতলে অবস্থানের ব্যবস্থা করা হউক।

যে বিষয়ে আমার মত প্রকাশ করিয়াছি, সে বিষয়টী আমি অগ্রেই সবিস্তারে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যালোচনা করিয়াছি; সুতরাং এ বিষয়ে কতকগুলি সুনিয়ম উদ্ভাবন করা, আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

স্বাক্ষর

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা,

১১ই জানুয়ারী, ১৮৬৪ সাল।

স্মারকলিপি।

(২)

না-বালকগণ ভাল রকম লেখা পড়া শিখিয়া এবং যথাযোগ্যরূপে কাজের লোক হইয়া পরে ভাল জমীদার এবং সমাজের উপকারক হইতে পারে, তৎসাধনই নাবালক বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। কিন্তু এইখানে তাহারা যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা শিক্ষা নামের উপযুক্তই নহে এবং তাহারা স্কুল পরিত্যাগ করিবার সময় সামান্যমাত্রই ইংরেজী জ্ঞান লাভ করে। আর এক্ষণে যেরূপ বন্দোবস্ত আছে, তাহাতে এর বেশীও ভাল

ফলের আশা করা যাইতে পারে না। এই সকল দোষ সংশোধন করিবার নিমিত্ত আমি গত ১১ই জানুয়ারির রিপোর্টে কতকগুলি প্রস্তাব উত্থাপন করি। এই বর্ত্তমান সমিতি গঠন হইবার পর হইতে আমি সেই গুলি বিশেষ করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি এবং ঐ মত পরিবর্ত্তন করিবার কোনই কারণ দেখি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমি যে মতে ইনষ্টি-টিউসনের সংস্কারের কথা উল্লেখ করিয়াছি, ঐ মতে সংস্কার হইলে, যে সুফল সাধনের উদ্দেশ্যে ইনষ্টিটিউসন স্থাপিত হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

যদি ইনষ্টিটিউসনকে পরে বোর্ডিং স্কুল করা বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে শিক্ষকনির্ব্বাচন বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। উপযুক্ত লেখা পড়াওয়ালা শিক্ষক আবশ্যক। কি প্রকারে যুবকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা তাঁহাদের ভাল রকম জানা উচিত এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় যে সকল দোষে দূষিত থাকে, তাহা যেন তাঁহাদের না থাকে। স্কুলের রক্ষণাবেক্ষণের ভার হেডমাষ্টারের হস্তে থাকা উচিত। এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে, লোকের এই স্কুলের উপর যে বিতৃষ্ণা আছে এবং যাহা মিথ্যা বলা যাইতে পারে না, আমার বিশ্বাস, তাহা সংশোধিত হইতে পারে এবং ইহার উপর লোকের বিশ্বাস পুনঃ সংস্থাপিত হইতে পারে; কিন্তু এখন যে অবস্থায় স্কুল চলিতেছে, তাহাতে এই স্কুল যদি উঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমি দুঃখিত হইব না। এইখানে প্রতিপালিত কতকগুলি যুবকের জীবন এই বিদ্যালয়ের কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছে। যদি এই স্কুলে শিক্ষিত না-বালক সম্প্রদায়ের সহিত অন্যত্র শিক্ষিত না-বালক জমিদার-গণের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে শেষোক্ত সম্প্রদায়কে ভাল বলিতে হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে না-বালকদিগের এই স্কুল কৃষ্ণনগরে স্থানান্তরিত করা কোনমতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। কারণ তথায় এখন ভয়ানক মড়কের প্রাদুর্ভাব।

ইহাকে বীরভূম কিম্বা বহরমপুরে স্থানান্তরিত করিলে কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু আমি যে সমস্ত সংস্কারের কথা বলিয়াছি, তাহা যদি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে আমি এই স্কুল কলিকাতায় থাকা বেশী পছন্দ করি। কারণ পল্লিগ্রাম অপেক্ষা সহরে নজরের উপর স্কুলের তত্ত্বাবধারণ ভাল হইবে। দর্শকগণের প্রায়ই পরীক্ষিত হইলে এবং শাসনকারী কর্ত্তৃপক্ষগণের নজরের উপর থাকিলে, স্কুলে খুব সুফল ফলিবারই সম্ভাবনা। ইহা পল্লিগ্রামে আশা করা যাইতে পারে না।

আমার বিবেচনায় নাবালকদিগের সাবালক হইবার বয়স যদি ১৮ বৎসর হইতে ২১ বৎসর করা যায়, তাহা হইলে না বালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইবে। তাহা হইলে তাহারা আত্মোন্নতি করিবার আরও বেশী সময় পাইবে। এইরূপ বয়সে তাহাদিগের স্ব স্ব বিষয় পাওয়া উচিত। এই বয়সে লোকের চরিত্র একরূপ গঠিত হইয়া যায়। বয়সের এই পরিবর্দ্ধন অত্রত্য জমিদারগণের অনভিপ্রেত হইবে না। আমি জানি যে, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা এই বিষয়ে আইন পরিবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা,
২৯ শে আগষ্ট, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ।

ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউসন রেবিনিউ বোর্ডের অধীন ছিল। রিপোর্টাদি বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইতে হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্চ্চ, জুলাই ও নবেম্বর মাসে ওয়ার্ড পরিদর্শন করিতেন। বোর্ডের কার্য্যালোচনায় তাঁহার আন্তরিকতা অবিসম্বাদী। তাঁহার প্রদত্ত রিপোর্ট ও স্মারক-লিপি ইহার অন্যতম অকাট্য প্রমাণ। আন্তরিকতা মনুষ্যত্বের মূল মর্ম্ম। বিদ্যাসাগরের সকল কার্য্যেই আন্তরিকতার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সব পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই গ্রাহ্য হইয়াছিল। তবে একটী বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন-প্রস্তাব গ্রাহ্য হয় নাই। ইনষ্টিটিউসনের ছাত্রবর্গকে বেত্রাঘাত করা হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় বেত্র-দণ্ড উঠাইবার চেষ্টা করেন। ইনষ্টিটিউসনের সেক্রেটরী ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার প্রতিবাদ করেন। এতৎসম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য, তন্নির্দ্ধারণার্থ একটী কমিটীও হইয়াছিল। কমিটীতে রাজেন্দ্রলালের প্রস্তাব গ্রাহ্য হয়।

ইহার পর নানা কারণে রাজেন্দ্র বাবুর সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনান্তর হয়। অনেকেই বলেন, এই মনান্তর হেতু বিদ্যাসাগর মহাশয় ইনষ্টিটিউসনের কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

প্রকৃত পক্ষে কি কারণে তিনি ওয়ার্ডের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে পারি নাই। এমন কি, প্রকৃত কারণ নির্ণয়ার্থ রেবিনিউ বোর্ডের অন্যতম সেক্রেটরী মাননীয় শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি বোর্ডের কাগজপত্র দেখিয়া শুনিয়া, কোন কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। এই পর্য্যন্ত কেবল জানা যায়, ১২৭১ সালের ১৬ই চৈত্র বা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ্চ তারিখে তাঁহার শেষ পরিদর্শন।* ইহাতে অনুমান

* Record keeper.
Can you give the last date on which the late

হয়, উপরোক্ত শেষ স্মারক-লিপি লিখিয়া, তিনি ইনষ্টিটিউসনের পরিদর্শন-কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

কোন্ পরীক্ষায় কি সংস্কৃত পাঠ্য হওয়া উচিত, তন্নির্দ্ধারণার্থ ১২৭০ সালে বা ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে একটী কমিটী হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ১২৭০ সালে ১৩ই ভাদ্র বা ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট এই কমিটীর এক জন সভ্য হইয়াছিলেন। উড্রো ও কাওয়েল সাহেব ইহার সভ্য ছিলেন।

স্বকীয় ও পরকীয় বহু কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও, পরোপকারার্থ সামান্য বিষয়েও বিদ্যাসাগর মহাশয় ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেন না। কেহ একটী সামান্য বিষয়ের প্রশ্ন করিলেও, তিনি তাহার আত্ম জ্ঞান-সঙ্গত যথোত্তর দানে কুণ্ঠিত হইতেন না। এইরূপ নিত্য কত প্রশ্নের উত্তর দিতে হইত, তাহার সংখ্যা হয় না। এক ক্ষণজন্মা পুরুষের জীবনে অগণিত কার্য্যের প্রতিষ্ঠা।

১২৭১ সালের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বা ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে

Pandit Iswar Chandra Vidyasagar paid a visit to the Ward Institution, Calcutta.

(Sd.) N. K. Bosu,
29-7.

The last date is 28th March, 1865.
To Secy. (Sd.) N. N. Seal,
29-7.

ছোট নাগপুর-রাঁচি হইতে ষ্টেনফোর্থ সাহেব একখানি চিঠি লিখিয়া * নিম্নলিখিত প্রশ্নের মীমাংসা প্রার্থনা করেন।

"ক নামক এক জমীদার পাগল। তাঁহার প্রজারা তাঁহার বিবাহ দেওয়ায়। এ বিবাহ ব্যাপারটা কি, জমীদার তাঁহার কিছুই বুঝেন নাই। কালে এই বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভে একটী পুত্র হয়। এই পুত্র জমীদারের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইতে পারে কি না।"

১২৭১ সালের ১০ই আষাঢ় বা ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার এইরূপ উত্তর লিখিয়া পাঠান,—

"এই পুত্রই উত্তরাধিকারী হইবে। যখন বিবাহ হয়, তখন সেই বিবাহ-ব্যাপারটা কি, যদিও জমীদার তা বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু এরূপ ত্রুটিসম্পন্ন বিবাহ হিন্দুর আইনের চক্ষে অসিদ্ধ নহে।"

---

* সাহেব ৺কিশোরী চাঁদ মিত্রের মাঃ এই চিঠি খানি পাঠাইয়া দেন। কিশোরী বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধু ছিলেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

মেট্রপলিটন।

১২৭৬ সালে বা ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে "ট্রেণিং-স্কুলে"র চিতা-ভস্মের উপর, বিদ্যাসাগরের কীর্ত্তিস্তম্ভ "মেট্রপলিটন ইনষ্টিটিউসন" প্রতিষ্ঠিত হয়। ৺ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী, ৺যাদবচন্দ্র পালিত, ৺বৈষ্ণবচরণ আঢ্য, ৺মাধবচন্দ্র ধাড়া, ৺পতিতপাবন সেন এবং ৺গঙ্গাচরণ সেন কর্ত্তৃক ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা শঙ্কর ঘোষের লেনে "ট্রেণিং স্কুল" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিখ্যাত কবি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতার বহুবাজারের দত্ত পরিবার এই স্কুলের লাইব্রেরীর জন্য অনেক পুস্তক দান করিয়াছিলেন। বিখ্যাত ধনী ৺শ্যামাচরণ মল্লিক অনুরূপ সাহায্য করিতেন। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল-পদ ত্যাগ করিলে পর, বিদ্যাসাগর মহাশয় এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতৃগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া স্কুলের সেক্রেটরী পদে নিযুক্ত হন। এই সময় ঐ স্কুল পরিচালনার্থ একটী কমিটী হয়। এই কমিটী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে ও নির্ব্বিঘ্নে স্কুল পরিচালিত করিয়াছিলেন। এই সময় সভ্যদের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। বিদ্যালয়ের কোন সভ্যের চরিত্র-দোষ-সন্দেহে সেই মনোমালিন্য। স্কুলগৃহে একদিন একটী মাকড়ী পাওয়া যায়। অনুসন্ধানে প্রকাশ হইল, এক জন সভ্য

রাত্রিযোগে স্কুলগৃহে বেঞ্চ আনিতেন। মাকড়ী সেই বেঞ্চারই। মনান্তরের মূলোৎপত্তি এই খানেই পরে যাহার উপর সন্দেহ হয়, তাঁহারই কোন প্রিয় পোষ্য শিক্ষকের পদচ্যুতি লইয়া মনান্তর পাকাপাকি হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্কুলের সেক্রেটরী পদ পরিত্যাগ করেন। ৺ ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী এবং ৺ মাধবচন্দ্র ধাড়া "ট্রেণিং স্কুলে"র বেঞ্চি, চেয়ার প্রভৃতি সরঞ্জাম স্থানান্তরে লইয়া গিয়া, "ট্রেণিং একাডেমি" নামক একটী নূতন স্কুল স্থাপিত করেন। ট্রেণিং স্কুলের অবশিষ্ট অধিষ্ঠাতৃগণ, বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমানাথ ঠাকুর, হিরালাল শীল, রামগোপাল ঘোষ এবং রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরকে স্কুল পরিচালনের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যতীত আর সকলই ভারগ্রহণে সম্মত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন, "আর তাঁবেদারীতে কাজ করিতে প্রবৃত্তি হয় না।" প্রতিষ্ঠাতৃগণ বলিলেন,—"তাঁবেদারী করিতে হইবে না; স্কুল আপনারই হইল; আমরা পৃষ্ঠপোষক রহিলাম মাত্র।" অনেক সাধ্য-সাধনায় বিদ্যাসাগর মহাশয় ভার গ্রহণ করেন।

১২৬৮ সালের বৈশাখ বা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে উপরোক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ লইয়া একটী কমিটী হয়। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ সভাপতি ও বিদ্যাসাগর মহাশয় সেক্রেটরী হইয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে রায় হরচন্দ্র ঘোষ ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে হিসাব

খোলা হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে "ট্রেণিং স্কুলের" নাম 'হিন্দু মেট্রপলিটন ইনষ্টিটিউসন' হয়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মেট্রপলিটনের ভার একা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তে নিপতিত হয়।

প্রথম প্রথম "মেট্রপলিটনের" জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নিজের অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের বেতন, উচ্চশ্রেণী হইতে নিম্নশ্রেণী পর্য্যন্ত ৩৲ টাকা ছিল বটে; কিন্তু অনেক ছাত্রকেই বিনা বেতনে পড়াইতে হইয়াছিল। নব-প্রতিষ্ঠিত "ট্রেনিং একাডেমি" তখন "মেট্রপলিটনে"র ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিল। মেট্রপলিটনেরই পসার প্রতিপত্তি শীঘ্রই বাড়িয়া যায়। ক্রমে ছাত্রসংখ্যা বাড়িতে থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অটুট যত্নে ও অধ্যবসায়ে এবং অনন্যপূর্ব শিক্ষা-প্রণালীর গুণে "মেট্রপলিটন" একটী উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়ের মধ্যে পরিগণিত হয়। ক্রমে স্কুলের আয়ে স্কুলের কার্য্যনির্ব্বাহ হইতে থাকে। তাঁহাকে ইহার জন্য ঘরের পয়সা বাহির করিতে হইত না। স্কুলের পয়সা তিনি কখন ঘরে লইয়া যান নাই।

প্রথম প্রথম ৺ দ্বারকানাথ মিত্র এবং ৺কৃষ্ণদাস পাল এই স্কুল পরিচালন সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাহায্য করিতেন। ইহাঁরাও স্কুলের ম্যানেজার ছিলেন। স্কুলে এল, এ, ক্লাস খুলিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সিণ্ডিকেটে যে আবেদন করা হয়, সেই আবেদন পত্রে ম্যানেজার বলিয়া ইহাঁদের স্বাক্ষর ছিল।

ইংরেজী শিক্ষায় হিন্দুসন্তানের নানা কারণে কু-প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়। ইহা দেশের দুর্ভাগ্য। কিন্তু ইংরেজী এখন হইয়াছে, অর্থকরী বিদ্যা। এই ইংরেজী-শিক্ষাপ্রসারণের কৃতিত্ব বিদ্যাসাগর মহাশয় বড় কমই লাভ করিয়াছেন। "মেট্রপলিটনের" শিক্ষকতায় অনেক এদেশী ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তির অর্থার্জ্জনের উপায়সংস্থান হইয়াছে। মধ্যবৃত্ত গৃহস্থ লোকের ইংরেজী বিদ্যার্জ্জনের সুলভ পথ পাইয়াছে। ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তন-প্রবর্দ্ধনে প্রকারান্তরে হিন্দুসন্তানের ঘোরতর কু-প্রবৃত্তি প্রণোদনে যে পোষকতা করা হয়, তাহা হিন্দুমাত্রেই স্বীকার করিবেন। তবে যখন ইংরেজী শিক্ষা ভিন্ন উপায়ান্তর সংস্থান হওয়া আজ কাল দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়, ইংরেজী বিদ্যাপ্রসারণের প্রশস্ততর পথ আবিষ্কার করিয়া যে এ যুগে যশস্বী হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? তিনি যে আপন বিদ্যালয়ে ইংরেজ শিক্ষক বা অধ্যাপক নিযুক্ত না করিয়া এদেশীয় শিক্ষক বা অধ্যাপক নিযুক্ত করিতেন তাহাতে তাঁহার স্বদেশিপোষকতা-প্রবৃত্তির পরিচয়। এদেশী শিক্ষক লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দিগ্বিজয়ী।

পাশ্চাত্য বিদ্যার উৎকর্ষসাধন পক্ষে যে প্রণালী ও পদ্ধতির প্রয়োজন, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতে সিদ্ধহস্ত। পরাধীন অবস্থাতেও সংস্কৃত কলেজে তিনি তাহার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়াছিলেন। স্বাধীন অবস্থায় নিজের বিদ্যালয়ে যে তিনি

সে সম্বন্ধে অভাবনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবেন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। এখানে ত আর প্রভুদিগের রোষকষায়িত কটাক্ষ-বিক্ষেপের বা শাসনসূচক তর্জ্জনী তাড়নার বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় নাই। সত্য সত্যই তাঁহার কৃতিত্বের যশ এখন বিশ্বব্যাপী। অধুনা এদেশীয় অনেক ব্যক্তি ইংরেজী-বিদ্যা প্রচারার্থ সেই প্রণালী-পদ্ধতিরই পথানুসারী। যখন বিদ্যাসাগর যে কোন ইংরেজী-বিদ্যাবিশারদ এদেশী লোক পাইতেন, তখনই তাঁহাকে নিজের বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিতেন। বালকদিগের প্রতি কটূ-ব্যবহার করিবার বা বেত্রাদি দণ্ড দিবার অধিকার কোন শিক্ষকেরই ছিল না। অথচ প্রায় কোন শিক্ষককেই ছাত্রদিগের দুরন্ত দুর্দ্দমনীয়তার জন্য অনুযোগ করিতে হইত না। যখন কোন ছাত্র দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিত, তখন তাহাকে বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইত এমন কি, কখনও কখনও অবিনয়ের অপরাধে কোন কোন শ্রেণীর সমুদায় ছাত্র বিতাড়িত হইত। তিনি ছাত্রদিগকে শিক্ষকগণকে এবং ভৃত্য ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণকে সততই সস্নেহ দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেন। আমরা জানি, একবার স্কুলের ছাত্রগণ, তাঁহার নিকট পৌষ-পার্ব্বণের ছুটি চাহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছুটী মঞ্জুর করেন; পরন্তু ছাত্রবৃন্দকে সহাস্যে সস্নেহে বলেন,—"তোমাদের অনেকের ত বিদেশে বাড়ী; কলিকাতার বাসায় পিঠে পাইবে কোথায়?" বালকেরা বলিল,—"আপনার বাটীতে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"ভাল

তাহাই হইবে।" তিনি বালকদিগের জন্য বাড়ীতে প্রচুর পিষ্টকের উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

স্বচক্ষে বিদ্যালয় পরিদর্শন করা তাঁহার একটা স্বাভাবিক অভ্যাস ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন কার্য্যের ভার অপরের হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। যাহা কিছু করিবার তিনি স্বয়ংই তাহা করিতেন। রুগ্নদেহেও পরনির্ভরতা তাঁহাকে আদৌ স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই জন্য এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃত শিষ্য দুষ্প্রাপ্য।

যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্কুল পরিদর্শনে আসিতেন, তখন তিনি কাহাকেও 'পূর্ব্বাহ্নে' তাহা জানিতে দিতেন না। অধ্যাপক অধ্যাপনায় গাঢ় মনোনিবিষ্ট হইয়া আছেন, এমন সময় হয় ত তিনি ধীরে ধীরে আসিয়া, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান থাকিতেন। কোন ক্রমে শিক্ষক বা অধ্যাপক, তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলে, তিনি বলিতেন,—"তুমি পড়াইতে পড়াইতে উঠিও না; তোমার কর্ত্তব্য তুমি পালন কর; আমার খাতির করিতে গিয়া, তোমার যেন কর্ত্তব্য-ত্রুটি না হয়।" কখনও কোন ছাত্রকে নিদ্রিত দেখিলে, তিনি তাহাকে স্থানান্তরে নিদ্রা যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। স্কুল-পরিদর্শনে তাঁহার নিয়মিত কোন সময় ছিল না; কাজেই ছাত্র অধ্যাপক, সকলকেই সতত সাবধানে থাকিতে হইত। সেই জন্য কোনক্রমে কোন সময়ে কাহারও কোন বিষয়ে অমনোযোগিতার সম্ভাবনা ছিল না। শিক্ষার চমোৎকর্ষও সেই সঙ্গে হইয়াছিল।

স্কুলের শিক্ষক বা অধ্যাপক কোন কার্য্যসূত্রে স্কুলের কার্য্যান্তে বাড়ীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলে, তিনি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে জলযোগ করাইতেন। এমন শুনিয়াছি যে, তিনি স্বহস্তে আম কাটিয়াও খাওয়াইয়াতেন। স্কুলের কোন ভৃত্যের কোনরূপ অসুখ হইলে, সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, তিনি তাহার চিকিৎসা করাইতেন। বিদ্যালয়ের পুরাতন কাশী দ্বারবানের একটা বিষম স্ফোটকে মৃত্যু হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কাশী তাহার ব্যারামের কথা আদৌ জানায় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাহার মৃত্যুর পর, তাহার ব্যারামের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে তিনি স্কুলের কর্ম্মচারিবর্গের চিকিৎসার্থ এক জন ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এইরূপ তাঁহার অকৃত্রিম সহৃদয়তায় এবং শিক্ষা-প্রণালীর সুশৃঙ্খলায়, তাঁহার বিদ্যালয় প্রকৃতপক্ষে সবিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়াছিল। এ প্রতিপত্তিরও মূলাধার, বিদ্যাসাগরের সাহস, উদ্যম, উৎসাহ, অধ্যবসায় ও একাগ্রতা।

মেট্রোপলিটনের বেতন ৩৲ তিন টাকা। অনেকেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগ্রহে বিনা বেতনে পড়িত। কেহ কেহ তাঁহাকে বঞ্চনাও করিতেন। কলিকাতা সহরের কোন লক্ষপতি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিয়া কহিয়া আপনার শ্যালককে বিনা বেতনে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। অবশ্য বিদ্যাসাগর মহাশয় জানিতে পারেন নাই, এটী লক্ষপতির শ্যালক; পরন্তু

জানিয়াছিলেন, সে অতি দরিদ্র। এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় স্কুলে গিয়া দেখেন, শ্যালকটী দিব্য পরিচ্ছদে ভূষিত; রসগোল্লা পান্তুয়া প্রভৃতি বহু উপাদেয় দ্রব্য জলোযোগ করিতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাতে বিস্ময়ান্বিত হন। পরে তিনি অনুসন্ধানে শ্যালকের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হন। তাহার পর সেই লক্ষপতির নিকট গিয়া তিনি বলেন, "আমার সঙ্গে বঞ্চনা! তোমায় ধিক্! কি করিয়া তুমি শ্যালকটীকে বিনা বেতনে স্কুলে ভর্ত্তি করিলে?" লক্ষপতি নির্ব্বাক্। শ্যালকটী স্কুল হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল।

মেট্রপলিটনের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একবার দেওয়ানী মোকদ্দমার আসামী হইতে হইয়াছিল। মেট্রপলিটন পাথুরিয়াঘাটার জমীদার ৺খেলাৎচন্দ্র ঘোষের ভাড়াটীয়া বাটীতে ছিল। ভাড়া পাওনার দরুণ খেলাৎ বাবু হাইকোর্টে নালিশ করিয়াছিলেন। আসামী হইয়াছিলেন, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়। বাড়ী মেরামত করিবার কথা ছিল। মেরামত হয় নাই বলিয়া, ভাড়া দেওয়া হয় নাই। মোকদ্দমা রুজু হইবার পূর্ব্বে ৺রমানাথ ঠাকুর, হীরালাল শীল ও রামগোপাল ঘোষ গোলযোগ মিটাইবার চেষ্টা করেন। খেলাৎ বাবু যাহা চাহেন, ইহাঁরা তাহাই দিতে বলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অন্যান্য মেম্বরগণ তাহাতে রাজি হন নাই। এই জন্য শুনা যায়, রমানাথ ঠাকুর, হীরালাল শীল ও রামগোপাল ঘোষ স্কুলের সম্পর্ক ছাড়িয়া দেন। ১২৭১ সালের ১লা চৈত্র বা

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্কুলের অবৈতনিক সেক্রেটরীরূপে খেলাৎ বাবুকে এই মর্ম্মে ইংরেজীতে পত্র লিখিয়াছিলেন,—

"আমি ভাড়ার হিসাবে একেবারে পাঁচ শত টাকা দিতে পারি না। তবে বিল পাঠাইলে, মাসিক ভাড়ার হিসাবে বাকি পাওনা ভাড়া দিতে পারি।" যাহা হউক, অবশেষে সকল গোল মিটিয়া গিয়াছিল।

১২৭১ সালে বা ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে আখ্যানমঞ্জরীর প্রথম ভাগ প্রণীত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। চরিতাবলী, জীবনচরিত সম্বন্ধে যে মত, আখ্যানমঞ্জরী সম্বন্ধেও সেই মত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

আত্ম-মতনিষ্ঠা, বেথুনে নরম্যাল, বেথুনে মিস্ পিগট্, পিতার কাশীবাস, প্রসন্নকুমার ও দুর্ভিক্ষ।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া দিবার পর, কচিৎ কোন পুঁথির প্রয়োজন হইলে, কলেজে যাইতেন। তিনি সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকবর্গ তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। কলেজের অধ্যক্ষ বা অধ্যাপকেরা সময়ে সময়ে নানা বিষয়ে তাঁহার নিকট পরামর্শও লইতেন। ১২৭০ সালে বা ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের তাৎকালিক অলঙ্কার-অধ্যাপক পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ পেন্‌সন লইয়া বিদায় লয়েন। পেন্‌সন লইবার পূর্ব্বে, তাৎকালিক অধ্যক্ষ কাওয়েল সাহেবের সহিত তাঁহার এই পরামর্শ ও প্রস্তাব হইয়াছিল যে, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন তাঁহার পদে, তদীয় সহোদর রামময় চট্টোপাধ্যায়, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পদে এবং পুত্র রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃত কলেজের কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় তখন ৫০ টাকায় সংস্কৃত কলেজের সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের পেন্‌সনপ্রার্থনা গ্রাহ্য হইবার পূর্ব্বে পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় আপত্তি তুলেন। তিনি বলেন,—"আমি রামময় চট্টোপাধ্যায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক; অতএব ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পদ আমি পাইব।" বিদ্যারত্ন

মহাশয়ের আপত্তি শুনিয়া কাওয়েল সাহেব কতকটা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন। তিনি তখন ন্যায়রত্ন মহাশয়কে দিয়া বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের মত চাহিয়া পাঠান। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন,—"গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নই মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের পদ পাইবার যোগ্য। আমি যাহা বলিলাম, তাহাই ন্যায়; আর যাহা হইবে, তাহা অন্যায়।" তর্কবাগীশ মহাশয় বড়ই দুঃখিত হইলেন। কাওয়েল সাহেব, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মধ্যস্থ মানিবার প্রস্তাব করেন। তর্কবাগীশ মহাশয় ভাবিলেন, বিদ্যাসাগর তাঁহার পরম ভক্ত শিষ্য, তিনি নিশ্চিতই তাঁহার সহোদরেরই পোষকতা করিবেন। এই ভাবিয়া, তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মধ্যস্থ মানিতে সম্মত হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, ইতিপূর্ব্বে ন্যায়রত্ন মহাশয়কে যাহা বলিয়া-ছিলেন, এখনও তাহাই বলিলেন। তর্কবাগীশ অবাক্ হইলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন, বিদ্যাসাগর অন্যায় বলিবার লোক নহেন; তাই আর কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া, পেন্‌সন লইলেন। কলেজ হইতে বিদায় লইয়া তিনি কাশীবাসী হইয়াছিলেন। সেইখানেই ১২৭৩ সালের ১৩ই চৈত্র বা ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ্চ ৬১ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহান্তর হয়। ইহাঁর অন্যতম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামক্ষয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় ডিপুটী মাজিষ্টর হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের গুরু বলিয়া, তর্কবাগীশ মহাশয় সততই গৌরব করিতেন। হিন্দুপেটরিয়ট এই কথারই উল্লেখ করিয়া, তাঁহার মহিমা

প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুকবি পণ্ডিত এখন বিরল। বিদ্যাসাগর এহেন গুরুর জন্যও আপন মত পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরকালই স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। বেথুন স্কুলের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ১২৭১ সালের ১লা চৈত্র বা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ বেথুন-বিদ্যালয়ের পারিতোষিকের সময় তিনি এক ছড়া সোণার চিক উপহার দিয়াছিলেন। এই পারিতোষিক-সভায় বড় লাট লরেন্স ও তাঁহার পত্নী উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, মধ্যে মধ্যে এইরূপ পারিতোষিক দিতেন। বেথুন স্কুলের কোন বিভ্রাট উপস্থিত হইলে তন্মীমাংসার ভার তাঁহারই উপর অর্পিত হইত। ১২৭৩ সালে বা ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বেথুন স্কুলকে নর্ম্ম্যাল স্কুলে পরিণত করিবার কথা প্রস্তাবিত হয়; অর্থাৎ এইখানে হিন্দু স্ত্রীলোককে এমনই করিয়া শিখান হইবে যে, তাঁহারা পরে শিক্ষয়িত্রী-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া উপার্জ্জনক্ষম হইবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, এ প্রস্তাবের পক্ষপাতী ছিলেন না। তৎকালে ৺ কেশবচন্দ্র সেন, বাবু এম, এম্ ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ইহার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা উচিত কি না, তন্নির্দ্ধারণার্থ একটী "কমিটি" হইয়াছিল। সে কমিটিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন। কিন্তু ৺ কেশবচন্দ্র সেন-প্রমুখ ব্যক্তিগণ ব্রাহ্ম সমাজে একটী সভা করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে,

নর্ম্ম্যাল স্কুলের প্রতিষ্ঠা জন্য লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরকে আবেদন করিতে হইবে। এ মীমাংসাটা অতি তাড়াতাড়ি হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে এত তাড়াতাড়ি হওয়া উচিত ছিল না। তিনি জানিতেন, এতৎসম্বন্ধে খ্যাতনামা ব্যক্তি-বর্গের মতামত লওয়া হইবে এবং তাঁহাদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কার্য্য করা হইবে। তাহা হয় নাই। এই জন্য বিদ্যাসাগ মহাশয় বিরক্ত হইয়া, এক পত্র লিখিয়া, কমিটি হইতে আপনার নাম উঠাইয়া লয়েন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, ৺ কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতির মত ছিল যে, সৎকুলজাত ভদ্র-মহিলারা মেয়ে পড়াইবার জন্য শিক্ষালাভ করিতে সম্মত হইবেন না। এই জন্য তাঁহাদের আপত্তি ছিল। এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি করিবার জন্য একটা "কমিটিও" সংগঠিত হইয়াছিল,—তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্য ছিলেন;—"অনারেবল ডবলিউ, এস, সিটনকর,—সভাপতি; অনারেবল শম্ভুনাথ পণ্ডিত; ডবলিউ, এস্, আটকিনসন; রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর; হরচন্দ্র ঘোষ; কাশীপ্রসাদ ঘোষ; রাজেন্দ্রনাথ দত্ত; নরসিংহ দত্ত; হরনাথ রায়; কুমার হরেন্দ্র-কৃষ্ণ বাহাদুর এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

প্রস্তাব অবশ্য কার্য্যে পরিণত হয় নাই বটে; কিন্তু ক্রমে বেথুন স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অননুমোদিত হইয়া উঠে। সেই জন্য ১২৭৬ সালে বা ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বেথুন স্কুলের সেক্রেটরী পদ পরিত্যাগ করেন। ১২৭৪ সালের

ফাল্গুন মাসে বা ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহাকে বেথুন-স্কুলের আরও একটী গুরুতর কার্য্যের মীমাংসা করিতে হইয়াছিল। স্কুলের তত্ত্বাবধায়িকা মিস্ পিগটের নামে এক অভিযোগ উপস্থিত হয় যে, তাঁহার অমনোযোগিতা হেতু বিদ্যালয়ের অবনতি হইতেছে। তদ্ব্যতীত স্কুলে খৃষ্টানী গান গীত হইত, এইরূপও একটা অতি ভয়ঙ্কর অভিযোগ হয়; অধিকন্তু স্কুলের বেতনবৃদ্ধির প্রস্তাব হইয়াছিল। এই জন্য অনেকেই স্কুলে আর মেয়ে পাঠাইত না। এই অভিযোগের অনুসন্ধানার্থ এক কমিটি হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এই কমিটির সবকমিটিতে সভ্য ছিলেন। অনুসন্ধানে নির্দ্ধারিত হয়, মিস্ পিগট্ বাস্তবিক অপরাধিনী।* তিনি পদচ্যুত হন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা কাশীবাসী হন। পিতৃভক্ত পুত্র পিতাকে প্রথমতঃ কাশী পাঠাইতে সম্মত হন নাই। পিতার সনির্ব্বন্ধ ব্যগ্রতা দেখিয়া তিনি অবশেষে তাঁহাকে কাশী পাঠাইতে বাধ্য হন। পিতাকে কাশী পাঠাইবার পূর্ব্বে, তিনি ৩ তিন শত টাকা ব্যয় করিয়া, পিতার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া লয়েন। এ প্রতিকৃতি এখনও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে বিরাজমান। অতঃপর তিনি জননীরও প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া লইয়াছিলেন। জননীর

* মিস্ পিগট্ আত্মপক্ষসমর্থনার্থ একটী সুবিস্তৃত মন্তব্য লিখিয়াছিলেন।

প্রতিকৃতি পিতার প্রতিকৃতির সম্মুখেই প্রতিষ্ঠিত আছে। পিতামাতার মৃত্যুর পর, তিনি সময়ে সময়ে তাঁহাদের প্রতিকৃতি দেখিয়া চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেন। প্রত্যহ তিনি দুইবার করিয়া তাঁহাদের প্রতিকৃতি দেখিতেন। *

১২৭২ সালের ১৬ই বৈশাখ বা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রেল, সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল, ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল সাটক্লিফ সাহেবের সহিত তাঁহার মনান্তর হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের দ্বিতলের একটী গৃহে প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরী ছিল। সেই ঘরে লাইব্রেরির স্থান সঙ্কুলান হইত না। যে ঘরে সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরি

---

* পিতা ঠাকুরদাসের কাশীবাস সম্বন্ধে, পুত্র নারায়ণ বাবুর মুখে এই কথা শুনিয়াছি,—পিতার কাশীবাস করিবার প্রস্তাব শুনিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় বাড়ী যান। তথায় নির্জ্জনে তিনি পিতাকে বলেন,—"আপনি কাশীবাসী হইবেন কেন? যদি পুণ্যার্থে যান, তবে কথা নাই; যদি সংসার-বৈরাগ্যে যান, তাতেও কথা নাই; কিন্তু সুখস্বচ্ছন্দে সংসার চালাইবার উপযুক্ত টাকা পান না বলিয়া যদি যান, তাহা হইলে, আমি টাকার বন্দোবস্ত করিতে পারি।" পিতা বলিলেন,—"পুণ্যার্থেই যাইব।" বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বিরুক্তি করেন নাই। পিতা যখন কাশী যাইবার জন্য উদ্যোগী হইয়া, কলিকাতায় আসেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়, পুত্র নারায়ণকে বলিলেন,—"দেখ্, তোর ঠাকুরদাদার যাহাতে কাশী না যাওয়া হয়, তাহার চেষ্টা কর্ দেখি।" অতঃপর নারায়ণচন্দ্র ঠাকুরদাদার সঙ্গ ছাড়িলেন না। ঠাকুরদাদা নাতির মায়ায় জড়াইয়া পড়িলেন। ক্রমে কাশী যাওয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। এমন সময় কনিষ্ঠ পুত্র ঈশানচন্দ্র আসিয়া উত্তেজনা-বাক্যে পিতার মতপরিবর্ত্তন করেন।

ছিল, সার্টক্লিফ্ সাহেব, প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরির জন্য সেই ঘরটী চাহেন এবং সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরিটীকে নিম্নতলে লইয়া যাইতে বলেন। প্রসন্ন বাবু তাহাতে সম্মত হন নাই। ইহাতে সার্টক্লিফ্ সাহেব প্রসন্ন বাবুর উপর বিরক্ত হন। পরে প্রসন্ন বাবু তাৎকালিক ডাইরেক্টার আটকিনসন্ সাহেবের নিকট হইতে সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরি স্থানান্তরিত করিবার জন্য আদেশ-পত্র প্রাপ্ত হন। প্রসন্ন বাবু পত্রখানি বড় অপমানজনক মনে করিয়া, তদ্দণ্ডেই একখানি অভিমানসূচক পত্র লিখিয়া পদ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পদত্যাগের পর সণ্ডর্স সাহেব ছয় মাস কাল সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোট লাট বাহাদুর বিডন সাহেবের নিকট গিয়া, প্রসন্ন বাবুর পদত্যাগের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন,—"আপনার রাজত্বে একি অন্যায়!" বিডন সাহেব বলেন,—"আমি প্রসন্নকে পুনরায় প্রিন্সিপালের পদগ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিব।" ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন,—"তিনি যেরূপ স্বাধীনচেতা ও তেজস্বী, তাহাতে আমার মনে হয় না যে, তিনি আবার পদ গ্রহণ করিবেন।" তদুত্তরে বিডন সাহেব বলেন,—"প্রসন্ন আমার ছাত্র, আমার অনুরোধ সে ঠেলিবে না।" ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিয়া ফিরিয়া আসেন। পরে ১২৭২ সালের ১৬ই ভাদ্র বা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট বিডন সাহেবের অনুরোধে

প্রসন্ন বাবু সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। *

সরকারী কর্ম্মে বিদ্যাসাগরের আর কোন সম্পর্ক ছিল না, তবুও রাজপুরুষগণ তাঁহার কত সম্মান করিতেন, তাহা এইখানেই বুঝা যায়। তেজস্বী বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বঙ্গেশ্বরকে স্পষ্টাক্ষরে কথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় বুঝিতেন, বিডন সাহেব তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিতেন; নহিলে তিনি কি অমন করিয়া বলিতে পারেন,—"আপনার রাজত্বে একি অন্যায়!" কোথায় সম্ভ্রমক্রটির সম্ভাবনা, আর কোথায় নহে, তাহার বিচার করিয়া, তিনি ভাল মন্দ কথা কহিতেন; এবং কহিতে জানিতেন।

১২৭৩ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে বা ১৮৬৬ সালে মে, জুন ও জুলাই মাসে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ আবির্ভূত হইয়াছিল। সে দুর্ভিক্ষের কথা স্মরণ হইলে শরীর শিহরিয়া উঠে এবং মস্তক ঘুরিয়া পড়ে। কত লোককে শাক, কচু

* ১২৭৯ সালের ১লা পৌষ বা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর প্রসন্ন বাবুকে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল-পদ পরিত্যাগ করিয়া বহরমপুর কলেজে যাইতে হইয়াছিল। তখন এ পদের বেতন হাজার টাকা ছিল। এই বেতনের উল্লেখ করিয়া, ৺শ্যামাচরণ বিশ্বাস মহাশয়ের স্ত্রী, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যাকে বলিয়াছিলেন,—'এত দিন তোমার বাপের হাজার টাকা মাহিনা হইত।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কন্যা বলেন, "তাহা হইলে স্কুল, বাড়ী. এ সব হইত কি?" বিদ্যাসাগর মহাশয় কন্যার মুখে এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন,—"হইত বৈকি?" আমরাও বলি, হইত বৈ কি, যদি ইয়ং সাহেবের সহিত মনান্তর না হইত।

সিদ্ধ করিয়া খাইতে হইয়াছে; কত লোক অনাহারে মরিয়াছে; কত পিতামাতা পুত্রকন্যাকে ফেলিয়া; কত স্বামী, স্ত্রীর মুখ না চাহিয়া; কত স্ত্রী, স্বামীর অপেক্ষা না করিয়া; দগ্ধ জঠর-জ্বালায় অস্থির হইয়া, এক মুষ্টি অন্নের জন্য সহরে দলে দলে ছুটিয়াছিল, তাহার সবিস্তার বিবৃতির স্থান তো হইবে না। তবে এ দুর্ভিক্ষ-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যতটুকু সম্পর্ক, তাহারই একটা সংক্ষিপ্ত উল্লেখ হইবে মাত্র। জাহানাবাদ জেলা অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ-বার্ত্তা প্রথম হিন্দু-পেটরিয়টে এক জন লিখিয়া পাঠান। দুর্ভিক্ষ দমনে তত্রত্য জমীদারমণ্ডলী প্রথম উদাসীন ছিলেন। তাৎকালিক ডিপুটী মাজিষ্টর বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র প্রথম প্রথম এ বিষয়ে তত মনোযোগী হন নাই। হিন্দু-পেটরিয়টে লিখিত হয়, গড়বেতার ডিপুটী মাজিষ্টর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কর মহাশয়, বহুশ্রম স্বীকার করিয়া, দেশের অবস্থা পরিদর্শন করেন; এবং দেশের লোককে সাহায্য করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া পাঠান। জাড়ার জমীদার শিবনারায়ণ রায় মহাশয় অনেককে অন্ন দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়, এ দারুণ দুর্ভিক্ষের সংবাদ পান নাই। হিন্দু-পেটরিয়টের এক জন সংবাদ-দাতা কাতরকণ্ঠে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আবেদন করেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও গ্রাম হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হন। স্বভাবদাতা বিদ্যাসার কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তিনি তখনই গ্রামে অন্নসত্র স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের জননী অনেককেই অন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দয়াময়ের দয়াময়ী জননী, অকাতরে অকুণ্ঠিত চিত্তে, বহু লোককে অন্নদান করিতেছিলেন। হিন্দু পেটরিয়টের সংবাদদাতা ১২৭৩ সালের ১৫ই শ্রাবণ বা ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই তারিখে এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন,—

"বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতা প্রত্যহ ৪।৫ শত লোক খাওয়াইয়া থাকেন।"

ইহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় বীরসিংহ এবং নিকটবর্ত্তী ১০।১২ খানি গ্রামের নিরন্ন লোকদিগের জন্য অন্নসত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম বীরসিংহের অন্নসত্রে এক শত করিয়া লোক অন্ন পাইয়াছিল।

ক্রমে অন্নার্থী, দলে দলে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তদনুপাতে সাহায্য-পরিমাণ বাড়াইয়া দিলেন। তিনি স্বয়ং অন্ন-সত্রের ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না। যাহাতে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, তৎপক্ষে তিনি সর্ব্বাগ্রেই যত্নশীল হইয়াছিলেন। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র প্রথমতঃ উদাসীন ছিলেন বটে; কিন্তু অবশেষে তিনি দুর্ভিক্ষের দারুণতা অনুভব করিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু-ন্যায়রত্ন মহাশয়কে লইয়া, ঘাটাল, ক্ষীরপাই-রাধানগর, চন্দ্রকোনা প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া অন্নসত্র স্থাপন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত হইয়াছিল। জুন, জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর,

টাকা প্রেরণ করেন। এতদ্ব্যতীত ঐ সময় কোন কোন ভদ্র-লোক পিতৃহীন অবস্থায় যাত্রা করিতে আইসেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও ৫০৲ টাকা, কাহাকেও ১০০৲ টাকা, কাহাকেও ২০০৲ টাকা দান করেন। ২৮শে শ্রাবণ পৃথক বাটীতে অন্নসত্র স্থাপিত হয়। ১লা পৌষে ভোজনের পর অন্নসত্র বন্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু বিদেশীয় নিরুপায়গণ ৮ই পৌষ পর্য্যন্ত অন্নসত্রগৃহে উপস্থিত ছিল। একারণ দুর্ব্বল নিরুপায় প্রায় ৬০ জনকে কয়েক দিন ভোজন করাইতে হইয়াছিল।"

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজ-পরিবার, অবাধ সাক্ষাৎ, অনাহূতের অত্যাচার, দেবোত্তর সম্পত্তি, দারুণ দুর্ঘটনা ও পারিবারিক পার্থক্য।

১২৭৩ সালের ৪ঠা শ্রাবণ বা ১৮৬৬ সালের ১৯শে জুলাই রাত্রি ৩ টার সময় পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের মৃত্যু হয়। রাজা প্রতাপচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। বিধবা-বিবাহ, স্ত্রী-শিক্ষা এবং অন্যান্য অনেক কার্য্যে রাজাবাহাদুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান সুহায় ও পোষক ছিলেন। * মৃত্যুর পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়, মুর্শিদাবাদে গিয়া রাজা বাহাদুরের যথেষ্ট চিকিৎসা-শুশ্রূষাদি করিয়াছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার রাজাবাহাদুরের চিকিৎসা করিতেন। এতদর্থ তিনি মাসে সহস্র টাকা পাইতেন। কাশীপুরে গঙ্গাতীরে রাজার মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিষয়ের ট্রষ্টি নিযুক্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতে সম্মত হন নাই।

---

* He was one of the principal supporters of the female schools established and managed by Pandit Issur Chandra Vidysaghar.

Hindu Patriot, 1866, 23, July.



রাজা প্রতাপনারায়ণ সিংহ।

রাজা প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুর পর পাইকপাড়া-রাজ-পরিবারের শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের পিতামহী রাণী কাত্যায়নীর অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাৎকালিক বঙ্গেশ্বর বীডন সাহেবকে অনুরোধ করিয়া পাইকপাড়া ষ্টেট, কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের অন্তর্ভূত করিয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাৎকালিক পাইকপাড়ার না-বালক রাজ-পুত্রদিগকে সঙ্গে করিয়া বঙ্গেশ্বরের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। বিষয় কোর্ট অব ওয়ার্ডের অন্তর্ভূত হইবার সম্বন্ধে অনেকটা গোলযোগ হইয়াছিল। বাহুল্যভয়ে তদুল্লেখে নিবৃত্ত হইলাম। তবে একটা কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক। কলেক্টরী খাজনার দায়ে পাইকপাড়া রাজবংশের বিষয় বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে বঙ্গেশ্বর সে যাত্রা বিক্রয়দায় হইতে উদ্ধার করেন। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডে বিষয় গিয়াছিল বটে; কিন্তু আমাক রাজপুত্রদিগকে, ওয়ার্ডের অধীন বিদ্যালয়ে থাকিতে হয় নাই। যাহাতে রাজকুমার-দিগকে ওয়ার্ডের বিদ্যালয়ে যাইতে না হয়, তাহার জন্য রাণী কাত্যায়নী, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বাষ্পাকুলিত-লোচনে অনুরোধ করেন। এতদর্থ বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গেশ্বরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অনুরোধ রক্ষা হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্রায়ই পাইকপাড়ার রাজবাটীতে যাই-তেন। এক দিন পথিমধ্যে তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত রামধন নামে এক মুদি তাঁহাকে ডাকিয়া আপনার দোকানে লইয়া যায়।

রামধন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে খুড়া খুড়া বলিয়া ডাকিত। রামধনের সাদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অম্লান বদনে, তাহার দোকানের সম্মুখে, ঘাসের উপর বসিয়া থেলো হুকায় তামাক খাইতেছিলেন। এমন সময় রাজবাটীর কয়েক জন তাঁহাকে দেখিতে পান। বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজবাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলে, কেহ কেহ এ কথার উল্লেখ করেন। এটা "ভবাদৃশ জনোচিত নহে" বলিয়া একটা মৃদুতীক্ষ্ণ মন্তব্যও প্রকটিত যে না হইয়াছিল, এমন নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয়, কিন্তু ধীর-গম্ভীর বাক্যে, অথচ একটু মৃদু হাস্যে বলিয়াছিলেন, 'গ[illegible]ব বড় মানুষ আমার [illegible]ই সমান।'

এক স[illegible] বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজবাটী[illegible]ছিলেন; এমন সময় দ্বারদেশে এক জ[illegible]ধারী আসিয়া ভিক্ষা চাহে। দ্বারবানেরা তাহাকে তাড়াই[illegible]। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাতে বড় সংক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। [illegible] কেহ বলেন, ইহার পর হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজ[illegible]যাওয়া বন্ধ করেন; কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয়, ইহার জন্য রাজবাড়ী যাওয়া পরিত্যাগ করেন নাই। কোন কোন রাজকুমারের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে তিনি বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পাছে আর পূর্ব্ব-সম্মান না থাকে, এই ভাবিয়া, তিনি রাজবাটী যাওয়া বন্ধ করেন। রাজকুমারেরা কিন্তু একটী দিনের জন্যও তাঁহার প্রতি ভক্তিশূন্য হন নাই। কুমার ইন্দ্রচন্দ্র

প্রায়ই তাঁহার বাড়ীতে আসিতেন। কেহ তাঁহাকে বাড়ীতে দ্বারবান রাখিবার পরামর্শ দিলে, তিনি রাজবাড়ীর দিকেই অঙ্গুলি সঙ্কেত করিতেন। এমন কি তিনি প্রায়ই বলিতেন,—"দ্বারবান রাখিলেই ত, আমার বাড়ীতে ভিখারী এক মুষ্টি ভিক্ষা পাইবে না; অধিকন্তু প্রায় অনেক সাক্ষাৎকার-প্রার্থী ভদ্র লোকেরও সাক্ষাৎকার লাভে বঞ্চিত হইব; তাহা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে দ্বারবান ছিল না। কখনও কখনও তিনি আপনার দৌহিত্রবর্গকে বলিতেন,—"যদি শুনিতে পাই, বাড়ীর কাহারও দ্বারা আমার বাড়ীতে কোন ভদ্র লোকের আসিবার পক্ষে ব্যাঘাত হয়, তাহা হইলে, তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিব।" দ্বারবান্ রাখিবার কথা হইলে তিনি বলিতেন,—"আমি অন্যের বাড়ীতে যে অসুবিধা দেখিয়া আসিয়াছি, সে অসুবিধা আমার বাড়ীতে যাহাতে না থাকে, তাহারই ব্যবস্থা করা তো আমার কর্ত্তব্য।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাক্ষাৎকার লাভের পক্ষে কখনও কোনরূপ বিঘ্ন-বাধার ব্যবস্থা ছিল না। তিনি যে সময় সুকিয়া-ষ্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে থাকিতেন, সেই সময় এক দিন মধ্যাহ্নে এক ব্যক্তি অতি ব্যস্তভাবে তথায় তথায় উপস্থিত হন। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। লোকটি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে চিনিতেন না। তিনি একটু বিরক্ত, একটু উগ্রভাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই বলিলেন,—"বিদ্যাসাগর কোথায়?" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"কেন?"

কটী বলিলেন,—"তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে কি? নক বড় লোকের বাড়ী যাইলাম; কেহই সাক্ষাৎ করিলেন ; দেখিয়া যাই, বিদ্যাসাগর কিরূপ।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"আহার হইয়াছে?" উত্তর হইল,—"আহার কি, জলস্পর্শ হয় নাই। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। এখন আপনি কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া শান্ত হউন।" লোকটী বলিলেন,—"অগ্রে সাক্ষাৎ চাই।" ইতিমধ্যে দিব্য-রূপ জলযোগ আসিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে লোকটী জলযোগ করিলেন। পরে শান্ত হইয়া, তিনি বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎকার-প্রার্থী হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় আর আত্মগোপন করিতে পারেন নাই। তখন লোকটী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃত মহত্ত্বানুভব করিয়া পরম পুলকে বিদায় গ্রহণ করেন।

অনেকেই আবার সাক্ষাৎকার জন্য অসময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর উৎপীড়ন করিতেন। এক বার উত্তর-পাড়া হইতে কতকগুলি লোক তাঁহার বাদুড়বাগানের বাড়ীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। উদ্দেশ্য,—চাকুরী-প্রার্থনা। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কনিষ্ঠ কন্যা সাংঘাতিকরূপে পীড়িত ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় উপরে তাঁহারই সুশ্রূষা করিতেছিলেন। মন অত্যন্ত চঞ্চল ছিল। এমন অবস্থায় উপস্থিত ব্যক্তিরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। সেই সময় ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বসু মহাশয় নীচে এক স্থানে

উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি উপস্থিত ব্যক্তিগণকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনের অবস্থা জানাইয়া তাঁহাদিগকে সময়ান্তরে আসিতে বলেন। তাঁহারা তাঁহার কথা শুনিলেন না; অধিকন্তু চাকরের দ্বারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সংবাদ পাঠাইয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়া পাঠান,—"অদ্য আমার মন বড়ই চঞ্চল। কন্যার কাছ ছাড়া হইতে পারি না। আপনারা অন্য দিন আসিবেন।" লোক-কয়টী এ কথা না মানিয়া, উপরে যাইবার জন্য সিঁড়ির উপর উঠিলেন। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় উপর হইতে নামিয়া আসিয়া, একটু বিরক্তি-সহকারে বলিলেন—"আপনারা বড়ই গরজ বুঝেন; আপনাদের কি দয়া-মায়া নাই; অদ্য যাউন, আর এক দিন আসিবেন।" তখন লোকগুলি অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া যান। *

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর এইরূপ উৎপীড়ন প্রায়ই হইত। তিনি বলিতেন—"উৎপীড়ন প্রায়ই হইত বটে; কিন্তু উৎপীড়ন সহ্য করিতে অভ্যাস করিয়াছি।"

এই সময় দেবোত্তর-বিষয়ের হস্তান্তরকরণ সম্বন্ধে আইন করিবার বিল হয়। সরকার বাহাদুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত অবগত হইবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, নিম্নলিখিত পত্রে নিম্নলিখিত রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পত্র ইংরেজিতে লিখিত হইয়াছিল। এই খানে তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রকাশিত হইল,—

* ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বসু মহাশয়ের নিকট এই বৃত্তান্ত শুনিয়া

আর, বি, চ্যাপম্যান স্কোয়ার
বোর্ড অব্ রেবিনিউ আপিসের সেক্রেটরি
মহোদয় সমীপেষু—

মহাশয়!

আপনি গত ১৮ই জুলাই তারিখে ৬৫৬ নং বি নং পত্রে আমার যে মন্তব্য জানিতে চাহিয়াছেন, তাহার প্রত্যুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্রে দেবোত্তর সম্পত্তির বিক্রয় বা হস্তান্তরের অনুকূলে বা প্রতিকূলে কোন প্রকার প্রমাণ-বাক্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু দেশের চিরন্তন পদ্ধতি, এরূপ সম্পত্তির কোন প্রকার হস্তান্তরের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান। বস্তুতঃ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীমাত্রেই যখন ঈদৃশ দেবোত্তর সম্পত্তির প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহাদিগের প্রথম প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, এরূপ সম্পত্তি ভবিষ্যতে যেন কোন প্রকারে হস্তান্তরিত না হয় ও চির দিন অক্ষুন্ন থাকে। এরূপ অভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা উক্ত প্রকার সম্পত্তি সংক্রান্ত কতকগুলি নিয়মের নির্দ্দেশ করিয়া দেন। উক্ত সম্পত্তির টষ্টিরা (অধ্যক্ষেরা) তন্নিমিত্ত ঈদৃশ সম্পত্তি কোন প্রকারেই হস্তান্তর বা বিক্রয়াদি করিতে সমর্থ হন না। যদিও এ সম্বন্ধে কোন প্রকার সুস্পষ্ট বিধি হিন্দু শাস্ত্রে লক্ষিত হয় না, তথাপি হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্রের নিয়মানুসারে ঈদৃশ সম্পত্তির হস্তান্তর কোন ক্রমেই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে সম্পত্তির কোন প্রকার হস্তান্তর উক্ত সম্পত্তির মালিকের স্পষ্ট সম্মতি ব্যতীত একেবারেই অসিদ্ধ। যে দেবতার উদ্দেশে দেবোত্তর সম্পত্তির সৃষ্টি হয়, তিনিই আইনানুসারে উক্ত সম্পত্তির একমাত্র মালিক। সুতরাং দেবতার সম্মতি ব্যতীত উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তর বা বিক্রয়াদি আদৌ সম্ভবপর নহে। দেবতার নিকট হইতে তাদৃশ সম্মতিগ্রহণ একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং দেবোত্তর সম্পত্তির হস্তান্তর কোন মতেই আইনসঙ্গত

বিধানগুলি নিবিষ্ট হইলে পাণ্ডুলিপি লিখিত আইনটী হিন্দু-ব্যবহার শাস্ত্রের বিরোধী বা সাধারণ হিন্দু-সমাজের মনক্ষোভের কারণ হইবে না।

কলিকাতা, ৭ই আগষ্ট, ১৮৬৬ খৃঃ। } (স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

বলা বাহুল্য, দেবোত্তর সম্পত্তি-হস্তান্তর-করণ সম্বন্ধে কোন আইন পাশ হয় নাই।

১৮৭৩ সালের ২রা পৌষ বা ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর রবিবার বিদ্যাসাগর মহাশয়, মিস্ কারপেন্টারকে * লইয়া, উত্তরপাড়ায় শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থ গমন করেন। তাৎকালিক শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টর আটকিন্‌সন্ সাহেব এবং স্কুল-ইনস্পেক্টর উড্রো সাহেব তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। বিদ্যালয় পরিদর্শনান্তে সকলেই গাড়ী করিয়া ফিরিয়া আসেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, একটী ভদ্র লোকের সহিত একখানি বগী করিয়া আসিতেছিলেন। গাড়ী চড়িবার সময়, তিনি সঙ্গী ভদ্র লোকটীকে বলেন,—"বাপু! আমি কখন বগী চড়ি নাই; হাঁকাইও নাই; দেখ, সাবধানে হাঁকাইও।" ভদ্র লোকটী অবশ্য তাঁহাকে খুবই আশা-ভরসা দিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, গাড়ীখানি কিছু দূর আসিয়া মোড় ফিরিবার সময়, একেবারে উল্টাইয়া

* ভারতীয় স্ত্রীলোকদিগের লেখাপড়া-শিক্ষা-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় ইনি ভারতে আসিয়াছিলেন। বৃষ্টলে ইহাঁরই পিতা পাদরী কারপেণ্টার সাহেবের গৃহে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়। তখন ইনি বালিকা।

পড়ে। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তখনই পড়িয়া অজ্ঞান হইয়াছিলেন। যকৃতে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। চারি দিকে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। মিস্ কারপেণ্টার, তাঁহাকে বুকে তুলিয়া, আপন রুমাল ছিঁড়িয়া, ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ও উড্রো সাহেবের সুশ্রূষায় বিদ্যাসাগর মহাশয় চৈতন্য লাভ করেন। পরে তিনি চৈতন্য লাভ করিয়া, অনেক কষ্টে কলিকাতার কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ বাসায় ফিরিয়া আসেন। এই দৈব-দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া, তাঁহার বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে দেখিতে যান। পরম বন্ধু রাজকৃষ্ণ বাবু, তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া গিয়া, সুকিয়া ষ্ট্রীটে নিজের বাটীতে লইয়া যান। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার চিকিৎসা করেন। ভয়ানক আঘাতে উরুদেশ ফুলিয়া উঠিয়াছিল। এক মাসের সুচিকিৎসায় তিনি এক রকম সারিয়া উঠেন; কিন্তু যে কালরোগে তাঁহার জীবলীলার অবসান হয়, তাহার অঙ্কুরোৎপত্তি এই খানে। চিকিৎসকেরা বলেন, তাঁহার যকৃৎ উল্টাইয়া গিয়াছিল। এই সময় হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। ইহার পর তাঁহাকে প্রায়ই শিরঃপীড়া ও উদরাময় ভোগ করিতে হইত। পরিপাকশক্তি হ্রাস হইয়া যাইল; সুতরাং আহারও লঘু হইল। দুগ্ধ সহ্য হইত না। প্রাতে মাছের ঝোল ভাত এবং রাত্রিকালে বারলি রুটি, কখন কখন গরম লুচিমাত্র আহার ছিল। পরে তাহাও অসহ্য হইয়াছিল। অনেক সময় তিনি রাত্রিকালে দুই এক গাল মুড়ি খাইয়া

থাকিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন,—"বাল্যে পয়সার অভাবে দুগ্ধ খাই নাই; বয়সেও রোগের জ্বালায় তাহা হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বমুখে শুনিয়াছি, উত্তরপাড়ায় পতনের পর হইতে তাঁহার সাহস, উদ্যম, অধ্যবসায়, চেষ্টা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি, যা কিছু সকলেরই হ্রাস হইয়াছিল। সেই সিংহবীর্য্যশালী মহাতেজস্বী কার্য্যবীরের পতন এইখানেই। আর তিনি শোধরাইতে পারিলেন না। স্বাস্থ্য-রক্ষার্থ প্রায়ই তাঁহাকে ফরাসডাঙ্গা, বৰ্দ্ধমান, কাণপুর প্রভৃতি স্থানে থাকিতে হইত। তবুও কিন্তু কার্য্যবীরের কার্য্যবিরাম ছিল না।

পতনাঘাত হইতে কতকটা আরোগ্য লাভ করিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়, ১৮৬৭ সালের প্রারম্ভে বীরসিংহ গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। এই সময় এক অবীরা বিধবার আত্মীয়েরা, তাঁহার জমী আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই বিধবা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কাঁদিয়া-কাটিয়া আপন দুঃখ জ্ঞাপন করেন। তিনি বিধবার আত্মীয়দিগকে ডাকাইয়া আনিয়া, বিধবার জমী আত্মসাৎ করিতে নিষেধ করেন। তাঁহারা তাঁহার কথা শুনেন নাই; বরং তাঁহারা বিধবার নামে আদালতে নালিষ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়, এ বিধবার যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন শুনিয়া, তাঁহারা আর আদালতে উপস্থিত হন নাই।

এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়, বীরসিংহের বাটীর নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করেন;—

"মধ্যম ও তৃতীয় সহোদরের ও স্বীয় পুত্রের পৃথক্ পৃথক্ ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দেন। সকলেরই মাসিক ব্যয়ের নিমিত্ত যাহার যেরূপ টাকার আবশ্যক, সেইরূপ ব্যবস্থা করেন। এইরূপ করিবার কারণ এই,—একত্র অনেক পরিবার থাকিলে কলহ হইবার সম্ভাবনা; বিশেষতঃ বহুপরিবার একত্র অবস্থিতি করিলে সকলেরই সকল বিষয়ে কষ্ট হয়। ইতিপূর্ব্বে ভগিনীদ্বয়ের পৃথক্ বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বিদেশীয় যে সকল বালক বাটীতে ভোজন করিয়া বীরসিংহ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত, তাহাদের মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সমস্ত টাকা দিয়া পাচক ও চাকর দ্বারা স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করেন। ইহার কিছু দিন পরে তাঁহার পুত্র নারায়ণের পৃথক্ বাটী প্রস্তুত হয়। এবং নিজের নিকট জননীদেবীর অবস্থিতি করিবার ব্যবস্থা হইল।" *

এই ব্যবস্থায় হিন্দুর একান্নভুক্ত পরিবারপ্রথার বিরোধ-প্রমাণ। বিদ্যাসাগর মহাশয় একান্নভুক্ত পরিবারপ্রথার পক্ষপাতী ছিলেন না। ইহা তাঁহার দোষ নহে; দোষ তাঁহার শিক্ষার। হিন্দু ধর্ম্মের অন্তস্তলে প্রবেশ করিবার অধিকার তাঁহার ছিল না; হিন্দু-সমাজের গঠনের মূলতত্ত্বে এই জন্যই তিনি লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইতেন না। তিনি হিন্দুর যে

* বিদ্যারত্ন মহাশয় এই কথা লিখিয়াছেন। নারায়ণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সবই সত্য; তবে কলহের সম্ভাবনা নহে; সত্যসত্যই কলহ ঘটিয়াছিল।

সামাজিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই একান্নভুক্ত পরিবারপ্রথার বিরুদ্ধাচরণ করাও সেই বিষয়েরই পরিচয় দিতেছে। হিন্দুর সংসারে, সমাজে, ব্যবহারিক সকল বিষয়ে, পরমার্থ-তত্ত্ব লাভের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকটভাবে অন্তস্তত্ত্ব বুঝাইবার নিমিত্তই হিন্দুর বাহ্য ব্যবহারের সৃষ্টি। একান্নভুক্ত পরিবারপ্রথা হিন্দু-সমাজ-গঠনের একটা প্রধান অঙ্গ—হিন্দুর যোগ-সাধনের—মোক্ষ-প্রাপ্তির প্রধান পথ। এক অপরের সহিত যুক্ত হইলেই যোগ হয়। সমস্ত জগতের সহিত মিশিয়া যাওয়া, আপনাতে সমস্ত জগতের লয় করা, জাগতিক প্রত্যেক বস্তুতে আপনার সত্ত্বা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করাই হিন্দুর মুখ্য সাধন-পথ। গৃহে ইহার প্রথম সূত্রপাত হয়। প্রথম সূত্রপাত হয়,—একে একে,—অর্থাৎ হয় গুরু-শিষ্যে, না হয় স্বামী স্ত্রীতে, না হয় পিতাপুত্রে ইত্যাদি। দুই এক হইয়া দ্বিগুণ বললাভ করিলে অপর এক জনকে গ্রহণ করা অর্থাৎ আপন শক্তিতে মিশাইয়া লওয়া সহজ। এইরূপ দুই ও একে তিন হইতে তখন স্বচ্ছন্দে আর দুই জনকে লওয়া চলে,—তাহার সুখদুঃখে সুখীদুঃখী হওয়া যায়। যাহারা আত্মীয়, যাহাদের একইরূপ সংস্কার-বশে একই বংশে জন্ম, তাহাদের সহিত এরূপ মিল সহজ এবং অধিকতর অনায়াস-সাধ্য। তাই একান্নভুক্ত পরিবার-প্রথার সৃষ্টি।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

ভ্রাতার অভিমান, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, রাজা রাধাকান্ত, হিন্দু-পেটরিয়টে পত্র, জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহ, রামগোপাল ঘোষ, সারদাপ্রসাদ, ঘাটাল-স্কুল, রাণী কাত্যায়নী, ইন্‌কম্‌ ট্যাক্স ও হরচন্দ্র ঘোষ।

নারায়ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, ভ্রাতারা মধ্যে মধ্যে জ্যেষ্ঠের উপর অভিমান করিয়া, মাসহরা লইতেন না। এ জন্য সময় সময় তাঁহাদের কষ্ট হইত; সে কষ্টের কথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্ণগোচর হইলে, তিনি বাটী যাইয়া, গোপনে গোপনে ভ্রাতৃবধূদের অঞ্চলে টাকা বাঁধিয়া দেওয়াইতেন।

১৮৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বহুবিবাহ রহিত করণসম্বন্ধে আইনের প্রত্যাশায় গবর্ণমেণ্টে আবেদন হইয়াছিল। ফল হয় নাই।

১২৭৩ সালের ১৮ই পৌষ বা ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৩ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ অনারেবল শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যু হয়। বেথুন-স্কুলের সম্পর্কে ইহাঁর সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সবিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেবার বেথুন স্কুলে চিক পুরস্কার দেন, সেইবার ইনি সোণার বালা পুরস্কার দিয়াছিলেন।

১২৭৪ সালের ১লা বৈশাখ বা ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রেল

স্থর রাজা রাধাকান্ত দেবের মৃত্যু হয়। ইনি বিধবা-বিবাহের বিপক্ষবাদী ছিলেন; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তেজস্বিতা ও বুদ্ধিমত্তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন।

এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ে অনেক দেনা বলিয়া হিন্দু-পেটরিয়ট, এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি সংবাদপত্রে সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া, এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন বীরসিংহ গ্রামে ছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া যখন তিনি এই কথা শুনেন, তখন তাঁহার সেই প্রশান্ত বারিধিবৎ হৃদয়ে যেন মুহূর্ত্তে বিষম বাড়বানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। তিনি তখনই তার একটা প্রতিবাদ করিয়া, হিন্দু-পেটরিয়টে এক পত্র লেখেন। পত্রের মর্ম্ম এইঃ—

"বহু দিনের পর আমি বাড়ী হইতে কলিকাতায় আসিলাম। আসিয়া শুনিলাম, বিধবা-বিবাহ-সংস্কারের জন্য অনেকগুলি টাকার ঋণ হইয়াছে বলিয়া, চাঁদা তুলিয়া, সেই ঋণশোধের নিমিত্ত একটা ফণ্ড স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে; বলা হইয়াছে, আমিই সেই ঋণ করিয়াছি। শুনিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। দেশী ইংরেজী সকল সংবাদপত্রেই এ কথা ব্যক্ত হইতেছে; লোকের মুখে মুখে একথা ঘুরিতেছে; তথাকথিত ঋণের একটা তালিকাও দেওয়া হইয়াছে।

কাজেই যত শীঘ্র সম্ভব, আমাকে প্রতিবাদ করিতে হইল। বলিতে হইল, আমার সম্মতি লওয়া ত দূরের কথা, এ প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে আমাকে একবার জানানও হয় নাই। এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বলিতে হইল, না জানিয়া শুনিয়া যে ৪৫ হাজার টাকা ঋণের কথা কথিত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে ঋণ তাহার অর্দ্ধাংশেরও অনেক অল্প; আর

এই ঋণশোধের নিমিত্ত সাধারণের নিকট সাহায্যপ্রার্থনা করিবার ইচ্ছা আমার কখনই নাই। বিধবা-বিবাহ-সংস্কারের অনেক হিতৈষী অতি যৎসামান্য অর্থসাহায্যও করিয়াছেন; কিন্তু স্বেচ্ছায়; আমি সেই স্বেচ্ছাদত্ত অর্থ সাহায্যের কখনও প্রত্যাখ্যান করি নাই; কিন্তু তাই বলিয়া ইহার জন্য ব্যক্তিবিশেষকে পীড়াপীড়ি করা আমার নীতিবিরুদ্ধ। কয়েকটী বন্ধুর অর্থসাহায্যে, এবং যত অল্পই হউক, আমার নিজ আয়ের উপর নির্ভর করিয়াই আমি এতাবৎ এই সংস্কারের পথে চলিয়া আসিতেছি; এবং আশা আছে, এখনও এইরূপ চলিতে পারিব। উল্লিখিত কয়েকটী বন্ধু এবং স্বেচ্ছায় যাঁহারা অর্থসাহায্য করিতেছেন, এমন কতকগুলি ব্যক্তি এ পক্ষে আমার সহায়। অনেক স্থলেই ইহাঁরা কথার মত কাজ করিয়াছেন এবং এখনও সাহায্যাদি করিতেছেন।

৬০ টী বিধবা-বিবাহে ৮২ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। শুনিলাম, এ জন্য কেহ কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা হিন্দুসমাজের অবস্থা জানেন, এক দলাদলির জন্যই এ পক্ষে কত অধিক টাকার ব্যয় হইতে পারে, তাহা বোধ করি, তাঁহারা অজ্ঞাত নহেন। মফঃস্বলের যে সকল গ্রামে বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার অনেক স্থলেই এইরূপ দলাদলি; সুতরাং সহজেই প্রতীত হইতেছে, এরূপ স্থলের বিবাহ অবশ্যই কিছু ব্যয়সাপেক্ষ।

প্রথম বিধবা-বিবাহের অনুষ্ঠান হয়—কলিকাতা সহরে। এই প্রথম বিবাহে একটু ধূমধাম করা এবং পণ্ডিতকুলীনাদির বিদায়াদি দেওয়া সংস্কার-সমিতির সভ্যগণের মতে প্রয়োজনীয় বোধ হয়। তাই বহু কুলীন ব্রাহ্মণাদি এ বিবাহে আহূত হইয়াছিলেন, এবং বিদায়াদিও তাঁহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। শুদ্ধ এই একটী বিবাহেই দশ সহস্র টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। কিন্তু অতিব্যয়ের শুদ্ধ ইহাই কারণ নহে। মফঃস্বলে যাঁহারা এ সংস্কারের জন্য——বিধবা-বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহা-



বাবু রামগোপাল ঘোষ।

চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, রামগোপাল বড় মাতৃ-ভক্ত; মায়ের কথা ঠেলিতে পারিবেন না; অতএব এ সম্বন্ধে তাঁহার মাকে দিয়া অনুরোধ করিতে হইবে। এই ভাবিয়া পর দিন প্রাতঃকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়, রামগোপালের বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার ঠাকুর-দালানে বসিয়া থাকেন। সেই সময় রামগোপালের জননী গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী আসেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"ঈশ্বর তুমি যে এখানে ব'সে?" বিদ্যাসাগর বলিলেন,—"মা! কলে মড়া পোড়াইবার ব্যবস্থা হইতেছে।" রামগোপালের জননী শুনিয়া অবাক্! বলিলেন,—"বাবা! এ ব্যবস্থা যাহাতে না হয়, তাহার উপায় কি নাই?" বিদ্যাসাগর বলিলেন,—"এক উপায় আছে। কাল টাউন হলে সভা করিয়া ইহাঁর মীমাংসা হইবে। আপনার ছেলে যদি সভায় যাইয়া ইহাতে আপত্তি করে, তাহা হইলে, এ ব্যবস্থা বন্দ হইতে পারে।" রামগোপালের জননী বলেন,—"তা যদি হয়, আমি এখনই রামগোপালকে বলবো।" পরে তিনি বাড়ীর ভিতর যাইয়া রামগোপালকে অনুরোধ করেন। রামগোপাল বাহিরে আসিয়া বিদ্যাসাগরকে বলিলেন,—"মাকে বলেছ। কি বলবো মার কথা ঠেলিবার নহে। ভাল, কাল তিনটার সময় এস, সভায় যাইব।" পর দিন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া, রামগোপাল টাউন হলের সভায় গিয়া, কলে শবদাহ করিবার প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁহারই প্রতিবাদে না কি প্রস্তাব রদ হইয়া যায়।

১২৭৪ সালের ১৯শে ফাল্গুন বা ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ বুধবার বর্দ্ধমান-চকদিঘীর জমীদার সারদাপ্রসাদ রায়ের মৃত্যু হয়। সারদা বাবুর সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠতা ছিল। সারদা বাবু কোন বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত না লইয়া চলিতেন না। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা উচিত কি না, একবার এ বিষয়ে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহাকে পোষ্য পুত্র লইতে নিষেধ করিয়া, স্কুলস্থাপন, ডিস্পেনসারিপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানের পরামর্শ দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শানুসারে সারদা বাবু ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে চকদিঘীতে একটা ডাক্তারখানা এবং ১২৬৮ সালের ১৮ই শ্রাবণ বা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই চকদিঘীতে এক দরিদ্র পরিবারকে বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৫ টাকা করিয়া মাসহারা দিতেন। সারদা বাবুর মৃত্যুর পর তদীয় উইল সম্বন্ধে এক মোকদ্দমা হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতে সাক্ষী ছিলেন। সে কথা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় দারুণ ঋণভারগ্রস্ত; তবুও কিন্তু কাহাকেও অর্থ সাহায্য করা একান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলে, যেখান হইতেই হউক, অর্থ সংগ্রহ করিয়া, সাহায্য করিতেন। এই সময় মেদিনীপুর-ঘাটাল অঞ্চলে একটি এণ্ট্রান্স পরীক্ষার উপযোগী স্কুল-স্থাপনের সাহায্য-প্রার্থনায় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নিম্নলিখিত পত্র লিখিত হয়,—

ঘাটাল, ১১শে জ্যৈষ্ঠ
সন ১২৭৫ সাল।

সবিনয় সম্মানপুরঃসরনিবেদনমিদং—

অত্র স্থলে একটী এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পাঠোপযোগী সংস্কৃতসহিত ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক বিবেচনায় তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি বটে; কিন্তু এতদ্দেশবাসী সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা এই মহৎ কার্য্যে সাহায্য না করায় সুতরাং সম্যক্প্রোষিত ব্যক্তিগণের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া আমরা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না। এই স্কুলগৃহটী প্রস্তুত করিতে অন্ততঃ চারি হাজার টাকার আবশ্যক, স্কুলইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত মার্টীন মহোদয় অনুমতি করিয়াছেন অগ্রে স্কুলবাটী প্রস্তুত করিয়া দিলে পশ্চাৎ গবর্ণমেণ্ট, অর্দ্ধেক দুই হাজার টাকা দিবেন। কিন্তু এক্ষণে এককালীন দানের যেরূপ ফল দেখা যাইতেছে, ইহা সম্যক্ সংগ্রহ হইলেও প্রায় পনর শত টাকা মাত্র সংস্থান হইতে পারে। যদিও আমরা গবর্ণমেণ্টের ভাবি আনুকূল্যের প্রত্যাশায় ঋণের দ্বারায় দুই হাজার টাকা সংগ্রহের উপায় করিয়াছি, কিন্তু এদিকে ঐ পনর শত ব্যতীত আর প্রত্যাশা নাই কাজেই এখন এ কাজটী নির্ব্বাহপক্ষে পাঁচ শত টাকার অনটন ঘটনা দেখা যাইতেছে। এই সঙ্কল্পিত কার্য্যটী সংসাধিত পক্ষে আমরা স্বতঃপরত সাহায্যের ত্রুটী করি নাই। কিন্তু ঐ অনটন নিরাকরণ করা আমাদিগের নিতান্ত সাধ্যাতীত হওয়ায় সুতরাং এক্ষণে একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত উপায়ান্তর উপলব্ধি হইতেছে না, অধুনা অস্মদীয় কামনা এই যে সেই মহাপুরুষ, প্রসন্ননেত্রে এ দেশের প্রতি কটাক্ষ করত উল্লেখিত অনটন বিমোচন করিয়া স্বীয় নাম ও গুণের মাহাত্ম্য প্রকাশ করুন নিবেদন ইতি।

(স্বাঃ) শ্রীতারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকেদারনাথ হালদার।

ইংরেজী শিক্ষা-বিস্তার-ব্রতী বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সাহায্য-দানে কি অসম্মত হইতে পারেন? হাত পাতিয়া কেহ ত প্রায় রিক্তহস্তে ফিরিত না; বিশেষ ইংরেজী শিক্ষার প্রসার-কল্পে। বিদ্যাসাগর মহাশয়, নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া সাহায্য-দানে সম্মতি প্রকাশ করেন,—

সবিনয়ং সবহুমানং নিবেদনম্

আপনারা অনুগ্রহপ্রদর্শনপূর্ব্বক আমায় যে পত্র লিখিয়াছেন, তদ্দ্বারা সমস্ত অবগত হইলাম আপনাদিগের উদ্যোগে ঘাঁটালে যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে উহার গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধে যে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অনাটন আছে আমি স্বতঃপরতঃ তাহা সমাধা করিয়া দিব সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিবেন তজ্জন্য অন্য চেষ্টা দেখিবার আর প্রয়োজন নাই কিন্তু আগামী সারদীয় পূজার পূর্ব্বে এই টাকা আপনাদিগের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প বোধ করি এই বিলম্ব বিশেষ ক্ষতিকর বা অসুবিধাজনক হইবেক না শ্রাবণ মাসের শেষভাগে আমার বাটী যাইবার কামনা আছে যদি যাওয়া হয় সাক্ষাতে সবিশেষ নিবেদন করিব কিমধিকমিতি ২৪ আষাঢ় ১২৭৫ সাল।*

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণঃ

(স্বাঃ) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

মাননীয় শ্রীযুক্ত এল এস টরনবুল স্কোয়ার
শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ হালদার
মহাশয় মদনুগ্রাহকেষু—
ঘাঁটাল।

---

* শুনিতে পাই, বিদ্যাসাগর মহাশয়, বাঙ্গালায় , ; প্রভৃতি বিরাম-চিহ্নের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার সকল পুস্তকেই ইহার ব্যবহার দেখিতে পাই; কিন্তু পত্রাদিতে প্রায় দেখা যায় না। এ পত্রেও আদৌ কোন চিহ্ন নাই।

ইহার পর, যথাসময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়, সাহায্য-দান করিয়াছিলেন।

১২৭৫ সালের ৩রা ভাদ্র বা ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট পাইকপাড়ার বৃদ্ধ রাণী কাত্যায়ণী দেহ ত্যাগ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা ইনি কিরূপ উপকার পাইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের শীতকালে ইন্‌কম্‌-ট্যাক্সের অসহ কর-নির্দ্ধারণে প্রপীড়িত হইয়া, অনেকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাগত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়, সে কথা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরকে বিদিত করেন। তাঁহার অনুরোধে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বর্দ্ধমানের তদানীন্তন কমিশনর হারিসন সাহেবকে ইনকম্‌ ট্যাক্সের তথ্যানুসন্ধানে নিযুক্ত করেন। তথ্যানুসন্ধানে নির্ণীত হয় যে, প্রকৃত পক্ষে অন্যায়রূপে কর নির্দ্ধারিত হইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়, দুই মাস কাল অন্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, এ তদন্ত-ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রায় তিন সহস্র টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ আখ্যানমঞ্জরী প্রণীত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইহাতেও বৈদেশিক চরিত্রের সমাবেশ। ভাষা বাঙ্গালী স্কুল-পাঠকের সম্পূর্ণ উপযোগী।

১২৭৬ সালের ২০শে অগ্রহায়ণ বা ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর কলিকাতার ছোট আদালতের ভূতপূর্ব্ব জজ হরচন্দ্র

ঘোষের মৃত্যু হয়। ইনিও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তারের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন। ১২৭৬ সালের ২১শে পৌষ বা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী ৺হরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু জন্য শোক-চিহ্ন প্রকাশার্থে এক সভা হইয়াছিল। তাঁহার স্মরণ-চিহ্ন-নির্দ্ধারণার্থ এই সভাতে যে "কমিটি" হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়, সেই কমিটিতে ছিলেন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ছাপাখানার সত্ব, মনোবেদনা, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, বর্দ্ধমানে বিদ্যাসাগর, ঋণের জন্য ঋণ ও বিধবা-বিবাহে লাঞ্ছনা।

এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র নারায়ণ বাবু, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলেন,—"বাবা! মেজ-খুড়ো, ছাপাখানার বখরা চাহিতেছেন।" বিদ্যাসাগর মহাশয়, শুনিয়া অবাক্ হইলেন। পরে তিনি মধ্যম ভ্রাতাকে ডাকাইয়া বলিলেন,—"ভাই! শুনিয়াছি, তুমি ছাপাখানার ভাগ চাহিতেছ। ভাল, তাহাই হইবে। দেনা পাওনা দেখ। মধ্যস্থ মান।" অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয় ৺দ্বারকানাথ মিত্রকে এবং তদীয় মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়, বাবু দুর্গামোহন দাসকে মধ্যস্থ মানিলেন।

এ সালিসিতে রাজকৃষ্ণ বাবু, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতয়ানুজ শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং তদীয় পিতৃব্য-পুত্র পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাক্ষী মানা হইয়াছিল। বিদ্যারত্ন মহাশয় এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ষষ্ঠানুজ শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছাপাখানার অংশে দাবী করেন নাই। সাক্ষ্য দিতে হইবে বলিয়া, বিদ্যারত্ন মহাশয়, ন্যায়রত্ন মহাশয়কে ছাপাখানার দাবী পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়

অনুরোধে দাবী পরিত্যাগ করেন।* ন্যায়রত্ন মহাশয়, যখন ছাপাখানার অংশে দাবী করেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়, আপনাকে লইয়া চারি ভাই ও পিতা মাতা, এই কয় জনের নামে ছয় ভাগে ছাপাখানার অংশ করিতে চাহিয়াছিলেন। পরে সালিসীতে ধার্য্য হয়, ছাপাখানায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সম্পূর্ণ সত্ত্ববান। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তিন ভ্রাতা বিদ্যমান ছিলেন,—দ্বিতীয় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, তৃতীয় শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং ষষ্ঠ শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিপূর্ব্বে চতুর্থ, পঞ্চম ও সপ্তম ভ্রাতা ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। ইহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশায় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দেহান্তর হয়। ইনি পণ্ডিত ও পরোপকারী ছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, ভ্রাতৃবর্গ এবং অন্যান্য আত্মীয়ের সতত শুভ কামনা করিতেন। তাঁহাদের মঙ্গল চেষ্টায় তাঁহার অনেক অর্থ ব্যয় হইত। সকলকেই তিনি সাধ্যানুসারে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু তিনি প্রায়ই দীর্ঘশ্বাসে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিতেন,—"সন্তুষ্ট কাহাকেও করিতে পারিলাম না। আমার কথামালায় যে বৃদ্ধ ও ঘোটকের গল্প আছে, আমি সেই বৃদ্ধ।"

এই সময় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রীতি ও প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে ইনি

---

* শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত "ভ্রমনিরাস" নামক পুস্তকে এই কথার উল্লেখ আছে।

এই চিকিৎসার উপর বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিদ্ বেরিণী সাহেব, কলিকাতায় আসিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন। কলিকাতা-বহুবাজার-বাসী ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত বেরিণী সাহেবের বেশ সংপ্রীত হইয়াছিল। রাজেন্দ্র বাবু ইতিপূর্ব্বে হোমিওপ্যাথিক শিক্ষানুশীলনে কতকটা মনোযোগী হইয়াছিলেন। বেরিণী সাহেবের সহায়তায় তিনি এ বিষয়ে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। চিকিৎসাতেও তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছিল। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসামতে রাজেন্দ্র বাবু, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিরঃপীড়া আরাম করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র বাবুর হোমিওপ্যাথিক ঔষধ-সেবনে রাজকৃষ্ণ বাবু নিদারুণ মলকৃচ্ছ্রতা পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবুকে মলত্যাগ করিবার সময় ফিচকারী ব্যবহার করিতে হইত। ফিচকারী ব্যবহারে কঠোর মল অতি কষ্টে নির্গত হইত; এবং তাঁহার দুই জানুদ্বয় রক্তস্রাবে ভাসিয়া যাইত। এ হেন রোগ কেবল হোমিওপ্যাথিকের বিন্দুপানে আরাম হইল দেখিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। অতঃপর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিষয়ে তিনি সবিশেষ মনঃসংযোগ করেন। ইহাতে কতকটা ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিনি অনেকের চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার পরামর্শে তদীয় মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়, এক জন হোমিওপ্যাথিক সুচিকিৎসক হইয়াছিলেন। আধুনিক বিখ্যাত

হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় তখন এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার উপর তাঁহার বিষম বিদ্বেষ ছিল। তিনি প্রায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার নিন্দা করিতেন। এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং মহেন্দ্র বাবু হাইকোর্টের জজ পীড়িত অনারেবল দ্বারকানাথ মিত্রকে দেখিতে গিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্তনের সময় গাড়ীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধে মহেন্দ্র বাবুর ঘোরতর বাদানুবাদ হইয়াছিল। শেষে মহেন্দ্র বাবু, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা শিরোধার্য্য করিয়া বলেন,—"আমি এক্ষণে আর হোমিওপ্যাথির নিন্দা করিব না; তবে পরীক্ষা করিয়া দেখিব, ইহার কি গুণ।" পরীক্ষায় তিনি হোমিওপ্যাথির পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। ক্রমে অল্প দিনের মধ্যে ঐ চিকিৎসায় তিনি যশস্বী হইয়া উঠেন। তাঁহার যশঃ-প্রভায় বেরিণীর প্রতিপত্তি কমিয়া গিয়াছিল। এ দেশের লোক, প্রায় বেরিণীকে না ডাকিয়া, মহেন্দ্র বাবুকেই ডাকিতেন। মহেন্দ্র বাবুরই উপর সকলের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। ১৮৬৯ সালে বেরিণী সাহেবকে শূন্য পকেটে ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। তাঁহাকে বিদায় দিবার সময়, ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—"কত সাহেব এ দেশে আসিয়া ফিরিয়া যাইবার সময়, পকেট ভরিয়া টাকা লইয়া যান; আপনি কিন্তু রিক্ত পকেটে ফিরিতেছেন।" এতদুত্তরে বেরিণী সাহেব বলিয়াছিলেন;—

"আমি পাঁচ হাজার টাকা পকেটে পূরিয়া লইয়া যাইতেছি।"

রাজেন্দ্র বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"সে কিরূপ"?

উত্তর হইল,—

"মহেন্দ্র যে হোমিওপ্যাথিকের পক্ষপাতী হইয়াছে, ইহারই মূল্য পাঁচ সহস্র টাকা।"

এই সময় গোবরডাঙ্গার জমিদার ৺সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ার জমীদার ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং কলিকাতার ঝামাপুকুর-নিবাসী রাজা দিগম্বর মিত্র হোমিওপ্যাথিকের পক্ষপাতী ছিলেন।

ইহার ৬।৭ বৎসর পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কনিষ্ঠ কন্যার অতি উৎকট পীড়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় আরাম হইয়াছিল। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা হার মানিয়াছিল। ইহাতে হোমিওপ্যাথিকের উপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধিকতর ভক্তি হইয়াছিল। তিনি এই সময় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যত্নশীল হন। শববিচ্ছেদ শিক্ষা ভিন্ন চিকিৎসা-বিদ্যা ব্যর্থ হয় বলিয়া, তিনি কতকগুলি নরকঙ্কাল ক্রয় করিয়াছিলেন। সুকিয়া ষ্ট্রীটনিবাসী ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষ, তাঁহাকে এতদ্বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, পরে এই সব নরকঙ্কাল রাজকৃষ্ণ বাবুর পুত্রকে দিয়াছিলেন। এই সময় তিনি বহুসংখ্যক হোমিওপ্যাথিক পুস্তক ক্রয় করিয়াছিলেন।

এ সব পুস্তক তাঁহার লাইব্রেরীতে আছে। এই লাইব্রেরীতে হোমিওপ্যাথিক পুস্তক ব্যতীত প্রায় লক্ষাধিক টাকার অন্য পুস্তক আছে। তেমন সুন্দর বিলাতী বাঁধান পুস্তক আর কোন পুস্তকালয়ে আছে কি না সন্দেহ। পুস্তকালয় তাঁহার জীবনাবলম্বন বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। অধ্যয়ন তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। এক মুহূর্ত্ত তিনি পুস্তক ব্যতীত থাকিতেন না। কাহাকেও তিনি লাইব্রেরীর পুস্তক লইয়া যাইতে দিতেন না। এমন কি, একবার তাঁহার প্রিয়পাত্র স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়, ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিবেন বলিয়া, তাঁহার নিকট হইতে কতকগুলি পুস্তক চাহেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহাকে লাইব্রেরীর পুস্তক না দিয়া, নূতন পুস্তক কিনিয়া আনিয়া দেন।* এক বার তাঁহার একটী ধনাঢ্য বন্ধু লাইব্রেরীর বাঁধান পুস্তক দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—"আপনি পাগল।" এত টাকা খরচ করিয়া বিলাত হইতে এ সব পুস্তক বাঁধাইয়া আনিয়া রাখিবার প্রয়োজন কি?" বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার উত্তরে বলেন,—"এক গাছি দড়ি দিয়া আপনি ঘড়িটী বাঁধিয়া রাখিতে পারেন; তবে এত টাকার সোণার চেইনের প্রয়োজন কি? কম্বল গায়ে দিতে পারেন; শাল গায়ে দিয়েছেন কেন? পাগল আপনিও ত।"

উত্তরপাড়ায় পড়িয়া যাইবার পর, স্বাস্থ্যলাভার্থে বিদ্যাসাগর

* এই কথাটী ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বসু মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি।

মহাশয়, ফরাসডাঙ্গায় যাত্রা করেন। সেখানে কিন্তু সুবিধা না হওয়ায়, তাঁহাকে বৰ্দ্ধমানে যাইতে হয়। বৰ্দ্ধমানে যাইয়া, তিনি পরম মিত্র প্যারিচাঁদ মিত্রের বাড়ীতে থাকিতেন। প্যারিচাঁদ মিত্র জজ আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন।* প্রণয়-সদ্ভাবে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও প্যারিচাঁদ বাবু হরি-হর-আত্মা। উভয়েই যেন এক পরিবারভুক্ত। বৰ্দ্ধমানেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দান ও দয়ার কার্য্য অবিশ্রান্ত ভাবে চলিত। তাঁহার নাম শুনিলে, অনেক দীন-দরিদ্র তাঁহার নিকট আগমন করিত। তিনি যাহার যেরূপ অভাব বুঝিতেন, তাহাকে সেইরূপ দান করিতেন। দানে তাঁহার জাতিবিচার ছিল না। অনেক দরিদ্র মুসলমান, তাঁহার নিকট সাহায্য পাইয়া, গুরুতর দায় হইতে মুক্ত হইত। বৰ্দ্ধমান হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্রায় বীরসিংহ গ্রামে যাতায়াত করিতেন। সেই সময় যত দীন-দরিদ্র বালক, তাঁহার পাল্কী ধরিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত। তিনি কাহাকেও মিঠাই, কাহাকেও পয়সা, আর কাহাকেও বস্ত্র দান করিতেন। দয়ালু বিদ্যাসাগর যাইতেছেন শুনিলে, সাহায্য-কামনা না থাকিলেও,

* প্যারিচাঁদ বাবু কলিকাতা-পটলডাঙ্গার শ্যামাচরণ দে মহাশয়ের ভগিনীপতি ছিলেন। শ্যামাচরণ বাবুর ভগিনী অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। প্যারী বাবুকে দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহণ করিতে হয়। প্রথম পত্নী গত হইলেও প্যারি বাবু শ্যামাচরণ বাবুর সহিত পূর্ব্ববৎ সদ্ভাব রাখিয়াছিলেন। প্যারি বাবুর দ্বিতীয় পত্নীও শ্যামাচরণ বাবুকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত মনে করিতেন। শ্যামাচরণ বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয় বন্ধু। এই সূত্রে প্যারী বাবুর সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধুত্ব হয়।

তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য শত শত লোক উদ্গ্রীব হইয়া থাকিত।

ঋণ-পরিশোধ একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। হিন্দু-পেটরিয়টে বিদ্যাসাগর মহাশয়, যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে প্রকাশ পায়, তাঁহার দেনা ২০।২২ হাজার টাকা। দেনা হইয়াছিল, প্রকৃতই অর্দ্ধ-লক্ষাধিক টাকা। পত্র লিখিবার পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক দেনা শুধিয়াছিলেন।* এক্ষণে অবশিষ্ট ঋণ-পরিশোধের গত্যন্তর না দেখিয়া, তিনি মুরশিদাবাদের মহারাণী স্বর্ণময়ীর সরকার হইতে ঋণ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মহারাণীর পরিবারের সহিত ইতিপূর্ব্বে তাঁহার বেশ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। এ কথা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। মহারাণী মধ্যে মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আবশ্যকমত টাকা ধার দিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও যথাসময়ে পরিশোধ করিতেন। ১২৭৬ সালের ২০শে কার্ত্তিক বা ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নবেম্বর বিদ্যাসাগর মহাশয় নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া, মহারাণীর সরকার হইতে টাকা ধার চাহিয়াছিলেন,—

শুভাশিষঃসন্তু—

সাদর সম্ভাষণমাদনম্—

আপনি অবগত আছেন বিধবা-বিবাহ কার্য্যোপলক্ষে আমি বিলক্ষণ ঋণগ্রস্ত হইয়াছি ঐ ঋণের ক্রমে পরিশোধ করিতেছি। দুই ব্যক্তির

---

* শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় এ কথা বলিয়াছেন।

নিকট কিছু অধিক ঋণ আছে তাঁহারা ক্রমে লইতে সম্মত নহেন এককালে টাকা পাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত করিতেছে এককালে তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করি তাহার সুযোগ নাই। কিন্তু তাহা না করিলেও কোনক্রমে চলিতেছে না। উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে শ্রীমতী রাণী মহোদয়ার নিকট প্রার্থনা করিতেছি তিনি দয়া করিয়া আমাকে ৭৫০০ সাত হাজার পাঁচশত টাকা ধার দেন একখানি হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিব এবং তিন বৎসরে পরিশোধ করিব। এই ঋণ নিয়মিত সময়ে পরিশোধ করিতে পারিব সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই সন্দেহ থাকিলে কখন আমি এরূপে ধার চাহিতাম না। আপনকার সহায়-ব্যতিরেকে আমার এই প্রার্থনা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। আপনি অসন্দিগ্ধচিত্তে সহায়তা করিবেন। এই সহায়তা করিয়া আপনাকে কখনও অপ্রস্তুত হইতে হইবেক না। আমি এত অসম্ভ্রান্ত ও অপদার্থ লোক নহি যে পরিশোধ করিবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি ঋণ করিতেছি অথচ পরিশোধ বিষয়ে অযত্ন করিব কিংবা নিশ্চিন্ত থাকিব, আপনি এক মুহূর্তের জন্যও আশঙ্কা করিবেন না। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ যতদিন জীবিত ও সহজ অবস্থায় ছিলেন, তাঁহার নিকট মধ্যে মধ্যে এইরূপ ধার পাইতাম এবং ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিতাম। এক্ষণে এখানকার কোন ধনীর সহিত আমার এরূপ আত্মীয়তা নাই যে টাকা ধার চাহিতে পারি। আপনি না থাকিলে শ্রীমতী রাণী মহোদয়ার নিকটেও ধার চাহিতে পারিতাম না। এক্ষণে যাহাতে আমার প্রার্থনা সফল হয় দয়া করিয়া তাহা করিতে হইবেক। না করিলে আমি অপমানিত ও অপদস্থ হইব, এই বিবেচনায় যাহা উচিত হয় তাহা করিবেন। অত্যন্ত অসুবিধায় না পড়িলে আমি কদাচ শ্রীমতীকে ও আপনাকে এরূপে বিরক্ত করিতে উদ্যত হইতাম না জানিবেন। অগ্রহায়ণ মাসে আমার টাকার প্রয়োজন। এই টাকা ধার করিয়া দিলে আর পূর্ব্ববৎ বার্ষিক সাহায্য করিতে হইবেক না। শ্রীমতী

আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। ঐ সকল উপকার আমার অন্তঃকরণে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে। আমি যে তাঁহার যথার্থ গুণগ্রাহী ও আশীর্ব্বাদক অনতিবিলম্বে তাহার পরিচয় দিব।

আমি এক্ষণে কিছু ভাল আছি। আপনার নিজের ও রাজধানীর সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সংবাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে আজ্ঞা হয়। কিমধিকমিতি ২০ কার্ত্তিক ১২৭৬ সাল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পত্র লিখিয়া টাকা পাইয়াছিলেন, এবং যথাসময়ে তাহার পরিশোধও করিয়াছিলেন।

কেবল মহারাণী স্বর্ণময়ীর নিকট হইতে কেন, আরও অন্যান্য অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট হইতেও ঋণ করিতে হইয়াছিল। পাইকপাড়া-রাজ-পরিবারের কোন স্ত্রীলোকের নিকট হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়, ২৫০০ টাকা ঋণ লইয়াছিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে চকদীঘির উইল সংক্রান্ত মোকদ্দমায় বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তিনি তাহাতে এই কথা স্বীকার করিয়াছেন।

মফঃস্বলে বিধবা-বিবাহসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য ব্যয় অধিক হইত। সেই জন্য ঋণটা বেশী হইয়াছিল। হিন্দু-পেটরিয়টে বিদ্যাসাগর মহাশয়, এ কথা লিখিয়াছিলেন। কেবল অর্থব্যয় নহে; প্রকৃতই মফঃস্বলের জন্য তাঁহাকে নানাপ্রকারে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত। মফঃস্বলে বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতীদিগের তাড়না ও লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। জাহানাবাদ-মহকুমার চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্বর্ত্তী কুমারগঞ্জে বিধবা-বিবাহের পক্ষ ও বিপক্ষদের এক সময় খুব সংঘর্ষণ চলিয়াছিল। এতৎসম্বন্ধে

বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বহস্তে ইংরেজীতে এক বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই,—

"কুমারগঞ্জে বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী দলকে চড়ক পূজায় শিবের মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। এতৎসম্বন্ধে পক্ষপাতীদের পক্ষ হইতে জাহানাবাদের ডিপুটী মাজিষ্টরকে আবেদন করা হইয়াছিল। তিনি তদন্তের হুকুম দেন। তদন্ত হইয়াছিল, উৎসব সাঙ্গ হইবার পরে। জমীদার বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতীদিগকে প্রহার করিয়া জরিমানা আদায় করিয়াছিলেন। অনেকেই সপরিবারে গ্রাম ত্যাগ করে। পুলিসে সংবাদ দিলেও, পুলিস তদন্তে উদাসীন্য প্রকাশ করিতেন।"

এই ঘটনায় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্পষ্টতঃই লিখিয়াছিলেন,—

"যদি উৎপীড়ন নিবারণ না হয়, যদি অত্যাচারীরা দণ্ডিত না হয়, তাহা হইলে আমার এ পৃথিবীতে থাকিবার প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে আমার জীবন-ব্রতের উদ্‌যাপন হইবে কিসে? এ ব্রত-সাধনেই তো আমি আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি। যদি ব্রত সিদ্ধ না হইল, তাহা হইলে, জীবন বৃথা।"

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

পাচকের অপরাধ, বর্দ্ধমানে ম্যালেরিয়া ও দানে কৌতুক।

হরকালী চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় রন্ধন করিত। বর্দ্ধমানেও তাহার উপর রন্ধন করিবার ভার ছিল। একবার বর্দ্ধমানের বাসা হইতে কোন একটী স্ত্রীলোক, অনেকবার টাকা ও কাপড় লইয়া গিয়াছিল। হরকালী তাহাকে বলে,—"মাগী, তোরা কি বিদ্যাসাগরকে লেদা আম পেয়েছিস্।" বিদ্যাসাগর মহাশয়, একথা শুনিয়া, হরকালীর উপর বড়ই বিরক্ত হন। হরকালী ক্ষমা প্রার্থনা করে। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, দুই টাকা মাসহারার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, তাহাকে বিদায় দেন।

এ অতীব অবিশ্বাস্য বিবরণ, আমরা বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিলাম। বিদ্যারত্ন মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতা। তিনি এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। তবে একবার একটা দোষ করিয়া, দীন-হীন অনুগত ভৃত্য, কাতর-কণ্ঠে ক্ষমা চাহিলেও, বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষমা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন এ কথা বিশ্বাস করিতে সহজে কাহার প্রবৃত্তি হইবে বল' তবে ঘটনা যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে, বিস্ময়ের বিষ বলিতে হইবে।

কাহাকেও কোন দোষের জন্য ভর্ৎসনা করিলে, সে যদি কোপ প্রকাশ বা উত্তর-প্রত্যুত্তর করিত, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহার উপর বড়ই অসন্তুষ্ট হইতেন; এমন কি, তাহার সহিত আর বাক্যালাপও করিতেন না। কেহ যদি ভর্ৎসিত হইয়াও নীরব থাকিত বা ক্ষমা চাহিত, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় অবসরক্রমে তাহাকে সান্ত্বনা করিতেন। ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রাভ্যাস। সেই জন্য, প্রাগুক্ত ঘটনায় বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্ত হয় না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরীর ভাঙ্গিয়াছে। রোগে দেহযষ্টি ক্ষীণ-বল হইয়াছে। তবুও কিন্তু কার্য্যের বিরাম নাই। বর্দ্ধমানে আবার কঠোর কার্য্যকারিতার প্রয়োজন হইল। ১৮৬৯ সালে বর্দ্ধমানে ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বরের সংহার-মূর্ত্তি দেখা দিয়াছিল। ১৮৬৩ সালের দুর্ভিক্ষ-দৃশ্যে যাঁহার করুণ-বুক ফাটিয়া অবিশ্রান্ত শোণিতস্রোত ছুটিয়াছিল, আজ বর্দ্ধমানের ম্যালেরিয়ার কি তিনি স্থির থাকিতে পারেন? সংবাদপত্রে কোটি কণ্ঠের কাতর-ক্রন্দন উত্থিত হইল। রোগে ত্রাহি ত্রাহি; কিন্তু চিকিৎসা করিবার লোক নাই। দারুণ দুন্দুভিনাদে সংবাদপত্র সমূহে এ সাংঘাতিক সংবাদ বিঘোষিত হইতে লাগিল। সে সময় কি যে মর্ম্মান্তিক হুলস্থূল কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল, তাৎকালিক সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রেই তাহা বলিতে পারেন। সে মহামারী ব্যাপার বর্ণনাতীত। হিন্দুপেটরিয়ট-সম্পাদক, সে লোকক্ষয়কর কাণ্ডের প্রতীকার-

প্রত্যাশায়, মুহুর্মুহু চীৎকার করিয়া, গবর্ণমেণ্টের কর্ণাকর্ষণ করিতে তিলমাত্র ত্রুটি করেন নাই।

স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়, রোগীদিগের চিকিৎসার্থ "ডিস্পেন্সারি" স্থাপন করিয়াছিলেন। ঔষধ-পথ্যের যথারীতি ব্যবস্থা হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং কলিকাতায় আসিয়া ম্যালেরিয়ার সেই ভীষণ সর্ব্বনাশকারিতার সংবাদ তাৎকালিক ছোট লাট গ্রে সাহেবের কর্ণগোচর করেন। গ্রে সাহেব বাহাদুরও, সবিশেষ তথ্য নির্দ্ধারাণার্থ প্রবৃত্ত হয়েন। তথ্য-নির্ণয়ে অবশ্য কালবিলম্ব হইল না। সাহায্যের আবশ্যকতা বিবেচনায়, স্থানে স্থানে "ডিস্পেন্সারি খোলা হইল। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে পীড়িত ব্যক্তিগণ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "ডিস্পেন্সারি" হইতে ঔষধ, পথ্য ও পয়সা পাইত। তিনি প্রায় দুই সহস্র টাকার বস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, নামের প্রত্যাশায় এ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন নাই। কিন্তু তৎকালে হিন্দুপেটরিয়টপ্রমুখ সংবাদপত্রে তাঁহার নামে একটা আকাশ-ভেদী জয়-জয়কারধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল।*

এই সময় প্যারিচাঁদ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ মিত্র মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনেক সাহায্য করিতেন। তাঁহার উপর "ডিস্পেন্সারি"র সম্পূর্ণ ভার ছিল। কুইনাইন বড় মূল্যবান্, অথচ রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছিল।

---

* Hindu Patriot 1869.

এই জন্য গঙ্গানারায়ণ বাবু, পরামর্শ দেন যে, কুইনাইনের পরিবর্ত্তে "সিঙ্কোনা" ব্যবহার করা হউক। বিদ্যাসাগর মহাশয়, বলেন,—"গরীবের রোগ বলিয়া, প্রকৃত ঔষধ ব্যবহার করিবে না; এও কি কখন হয়? দুঃখী-ধনী সবারই প্রাণ তো একই; পরন্তু রোগও এক।" গঙ্গানারায়ণ বাবু, বিদ্যাসাগরের মহত্ত্বে ডুবিয়া গেলেন। যে সব রোগী ঔষধ লইবার জন্য "ডিস্পেন্সারি"তে আসিতে পারিত না, বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাহাদের বাড়ীতে গিয়া, স্বয়ং ঔষধ-পথ্য দিয়া আসিতেন।

প্যারিচরণ বাবু, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাণের প্রিয়তম সুহৃদ্। মৃত্যুর পর, তাঁহার পরিবারবর্গ বিদ্যাসাগরের সেই সাদর স্নেহে বঞ্চিত হন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট তাঁহারা চির-কৃতজ্ঞ। প্যারি বাবুর জেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ মিত্র এখন মুনসেফ এবং কনিষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মিত্র জজ আদালতের সেরেস্তাদার। বঙ্গবাসী কলেজের শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু তাঁহার জামাতা। গিরিশ বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন। এখনও উভয় সংসারে পূর্ব্ববৎ সদ্ভাব বিদ্যমান আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্রায়ই গিরিশ বাবুর নিকট আপন জীবনের গল্প করিতেন।

বর্দ্ধমানে ম্যালিরিয়ার প্রাবল্য এবং প্যারিচাঁদ বাবুর সহিত সৌহার্দ্দ জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনেক সময় বর্দ্ধমানে যাইতে হইত। বর্দ্ধমানের দুঃস্থ দারিদ্রমাত্রেই

বিদ্যাসাগরকে দয়ার সাগর ও দাতা বলিয়া চিনিত। তিনি ট্রেন হইতে ষ্টেশনে নামিলেই তাহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঘেরিয়া দাঁড়াইত। একবার একটী অতি দীন-হীন মলিন বালক তাঁহার নিকট একটী পয়সা ভিক্ষা চাহে। তাহার কঙ্কালসার জীর্ণশীর্ণ দেহ ও ধূলি-ধূসরিত মলিন মুখখানি দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়, অত্যন্ত দয়ার্দ্র হইয়াছিলেন। তাহার দারিদ্র্য-মালিন্য-ক্লিষ্ট মুখে কি যেন একটু জ্যোতিঃপ্রভা মিশ্রিত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, সেই জন্যই একটু কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, তাহার সহিত একটু ঘনিষ্ঠভাবে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। তিনি বলেন,—"আমি যদি চারিটী পয়সা দিই।" বালক ভাবিল,—"চাহিলাম একটী, ইনি দিতে চাহেন চারিটী; এ কেমন, বুঝি ঠাট্টা করিতেছেন।" তখন সে বলিল, "মহাশয় ঠাট্টা করেন কেন। দিন একটী পয়সা।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"ঠাট্টা নহে, যদি চারিটী পয়সা দিই, তাহা হইলে কি করিস্।" বালক বলিল,—"তা হ'লে দুটী পয়সা খাবার কিনি, আর দুইটী পয়সা মাকে গিয়া দিই।" বিদ্যাসাগর বলিলেন,—"যদি দুই আনা দিই।" এবারও বালক ঠাট্টা মনে করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবার তাহার হাত ধরিয়া বলেন,—"বল্ না, সত্যি সত্যি তাহা হ'লে তুই কি করিস্।" তখন বালক চক্ষের দুফোটা জল ফেলিয়া বলিল,—"চার পয়সা চা'ল কিনে নিয়ে যাই। আর চার পয়সা মাকে দিই। তাতে আমাদের আর এক দিন চ'লবে।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় আবার বলিলেন,—"যদি চারি আনা দিই।" বালক তখনও বিদ্যাসাগরের মুষ্টিগত; উত্তর দেওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। সে বলিল,—"তা হ'লে, দু' আনা দু'দিন খাওয়া চ'লবে, আর দুই আনার আম কিনি। আম কিনে বেচি। দু আনা আমে চার আনা হ'বে। তাহা হ'লে আবার দু'দিন চলবে। আবার দু'আনা আম কিনবো। এমন ক'রে য দিন চলে।" বিদ্যাসাগর মহাশয়, তখন তাহাকে একটী টাকা দিলেন। বালক টাকা পাইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে চলিয়া যায়। বৎসর দুই পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়, একবার বর্দ্ধমান গিয়াছিলেন। তিনি ষ্টেশনে নামিয়া প্রায়ই একটী পরিচিত দোকানদারের দোকানে বসিতেন। এবার তিনি যেমন সেই পরিচিত দোকানদারের দোকানে প্রবেশ করিতে যাইবেন, অমনই একটী হৃষ্টপুষ্ট বালক আসিয়া বলিল,—"মহাশয়! এক বার আসুন, আমার দোকানে বস্‌তে হ'বে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"তুমি কে, আমি তো তোমায় চিনি না। তোমার দোকান কেন যাইব।" বালক তখন বাষ্পাকুলিত-লোচনে বলিল,—"আপনার স্মরণ নাই। আজ দু'বৎসর হলো, আমি আপনার কাছে একটী পয়সা চেয়েছিলুম। আপনি আমাকে একটা টাকা দিয়েছিলেন। সেই এক টাকায় দু'আনার চা'ল কিনি, আর বাকি চৌদ্দ আনায় আম কিনে বেচি। তাতে আমার বেশ লাভ হয়। তার পর আবার আম কিনে বেচি। ক্রমে লাভ বাড়তে থাকে। এটা সেটা বেচে

বেশ পুঁজি হয়। এখন এই মণিহারী দোকানখানি করেছি।” বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তখন পূর্ব্ব-কথাটী স্মরণ হইল। তিনি বালককে আশীর্ব্বাদ করিয়া, তাহার সন্তোষ জন্য তাহার দোকানে যাইয়া বসিয়াছিলেন। *

* এই গল্পটী ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বসু মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম।

ত্রিংশ অধ্যায়।

ভ্রান্তিবিলাস, রামের রাজ্যাভিষেক ও ভাষা-চর্চ্চা।

রোগ-কোলাহল-সঙ্কুল কার্য্যময় বর্দ্ধমানে বসিয়াও বিদ্যা-সাগর মহাশয়, সেক্সপিয়রের "কমিডি অব্ এরারস্" অবলম্বন করিয়া, ভ্রান্তিবিলাস নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ভ্রান্তিবিলাসের ভাষা লালিত্যময়ী ও রহস্যোদ্দীপিকা। ভাষান্তর-রচিত ও ইংরেজী ভাষায় অনুবাদিত পুরাতন পুস্তকের ছায়াবলম্বন করিয়া, সেক্সপিয়র, "কমিডি অব্ এরারস্" রচনা করেন।* বলা বাহুল্য, এ রচনায় ইংরেজী ভাষার বলপুষ্টি হইয়াছে। "কমিডি অব্ এরারস্" উৎকৃষ্ট নাটক মধ্যে পরিগণিত না হইলেও, সুন্দর রহস্যোদ্দীপক প্রহসন-প্রকারে পরিগণিত হইতে পারে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কি অদ্ভুত অনুবাদ-শক্তি ছিল, বিদেশী ভাব ও ভাষাকে তিনি কেমন বঙ্গীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া সম্পূর্ণ নিজস্ব করিতে পারিতেন, ভ্রান্তিবিলাস তাহার

---

* Comedy of Errors (Comedy) The Menaechmi and Amphitruo of Plautus; (? an old play the Historie of Error, 1576-77. Shaw's 'Student's English Literature', P. 150.

উৎকৃষ্ট উদাহরণ। "কমিডি অব্ এরারসের" গল্পাংশ কিছু জটিল। এ জটিলতা সত্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়, উপাখ্যান ভাগের এমন সুন্দর সন্নিবেশ করিয়াছেন যে, মূল-কৌতুকাবহত্বের কিছুমাত্র খর্ব্বতা ঘটে নাই। ফলতঃ ভ্রান্তিবিলাস একখানি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা উপন্যাস হইয়াছে। নাটককে উপন্যাসাকারে পরিণত করা কত দুরূহ ব্রত, তাহা ল্যাম্বলিখিত গল্পের পাঠকের অবিদিত নাই। কিন্তু এ দুরূহ ব্রত বিদ্যাসাগর সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়াছেন। যে লিপিকৌশল ভবভূতির মর্ম্মস্পর্শী উত্তর-চরিত নাটককে সীতার বনবাসে আকারিত করিয়াছে, তাহার সফলতা আমরা ভ্রান্তিবিলাসে দেখিতে পাই। বিদ্যাসাগর যদি ভ্রান্তিবিলাসের আদর্শে সেক্সপিয়রের অন্যান্য নাটক বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল।

ভ্রান্তিবিলাসের বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর মহাশয়, এই কথা লিখিয়াছেন,—"তিনি (সেক্সপিয়র) এই প্রহসনে হাস্যরস উদ্দীপনের নিরতিশয় কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঠকালে হাস্য করিতে করিতে বাক্‌রোধ উপস্থিত হয়। ভ্রান্তিবিলাসে সেই অপ্রতিম কৌশল নাই।" বিদ্যাসাগর সত্যদর্শী লোক; আপনার গুণ পক্ষপাতের চক্ষে দেখিতেন না। বাস্তবিক "কমিডির" হাস্যরস অনুবাদ রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। ভ্রান্তিবিলাসেও সম্পূর্ণ রক্ষিত হয় নাই।

আহিরীটোলানিবাসী সব জজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি,—"বিদ্যাসাগর মহাশয় পনর দিনে ভ্রান্তিবিলাস লিখিয়াছেন। প্রত্যহ আহার করিতে যাইবার পূর্ব্বে তিনি প্রায় পনর মিনিট কাল করিয়া লিখিতেন।" বিদ্যাসাগর মহাশয়, যদি নীরস অঙ্কবিদ্যার চর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া, আনন্দকৃষ্ণ বাবুর নিকট সেক্সপিয়র না পড়িতেন, তাহা হইলে কি সেক্সপিয়রের এমন অনুবাদ প্রকাশিত হইত? মেকলেও যদি নীরস অঙ্কবিদ্যার অনুশীলনে শ্লথ-প্রযত্ন হইয়া, সাহিত্য-বিদ্যায় অধিকতর মনোযোগী না হইতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, কতকগুলি সুচারু ইংরেজী সাহিত্য পুস্তকে বঞ্চিত হইতাম।* ভগবানই প্রকৃতিসম্মত পথ খুলিয়া দেন।

ভ্রান্তিবিলাস বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত বাঙ্গালা স্কুল-পাঠ্যের শেষ পুস্তক। তিনি স্কুল-পাঠ্য যতগুলি পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাঁহার জীবদ্দশায়, তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, দুই খানি অতি উপাদেয় পাঠ্য লিখিত হইয়াও প্রকাশিত হয় নাই। একখানি বাসুদেব-চরিত; অপর খানি রামের রাজ্যাভিষেক। বাসুদেব-চরিত সম্বন্ধে বক্তব্য ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। রামের রাজ্যাভিষেকের ছয় ফর্ম্মা মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে রামের রাজ্যাভিষেক লিখিত হইয়া মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সময় শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রামের

* Minto's English Prose Lateraturе P. 78.

রাজ্যাভিষেক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। শশি বাবু বলেন,—"মৎপ্রণীত রাজ্যাভিষেক মুদ্রিত হইলে পর, যে প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়, এক দিন স্বয়ং সেই প্রেস হইতে একখানি মৎপ্রণীত রাজ্যাভিষেক ক্রয় করিয়া লইয়া যান। আমি সেই সময় প্রেসে উপস্থিত ছিলাম না। প্রেসে আসিয়া, এ কথা শুনিবামাত্র একখানি পুস্তক লইয়া, তাড়াতাড়ি তাঁহার ডিপজিটরীতে যাই। সেইখানেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাকে নমস্কার করিয়া, আমি আমার পুস্তকখানি তাঁহার হস্তে অর্পণ করি। তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"আমি যে একখানি কিনে এনেছি। ভাল, তোর খানিও নিলুম। বই বেশ হয়েছে।"

শশী বাবুর রাজ্যাভিষেক প্রকাশিত হইতে দেখিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্বলিখিত রাজ্যাভিষেকের মুদ্রাঙ্কণ বন্ধ করিয়া দেন। নারায়ণ বাবু, গত বৎসর ভাদ্র মাসে মুদ্রিত ছয় ফর্ম্মা দেখিতে দিয়াছিলেন। পুস্তকের ভাষা অধিকতর সংযত ও মার্জ্জিত। এইখানে ভাষার একটু নমুনা দিলাম,—

আমি দীর্ঘ কাল অকণ্টকে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিলাম। লোকে, যে সমস্ত সুখসম্ভোগের অভিলাষ করে, আমি তদ্বিষয়ে পূর্ণাভিলাষ হইয়াছি। এইরূপে সর্ব্বসুখসম্পন্ন হইয়াও, এক বিষয়ে বিষম অসুখী ছিলাম; ভাবিয়াছিলাম, সংসারাশ্রম সংক্রান্ত সকল সুখের সারভূত পুত্রমুখ-সন্দর্শন-সুখে বঞ্চিত থাকিতে হইল। সৌভাগ্যক্রমে, চরম বয়সে, সেই সর্ব্বজন-প্রার্থনীয় অনির্ব্বচনীয় সুখের অধিকারী হইয়াছি। পুত্র অনেকের জন্মে, কিন্তু কোনও ব্যক্তিই আমার সমান সৌভাগ্যশালী নহেন। কেহ কখনও



রায় বঙ্কিমচন্দ্র বাহাদুর

রামসম সর্ব্বগুণাস্পদ পুত্র লাভ করিতে পারেন নাই। ফলতঃ, কোন বিষয়েই আমার আর প্রার্থয়িতব্য নাই; কেবল রামকে সিংহাসনে সন্নিবেশিত দেখিলেই, সকল সুখের একশেষ হয়। গুণ, বয়স, লোকানুরাগ বিবেচনা করিলে, রাম আমার সর্ব্বতোভাবে সিংহাসনের যোগ্য হইয়াছে; তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, স্বয়ং রাজকার্য্য হইতে অবসৃত হই। শরীর ক্ষণভঙ্গুর; বিশেষতঃ, আমার চরম দশা উপস্থিত; কখন্ কি ঘটে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই; অতএব এবিষয়ে কালবিলম্ব করা বিধেয় নহে। যদি এক দিনের জন্য রামকে সিংহাসনারূঢ় দেখিয়া, এই জরাজীর্ণ শীর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার জীবনযাত্রা সফল হয়।

মনে মনে এই সমস্ত আলোচনা করিয়া, রাজা দশরথ অমাত্যগণের নিকট অতি সংগোপনে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। ৪০ পৃষ্ঠা।

কি মনোমোহিনী ভাষা! কি সতেজ-স্রোতময়ী লিপি-ভঙ্গী! কি অব্যাহত-গতি ভাব-ব্যক্তি! আজই যেন ভাষার স্রোত ভিন্নমুখীন্; কিন্তু এক দিন বঙ্গে বিদ্যাসাগরের ভাষাই আদর্শ হইয়াছিল। পুস্তক লিখিতে হইলে, এই ভাষারই অনুকরণ হইত। টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারিচাঁদ মিত্র) মহাশয়, সরল গ্রাম্য ভাষায় পুস্তক লিখিয়া, ভাষার স্রোত ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু লিখিত ভাষায়, তাঁহার প্রচলিত সে সরল গ্রাম্যশব্দপূর্ণ ভাষা স্থায়ী হইল না। বঙ্গের প্রতিভাশালী লেখক বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষার নূতন মূর্ত্তির প্রকটন করেন। সে মূর্ত্তি বিদ্যাসাগর ও টেকচাঁদের ভাষার সংমিশ্রণে সংগঠিত। চুণ ও হলুদ স্বতন্ত্র পদার্থ। কিন্তু উভয়ে মিশিয়া এক নূতন পদার্থ হইয়া

দাঁড়ায়। বিদ্যাসাগর ও টেকচাঁদ ঠাকুরের ভাষা মিশাইয়া, বঙ্কিম বাবু যে নবীন ভাষার গঠনরাগ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা এক নূতন পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাই এক্ষণে অধিকাংশ স্থলে অনুসৃত। বঙ্কিম বাবুর ছাঁচে ঢালিয়া, অথচ একটু নূতন করিয়া, ভাষা-সৃষ্টির প্রয়াস, কোথাও কোথাও হইতেছে। ঠাকুর বাড়ীর ভাষা, তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

নারায়ণ বাবু বলেন, বাঙ্গালা ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সে পত্র পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে কোন মীমাংসা হয় নাই। বঙ্কিম বাবু স্বয়ং ভাষার স্বতন্ত্র পথের নির্দ্দেশ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবিতাবস্থায় বঙ্কিম বাবু, অনেক সময় বঙ্গদর্শনের লেখায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি প্রকারান্তরে কঠোর কটাক্ষবিক্ষেপ করিতেন। উত্তর চরিতের সমালোচনায় তাহার আভাস পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজস্ব-হীনতার উল্লেখ করিয়া, বঙ্গদর্শনে প্রকারান্তরে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কটাক্ষও হইত। বঙ্গ-দর্শনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকগুলি আরুণি, সিকির সহিত তুলিত হইয়া, তাঁহার নিজস্বহীনতার প্রমাণ স্বরূপ হইয়াছিল।*

---

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লোকান্তর হইবার পর, বঙ্কিম বাবু একখানি সমবেদনাসূচক পত্র লিখিয়াছিলেন। সে পত্রও পাওয়া যায় নাই। অতঃপর বঙ্গদর্শন হইতে প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া বঙ্কিম বাবু যে

যেখানে যেরূপ হউক, যে ভাবে যে প্রকারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার আলোচনা হউক, ভাষা সম্বন্ধে কীর্ত্তিমান্ গ্রন্থকারগণকে বিদ্যাসাগরের নিকট অল্পবিস্তর পরিমাণে ঋণী থাকিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষা কোন্ মূর্ত্তিতে দাঁড়াইবে, তাহার এখনও স্থির-নিশ্চয়তা নাই। বাঙ্গালা ভাষা, যে মূর্ত্তিতে দাঁড়াক্ না কেন, মূর্ত্তি দেখিয়া, সর্ব্বাগ্রে বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করিয়া, অবনতমস্তকে সহস্রবার অভিবাদন করিতে হইবে। সে মূর্ত্তিতে বিদ্যাসাগরেরই ভাষার সৌন্দর্য্য-বিলাসের ছায়ালোক মিশিয়া থাকিবেই থাকিবে।

বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত হইতে অনুসৃত। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষায় লিঙ্গাদিপ্রয়োগ সংস্কৃতানুসারে হইয়া থাকে। আজ কাল অনেক স্থলে তাহার ব্যত্যয় হইতেছে। বঙ্কিম বাবু সংস্কৃতানুসারে লিঙ্গাদিপ্রয়োগে দৃষ্টি রাখিতেন; অনেক স্থলে তাহার ব্যত্যয়ও করিতেন। এরূপ ব্যত্যয় এখন প্রায়ই হয়। ব্যত্যয় হয় নাই, ঢাকার বান্ধব-সম্পাদক মনস্বী চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের লেখায়। বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতানুসৃত; অতএব তাহার লিঙ্গাদিপ্রয়োগে সংস্কৃতানুসারে চলা কর্ত্তব্য বলিয়া, এখনও অনেকের ধারণা। সে সম্বন্ধে ব্যত্যয় হইলে, ভাষা অশুদ্ধ হয়। সেরূপ বিশুদ্ধি-রক্ষা সম্বন্ধে আজ কাল কালীপ্রসন্ন বাবু অতুলনীয়। কিন্তু এখনকার উদীয়-

---

পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়সংক্রান্ত বক্রোক্তি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

মান অনেক নব্য লেখক এবং সাহিত্য-সেবী সম্প্রদায় বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের সর্ব্ববিধ বাঁধন রাখিতে সম্মত নহেন। ফলে, ইংরেজী ভাষার ন্যায়, এখন বাঙ্গালাভাষাও পরিবর্ত্তনমুখী। পরিবর্ত্তন যেরূপই হউক, বিদ্যাসাগর চিরকালই বাঙ্গালী-মাত্রেরই বরণীয় হইয়া রহিবেন। ভাষায় সৌন্দর্য্য-বিন্যাসে, রাগ-অনুরাগে, যতই কেন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হউক, বিদ্যা-সাগরের ঠাট রাখিতেই হইবে।

একত্রিংশ অধ্যায়।

গৃহ-দাহ, ছাপাখানা-বিক্রয়, মেঘদূত, দেশ-ত্যাগ, সত্য-রক্ষা, ডাক্তার দুর্গাচরণ, বিষয় রক্ষা, ডাক্তার সরকার, মহারাজ মহাতাপচাঁদ, সভায় সাহায্য ও পুত্রের বিবাহ।

১২৭৫ সালের চৈত্র বা ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবাস-বাটীতে আগুন লাগিয়াছিল। বাড়ী পুড়িয়া ভস্মাবশেষ হইয়া গিয়াছিল। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যম ভ্রাতা ও জননী নিদ্রিত ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারা সকলেই রক্ষা পান। বাড়ীর বিগ্রহটী পর্য্যন্ত দগ্ধ-বিদীর্ণ হইয়াছিল। * জিনিস-পত্র কিছু রক্ষা পায় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়, এই সংবাদ পাইয়া বাড়ীতে গিয়াছিলেন।

১২৭৬ সালের ২৬শে শ্রাবণ বা ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট বিদ্যাসাগর মহাশয়, পরম বন্ধু রাজকৃষ্ণ বাবুকে সংস্কৃত প্রেসের এক তৃতীয়াংশ চারি সহস্র টাকায় এবং শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষকে এক তৃতীয়াংশ চারি সহস্র টাকায় বিক্রয় করেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখেই শুনিয়াছি, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পাওনা

---

* কাহারও কাহারও মুখে শুনি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা সর্ব্বাগ্রে বিগ্রহটী মস্তকে লইয়া, বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়েন। বিগ্রহ অক্ষত দেহে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে, বিদ্যাসাগর মহাশয়, ছাপা-খানার অংশ বিক্রয় করিয়া, তাঁহার দেনা পরিশোধ করেন।

দেনার দায়েই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাধের ছাপাখানা বিক্রীত হইল। এই ছাপাখানার কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ তিনি যে কি পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং কি উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, পাঠক, তাহা অবগত আছেন কি? ইংরেজী বর্ণাক্ষরের ৭০। ৭২টী ঘর; বাঙ্গালার প্রায় ৫০০ ঘর। 'র' ফলা, 'ল্ল' ফলা, 'য' ফলা, এমন কত আছে। এই সব অক্ষর-যোজনা সামান্য কষ্টকর নহে। কোথায় কোন অক্ষরটী থাকিলে অক্ষরযোজকের যোজনা পক্ষে সুবিধা হইবে, বিদ্যাসাগর মহাশয়, বহু পরিশ্রম করিয়া, তাহা নির্দ্ধারিত করেন। ইহার পূর্ব্বে অক্ষরযোজনার এমন সুবিধা ছিল না। তিনি অক্ষর-সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অনেক স্থলেই তাহা অনুকৃত হইয়া থাকে। তাহার নাম বিদ্যাসাগর "সার্ট"।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় মল্লিনাথের টীকা সহ মেঘদূত মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন।

এইবার বড় হৃদয়বিদারক কথা। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়, জন্মের মতন বীরসিংহ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। নিম্নলিখিত ঘটনাটী, তাঁহার দেশ-পরিত্যাগের অন্য-তম কারণ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগত প্রতিবেশী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ সিংহের পুত্র, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদনাথ সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে ঘটনাটী আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছি;—

ক্ষীরপাইনিবাসী মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় নামক কেঁচকাপুর-স্কুলের হেডপণ্ডিত, কাশীগঞ্জবাসিনী মনোমোহিনী নাম্নী এক ব্রাহ্মণ-বিধবাকে বিবাহ করিতে উদ্যোগ করেন। পাত্র-পাত্রী উভয়কেই বীরসিংহ গ্রামে আনয়ন করা হইয়াছিল। সেই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়, বীরসিংহ গ্রামে উপস্থিত ছিলেন। মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরপাই গ্রামের হালদার-পরিবারের ভিক্ষাপুত্র। হালদার বাবুরা আসিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন,—"মহাশয় যাহাতে এ বিবাহ না হয়, আপনাকে তাহাই করিতে হইবে।" বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহাদের কাতরতা দেখিয়া, তাঁহাদিগকে অভয় দিলেন এবং বলিলেন,—"এ বিবাহ হইবে না, আপনারা উহাদিগকে লইয়া যাউন।" তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও গ্রামের অন্যান্য কয়েক জন, রজনীযোগে তাঁহাদের বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়া, বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া, তামাক খাইতে খাইতে, অকস্মাৎ শঙ্খধ্বনি শুনিতে পাইলেন; কিন্তু ইহার কিছু ভাব গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সেই সময় গোপীনাথ সিংহ, তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শাঁক বাজিতেছে কেন?" সিংহ মহাশয় বলিলেন,—"আপনি জানেন না? মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়া গেল।" শুনিয়া ক্রোধে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

বদনমণ্ডল রক্তিমা বর্ণ ধারণ করিল। তিনি আর কোন কথা না কহিয়া, কেবল তামাক টানিতে টানিতে মুহুর্ম্মুহু ধূমত্যাগ করিতে লাগিলেন। রাগ হইলে, তিনি প্রায়ই এইরূপ করিতেন। রাগ হইলে, তিনি অনেক সময় চুপ করিয়া থাকিতেন; বড় একটা কথা-বর্ত্তা কহিতেন না। যদি কোন স্নেহাস্পদ বয়ঃ-কনিষ্ঠকে "ইনি" 'উনি" "বাবু" প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইত, তাঁহার অন্তরে দাবানল প্রধূমিত। যাহাই হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয়, সিংহ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুই ইহার কিছুই জানিস্ না?" সিংহ মহাশয় উত্তর দিলেন,—"আপনার দিব্য করিয়া বলিতেছি, আমি ইহার কিছুই জানি না।" তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"আমি ভদ্র লোকদিগকে কথা দিয়া, সত্য রক্ষা করিতে পারিলাম না; অতএব বীরসিংহ পরিত্যাগ করিলাম, আর আসিব না।" বিধবা-বিবাহের সৃষ্টিকর্ত্তা সত্যপ্রিয় বিদ্যাসাগর, সত্য-ভঙ্গ হইল বলিয়া, জন্মের মত প্রিয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলেন। আর তিনি বীরসিংহ গ্রামে গমন করেন নাই; কিন্তু যাহার যেরূপ বৃত্তি বা মাসহারার বন্দোবস্ত ছিল, তাহা বন্ধ হয় নাই।

বীরসিংহ গ্রাম পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহারই অন্নে প্রতিপালিত কোন অতি-অন্তরঙ্গ আত্মীয়, এক স্থানে দাঁড়াইয়া, তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"জানেন, এখনই তার ধোপা নাপিত বন্ধ করে দিতে পারি; তাকে এখানে চেনে কে?"

১২৭৬ সালের ভাদ্র মাসে বা ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে, বিদ্যাসাগর মহাশয়, কৃষ্ণনগরের ৺ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে "ডিপজিটরী" প্রদান করেন। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়, ডিপজিটরীর কর্ম্মচারীদের ব্যবহারে বড় বিরক্ত হইয়াছিলেন। এক দিন তিনি রাজকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে বসিয়া, বিরক্ত ভাবে বলিয়াছিলেন,—"কেহ যদি ডিপজিটরী লয়, তাহা হইলে আমি বাঁচি।" সেই সময় ব্রজ বাবু উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন,—"আপনি রাগ করিতেছেন; না—সত্য সত্য আপনার মনের কথাই ইহা।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"সত্যই আমার মনের কথা।" ব্রজ বাবু বলিলেন,—"তবে আমাকে দিন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"লও।"

আমরা এই কথা রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি। বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—"আপনি এক্ষণে ডিপজিটরীর কার্য্য রীতিমত চালাইয়া, ইহার উপস্বত্ব ভোগ করুন, পরে যেরূপ হয়, করা যাইবে।" রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, ইহার পর দুই এক জন লোক ৫।৬ হাজার টাকা দিয়া, ডিপজিটরীর স্বত্ব ক্রয় করিতে চাহেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি বলেন,—"যাহা এক জনকে এক বার দিয়াছি, কোটি মুদ্রা পাইলেও, তাহা ফিরাইয়া লইব না।"

১২৭৬ সালের ১০ই ফাল্গুন বা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি রবিবার বেলা ৩টার সময়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মানবলীলা সম্বরণ করেন।

যে অকৃত্রিম প্রিয় বন্ধুর নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয়, ইংরেজী বিদ্যায় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন; এবং যাঁহারা অলৌকিক উদারতাগুণে এবং চিকিৎসা-সাহায্যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়, শত শত অর্ত্তপীড়িতের প্রাণ-দান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই অভিন্ন-হৃদয় বন্ধুর বিয়োগে তিনি যে মর্ম্মান্তিক তাপ পাইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্যে দুর্গাচরণ বাবু প্রাণ উৎসর্গ করিতেন; আবার দুর্গাচরণ বাবুর কার্য্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিতেন। ১৮৬৯ সালে দুর্গাচরণ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনাথ বিলাতে সিবিলিয়ান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; কিন্তু তাঁহার বয়স লইয়া গোল হইয়াছিল। দুর্গাচরণ বাবু সে সংবাদ পাইয়া, এ দায়ে উদ্ধার পাইবার জন্য, আকুল প্রাণে বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, পরম বন্ধু ৺দ্বারকানাথ মিত্রের সহিত নানা পরামর্শ করিয়া, দুর্গাচরণ বাবুর দায় উদ্ধারার্থ বহুবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ মিত্র ও বিদ্যাসাগর মহাশয়, সুরেন্দ্র বাবুর কোষ্ঠী সংগ্রহ করিয়া, তাঁহার সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষোপযোগী বয়স নির্দ্ধারণপূর্ব্বক, নানা তর্কযুক্তি সহকারে বিলাতে পত্রাদি লিখিয়াছিলেন। ইহাতেই বয়সবিভ্রাট মিটিয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া গণ্য হন। দুর্গাচরণ বাবুর মৃত্যুর কিয়ৎক্ষণ পরে, সে সংবাদ কলিকাতায় আসিয়াছিল। লোকান্তরিত বন্ধু দুর্গাচরণের স্মৃতিমাত্রেই বিদ্যাসাগর মহাশয়, চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেন। যখন সুরেন্দ্রনাথ, নিজ কর্ম্ম-

কলে 'সিবিল সার্ব্বিস” হইতে পদচ্যুত হন, তখন তিনি অনন্যোপায়ে, বাক্-বজ্র-সাহায্যে দেশহিতৈষী হইয়া পড়িয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার অন্ন-সংস্থানে সে বাকপটুতা খুব অল্প সাহায্য করিয়াছিল। একমুষ্টি উদরান্নের জন্য তাঁহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হইতে হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহাকে নিজের কলেজে অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করেন।

দুর্গাচরণ বাবুর পরিবারবর্গ নানা কারণে বিদ্যাসাগরের নিকট ঋণী। তাঁহার বিষয়সম্পত্তি লইয়া, তাঁহার পত্নী ও তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, মধ্যস্থ হইয়া, মোকদ্দমা মিটাইয়া দেন। এ মোকদ্দমার মীমাংসাসংক্রান্ত পত্রাদি আজিও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে আছে। বিবাদ-মীমাংসা পক্ষে তিনি কিরূপ সূক্ষ্ম-বুদ্ধি ধারণ করিতেন, এই সব কাগজপত্রে তাঁহার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। শুদ্ধ ৺দুর্গাচরণ বাবুর বিষয়ের গোলযোগে কেন, অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি, বিষয়ের কোন গোলযোগ হইলেই, তাঁহাকে মীমাংসা করিবার জন্য সাদর-আহ্বান করিতেন। তিনি বিনা পারিশ্রমিকে বহু পরিশ্রমে কার্য্য করিয়া অনেকেরই বিষয়ের গোলযোগ মিটাইয়া দেন। কলিকাতার বিখ্যাত ধনাঢ্য ৺আশুতোষ দেব (ছাতু বাবু) মহাশয়ের মৃত্যুর পর, বিষয়-সম্পত্তির গোলযোগ হওয়ায়, তাঁহাকে ম্যানেজারপদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তিনি বিনা পারিশ্রমিকে, বিষয়ের গোলযোগ মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু আশু বাবুর আত্মীয় ও

কর্ম্মচারিবর্গের নানা বিষয়ে মতানৈক্য দেখিয়া, এ কার্য্যভার পরিত্যাগ করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তিনটী চিকিৎসক-বন্ধু সর্ব্বকার্য্যে সহায় ছিলেন। ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলমাধব মুখোপাধ্যায় এবং মহেন্দ্রলাল সরকার। দুর্গাচরণের কিছুকাল পূর্ব্বে নীলমাধব লোকান্তরিত হন। মহেন্দ্রলাল আজ চিকিৎসা-রাজ্যের উচ্চ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। এই মহেন্দ্রলালের সঙ্গে কিন্তু বৎসর কতক পরে দারুণ মনান্তর সংঘটিত হয়। শুনিতে পাই, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কনিষ্ঠ কন্যার সঙ্কটাপন্ন পীড়াসূত্রে এই মনান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। মহেন্দ্র বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়-প্রেরিত আহ্বান পত্র না পড়িয়া, রাখিয়া দিয়াছিলেন; পরে সেই পত্র পড়িয়া, চিকিৎসার্থ আগমন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহার বিলম্বে আগমনের হেতু অবগত হইয়া, ক্ষুন্ন ও ক্রুদ্ধ হন। ইহাতেই মনান্তরের সূত্রপাত। ক্রমে মনান্তর এত দূর ঘনীভূত হইয়াছিল যে, কোন স্থানে দুই জনের সাক্ষাৎ হইলে, চারি চক্ষু একত্র হইত না। সেই চারিটী বিশাল চক্ষের পুনঃ-সম্মিলন হইয়াছিলমাত্র, বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পূর্ব্বে,—রুগ্ন-শয্যায়! মহেন্দ্রলাল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিতে গিয়াছিলেন। মৃত্যু-শয্যায় মনের মালিন্য-ভেদ ও মিত্র-মিলন মহা-নাটকেরই বিষয়ীভূত। মৈত্রী-বিচ্ছেদে বিদ্যাসাগর মহাশয়, কখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, বিগত মৈত্রীর পুনরুদ্ধারার্থ অগ্রসর হইতেন না। মৈত্রী-উদ্ধারের এরূপ অনাকাঙ্ক্ষা,

মানব-চরিত্রের মহত্ত্ব-পরিচায়ক নহে নিশ্চিতই; কিন্তু কৃতাত্ম-নির্ভর ও তেজস্বী পুরুষে প্রায়ই এইরূপ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

১২৭৭ সালে বা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্যতম সুহৃদ্ ও সহায়, বৰ্দ্ধমানের মহারাজা মহাতাপচাঁদ বাহাদুরের মৃত্যু হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, ১৮৭০ সালে, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সভায় সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন। দীন-দরিদ্রে দান; যাচিতে-অযাচিতে দান; সভা-সমিতিতে দান; আত্ম-পরে দান; বিদ্যাচর্চ্চায় দান; বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠায় দান;—দানময় জীবনের অবারিত দান। বিদ্যোৎসাহে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচুর দানের কথা তুলিয়া, তাৎকালিক দক্ষিণ-পশ্চিম বিভাগের স্কুল-ইন্স্পেক্টর মার্টিণ সাহেব, বিস্ময়-বিমোহনে শত মুখে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিয়াছিলেন।

১২৭৭ সালের ২৭শে শ্রাবণ বা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার পুত্র নারায়ণ বাবু বিধবা-বিবাহ করেন। পাত্রীর নাম শ্রীমতী ভবসুন্দরী। খানাকুল কৃষ্ণনগরবাসী ৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। বয়স ত্রয়োদশ বৎসর। * নারায়ণ বাবু, বিবাহ করিবার পূর্ব্বে পিতাকে এই ভাবে বলিয়াছিলেন,—"আমার এমন গুণ নাই যে, আপনার মুখোজ্জ্বল করি; তবে

---

* বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন,—ষোল বৎসর। জন্মনিরাস, ২৭ পৃষ্ঠা।

আপনার জীবনের মহৎ ব্রত,—বাল-বিধবা-বিবাহ-প্রচলন করিয়া, বাল-বিধবার ভীষণ বৈধব্য-যন্ত্রণা দূর করা। এ অধম সন্তানের তাহা অবশ্য সাধ্যায়ত্ত। আমি তাহাতে পশ্চাৎপদ হইব না। তাহাতে আপনাকে কতকটা সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই আমার জীবন ধন্য হইবে ; আর তাহা হইলে বোধ হয়, আপনার সদভিপ্রায়ের বিপক্ষবাদীরাও সন্দিহান হইতে পারিবে না।"

কন্যার মাতা, বিধবা কন্যাটীকে লইয়া প্রথম বীরসিংহগ্রামে উপস্থিত হন। তথায় তিনি বিদ্যারত্ন মহাশয়কে কন্যার পুনর্ব্বিবাহ দিবার প্রস্তাব করেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্র লেখেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, একটী পাত্র ঠিক করিয়া, কন্যাকে কলিকাতা আনিবার জন্য, বিদ্যারত্ন মহাশয়কে পত্র লিখিয়া পাঠান। ইতিমধ্যে কিন্তু নারায়ণ বাবু, কন্যাটীর বিবাহার্থী হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, সে সংবাদ পাইলেন। বাড়ীর অন্যান্য অনেকের অমত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্পূর্ণ অভিমতি প্রকাশ করেন। তাঁহারই আদেশ-ক্রমে পাত্র ও পাত্রী কলিকাতায় আনীত হয়। মৃজাপুর-নিবাসী ডিঃ কলেক্টর ৺কালীচরণ ঘোষের বাড়ীতে পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

ভ্রাতা বিদ্যারত্ন মহাশয়, এ বিবাহে আপত্তি করিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন। বিবাহান্তে বিদ্যাসাগর মহাশয়, ভ্রাতাকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন ;—

শুভাশিষঃ সন্তু,—

২৭শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার নারায়ণ ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে। এই সম্বাদ মাতৃদেবী প্রভৃতিকে জানাইবে।

ইতিপূর্ব্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিধবাবিবাহ করিলে, আমাদের কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন; অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্যক। এবিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে আমার ইচ্ছা বা অনুরোধে করে নাই। যখন শুনিলাম, সে বিধবাবিবাহ করা স্থির করিয়াছে এবং কন্যাও উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে বিষয়ে সম্মতি না দিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করা, আমার পক্ষে কোনও মতেই উচিত কার্য্য হইত না। আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তক; আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া, কুমারী বিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না; ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া, আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেক, তাহার পথ করিয়াছে। বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম। এজন্মে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা, কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে, আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। অধিক আর কি বলিব, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করায় আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক, তাহা

করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না। অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে, সমাজের ভয়ে বা অন্য কোন কারণে নারায়ণের সহিত আহার ব্যবহার করিতে যাঁহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবেক, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন সে জন্য, নারায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেক, এরূপ বোধ হয় না এবং আমিও তজ্জন্য বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইব না। আমার বিবেচনায় এরূপ বিষয়ে সকলেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ, অস্মদীয় ইচ্ছার অনুবর্ত্তী বা অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া চলা কাহারও উচিত নহে। ইতি ৩১শে শ্রাবণ।* শুভকাঙ্ক্ষিণঃ

(স্বাঃ) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

এই বিবাহের সময়, নারায়ণ বাবুর জননী উপস্থিত ছিলেন না। এ বিবাহে তাঁহার মত নাই ভাবিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহাকে সংবাদ দিতে দেন নাই। নারায়ণ বাবু বলেন,—"ইহাতে যে মায়ের মত ছিল, বিবাহান্তে মা তাহা স্পষ্টই বলিয়াছিলেন।"

বিধবা-বিবাহে নারায়ণ বাবুর জননীর সম্পূর্ণ অমত ছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়, ইহা নিশ্চিতই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কেননা, পাছে বধূ ও বনিতার অসদ্ভাব হয়, এই জন্যই বিদ্যাসাগর মহাশয়, নারায়ণ বাবুকে স্বতন্ত্র বাসা করিয়া দেন।

---

* এই পত্র পূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই মুদ্রিত পত্র উদ্ধৃত করিয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তলিখিত পত্রাদিতে প্রায় বিরাম চিহ্ন দেখা যায় না। এ পত্রে আছে। আমাদের বোধ হয়, যাঁহারা পত্র মুদ্রিত করিয়াছেন, তাঁহারা চিহ্ন বসাইয়া দিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, তথায় প্রায়ই যাইতেন এবং আহারাদি করিতেন।

ইহার পর শ্বশ্রূ, পুত্র ও বধূ, সকলেই বহুদিন একত্র কাল-যাপন করিয়াছিলেন। নিরক্ষরা বিদ্যাসাগর-পত্নী, স্বধর্ম্মে সম্পূর্ণ প্রবৃত্তিমতী হইয়াও, পতি-পুত্রের স্নেহনিবন্ধন শেষে পুত্রের সংস্রব পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা, মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতে বড়ই নারাজ ছিলেন। এই জন্য তাঁহার সকল পুত্র-বধূরই লেখাপড়া শিখিবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় ঘটিয়াছিল।

বিদ্যাসাগর ভণ্ড নহেন। যে কার্য্য, সাধু বলিয়া তাঁহার বিবেচনা হইয়াছিল, তৎসাধনার্থ তিনি সমগ্র সমাজের চক্ষের উপর অটল বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। অধুনাতন যে সব কুলাঙ্গার, সম্পূর্ণ অনাচারী এবং ধর্ম্মবিরোধী হইয়াও, বাহিরে হিন্দু-নামে পরিচয় দেয়; এবং হিন্দুর সংসারে স্বচ্ছন্দ-বিহারে প্রয়াস পায়, তাহাদের নরকেও স্থান নাই। এই সব ভণ্ড-পাষণ্ডের দল-পুষ্টিতে আজ সমগ্র সমাজ সন্ত্রাসিত। ভয় তাহাদিগেরই জন্য। বিদ্যাসাগর বা রামমোহন, এক মুহূর্ত্তের জন্য আত্ম-গোপনে প্রয়াস পাইতেন না; বরং তাঁহাদের আত্ম পরিচয়ে বীরত্বেরই বিকাশ। লোকে তাঁহাদিগকে চিনিয়াছে; সুতরাং তাঁহাদের দোষ-গুণের বিচারে সহজে বিড়ম্বনা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ব্যক্ত শত্রু অপেক্ষা গুপ্ত শত্রুই ভয়ঙ্কর।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

কাশীতে জননী, মাতৃ-বিয়োগ, পিতৃ সেবা, কাশীর কার্য্য, হিন্দু-উইল, রাজা সতীশচন্দ্র, রাণী ভুবনেশ্বরী, উত্তর-চরিত ও অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক।

১২৭৭ সালের ভাদ্র বা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী, ৺বারাণসী ধামে গমন করেন। তিনি তথায় কিয়দ্দিন থাকিয়া, বহু তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হন। তীর্থ-পর্য্যটনান্তে তিনি পুনরায় কাশীধামে ফিরিয়া আসেন। নারায়ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, কাশীতে ফিরিয়া আসিয়া, তিনি স্বামীকে বলেন,—"আমি বাড়ী ফিরিয়া যাই; মরিবার এখনও বহু বিলম্ব আছে; এখন দেশে যাইলে, দেশের অনেক গরিব-দুঃখী খাইতে পাইবে; ঠিক মরিবার পূর্ব্বে এই খানে আসিব।" এই কথা বলিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী দেশে ফিরিয়া আসেন। এখানে তিনি দরিদ্র্য-দুঃখ-হরণ-রূপ মহাব্রতে নিযুক্ত হন। এই মহাব্রতের উদ্‌যাপন কিন্তু এই বার এইখানেই হইল। পর বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে, ৺বারাণসী ধামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতার সাংঘাতিক পীড়া হয়। এই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা, তৃতীয় ভ্রাতা এবং জননী, কাশীধামে গিয়াছিলেন। পিতা আরোগ্য লাভ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ফিরিয়া আসেন। দুই মাস কাশী-বাস করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী কিন্তু চৈত্র-সংক্রান্তিতে বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া, অসুস্থতা-নিবন্ধন কলিকাতা-কাশীপুরের গঙ্গাতীরে দেড় শত টাকায় একটী বাড়ী ভাড়া লইয়া বাস করিতেছিলেন। এই খানে তিনি জননীর মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্ত হন। মাতৃভক্ত পুরুষ, মাতৃ হারা হইলেন! যে মাতৃ-আজ্ঞার পত্র পাইয়া, মাতৃ-চরণ-দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বিদ্যাসাগর, প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়া, দুস্তর দামোদরের খর-স্রোতে সাঁতার দিয়াছিলেন, সে মা আজ নাই! মাতৃভক্তের সে মর্ম্মান্তিক বেদনা কি বর্ণনীয়! তিনি কয়েক মাস বিষয়-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, নিভৃত নিলয়ে কেবল অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেন। মাতার মৃত্যুর পর, তিনি এক বৎসর হবিষ্যান্নাহারী হইয়াছিলেন। এই এক বৎসর কাল তিনি ছত্র, শয্যাসন প্রভৃতি বিলাসদ্রব্য ব্যবহার করিতেন না। পূর্ব্বে তিনি প্রায়ই কাশী যাইতেন। মাতার মৃত্যুর পর দুই বৎসর যান নাই। মাতৃশোকে জর্জ্জরিত হইয়াও কিন্তু তিনি পিতৃ-পাদপদ্ম বিস্মৃত হন নাই। পিতার সেবার্থ, ভ্রাতা ও অন্য কোন আত্মীয়কে নিযুক্ত করিয়, পিতৃপ্রিয় দ্রব্যাদি এখান হইতে পাঠাইয়া দিতেন। কাশীর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহারা কিছু পাইবার প্রত্যাশায় আসিলে, প্রায়ই বিমুখ হইতেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি ছিল। কোন কার্য্যোপলক্ষে তিনি কাশীতে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগকেই ভোজন করাইতেন। এমন কি, তিনি স্বয়ং তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালনাদি করিয়া দিতেন। কোন

প্রকার ক্ষত-পূঁজ দেখিয়াও ঘৃণা বোধ করিতেন না। কাশীতে যাইলে, পিতার অন্নব্যঞ্জনাদি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া দেওয়া এবং পিতার ভোজনাবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করা, তাঁহার নিত্যক্রিয়া মধ্যে পরিগণিত হইত।* স্বয়ং তিনি বাজার করিয়া আনিতেন। মাতৃ-বিয়োগের পর ১৮৭৩ সালে নবেম্বর মাসে, পিতার অত্যন্ত পীড়া হইয়াছে শুনিয়া, তিনি সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, কাশী গিয়াছিলেন। তথায় এক পক্ষের মধ্যে পিতা সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করেন। পবিত্র কাশীধামে তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে টাকা, আধুলী, সিকি লইয়া পদব্রজে বাহির হইতেন; এবং দীন-হীন দরিদ্র ব্যক্তিকে যথাসাধ্য বিতরণ করিতেন।

এই সময়ে এক দিন এক ব্যক্তি, তাঁহাদের বাসায় আগমন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, মনে করেন, তিনি তাঁহার পিতার পরিচিত; পিতা মনে করেন, পুত্রের পরিচিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়, সেই সময় কি একটা বিশেষ কার্য্যের জন্য স্থানান্তরে যান; পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, লোকটী নাই। এখন

---

* বাল্য কালে বিদ্যাসাগর মহাশয়, দারিদ্র্য পীড়ন হেতু স্বহস্তে রন্ধন করিতেন। সুতরাং রন্ধনে তিনি সিদ্ধ-হস্ত। স্বচ্ছন্দ-উপার্জ্জনে সক্ষম হইয়াও, অনেক সময়, কেবল পিতৃসেবার্থ কেন, অনেককেই স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতেন। স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়ান, তাঁহার একটা সখ ছিল। খাওয়াইয়া তিনি পরম প্রীতি লাভ করিতেন। খাওয়াইতে বসিয়া, প্রায়ই প্রীতিপ্রফুল্লভাবরে বলিতেন,—

"হুহু দেয়ং হাঁহাঁ দেয়ং দেয়ঞ্চ করকম্পনে।
শিরসি চালনে দেয়ং ন দেয়ং ব্যাঘ্রঝম্পনে॥"

তিনি পিতাকে লোকটীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতা বলিলেন,—"সে কি, আমি জানি, উনি তোমারই পরিচিত; মনে করিলাম, তুমি আসিয়া উঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবে। আমি একটা বিশেষ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম।" বিদ্যাসাগর মহাশয়, ব্যাপার বুঝিয়া, বড় দুঃখিত হইলেন। তখনই তিনি চাদর লইয়া, বাঙ্গালীটোলায় তাঁহার অন্বেষণে বহির্গত হন। অনেক অনুসন্ধানের পর, তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহাকে আপনাদের ত্রুটী স্বীকার করিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। লোকটীও যথেষ্ট আপ্যায়িত হইলেন। পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি আমাদের বাসায় গিয়াছিলেন কেন?" ভদ্র লোকটী বলিলেন,—"শুনিলাম, আপনি আসিয়াছেন, তাই দেখিতে গিয়াছিলাম; আর ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা ছিল।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"কি জিজ্ঞাসা করিবেন?" ভদ্র লোকটী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধর্ম্মমত কি, জানিতে চাহিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"আমার মত কাহাকে কখনও বলি নাই; বলিবও না; তবে এই কথা বলি, গঙ্গাস্নানে যদি আপনার দেহ পবিত্র মনে করেন; শিবপূজায় যদি হৃদয়ের পবিত্রতা লাভ করেন; তাহা হইলে, তাহাই আপনার ধর্ম্ম।" এই বলিয়াই তিনি ফিরিয়া আসেন।

বিদ্যারত্ন মহাশয়, এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"কাশীর ব্রাহ্মণেরা বলেন,—আপনি কি তবে কাশীর বিশ্বেশ্বর মানেন না?

ইহা শুনিয়া দাদা উত্তর করিলেন, আমি তোমাদের কাশী বা তোমাদের বিশ্বেশ্বর মানি না। ইহা শুনিয়া, ব্রাহ্মণেরা ক্রোধান্ধ হইয়া বলেন,—তবে আপনি কি মানেন? তাহাতে অগ্রজ উত্তর করেন, আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননী দেবী বিরাজমান।"

এই খানেই বিদ্যাসাগরের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির পরিচয়। তাঁহার ব্রাহ্মণ-সেবা কেবল মাতাপিতার তৃপ্ত্যর্থ বলিতে হইবে।

১২৭৭ সালের ১৭ই ভাদ্র বা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর, "হিন্দু উইলস্ আক্ট" পাস হয়। ১৮৬৯ সালে ইহার পাণ্ডুলিপি "পেশ" হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে "ইণ্ডিয়ান সাক্সেন্" নামক আইনে কার্য্য চলিত; সে আইন কেবল সাহেবদের জন্য। তাহারই কতকগুলি ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া, হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদের জন্য "হিন্দু উইলস্ আক্ট" হয়। পূর্ব্বে সুপ্রিম কোর্ট হওয়ার পর, কলিকাতায় ধনাঢ্যমণ্ডলী, আপনাদের স্বেচ্ছামতে উইল করিয়া যাইতেন। ক্রমে বিচারে প্রকাশ পায়, এইরূপ উইলে নানারূপ অসুবিধা ও জুয়াচুরি ঘটে। এতন্নিবারণ উদ্দেশ্যে, এই বিলের সৃষ্টি। এই বিল লইয়া তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল।

গবর্ণমেণ্ট হইতে এ বিষয়ে যাবতীয় গণ্যমান্য ও হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের মত গ্রহণ করা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও উক্ত আইন সম্বন্ধে স্বীয় মত প্রদান করিতে আহূত হইয়াছিলেন। তিনি আইনের মর্ম্ম বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা

করিয়া দুইটী বিষয় সমর্থন করেন নাই। প্রথমতঃ হিন্দু শাস্ত্রানুসারে অজাত কোন ব্যক্তিকে দান করিলে, তাহা বৈধ হয় না। গ্রহীতার ও দাতার জীবদ্দশায় বর্ত্তমান থাকা ও বোধবিশিষ্ট হওয়া চাই। কিন্তু উক্ত আইনে এ প্রকার দানে কোন কোন স্থলে বৈধ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ উক্ত আইনে, যাহাকে "Rules against perpetuity" অর্থাৎ "আবহমানকাল স্বত্বাধিকার বিরুদ্ধ বিল' বলে, তাহাও হিন্দু আইন-সম্মত নহে বলিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়, মত প্রকাশ করেন। যেরূপ সচরাচর ঘটিয়া থাকে, বিদেশীয় শাসনকর্ত্তারা উক্ত আপত্তিতে কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া, উক্ত আইন বিধিবদ্ধ হয়।

১২৭৭ সালের ৯ই কার্ত্তিক বা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর নবদ্বীপের মহারাজ সতীশচন্দ্র বাহাদুরের মৃত্যু হয়। নবদ্বীপ রাজ-বংশের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। সতীশচন্দ্রের পিতা মহারাজ শ্রীশচন্দ্র বাহাদুরের সঙ্গে ভারতচন্দ্রপ্রণীত গ্রন্থ-সংগ্রহ এবং কৃষ্ণনগর-স্কুলের পরিদর্শনসূত্রে এই সংস্রবের সূত্রপাত হয়। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণগ্রামে বিমুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে সুদৃঢ় সখ্য-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। কোথায় সেই বাঙ্গালীর সর্ব্বজন-পূজ্য ও সর্ব্ব-সাধারণ-মান্য ব্রাহ্মণ-কুলপ্রদীপ রাজ্যেশ্বর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশতিলক মহারাজ শ্রীশচন্দ্র! আর কোথায় পরসেবী দীন-হীন ব্রাহ্মণ ঠাকুরদাসের বংশধর গৃহস্থ বিদ্যাসাগর!

বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রত্ন-সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া, পুলক-প্রীতিভরে সেই বেশ-ভূষা হীন দরিদ্র-বেশধারী ব্রাহ্মণকে প্রেমালিঙ্গন দিতে কিঞ্চিৎ-মাত্রও কুণ্ঠিত হইতেন না। এত অনুরাগ কিসের? এমন কি, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধর্ম্মবিগর্হিত বিধবা-বিবাহকাণ্ডেও সহায়তা করিতে পাশ্চাৎপদ হন নাই।* বিধবা-বিবাহের আইনসম্বন্ধে আবেদনপত্রে মহারাজ শ্রীশচন্দ্র স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। প্রথম বিধবা-বিবাহের দিনে তাঁহার লোকান্তর হইয়াছিল। যে হিন্দুকুল-চূড়ামণি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র

* কেহ কেহ বলেন, পরাশরের যে বচন অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়, বিধবা-বিবাহের আন্দোলন উত্থাপিত করেন, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, তাঁহার বহু পূর্ব্বে সেই বচন-সহায়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক করিতেন। কৃষ্ণনগর-রাজধানীর দেওয়ান বাহাদুর ৺কার্ত্তিকচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতে এইরূপ লিখিত আছে,—"পরাশরোক্ত যে, বচন মূল করিয়া, মহামতি শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিধবা-বিবাহের অখণ্ড ব্যবস্থা দেন, রাজা (শ্রীশচন্দ্র) অনেক দিন পূর্ব্বে সেই বচন সহায়ে বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং যখন বিদ্যাসাগরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি বিধবা-বিবাহের প্রসঙ্গে ঐ বচনের উল্লেখ করেন।"

এই ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে যে একটী কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহাতে বুঝিতে হয়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত কি না, তদ্বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। তৎকালে বিক্রমপুরবাসী প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভ স্বীয় তরুণবয়স্কা কন্যার বৈধব্যব্যাকুলতায় কাতর হইয়া বিধবা-বিবাহ চালাইবার উদ্যোগ করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কৌশলে সে চেষ্টা বিফলীকৃত হয়। সে বৃত্তান্ত বর্ণনের স্থান হইবে না। পাঠকবর্গ ইচ্ছা করিলে, ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতের ১৫৪—১৫৬ পৃষ্ঠা পাঠ করিতে পারেন।

বিধবা-বিবাহের প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিবাদী ছিলেন, তাঁহারই বংশীয় মহারাজ শ্রীশচন্দ্র বিধবা-বিবাহের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। ইহা শিক্ষা, সংস্রব ও যুগ-ধর্ম্মের পরিচয়।

শ্রীশচন্দ্রের পুত্র সতীশচন্দ্রও পিতার মতন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। পিতার মৃত্যুর পরও মহারাজ সতীশচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত পূর্ব্ববৎ ঘনিষ্ঠ সংস্রব সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। সতীশচন্দ্রের মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়ে দারুণ শোক-শেল বিদ্ধ হইয়াছিল।

সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পরও, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কৃষ্ণনগর রাজ্যের সুশৃঙ্খলা-স্থাপন ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধন জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া, অনেক সময় ক্ষতি ও অর্থহানি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। উপকারী বন্ধুর উপকারসাধনার্থ এরূপ ক্ষতি-স্বীকার কৃতজ্ঞ বিদ্যাসাগরের স্বভাবসিদ্ধ।

এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন, একমাত্র ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। সে কলঙ্ক-প্রক্ষালনার্থ বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্বয়ং "নিষ্কৃতি লাভ প্রায়াস" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহারও প্রতিবাদ হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তৎপ্রতিবাদার্থ প্রয়াসী হইয়া, আপন মত-সমর্থনার্থ, আর একখানি পুস্তিকা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্থূল কথা, বিদ্যাসাগর মহাশয়, ৺মদন-

মোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষা আত্মসাৎ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা, আত্মসাৎ নহে; ছাপাখানাসংক্রান্ত বিবাদ-মীমাংসায়, তাহা তাঁহারই বিষয়ীভূত হইয়াছিল। বাদ-প্রতিবাদ সংগ্রহ করিয়া, একটা মীমাংসা-স্থলে উপস্থিত হইতে হইলে, একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক লিখিবার প্রয়োজন হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্র-সমালোচনায়, এ কলঙ্ক তাঁহাতে যে অসম্ভব, এ ধারণা অবশ্য সর্ব্বসাধারণেরই হইবে। আমাদেরও ধারণা তাই। রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে আদ্যন্ত বিবরণ শুনিয়া, আমাদের ঐ ধরণা দৃঢ়তর হইয়াছে। অন্যরূপ যদি কাহারও হয়, আমরা তাঁহাকে বাদ-প্রতিবাদের পুস্তক মনোভিনিবেশ সহকারে পড়িতে এবং তাহারা পর্য্যালোচনা করিতে অনুরোধ করি।

মহারাজ সতীশচন্দ্রের দুই মহিষী ছিলেন। মহারাজ উইল করিয়াছিলেন,—"রাজ্ঞীরা যদি পুত্রবতী না হন, তাহা হইলে আমার অবর্ত্তমানে কনিষ্ঠা রাণী দত্তক গ্রহণ করিবেন। যদি তিনি দত্তক না লন, তবে জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞী লইবেন।" মহারাজের জীবিতাবস্থায় জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞীর মৃত্যু হয়। মহারাজ সতীশচন্দ্র লোকান্তরিত হইলে পর, কনিষ্ঠা রাজ্ঞী ভুবনেশ্বরী, স্বয়ং বিষয়-কার্য্য চালাইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাৎকালিক দেওয়ান ৺কার্ত্তিকচন্দ্র রায় দেখিলেন, বিষয়ের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা তাহাতে স্বয়ং মহারাণী বিষয়ভার গ্রহণ করিলে, নানা কারণে বিষয়ের আরও শোচনীয়তর অবস্থা সংঘটিত হইবে।

এতৎসম্বন্ধে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণার্থ তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, সকল অবস্থা পর্য্যালোচন করিয়া, কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের হস্তে বিষয় থাকা ভাল বলিয়া, অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।* তখন রায় মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন রাজ্ঞী ভুবনেশ্বরীকে বুঝাইয়া, বিষয় কোর্ট অব ওয়ার্ডের হস্তে অর্পণ করিতে পরামর্শ দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাহাতেই সম্মত হন। তিনি সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণনগরে যাইয়া, রাণীকে বিধিমতে পরামর্শ দেন। রাণী তাঁহার পরামর্শ যুক্তি-সঙ্গত ভাবিয়া, কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের হস্তে বিষয় অর্পণ করেন।

* নাবালকী জমিদারী রক্ষা-কল্পোদ্দেশে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের সৃষ্টি। মালগুজারিতে ব্যাঘাত ভাবিয়াই যে গবর্ণমেণ্ট এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, আইনকারেরা তাহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। স্বার্থ-রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের এই পরার্থপরতার প্রয়োজন। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডে বিষয় না দিলে যে, রক্ষা হয় না, এমন নহে। পুটিয়ার রাণী শরৎসুন্দরী ও বহরমপুরের মহারাণী স্বর্ণময়ী, ইঁহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। ওয়ার্ডে বিষয় দিয়া, অনেককেই যে নানা লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহারও বহু প্রমাণ আছে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিদ্যাসাগর মহাশয় যে তাহা বুঝিতেন না, এমন নহে। তবে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, নবদ্বীপ রাজ্যের বিষয় কোর্ট অব্ ওয়ার্ডে না দিলে, বিষয় রক্ষা করা দুষ্কর; তাই তাঁহাকে ওয়ার্ডের মূলনীতি উপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। বাস্তবিকই ওয়ার্ডে গিয়া, বিষয় শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল। পূর্ব্বেকার সব ঋণ পরিশোধিত হয়। এখন বিষয়ের বেশ স্বচ্ছল অবস্থা। বর্ত্তমান মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র বাহাদুর রাণী ভুবনেশ্বরীর পোষ্যপুত্র। ইনি নাবালক হইয়া, দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা পাইয়াছেন। মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র ওয়ার্ডের স্কুলে ছিলেন।

১২৮৫ সালের ২৩শে পৌষ বা ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি, বিষয়-সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডে অর্পিত হয়।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত উত্তর-চরিত ও অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক প্রকাশ করেন। তিনি দুইখানি পুস্তকের টীকা করিয়াছিলেন। দুই খানি পুস্তকের বঙ্গভাষায় লিখিত উপক্রমণিকা-টুকু উপাদেয় পাঠ্য প্রবন্ধ। সেই মৃদঙ্গ-নিনাদ-নিন্দী গুরুগম্ভীর ভাষাধ্বনি! সেই মধুর-কোমল-কান্ত বাক্য-বিন্যাস! অন্যায়তনে ভবভূতি ও কালিদাসের গুণ-গরিমা ও প্রতিভা-প্রতিষ্ঠার এমন প্রস্ফুট পরিচয় আর কুত্রাপিও পাইবে না।

এতদ্ব্যতীত বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক সংস্কৃত "শিশুপাল বধ", "কাদম্বরী", "কিরাতার্জ্জুনীয়", "রঘু-বংশ" ও "হর্ষচরিত" মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থে টীকা নাই। তবে ইহার পাঠ পরিশুদ্ধ। নিম্নশ্রেণী ইংরেজী পাঠকের পাঠ-সৌকর্য্যসাধন-কল্পে তিনি তিন খানি ইংরেজী গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই তিন খানি গ্রন্থ সার-সংকলন। তিন খানি পুস্তক এই,—"Selections from the writings of Goldsmith, Selections from English Literature and Poetical selections.

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

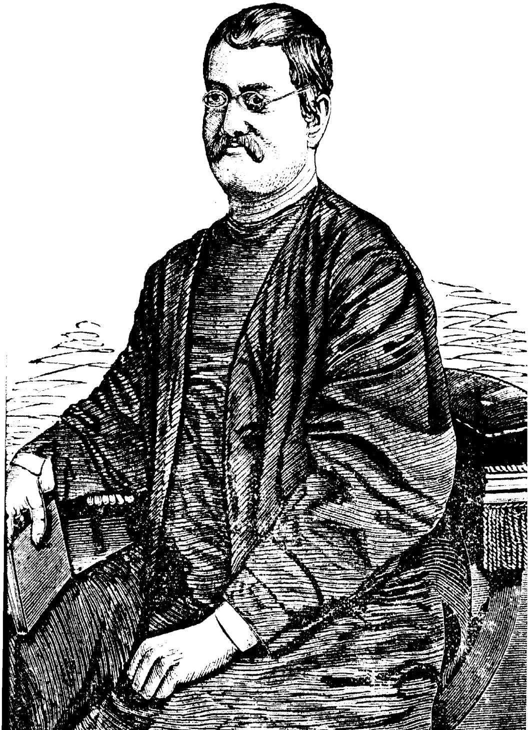
পাদরী ডল, কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু ও রামকৃষ্ণ পরমহংস।

পাদরী ডল সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সৌহৃদ্দ ও সদ্ভাব হইয়াছিল। পাদরী ডল, আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটসের রাজধানী বোষ্টন সহরের অধিবাসী ছিলেন। তত্রত্য "ইউনেটেরিয়ান" খৃষ্টান সমাজ কর্তৃক তিনি এ দেশে প্রেরিত হন। এ দেশে আসিয়া, তিনি "ইউসফুল আর্টস্ স্কুল" নামে কলিকাতা ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি এই বিদ্যালয়ে এ দেশবাসীকে ইংরেজী ও তৎসঙ্গে শিল্প, সঙ্গীত, ব্যায়াম প্রভৃতির শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দীন-দরিদ্রে তাঁহার অপার করুণা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় দীন-পালন তাঁহার জীবনের সাধন ব্রত ছিল। দীন-হীন-দরিদ্র বালকদিগকে বিনা বেতনে পড়াইবার জন্য তিনি একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহাকে সতত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। তিনি সদানন্দ, সরল, সাহসী ও সত্যপ্রিয় ছিলেন। এই সব গুণ চিরকালই বিদ্যাসাগরের চিত্তাকর্ষক। ডল সাহেবের মুখে প্রায়ই বিদ্যাসাগরের গুণব্যাখ্যা শুনিতাম। এক সময় তাহার বিদ্যালয়ে ছাত্র ছিলাম। স্কুলের শিক্ষক বা অন্য কোন কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হইলে, ডল সাহেব, তৎসম্বন্ধে বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিতেন। এতদ্ভিন্ন শিক্ষা-সংক্রান্ত অনেক বিষয়েই তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শ না লইয়া থাকিতে পারিতেন না। দুই জনেই দাতা ও দয়ালু। গ্রহ-উপগ্রহের পরস্পর অবিচ্ছিন্ন আকর্ষণের ন্যায় দুই দাতা ও দয়ালু হৃদয়ে আকর্ষণ-সংঘটন হইয়াছিল।

স্বদেশী হউক, বিদেশী হউক, ব্রাহ্ম হউক, খৃষ্টান হউক, হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, সাহসী, সদালাপী, সরল ও সত্য-সন্ধ ব্যক্তিমাত্রেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয় অধিকার করিতেন। যিনি যে পথেই চলুন, দেশের হিত-কামনাই তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য বুঝিলেই, বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া প্রেমালিঙ্গন দিতেন। ৺কেশবচন্দ্র সেনের সহিত তাঁহার অনেক বিষয়ে মতবিরোধ ছিল; কিন্তু তিনি কেশবকে দেশের হিতকামী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; এবং তাঁহাকে সতত প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। কেশব বাবুও তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। বহু-বিষয়ে উভয়ে বিরুদ্ধবাদী হইলেও, সাক্ষাৎ-সম্মিলনে উভয়ের অসীম সুখানুভব হইত। কেশব বাবু প্রায়ই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে আসিতেন। উভয়েরই মধ্যে কেবল দেশের মঙ্গলাকাম্য কথারই আলোচনা হইত।

সরলতা ও সত্যপ্রিয়তাগুণে ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসুর সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিও রাজনারায়ণ বাবুর অটল শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল।



বাগ্মিপ্রবর কেশবচন্দ্র সেন।

তিনি মনে করিতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়, ধর্ম্মপ্রচারক হইলে, দেশের মহা মঙ্গল সাধিত হইতে পারিত। এক সময় তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একথা খুলিয়া বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তদুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু রহস্য-ভাবে বলিয়াছিলেন,—"কাজ নাই, মহাশয়, ধর্ম্মপ্রচারক হইয়া, আমি যা আছি এবং যাহা করিতেছি, তাহার জন্য যদি দণ্ডভোগ করিতে হয়, তাহা আমিই করিব। যাহাদিগকে ধর্ম্মে জপাইব, তাহাদিগকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমরা কাহার মতে ধর্ম্ম পালন করিয়াছ, তখন তাহারা যদি আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে, এবং তাহারা যদি দণ্ড পাইবার পাত্র হয়, তাহা হইলে তাহাদের দণ্ডটা আমার উপর পড়িবে নিশ্চিতই। আমার অপরাধের জন্য আমি বেত খাইতে পারি; কিন্তু অপরের জন্য কত বেত খাইব!" *

রাজনারায়ণ বাবু অনেক বিষয়েই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শ লইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বিবেচনাপূর্ব্বক অতি সাবধানে পরামর্শ দিতেন। নিম্নলিখিত পত্রখানি ইহার একটী প্রমাণ,—

"সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্—

"কয়েক দিবস হইল, মহাশয়ের পত্র পাইয়াছি; কিন্তু নানা কারণে সাতিশয় ব্যস্ততা-প্রযুক্ত এত দিন উত্তর লিখিতে পারি নাই; ক্রটী গ্রহণ করিবেন না।

---

* এই কথাটী সাহিত্য-গুরু শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি।

"আপনার কন্যার বিবাহ-বিষয়ে অনেক বিবেচনা করিয়াছি, কিন্তু আপনাকে কি পরামর্শ দিব, কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। ফল কথা এই যে, এরূপ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া কোন ক্রমেই সহজ ব্যাপার নহে। প্রথমতঃ আপনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। ব্রাহ্মধর্ম্মে আপনার যেরূপ শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে দেবেন্দ্র বাবু যে প্রণালীতে কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, যদি তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুযায়িনী বলিয়া আপনার বোধ থাকে, তাহা হইলে ঐ প্রণালী অনুসারেই আপনার কন্যার বিবাহ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দ্বিতীয়তঃ, যদি আপনি দেবেন্দ্র বাবুর অবলম্বিত প্রণালী পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাচীন প্রণালী অনুসারে কন্যার বিবাহ দেন, তাহা হইলে ব্রাহ্ম-বিবাহ প্রচলিত হওয়ার পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিবেক। তৃতীয়তঃ, ব্রাহ্ম-প্রণালীতে কন্যার বিবাহ দিলে ঐ বিবাহ সর্ব্বাংশে সিদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হইবেক কি না তাহা স্থির বলিতে পারা যায় না। এই সমস্ত কারণে আমি এ বিষয়ে সহসা আপনাকে কোন পরামর্শ দিতে উৎসুক বা সমর্থ নহি। এই মাত্র পরামর্শ দিতে পারি যে, আপনি সহসা কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন না।

"উপস্থিত বিষয়ে আমার প্রকৃত বক্তব্য এই যে, এরূপ বিষয়ে অন্যের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা বিধেয় নহে। ঈদৃশ স্থলে নিজের অন্তঃকরণে অনুধাবন করিয়া যেরূপ বোধ হয়, তদনুসারে কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য। কারণ, যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, সে ব্যক্তি নিজের যেরূপ মত ও অভিপ্রায়, তদনুসারেই পরামর্শ দিবেন, আপনকার হিতাহিত বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে তত দৃষ্টি রাখিবেন না।

"এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া উপস্থিত বিষয়ের স্বয়ং কর্ত্তব্য নিরূপণ করিলেই আমার মতে সর্ব্বাংশে ভাল হয়।

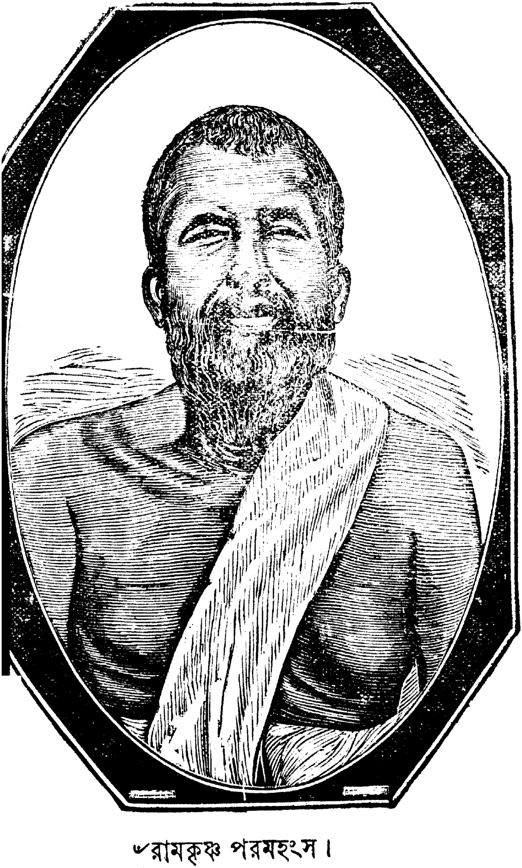
"আমি কায়িক ভাল আছি। ইতি তাং ৬ আশ্বিন।*

ভবদীয়

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।"

---

* এই পত্রখানি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত অনুশীলন নামক মাসিক পত্রের প্রথম ভাগের ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যায় (১৩০১ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র) প্রকাশিত হইয়াছিল।



৺রামকৃষ্ণ পরমহংস।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে অতি সরল ও সুদৃঢ়-বিশ্বাসী বলিয়া মনে করিতেন। এই জন্যই পরমহংস দেবের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। প্রথম সাক্ষাৎকারেই বিদ্যাসাগর মহাশয়, পরমহংস দেবের সরলতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। পরমহংস দেব, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিবার জন্য তাঁহার বাটীতে আসিয়াছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ করিয়া বলেন,—"আজি সাগরে আসিয়াছি, কিছু রত্ন সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইব।" ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়, একটু মৃদু হাসি হাসিয়া বলেন,—"এ সাগরে কেবল শামুকই পাইবেন।" ইহাতে পরমহংস দেব পরম পুলকিত চিত্তে বলেন,—"এমন না হইলে, সাগরকে দেখিতে আসিব কেন?" অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয়, পরমহংস দেবের মুক্তপ্রাণতার পরিচয় পাইয়া, প্রকৃতই তাঁহাকে অন্তরে স্থান দিয়াছিলেন। পরমহংস দেব যে সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাদর-অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হইয়া আসন গ্রহণ করেন, সেই সময় বর্দ্ধমান হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক জন আত্মীয় বন্ধু এক হাঁড়ি খাবার লইয়া আসেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, পরমহংস দেবকে তাহা আহার করিবার জন্য অনুরোধ করেন। পরমহংস দেবও সরস-সহাস্য বদনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বুদ্ধিপ্রবৃত্তি যেরূপই হউক, ভগবৎ-কৃপায় তিনি এরূপ সাধু-সমাগমে নিতান্ত সৌভাগ্যহীন ছিলেন না।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

বহু-বিবাহ।

১২৭৮ সালের শ্রাবণ মাসে বা ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে, "বহু-বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না" বিচারের প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। পুস্তকের প্রথম প্রতিপাদ্য বিষয়, বহু-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত কি না। কয়েকটী কারণে হিন্দুর একাধিক বিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত, বিদ্যাসাগর মহাশয়, এ পুস্তকের প্রারম্ভে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। দশরথ বহু-বিবাহ করিয়াছিলেন। পুত্রাভাব-নিবন্ধন দশরথের বহু-বিবাহ অশাস্ত্রীয় নহে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাও বলিতেছেন। যে কয়টী কারণে একাধিক বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্বীকৃত, তাহা এই,—

(১) যদি স্ত্রী সুরাপায়িনী, ব্যভিচারিণী, সতত স্বামীর অভিপ্রায়ের বিপরীতকারিণী, চিররোগিনী, অতি ক্রূর-স্বভাবা ও অর্থ-নাশিনী হয়, তৎসত্ত্বে অধিবেদন অর্থাৎ পুনরায় দার-পরিগ্রহ বিধেয়।

(২) স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, মৃতপুত্রা হইলে দশম বর্ষে, কন্যামাত্রপ্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে ও অপ্রিয়বাদিনী হইলে কালাতিপাত ব্যতিরেকে বিবাহ করিবে।

এতৎকারণ ব্যতীত একাধিক দারগ্রহণ অশাস্ত্রীয় এবং নিষিদ্ধ, বিদ্যাসাগর মহাশয়, ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কলিযুগে অসবর্ণা বিবাহ রহিত হইয়াছে ; সুতরাং যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বিবাহের আর স্থল নাই, ইহাই বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের কথা। এ কথার শাস্ত্রীয়তা বা অশাস্ত্রীয়তা লইয়া কোন বিচারও উত্থাপিত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে কৌলীন্যসম্মত বহুবিবাহ পাপাবহ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। এতৎ-প্রামাণার্থ তিনি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছেন।

কোন আত্মীয় কন্যার কষ্টানুভবে তিনি বহু-বিবাহ রহিত করিবার জন্য উদ্যোগী হন। আত্মীয় কুলীন কন্যার পতি বহু-বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁর প্রায়ই পতিসাক্ষাৎ-লাভ ঘটিত না। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিয়াছিলেন,—"আমাদের অদৃষ্টে যা ছিল, তা হইয়াছে; আমাদের কন্যারা যাহাতে আর কষ্ট না পায়, তাহার একটা উপায় করিতে পারেন?" ইহারই পর হইতে, তিনি বহু-বিবাহ রহিত-করণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। বাঙ্গালার কোন্ কোন্ কুলীনের একাধিক বিবাহ হয়, তাহারও তিনি তালিকা সংগ্রহ করেন। এই তালিকা "বহু-বিবাহ" বিষয়ক প্রথম পুস্তকে সন্নিবেশিত আছে।

১২৬২ সালের ১৩ই পৌষ বা ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর, বহু-বিবাহ-রদ করণাভিলাষে বর্দ্ধমানের মহারাজাপ্রমুখ অনেক ব্যক্তির স্বাক্ষরিত এক খানি আবেদন-পত্র গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হইয়াছিল। এই আবেদনের মর্ম্ম এই,—"কোন কোন বিশেষ কারণে শাস্ত্রে একাধিক বিবাহের ব্যবস্থা আছে বটে; কিন্তু এখন এতৎসম্বন্ধে যথেচ্ছাচার ঘটিয়াছে। কুলীনদের ভিতর এই যথেচ্ছার প্রবল। কেবল অর্থ-লালসায় অনেকেই বহু-বিবাহ

করিয়া থাকে। সমাজে ভ্রূণহত্যা রূপ নানা অনর্থ সংঘটিত হইতেছে। এতন্নিবারণার্থ গবর্ণমেণ্টের কোনরূপ আইন করা উচিত।” এ আবেদনে ফল হয় নাই। তবুও আন্দোলন চলিয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহ-ব্যাপারে বিব্রত ছিলেন বলিয়া, গবর্ণমেণ্ট ইহাতে মনোযোগী হইতে পারেন নাই।

বিদ্যাসাগর নিশ্চিন্ত থাকিবার পাত্র নহেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে যখন কাশীর রাজা দেবনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন, সেই সময় এসম্বন্ধে আইন হইবার উদ্যোগ হয়; কিন্তু কিয়দ্দিন পরে রাজাবাহাদুরকে ব্যবস্থা সমাজ হইতে যথানিয়মানুসারে বিদায় লইতে হইয়াছিল; সুতরাং উদ্যোগ কার্য্যে পরিণত হইল না। ১৮৬৫ সালে তাৎকালিক বঙ্গেশ্বর স্যর সিসিল বিডন সাহেবের নিকট বহুজন-স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র প্রেরিত হয়। তাহাতে যে কোন ফলোদয় হয় নাই, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়, উত্তরপাড়ায় পড়িয়া যান। শরীরের অসুস্থতানিবন্ধন তিনি এতৎসম্বন্ধে আর কোন আলোচনা করিতে পারেন নাই। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তাৎকালিক সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় এতৎসম্বন্ধে একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়। সভায় বাদানুবাদ ও তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল। এই অবসরে বিদ্যাসাগর মহাশয়, পুনরায় এতদালোচনায় প্রবৃত্ত হন। সেই আলোচনার ফল, এই প্রথম পুস্তক।

প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর, ৺তারানাথ বাচস্পতি,

৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ স্মৃতিরত্ন, মুর্শিদাবাদের খ্যাতনামা কবিরাজ ৺গঙ্গাধর কবিরত্নপ্রমুখ অনেকেই ইহার প্রতিবাদ করেন। সেই সময় ইহা লইয়া, সমগ্র বঙ্গদেশ বিলোড়িত হইয়াছিল। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পুস্তক সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল। অন্যান্য পুস্তক বাঙ্গালায়। এই সব প্রতিবাদীর মত খণ্ডনার্থ, ১২৭৯ সালের চৈত্র মাসে বা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে "বহু-বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না?" বিচারের দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হয়।

বহু-বিবাহের আন্দোলনকালে উপযুক্ত ভাইপোয়ের পুনরাবির্ভাব হইয়াছিল। উপযুক্ত ভাইপো এবার তারানাথ বাচস্পতি মহাশয়কে লইয়া পড়িয়াছিলেন। তারানাথের উপর ভাইপোর তীব্র আক্রমণ। ভাষা-ভঙ্গী ভীষণ ভ্রুকুটীময়ী। তাহা সভ্য সাহিত্যের সম্মানাস্পদ নহে। একটু নমুনা দিই,—

"এত কাল পরে সব ভেঙ্গে গেল ভুর।
হতদর্প হইল বাচস্পতি বাহাদুর॥
সকলের বড় আমি মম সম নাই।
কিসে এই দর্প কর ভেবে নাহি পাই॥
* * * * *
তুমি গো পণ্ডিত মূর্খ বুদ্ধিশুদ্ধিহীন।
অতি অপদার্থ তুমি অতি অর্ব্বাচীন॥"

ভাইপোর এ পুস্তকের নাম "অতি অল্প হইল।" পুস্তকের আরম্ভে উপরোক্ত ছড়া। পরে আরও গালিগালাজ পদ্যে।

তদুদ্ধার নিষ্প্রয়োজন। অনেকেই বলেন, এ ভাইপো স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়ই। আমরা কিন্তু ইহার তাদৃশ প্রমাণ পাই নাই। এ ভাষার ভাব-ভঙ্গী বিদ্যাসাগরের চরিত্রোচিত নহে। পণ্ডিত তারানাথ বাচস্পতি মহাশয়ও ইহার উত্তরচ্ছলে একখানি ২০ পৃষ্ঠার পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। ইহা ভাইপোর মতন তীব্র নহে। তবে ভাইপোর উপর কটাক্ষ আছে। "ভাইপোস্য" শব্দ অশুদ্ধ ধরিয়া, বাচস্পতি মহাশয় ভাইপোকে মৃত্তিকা-প্রোথিত করিয়াছেন। "কস্যচিৎ উচিত-বাদিনঃ" নাম দিয়া এক ব্যক্তি "প্রেরিত তেঁতুল" নামে এক খানি ২৫ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি আক্রমণ ছিল। এতদ্ব্যতীত গান-ছড়াও অনেক রকম প্রকাশিত হইয়াছিল। এডুকেশন গেজেটের প্রেরিত পত্রে "কুলীন-কামিনীর উক্তি" নামে একটী পদ্য প্রকাশিত হইয়াছিল।

বাচস্পতি মহাশয়, যেরূপ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আক্রমণ করিয়াছিলেন ; এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় বাচস্পতি মহাশয়কে যে ভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা বিজ্ঞোচিত হয় নাই। এই সূত্রে উভয়ের যে মনোমালিন্য হইয়াছিল, তাহা আর এ জন্মে বিদূরিত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়, বিচারে স্মার্ত্তিজ্ঞতা, তর্কনিপুণতা, মীমাংসাপটুতা, অনুসন্ধিৎসুতা এবং বিদ্যাবুদ্ধিমত্তার প্রকৃত পরিচয় দিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু বাচস্পতি মহাশয়কে আক্রমণ করিতে গিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব, বিদ্যাসাগর

মহাশয়, এ সম্বন্ধে যে তর্ক-প্রণালীর অবতারণা করিয়াছেন, বাঙ্গালায় এ পর্য্যন্ত তেমন অল্প লোকেই পারিয়াছেন। কোন কোন আত্মস্পর্দ্ধী দাম্ভিক লেখক, তাঁহাকে সময়ে সময়ে, 'নিজস্ব'-হীন বলিয়া, তাঁহার গৌরবহানির চেষ্টা করিয়া থাকেন; এবং সময়ে সময়ে তাঁহার অনুবাদিত গ্রন্থনিচয়, সেই সব দাম্ভিক পুরুষদের রহস্য-বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। বিদ্যাসাগরের "বহু-বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা" পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর, যাহাদের এরূপ স্পর্দ্ধা দেখিয়াছি, তাঁহাদিগকে আমরা কৃপার পাত্র মনে করিয়া রাখিয়াছি। কেননা, সেরূপ স্পর্দ্ধা ব্যাধি-বিশেষ।

বহু-বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না বিষয়ক পুস্তক লইয়া, বাদানুবাদ করিতে চাহি না। তাহার স্থানও নাই। এ সম্বন্ধে আইন যে হয় নাই, ইহাই দেশের মঙ্গলের বিষয়। আইনে বহু অনর্থপাতের সম্ভাবনা; বৈদেশিক বিচারকেরা ধর্ম্মার্থের সূক্ষ্ম মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, বহু অনর্থ ঘটাইতে পারিতেন। শাস্ত্রসম্মত একাধিক বিবাহেও বহু ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। স্ত্রী-পুরুষের সন্তানোৎপত্তির শক্তি-বিচারে যে নানা কুৎসিত কাণ্ডের অভিনয় হইত না, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

বিদ্যাসাগর মহাশয়, "বহু-বিবাহ" সংক্রান্ত পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ করিয়া, মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইচ্ছা সম্পূর্ণ হয় নাই।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ, পুত্র-বর্জ্জন ও আনুইটি ফণ্ড।

১২৭৯ সালের আষাঢ় মাসে বা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যম কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনীর সহিত চব্বিশ পরগণা রুদ্রপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়।

এই সময় পুত্র নারায়ণের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়, নানা কারণে বিরক্ত হন। ক্রমে বিরক্তি এত দূর উৎকট হইয়া উঠিল যে, প্রিয়তম পুত্রকেও হৃদয়ের শত যোজন দূরে নিক্ষেপ করিতে হইল। মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান পড়িয়া গেল। পিতার অন্তরে কি হইতেছিল, তাহা অন্তর্য্যামী বলিতে পারেন কিন্তু পুত্রের কর্ত্তব্যত্রুটী সংশোধিত হইল না বলিয়া, পুত্রকে বিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার বাহ্য ভাবে মনে হইত, তাহাতেই তিনি যেন আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। পুত্র নারায়ণের বিসর্জ্জনে মাতা দারুণ মনস্তাপ পাইয়াছিলেন। সে কুসুমাদপি কোমল প্রাণ দাবানলে দগ্ধীভূত হইয়াছিল। মাতার আর সুখ-স্বচ্ছন্দতা ছিল না। ইহার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বনিতার প্রসন্নতা-ফলভোগে কতক বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল।

নারায়ণ পিতা কর্ত্তৃক পরিবর্জ্জিত হইয়া, স্বকীয় চেষ্টায় সবরেজিষ্টরের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি পিতার ন্যায় তেজস্বী

ও কৃতাত্মনির্ভর ছিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি কলিকাতায় পিতার বাড়ীতে আসিতেন। দিনকতক থাকিয়া আবার চলিয়া যাইতেন। পিতার সঙ্গে কিন্তু বাক্যালাপ হইত না। কর্ত্তব্য-ত্রুটীহেতু একেবারে পুত্রবিসর্জ্জন এ সংসারে বিরল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, পুত্র-বর্জ্জনের একটী প্রকট দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু স্বভাবিক মমতা সহজ পদার্থ নহে। কর্ত্তব্যানুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয়, পুত্র নারায়ণকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু নারায়ণের প্রতি তাঁহার স্নেহ যে বিচলিত হয় নাই, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এক দিন তিনি নারায়ণের ফটোগ্রাফ দেখিয়া, দরবিগলিতধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। নারায়ণ বাবুর প্রতিগৃহীত হইবার বড় আশাও ছিল না। অনেকেই তাঁহার বিপক্ষে প্রায় গুরুতর অভিযোগ আনিত। তাহাতে পুত্রকে পুনর্গ্রহণের প্রবৃত্তি আর জাগিতে পারিত না।

১২৭৯ সালের ২রা আষাঢ় বা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন "হিন্দু ফ্যামিলি আনুইটি ফণ্ড" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই "ফণ্ড"-প্রতিষ্ঠার মহদুদ্দেশ্য। সামান্য আয়-সম্পন্ন বাঙ্গালী, মৃত্যুকালে পিতা, মাতা, বনিতা, সন্তান-সন্ততি কিম্বা আত্মীয়বর্গের জন্য কোনরূপ সংস্থান করিয়া যাইতে পারে না। যাহাতে এরূপ সংস্থান হয়, তাহারই জন্য এই ফণ্ডের সৃষ্টি। তুমি যদি ইচ্ছা কর, তোমার স্ত্রী কিম্বা অন্য কোন আত্মীয়, তোমার মৃত্যুর পর মাসে মাসে যাবজ্জীবন পাঁচ টাকা হিসাবে পাইবে, তাহা হইলে

তোমাকে প্রত্যেক মাসে এই ফণ্ডে দুই টাকা চারি আনা আন্দাজ জমা দিতে হইবে। তোমার দেহান্তে, তাহা হইলে তোমার স্ত্রী বা আত্মীয় মাসে মাসে পাঁচ টাকা পাইবে। এইরূপে দশ টাকার সংস্থান করিবার ইচ্ছা হইলে, উপরোক্ত হিসাবের অনুপাতে ফণ্ডে টাকা জমা দিতে হইবে। ত্রিশ টাকা পর্য্যন্ত সংস্থানের ব্যবস্থা আছে। এইরূপ একটী ফণ্ডের যে প্রয়োজন, ১২৭৮ সালের ১২ই ফাল্গুন বা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী মেট্রপলিটন ইনষ্টিটিউসনে একটী সভা করিয়া, তাহার সিদ্ধান্ত হয়। প্রথম ১০টী "সবস্ক্রাইবার" লইয়া ৩২ নং কলেজ ষ্ট্রীটে ইহার কার্য্যারম্ভ হয়। এতদ্ব্যতীত দুই চারি জন ইহার সাহায্যার্থ এককালীন মোট টাকা দিয়াছিলেন। পাইকপাড়ার রাজপরিবার দিয়াছিলেন, দুই হাজার পাঁচ শত টাকা। প্রথম বৎসর বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অনারেবল দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়, ইহার "ট্রষ্টি" হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বৎসরও এই দুই জনই "ট্রষ্টি" থাকেন। তৃতীয় বৎসর অনারেবল দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যুর পর রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, অনারেবল রমেশচন্দ্র মিত্র ও বিদ্যাসাগর মহাশয় "ট্রষ্টি" হন। সভার প্রতিষ্ঠাকালে নিম্নলিখিত ব্যক্তি, নিম্নলিখিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন,—শ্যামাচরণ দে,—চেয়ারম্যান। মুরলীধর সেন,—ডেপুটী-চেয়ারম্যান। রায় দীনবন্ধু মিত্র, রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র ধর, নবীনচন্দ্র সেন, ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, নন্দলাল মিত্র, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-

পাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন এবং পঞ্চানন রায়চৌধুরী,—ডাইরেক্টর। নবীনচন্দ্র সেন,—সেক্রেটরী। ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার,—"সবস্ক্রাইবার"দের রোগাদি-পরীক্ষক। "আন্নুইটি ফণ্ড" যে উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত, সেই উদ্দেশে "আলবার্ট লাইফ আসুরেন্স কোম্পানী" নামে একটী কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা টিকে নাই। অনেকের ক্ষতি হইয়াছিল।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ফণ্ডে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্রব ছিল। তাঁহার মতে 'ফণ্ড' প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তিন বৎসর 'ফণ্ডের' কার্য্য সুশৃঙ্খলায় চলিয়াছিল। ১২৮২ সালের ১৩ই পৌষ বা ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর তিনি ডিরেক্টরদিগকে ফণ্ডের সংস্রবত্যাগের কল্পে পত্র লিখেন। ১২৮২ সালের ১৯শে পৌষ বা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারিতে একটী বিশেষ-সভায় ডাইরেক্টরেরা তাঁহার সংস্রব ত্যাগের কারণ জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১২৮২ সালের ১০ই ফাল্গুন বা ১২৭৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বিদ্যাসাগর মহাশয় এক খানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া, সংস্রবত্যাগের কারণ বিদিত করেন। এই পত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। পত্র খানি "ফুলিস্কেপ" কাগজের প্রায় ২০২২ পৃষ্ঠা হইবে। পত্রের ভাষা তেজস্বিনী। সংস্রবত্যাগের কারণ যুক্তিপূর্ণ। পত্র পড়িলে এই বুঝা যায়,—

তাৎকালিক সেক্রেটরী ও তৎদলাক্রান্ত কয়েকটী ডাইরেক্টরের একাধিপত্যে ফণ্ডের কার্য্য বিশৃঙ্খল হইতেছে ভাবিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় ফণ্ডের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালী পাঁচ জনে একত্র কাজ করিতে পারে না বলিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। ফণ্ডের বিশৃঙ্খলতার উল্লেখে তিনি স্পষ্টই এ কথা বলিয়াছিলেন। এই বিশ্বাসে তিনি প্রথমে এ ফণ্ডের কার্য্যে যোগ দিতে চাহেন নাই। পরে একান্ত অনুরোধপরবশ হইয়া তিনি ফণ্ডের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন।

ফণ্ডের কার্য্যে "সবস্ক্রাইবারগণ" উদাসীন ছিলেন, ইহাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধারণা হইয়াছিল। ডাইরেক্টরদিগের সম্বন্ধে এই অনুযোগ হয় যে, তাঁহারা ফণ্ডের নিয়ম মানেন না; পরন্তু ফণ্ডের মঙ্গলসাধন পক্ষে তাঁহাদের মনোযোগ ছিল না। ডাইরেক্টর ও সবস্ক্রাইবার সম্বন্ধে এই অনুযোগের কথা ফণ্ডের রিপোর্টে লিখিত আছে। *

সেক্রেটরী ও তৎদলাক্রান্ত ডাইরেক্টরদিগের একাধিপত্য কিরূপ হইয়াছিল, তাঁহার প্রমাণ স্বরূপ বিদ্যাসাগর মহাশয়, সেই সুদীর্ঘ পত্রে অতি বিস্তৃতভাবে অনেক কথারই অবতারণা করিয়াছিলেন। হিসাব-নিকাশ নাই; ফণ্ডের নিয়মপরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলেও তাহা করা হয় নাই; সভার রিপোর্টে সভা-

* The charge against the subscribers was indifference to the affairs of the Fuud and the charges against the Directors were disregard of the rules and neglect of the true interests of the Fund. Proceedings of a special meeting of subscribers to the Hindu Family Annuity Fund, held at the Hiudu school on Sunday, 2nd January 1876.

পতি স্বাক্ষর না করিলেও, তাঁহার নাম স্বাক্ষর করা হইয়াছিল; ব্যাঙ্ক হইতে টাকা বাহির করিয়া আনা হইয়াছিল; ইত্যাদি ব্যক্তিবিশেষের উপর অনেক দোষারোপ আছে। সে সব কথা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। তৎপ্রকাশে ফলও নাই। ইহাতে আর একটা গুরুতর অভিযোগ ছিল। ডাইরেক্টরদিগের একান্ত অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয়, "ফণ্ডে"র জন্য এক জন কেরাণী মনোনীত করিয়া নিযুক্ত করেন। এই কেরাণী অন্যত্র কাজ করিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাহাকে ছাড়াইয়া আনেন। সেক্রেটরী ডাইরেক্টরদের সহিত কোনরূপ পরামর্শ না করিয়া, এই কেরাণীকে ছাড়াইয়া দেন। এ জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইতে হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, যে সব কারণ ও যুক্তি দেখাইয়া ফণ্ডের সংস্রব ত্যাগ করেন, তাহা মর্ম্মান্তিক কষ্টকর। এ সংস্রবত্যাগে তিনি যে কিরূপ মর্ম্মবেদনা পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি অতি সরল ও করুণ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। যে কয়েকটী কথা লিখিয়া, তিনি পত্রের শেষ করিয়াছেন, তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

"এই ফণ্ডের সংস্থাপন ও উন্নতি সম্পাদনবিষয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি। উত্তরকালে আপনাদের ফলভোগের প্রত্যাশা আছে; আমি সে প্রত্যাশা রাখি না। যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করে, সে দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া, তাহার পরম ধর্ম্ম ও তাহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম; কেবল এই বিবেচনায় আমি,

তাদৃশী চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি, এতদ্ভিন্ন এ বিষয়ে আমার আর কিছুমাত্র স্বার্থসম্বন্ধ ছিল না। বলিলে আপনারা বিশ্বাস করিবেন কি না জানি না; কিন্তু না বলিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না, এই ফণ্ডের উপর, আপনাদিগের সকলকার অপেক্ষা, আমার অধিক মায়া। আমায়, সেই মায়া কাটাইয়া, ফণ্ডের সংস্রব ত্যাগ করিতে হইতেছে, সে জন্য আমার অন্তঃকরণে কত কষ্ট হইতেছে, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। যাঁহাদের হস্তে আপনারা কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সরল পথে চলেন না, এবং আপনারাও কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখেন না। এমন স্থলে, এ বিষয়ে লিপ্ত থাকিলে, উত্তরকালে কলঙ্কভাগী হইতে ও ধর্ম্মদ্বারে অপরাধী হইতে হইবে; কেবল এই ভয়ে, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, নিতান্ত দুঃখিত মনে, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক, আমায় এ সংস্রব ত্যাগ করিতে হইতেছে।

"২রা জানুয়ারির বিশেষ সভায় আপনারা ইচ্ছা প্রকাশ ও অনুরোধ করিয়াছেন, আমি পুনরায় এই ফণ্ডের সংস্রবে থাকি; কিন্তু আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে বড় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, ফণ্ডের সবস্ক্রাইবার হইবার অভিপ্রায়ে, অনেকে আমায় পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে আইসেন। সে সময়ে আমায় বিষম সঙ্কটে পড়িতে হয়। ফণ্ডের যেরূপ কাণ্ড দেখিতেছি, তাহাতে আমার বিবেচনায়, কাহাকেও সবস্ক্রাইবার হইতে পরামর্শ দেওয়া যারপরনাই অন্যায় কর্ম্ম; আর, কাহাকেও সবস্ক্রাইবার হইতে নিষেধ করাও যারপরনাই অন্যায় কর্ম্ম; কারণ উত্তরকালে বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা জানিয়া, কাহাকেও সবস্ক্রাইবার হইতে পরামর্শ দিলে, তাহাকে প্রতারণা করা হয়; সবস্ক্রাইবার হইতে নিষেধ করিলে, ফণ্ডের প্রতিকূলাচরণ করা হয়। জ্ঞানপূর্ব্বক কাহাকেও প্রতারণা করা, আর, কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া কোন অংশে ঐ বিষয়ে প্রতিকূল আচরণ করা, এ উভয়ই অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম। অতঃপর

ফণ্ডের সংস্রবে থাকিতে গেলে, হয় প্রথম, নয় দ্বিতীয়, গর্হিত কর্ম না করিলে, কোনমতে চলিবে না। এই উভয় শঙ্কটে পড়িয়া, আমি আপনাদের অনুরোধ রক্ষায় সক্ষম হইতেছি না; সে জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমি অতি সামান্য ব্যক্তি; তথাপি আপনারা আমার উপর এত দূর বিশ্বাস করিয়া, গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছিলেন; এ জন্য আপনাদের নিকট অকপট হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ঐ গুরুতর ভার বহন করিয়া, যত দিন এই ফণ্ডের সংস্রবে ছিলাম, সেই সময় মধ্যে অবশ্যই আমি অনেক দোষে দোষী হইয়াছি; দয়া করিয়া, আপনারা আমার সকল দোষের মার্জ্জনা করিবেন। যতদিন আপনাদের ট্রষ্টি ছিলাম, সাধ্যানুসারে ফণ্ডের হিতচেষ্টা করিয়াছি; জ্ঞানপূর্ব্বক বা ইচ্ছাপূর্ব্বক কখনও সে বিষয়ে অযত্ন, উপেক্ষা বা অমনোযোগ করি নাই। এক্ষণে আপনারা প্রসন্ন হইয়া, বিদায় দেন, প্রণাম করি।

কলিকাতা, } ভবদীয়স্য
১০ই ফাল্গুন, ১২৮২ সাল। } শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

অতঃপর ফণ্ডের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আর কোন সংস্রব ছিল না। অনারেবল রমেশচন্দ্র মিত্র ও রাজা যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর ইহার পর ফণ্ডের সংস্রব ত্যাগ করেন। ফণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে সরকার বাহাদুরের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। বিদ্যাসাগরের সংস্রবত্যাগে ফণ্ডের অস্তিত্ব লোপ পায় নাই। অধুনা ফণ্ডের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, বড়ই উৎসাহে, ষোল-আনা প্রাণ খুলিয়া, আনুইটি ফণ্ডের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

প্রধান উদ্যোগী বলিয়া প্রথম গঠনবন্ধনে ইনি এই সমাজের ট্রষ্টি বা কর্ত্তানায়ক হইয়াছিলেন। এক বৎসর কাজ করিলেন। প্রথম বৎসর খর উৎসাহ-বেগ একটু কমিল; দ্বিতীয় বৎসর আর একটু; তৃতীয় বৎসরে বিদ্যাসাগরের প্রাণ এ বন্ধন আর সহিতে পারিল না। বিদ্যাসাগর বাঙ্গালী; এ যুগের ফুটন্ত বাঙ্গালী। এ যুগে বাঙ্গালী দশে মিলিয়া এক সঙ্গে থাকিতে পারে না, দশে মিলিয়া এক সঙ্গে কাজ করিতে পারে না। এখন সকলেই স্বাধীন, সকলেই স্বেচ্ছাচারী; সকলেই আপন মতের অবলম্বী। দেশের লোকের এ বিষয়ে মতিগতি বিকৃত পথে যাইতেছে দেখিয়া, বিদ্যাসাগর আনুইটি ফণ্ডের উপর বিপরীত দৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কালপ্রভায় তীব্র তেজের নিকট ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষুদ্র তেজ টিকিবে কেন? তিন বৎসরের মধ্যেই বিদ্যাসাগরকে হাল ছাড়িতে হইল। তিনি অনেকের ঘাড়ে এক সঙ্গে কাজ করিবার অসমর্থতার দোষ চাপাইয়া ফণ্ড-তরীর কাণ্ডারিগিরি ছাড়িয়া দিলেন। তিনি দোষ দিলেন অপরকে; কিন্তু অপরে দোষ দেন তাঁহাকে। তাহারা বলেন, বিদ্যাসাগর কখনই কাহারও সঙ্গে একযোটে কাজ করিতে পারেন নাই। প্রথমে তিনি মিশিতেন বটে; কিন্তু শেষে রাখিতে পারিতেন না। বিদ্যাসাগরের বিশেষত্বই ইহার কারণ। এরূপ বিশেষত্বে তেজস্বিতার পরিচয় সন্দেহ নাই; কিন্তু অনেক সময় ইহাতে যথেচ্ছাচার আসিয়া পড়ে।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

স্বাধীন মত, জামাতার মৃত্যু, দুহিতা-দৌহিত্র ও মেট্রপলিটনের শাখা।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, কাহারও সন্তোষ বা অসন্তোষের জন্য, কোন কথা গোপন করিতেন না। তাঁহার বিবেচনায় যাহা অন্যায় বোধ হইত, তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিতেন। নিজের অভিপ্রায় বা মত, অকপটচিত্তে না বলিলে, প্রত্যবায়-ভাগী হইতে হয়, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। ফণ্ডের সংস্রব-ত্যাগের পত্রে ইহার প্রমাণ। তিনি কখন আপন মত স্বাধীন-ভাবে বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। অপরকে স্বাধীন ও সঙ্গত মত প্রকাশে অকুণ্ঠিত দেখিলে, তিনি প্রীতি লাভ করিতেন। নিম্নলিখিত ঘটনাটী তাহার প্রমাণ।—

এক দিন ভট্টপল্লীনিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখাল দাস ন্যায়রত্ন, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান।

তর্করত্ন মহাশয়ের তখন ছাত্রাবস্থা। তবে পাঠ-সমাপ্তি প্রায় হইয়াছে। ভট্টপল্লীনিবাসী পণ্ডিতগণের সহিত বিদ্যা-সাগর মহাশয়, অনেক কথাবার্ত্তা কহিলেন। শেষে একটু ধর্ম্মের তর্ক সহসা আসিয়া পড়িল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, দেখ, ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও সব দল-বাঁধা কাণ্ড; এই দেখ, মনুর একটী শ্লোক,—

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন দুষ্যতি॥

পিতা পিতামহ যে পথে চলিয়াছেন, সৎপথ অবলম্বন করিয়া সেই পথেই চলিবে, তাহাতে চলিলে দোষ হয় না; কেন, বাপু, সৎপথেই যদি চলিবে, তবে আবার পিতা পিতামহ কেন? আর যদি পিতা পিতামহের পথেই চলিতে হয়, তবে আবার সৎপথ কেন? দুই পথ না বলিলে, দল রক্ষা হয় না, এই না! পাছে অপরের, অপর জাতির সৎপথে লোক যায়, দল ভাঙ্গিয়া যায়, এই জন্যই না মনু ঠাকুরকে এত মাথা ঘামাইতে হইয়াছে। তাই বলি, ধর্ম্ম কর্ম্ম ও সব দলবাঁধা কাণ্ড।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়, বিনীত ভাবে বলিলেন, আমার প্রকৃত অভিপ্রায় স্বতন্ত্র; তবে উপস্থিত ক্ষেত্রে মনু-বচনের যেরূপ ভাব হইলে, মহাশয় কিয়দংশে সন্তুষ্ট হইতে পারেন, একটু যত্ন করিলেই ত সে অর্থ করা যায়।

বিদ্যাসাগর। কিরূপে সে অর্থ হয় বল।

তর্করত্ন। 'সতাং মার্গং' এই স্থলে শেষের অনুস্বারটী লিপিকরপ্রমাদে ঘটিয়াছে। অনুস্বার না হইয়া বিসর্গ হইলে, এই শ্লোকের অন্যরূপ অর্থ হইতে পারে। অর্থাৎ পিতা পিতামহের অবলম্বিত পথে চলিবে। ইহাই সাধুগণের পন্থা।

বিদ্যাসাগর। ন্যায়রত্ন, এই ছেলেটী ত ভাল দেখিতেছি।

ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রভৃতি, তর্করত্ন মহাশয়ের বিশেষ প্রশংসা করিলেন। পরিশেষে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, এত যে প্রশংসা করিতেছ, ইহার পরিণাম ত ভিক্ষাবৃত্তি! ন্যায় পড়িয়াছে, অন্য দর্শন পড়িয়াছে, বেশ করিয়াছে, এখন বাড়ীতে বসিয়া উপবাস করিবে, তার আর ভাবনা কি?

১২৭৯ সালের ২৩শে মাঘ বা ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ৺বারাণসী ধামে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা গোপালচন্দ্র সমাজপতি, ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়ের সহিত কাশী গিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে ইহাঁর স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল। জামাতার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়, শোক-সন্তাপে অধীর হইয়া পড়েন; কিন্তু শোককাতরা কন্যাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তিনি পাষাণ-চাপে দারুণ শোকানল চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্বীয় জামাতা গোপালচন্দ্রকে পুত্রাধিক ভাল বাসিতেন। জামাতা যেমন সুপুরুষ, সুশ্রী ও বিদ্বান্ ছিলেন; তেমনই অমায়িক ও বিনয়ী ছিলেন। কবিতা-রচনায় তাঁহার শক্তি ও আসক্তি ছিল। বিধবা কন্যার মুখপানে তাকাইলে বিদ্যাসাগরের বুক ফাটিয়া যাইত! কন্যা একাদশী করিতেন। তিনিও একাদশীর দিন অন্নজল গ্রহণ করিতেন না। দুই বেলার আহারও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কন্যার অনুরোধে কিন্তু কিয়দ্দিন পরে তাঁহাকে এ কঠোরতা পরিত্যাগ করিতে হয়।

কন্যাকে তিনি গৃহের সর্ব্বময়ী করিয়াছিলেন। কন্যাও কায়মনোবাক্যে পিতৃ-সংসারের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নবতী ছিলেন। তঁহার কর্ম্মপটুতায় এবং স্নেহসুজনতায় পরিবারবর্গের সকলেই সন্তোষ লাভ করিত। বিধবা কন্যা, বিদ্যাসাগরের গৃহে অন্নপূর্ণারূপে বিরাজমানা। তাঁর পুত্র দুইটী, বিদ্যাসাগরের স্নেহ-বাৎসল্যে এবং করুণাশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। পিতার আদরযত্নে এবং পিতৃসংসারের কার্য্যানবচ্ছেদে তিনি স্বর্গীয় স্বামীর স্মৃতিসংযোগে একটীবারও অশ্রুপাতের অবসর পাই-তেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়, দৌহিত্রদ্বয়ের বিদ্যার্জ্জনের পক্ষে কোন ত্রুটি রাখেন নাই। জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি এবং দ্বিতীয় দৌহিত্র শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র সমাজ-পতি উভয়েই বাড়ীতে সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষা করিতেন। স্কুলে দেওয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়, যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন না। তিনি স্বয়ং তাঁহাদিগকে সংস্কৃত শিখাইবার ভার লইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে তাঁহার অদেয় কিছুই ছিল না। তাঁহাদিগের পায়ে কাঁটা ফুটিলে, বিদ্যাসাগরের বুকে বাজ বাজিত। তাঁহাদের মুখে পিতৃবিয়োগের স্মৃতিজনিত কোন আক্ষেপোক্তি শুনিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয়, যৎপরোনাস্তি যাতনা অনুভব করিতেন। একবার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র, বিলাত যাইবার জন্য উদ্যোগী হন। মাতামহ ও মাতা, উভয়েই নিষেধ করেন। সুরেশচন্দ্র এক দিন আহার করিতে করিতে, মাকে বলিয়াছিলেন,—"আমার বাপ থাকিলে কি, তোমার বাপকে বলিতে যাইতাম ?" বিদ্যাসাগর

মহাশয়, অন্তরাল হইতে এই কথা শুনিয়া, চক্ষের জলে ভাসিয়া গিয়াছিলেন। দৌহিত্রদের আহারের সময় তিনি প্রত্যহ নিকটে বসিয়া থাকিতেন। কাহারও কোন সদনুষ্ঠান দেখিলে, তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। একবার কনিষ্ঠ দৌহিত্র, পথ-পতিত একটী আমাশয়-রোগাক্রান্ত রোগীকে তুলিয়া লইয়া, বাড়ীতে আনিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আনন্দের সীমা ছিল না। দৌহিত্রের করুণায়, তাঁহার করুণাস্রোত মিশিয়া, গঙ্গা-যমুনার স্রোত বহিয়াছিল। তিনি স্বয়ং রোগীর ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দেন। বহু চেষ্টায় কিন্তু রোগী জীবন লাভ করিতে পারে নাই। জ্যেষ্ঠ সুরেশচন্দ্রের রচনা-শক্তি তাঁহার বড় প্রীতিপ্রদায়িনী হইয়াছিল। ইনি এখন সাহিত্যের সম্পাদক। তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্রবৎ স্নেহের ভাজন হইয়াছিলেন; কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে মাতামহের রহস্য-ভাযেও বঞ্চিত হইতেন না। বিদ্যাসাগর যে ষড় রসের পূর্ণাধার। তিনি আপন দুইটী দৌহিত্রের ভারত তো লইয়াছিলেন; অধিকন্তু জামাতার মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনী, তাঁহার প্রতিপাল্য হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের স্বতন্ত্র বাসা করিয়া দিয়াছিলেন এবং সমগ্র ভরণপোষণেরও ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দারুণ শোক-তাপেও বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্কুল-কলেজের শুভানুধ্যানে এক মুহূর্ত্তও বিরত হইতেন না। স্কুল-কলেজের কথা মনে হইলে, তিনি শোকতাপের সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হই-

তেন। শোকতাপে অভিভূত হইয়াও, তিনি ১৮৭৪ সালে কলিকাতা শ্যামপুকুরে মেট্রপলিটানের শাখা প্রতিষ্ঠিত করেন। মূল বিদ্যালয়ের ন্যায়, অল্প দিনে ইহারও শ্রীবৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল।



কবি হরিশ্চন্দ্র।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

পাদুকা-বিভ্রাট।

১২৮০ সালের ১৬ই মাঘ বা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি বিদ্যাসাগর মহাশয়, কাশীর মৃত কবি হরিশ্চন্দ্রকে কলিকাতার "মিউজিউম" (যাদুঘর) দেখাইতে লইয়া যান। সঙ্গে রাজকৃষ্ণ বাবুর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। তখন পার্কষ্ট্রীটে যাদুঘর ও এসিয়াটিক-সোসাইটী এক বাড়ীতেই ছিল। বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেশ, সেই থান ধুতি, থান চাদর ও চটি জুতা। কবি হরিশ্চন্দ্রের * পোষাক-পরিচ্ছদ আধুনিক সভ্য-জনোচিত,—পায়ে ইংরেজি জুতা,

* হরিশ্চন্দ্র এক জন প্রতিভাশালী হিন্দী কবি। হিন্দী কবিত্বযশে বর্ত্তমানকালে তিনি অতুলনীয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহার গুণগ্রাহী ছিলেন। গুণগ্রাহিতার গুণে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের প্রগাঢ় সখ্য স্থাপন হইয়াছিল। হরিশ্চন্দ্র বিদ্যাসাগরের উৎসাহে বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে হরিশ্চন্দ্র জগন্নাথ তীর্থে যাইবার জন্ত কলিকাতায় আসেন। সেই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে আপনার সকল পুস্তকের অনুবাদাধিকার দিয়া রাখিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী যখন কাশীধামে ছিলেন, হরিশ্চন্দ্র তখন তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেন। এক দিন হরিশ্চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননীকে বলেন,—"বিদ্যাসাগরের মায়ের হাতে রূপার খাড়ু।" ইহাতে বিদ্যাসাগরের জননী উত্তর দেন,—"সোণা রূপায় কি করে? উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময়, এই হস্ত রাঁধিয়া সহস্র সহস্র লোককে খাওয়াইয়াছিল। তাহাই বিদ্যাসাগরের মায়ের হাতের শোভা।" কবি হরিশ্চন্দ্র অকালে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ৩৪ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

গায়ে চাপকান-চোগা এবং মস্তকে পাগড়ী। গাড়ী হইতে নামিয়া, তিন জনেই যাদুঘরে প্রবেশোন্মুখ হইলেন। দ্বারবান বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যাইতে নিষেধ করিল। হরিশ্চন্দ্রের পক্ষে নিষেধ রহিল না; সুরেন্দ্র বাবুও নিশ্চিতই সুসজ্জিত ছিলেন; কেননা তিনিও অবাধে প্রবেশাধিকার পাইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অবশ্য বুঝান হইল, তাঁহার মতন এক জন উড়িয়াকে জুতা খুলিয়া রাখিয়া যাইতে হইবে। *

বিদ্যাসাগর মহাশয়, আর দ্বিরুক্তি না করিয়াই গাড়ীতে আসিয়া বসিলেন। এ সংবাদ তাৎকালিক "এসিয়াটিক সোসাইটী"র আসিটাণ্ট সেক্রেটরী ও কলিকাতার আধুনিক রেজিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনি সংবাদ পাইয়া, তাড়াতাড়ি আসিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ভিতরে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"আমি আর যাইতেছি না; অগ্রে কর্ত্তাদিগকে পত্র লিখিয়া জানিব, এরূপ কোন নিয়ম আছে কি না; আর যদি থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতীকার করিতে

---

* বিদ্যাসাগর মহাশয়, অনেক সময় অপরিচিত জনের নিকট সত্য সত্যই এক জন সভ্যভব্য উড়িয়ার সম্মান লাভ করিতেন। তিনি এক দিন স্বয়ং হাসিতে হাসিতে এই গল্পটী করিয়াছিলেন,—"আমি পটলডাঙ্গার পথ দিয়া যাইতেছিলাম; সেই সময় তাগা-হাতে, দানা গলায়, তসর-পরা. বোধ হয়, কোন বড় মানুষের ঝি যাইতেছিল। আমার চটি জুতার ধূলা তাহার গায়ে লাগিয়াছিল। মাগী বলিল,—"আ মর উড়ের তেজ দেখ।" কাম্বেল সাহেব সত্য সত্যই আমাকে উড়ে করেছে। কাম্বেল সাহেবের সময় বীরসিংহ গ্রাম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হয়।"

To

H. F. Blandford Esqr.

Honry. Secry. to the

Trustees, Indian Museum.

Sir,

Having had occasion to visit the library of the Asiatic Society of Bengal, I called on the 28th January last, and as I wore native shoes, I was not admitted, unless I would leave my shoes behind. I felt so much affronted that I came back without an expostulation.

Whilst I was in the compound, I saw that native visitors, wearing native shoes, were made not only to uncover their feet, but also to carry their shoes with their own hands, though there were some up-country people moving about in the museum rooms with their shoes on.

* * * * * *

Besides, if persons so wearing shoes of the English pattern, though coming on foot, could be admitted with shoes on, I could not make out why persons of the same status in life and under similar circumstances should not be admitted, simply because they happend to wear native shoes. &c.

* * * * * *

I have &c.

(Sd.) I. C. Sarma.

5-2-74.

পারি ত আসিব।" এই বলিয়া তিনি সঙ্গিগণকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসেন। অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয়, মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন,—

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের ট্রষ্টির অনরারি সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত এইচ, এফ্,

ব্ল্যানফোর্ড স্কোয়ার সমীপেষু।—

মহাশয়,

আমি গত ২৮শে জানুয়ারি এসিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরী দেখিতে যাই। আমার পায়ে দেশী জুতা ছিল বলিয়া, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিতে পাই নাই। জুতা না খুলিলে শুনিলাম, প্রবেশ নিষেধ। ইহার কারণ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। কতকটা মনক্ষুন্ন হইয়া আমি ফিরিয়া আসিলাম।

দেখিলাম, যে সব দর্শক চটি জুতা পায়ে দিয়াছিল, তাহাদিগকে জুতা খুলিয়া, হাতে করিয়া লইয়া, ফিরিতে হইতেছে। কিন্তু ইহাও দেখিলাম, কতিপয় পশ্চিমালোক দেশী জুতা পরিয়াই যাদুঘরের এদিক ওদিক ফিরিতেছে।

আরও দেখিলাম, সম্ভবতঃ কালীঘাটের প্রসাদী পুষ্পমাল্য গলায় পরিয়া যাহারা যাদুঘরে যাইতে চাহিতেছে, তাহাদিগকেও ফুলের মালা বাহিরে রাখিয়া যাইতে হইতেছে।

এ ঞ্চ জুতা-রহস্যের কারণ আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। যাদু-ঘর তো সাধারণের আরাম বিশ্রামের স্থান। এখানে এরূপ জুতাবিভ্রাট দোষাবহ। যাদুঘর যখন মাদুর-মোড়া, কারপেট-বিছান বা কারুচিত্রিত নহে, তখন এরূপ নিষেধবিধির আবশ্যকতাই বা কি? তা ছাড়া, পায়ে যাহাদের বিলাতী জুতা, কিন্তু আসিয়াছে পদব্রজে, তাহারা যখন প্রবেশ করিতে পাইতেছে, তখন তাহাদের সমান অবস্থাপন্ন লোকে, পায়ে শুদ্ধ

দেশী জুতা বলিয়া প্রবেশ করিতে পায় না কেন, ইহা আমি ঠিক করিতে পারিতেছি না। অবস্থা যাঁহাদের ইহাদেরও অপেক্ষা উন্নত, আসেন গাড়ি পাল্কী করিয়া, তাঁহাদিগের উপরই বা এরূপ নিষেধবিধি প্রবর্ত্তিত হয় কেন?

পসার-প্রখ্যাতিতে নামে মানে হাইকোর্ট সকলের সেরা। সেখানেও যখন এরূপ ব্যবস্থা নাই, তখন সাধারণের আরাম-বিশ্রামের স্থানে এরূপ অসঙ্গত নিষেধবিধি দেখিয়া আমাকে অতি বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হইয়াছে।

এ কথা তুলিয়া আপনাদিগকে কষ্ট দিতে প্রথমে আমার ইচ্ছা হয় নাই। কিন্তু পরে ভাবিলাম যে, ট্রষ্টিদিগের ন্যায় বিশিষ্ট এবং শিক্ষিত ভদ্র লোক কর্ত্তৃক এই পাদুকার ব্যবস্থা অনুমোদিত হইয়াছে; কিন্তু ইহাঁরাই আপন বাটীতে অথবা জনসমাজে কখনও এই অসম্মানসূচক এবং বিরক্তিকর প্রথার সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ নাই; সুতরাং এ কথা তাঁহাদের কর্ণগোচর না করিলে, তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে। অতএব আমার অনুরোধ, এ বিষয়ের মীমাংসা জন্য আপনি পত্রখানি অনুগ্রহ করিয়া ট্রষ্টিদিগকে দেখাইবেন।

৫।২।৭৪ (স্বাঃ) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষ এতৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত পত্র সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষকে লিখেন,—

এসিয়াটিক সোসাইটির অবৈতনিক সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

কলিকাতা, ২৬শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ।

মহাশয়!

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জানুয়ারি তারিখে এক জন দেশীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোক এসিয়াটিক সোসাইটী সংলগ্ন পুস্তকাগারে প্রবেশ কালীন

বহির্দ্দেশে পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। তৎসংক্রান্ত পত্রগুলি উক্ত সোসাইটীর অধ্যক্ষসভায় বিচারার্থ প্রেরিত হইল।

আপনার বশম্বদ ভৃত্য
(স্বাঃ) হেন্‌রি এফ্‌ ব্ল্যানফোর্ড,
ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের ট্রষ্টিগণের অবৈতনিক সম্পাদক।

মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষ, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নিম্নলিখিত পত্র লিখেন,—

কলিকাতা, ২৬শে মার্চ্চ, ১৮৭৪ খৃঃ।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়!

আপনি গত ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মিউজিয়াম প্রবেশকালীন জাতীয় প্রথানুসারে বহির্দ্দেশে পাদুকা পরিত্যাগ বিষয়ে আপনার অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া যে পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা উক্ত মিউজিয়ামের ট্রষ্টি-গণের গোচরার্থ অর্পণ করিয়াছি এবং প্রত্যুত্তরে আপনাকে অবগত করিতে আদিষ্ট হইয়াছি যে, ট্রষ্টিগণ উক্ত প্রথা সম্বন্ধে কোন প্রকার আদেশ প্রচার করেন নাই বা এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই।

আপনার ব্যক্তিগত আবেদন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, উক্ত মিউজিয়াম, এসিয়াটিক সোসাইটীর অট্টালিকার মধ্যে আংশিকভাবে অন্তর্ভুক্ত। সোসাইটীর পরিচারকবর্গ মিউজিয়ামের ট্রষ্টিগণের আজ্ঞাধীন নহে। যে সমস্ত ভৃত্যের বিরুদ্ধে আপনি অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন, তাহারা মিউজিয়াম বা সোসাইটী সংক্রান্ত কি না তাহা আপনার পত্রে প্রকাশিত নাই। যাহা হউক, আপনি যখন উল্লেখ করিতেছেন যে,

সোসাইটীর পুস্তকাগারে যাইবার পথে অট্টালিকায় প্রবেশকালীন উক্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, আপনার পত্রখানি উক্ত সোসাইটীর অধ্যক্ষসভার অবগতির জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

আপনার বশম্বদ ভৃত্য
(স্বাঃ) হেনুরি এফ্ ব্ল্যানফোর্ড,
অবৈতনিক সম্পাদক।

পত্র লেখালিখি অনেক হইয়াছিল; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা রক্ষা হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়, আর কখন সোসাইটী বা মিউজিয়মে যান নাই।

এতৎসম্বন্ধে তৎকালে হিন্দু-পেট্রিয়টে এইরূপ লেখা হইয়াছিল,—"বিদ্যাসাগর মহাশয়, গৃহে আসিয়া মিউজিয়মের তত্ত্বাবধায়দিগকে নরমভাবে একখানি পত্র লিখিয়া জানিতে চাহিলেন, মিউজিয়মের অধ্যক্ষগণ দেশী জুতা পায়ে দিয়া প্রবেশ করিতে নিষেধ-সূচক কোন আদেশ করিয়াছেন কি না; আর বুঝাইয়া বলা হইল যে, এরূপ নিষেধ থাকিলে মান্য গণ্য দেশীয় ভদ্র লোক অথবা যে সব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেশী চটি জুতা পায়ে দেন, তাঁহারা আর সোসাইটীতে যাইতে চাহিবেন না। সোসাইটীর কার্য্য-নির্ব্বাহক সভাকে এই মর্ম্মে স্বতন্ত্র পত্র লেখা হয়। মিউজিয়মের অধ্যক্ষ প্রত্যুত্তরে বলেন যে, এরূপ হুকুম দেওয়া হয় নাই; বিদ্যাসাগর মহাশয় ফিরিয়া গিয়াছেন বলিয়া কিন্তু তাহার জন্য একটু দুঃখপ্রকাশও করা হইল না; দ্বারবান্‌কে দোষী করাও হইল না; আর ভবিষ্যতে তাহাকে এরূপ করিতে বারণ করা হইবে, তাহাও বলা হইল না। সোসাইটীর অধ্যক্ষ-

সভা, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একটু টিটকারী দিয়া বলেন যে, দেশীয় লোকে দেশীয় আচার ব্যবহার ভাল জানেন। পাঠক অবশ্য বুঝিবেন যে, মিউজিয়মের অধ্যক্ষ, আর সোসাইটীর অধ্যক্ষ সভা স্বতন্ত্র জিনিস। দুই পক্ষের পত্রাপত্রি চলিতে লাগিল। সোসাইটীর কার্য্য-নির্ব্বাহক সভাকে বুঝাইয়া বলা হয়,—"দেশীয় আচার জুতা খোলা বটে, কিন্তু সে কোথায়? যেখানে চেয়ারে বসিবার ব্যবস্থা সেখানে জুতা খুলিতে হয় না; যখন ফরাস বিছনায় বসিতে হয়, তখনই জুতা খুলিতে হয়। সম্মান দেখাইবার জন্য জুতা খোলা ভারতবাসীর নিয়ম নহে।"

এই সম্বন্ধে ইংলিসম্যান এই ভাবে বলিয়াছিলেন,—"বিদ্যাসাগরের মতন এক জন পণ্ডিতের প্রতি যখন এইরূপ ব্যবহার, তখন এসিয়াটিক সোসাইটীতে আর কোন পণ্ডিত যাইতে চাহিবেন না।"

সোসাইটীর জুতাবিভ্রাটের সূত্র ধরিয়া, ১২৮১ সালের ২৬শে আষাঢ় বা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুলাই তারিখের "সাধারণী"তে "তালতলার চটি" শীর্ষক, নিম্নলিখিত প্রেরিত লিখিত হইয়াছিল,—

"রে তালতলার চটি, ইংরাজের আমলে কেবল তোরই অদৃষ্ট ফিরিল না! ইংরাজ, বটবিটপীর সহিত সাফোটক সমান করিয়া তুলিয়াছেন, কেবল বুট, চটির গৌরব এক করিতে পারিলেন না। ইংরাজ, মহারাজ সতীশচন্দ্র বাহাদুরের সহিত মধু মুচীকে এক কাণ ফোঁড়া কাগজে গাঁথিলেন, কেবল, রে চটি! তোর দুরদৃষ্টক্রমে, বুট চটি, একভাবে দেখিতে

পারিলেন না। ইংরাজ, বিচারকার্য্যের সাহায্য জন্য সাক্ষী ডাকিয়া আনেন, আনিয়া, তিনু ক্ষেপার স্থানে শ্রীধর সার্ব্বভৌমকে দাঁড় করান, আবার সার্ব্বভৌমের স্থানে গুলজার মণ্ডলকে উঠাইয়া দেন, ইংরাজের চক্ষে উচ্চ নীচ নাই, কেবল রে চর্ম্ম-চটি! তোরই প্রতি তাঁহাদের সমদৃষ্টি হইল না। ইংরাজ বাহাদুর বস্ত্র-পরিষ্কারককে অস্ত্রচিকিৎসক করিয়াছেন, মলজীবীর পুত্রকে মসীজীবী করিয়াছেন, ধীবর মৎসজীবীকে, ধীমান বিচারপতির কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, পীরবক্স খাঁকে রায় বাহাদুর করিয়াছেন, কিন্তু হতভাগা তালতলার চটি, এত উন্নতিতেও তোর কিছুমাত্র উন্নতি হইল না।

চটি তুই আপনার কর্ম্মদোষে আপনি মারা গেলি! এমন সামাজিক জোয়ারে তাই তুই ঠেলিয়া উঠিতে পারিলি না! তুই আপনার কর্ম্মদোষে মারা গেলি ; এ কথা কেন বলি ? তবে শোন্ :—মহামনি রব্ রায়, শ্রীমান্ মেকলে, আচার্য্যবর ডাক্তার ডফ্, পাদরি মনক্রিফ্ উড্, অশেষ ধীশক্তি-সম্পন্ন অতি বদান্য জারজ কাম্বেল প্রভৃতি মহাত্মা লোক অপেক্ষা স্কটল্যাণ্ড-বাসী সাধারণ লোক যত নীচ ; আবার সেই সাধারণ স্কটলণ্ডীয় হইতে ইংলণ্ডীয়েরা তত নীচ। সেই ইংলণ্ডীয় অপেক্ষা ইটালীয়েরা আবার সেই পরিমাণে নীচ ; ইটালীয় হইতে হিন্দুমাত্রেই ততোধিক নীচ, সেই হিন্দুর অপকৃষ্ট বাঙ্গালি, যে নীচস্থ নীচ, তুই না ইংরাজের মস্তক থাকিতে, স্কটলণ্ডীয়ের বিশাল বক্ষঃ থাকিতে, ইটালীয়ের সুন্দর দেহ থাকিতে, এত জাতির এত অবয়ব থাকিতে, তুই কিনা চটি সেই নীচস্থ নীচ বাঙ্গালির পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলি ?

তোর ঈর্ষা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? তাহাতেই বলি, চটি তুই আপনি আপনার কর্ম্মদোষে মারা গেলি! তোকে যে সকল মহৎ স্থান দেখাইয়া দিলাম, যদি এত দিন সেই সকল স্থানে বিশ্রামের উদ্যোগ করিতিস্, তাহা হইলে এত দিন তোর গৌরব, তোর গুণ স্যাটর্ডে রিবিউ

সংহিতা পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাত হইত। সেইরূপ উন্নতির উদ্যোগ করা দূরে থাকুক্, তুই কিনা সেই নীচস্য নীচ বাঙ্গালি জাতির মধ্যে যে কুসন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তাহারই ফাটা পায়ের আশ্রয় লইয়া, মহামন্ত্রপূত ইংরাজের যাদুগৃহে প্রবেশ লাভ করিতে ইচ্ছা করিস্।

তালতলার সম্ভূতার এতদূর স্পর্দ্ধা। শৌচিকালয়ের নিভৃতার্দ্রপ্রদেশে যদি ক্রমাগত দশ হাজার বৎসর উপর্য্যুপরি থাকিয়া লর্ড মেকলের তপস্যা করিতে পারিস্, করিয়া, লালবাজারে জন্মগ্রহণ করত পেণ্টুলনধারী কোন কেরাণীর পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিতে পারিস্, তবে এরূপ স্থানে আসিতে আকাঙ্ক্ষা করিস্। তোর এ জন্মে, এ চর্ম্মচটি-জন্মে, কুসন্তান বিদ্যাসাগরের বলে তুই এ স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবি না। বোধ হয়, তুই কখন মহর্ষি ডার্বিনের তন্ত্রশাস্ত্র পাঠ করিস্ নাই—মেটকাফ্ ভবনে যাইতে পারিবি না, সে তন্ত্র দেখিতে পাইবি কোথা হইতে? যদি তোর ডার্বিন-তন্ত্র পড়া থাকিত, ত বুঝিতে পারিতিস্।

পার্ক ষ্ট্রীটের শ্রীমন্দির রাজপুরুষগণের পিতৃপুরুষদিগের সমাধি-শালা। ইহাতে তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণের, ভ্রাতৃবর্গের, কুটুম্বসজ্জনের পবিত্র অস্থি সঞ্চিত থাকে। ইহার জন্য পুজারি, পুরোহিত, পরিষ্কারক, প্রয়াজক প্রভৃতি কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে; ইহার জন্য বিপুল অর্থব্যয়ে নূতন সমাজ-মন্দির গঠিত হইতেছে, তাই কলঙ্কিনী, তালতলা-সম্ভূতা, অপকৃষ্ট জুতা, বিদ্যাসাগর পদাশ্রিতা, তোর কেন এ স্পর্দ্ধা!!! দূরীভব।

চটির বড় লাঞ্ছনা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্রোপম প্রিয়-পাত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বসু মহাশয়ের মুখে এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আর একটী গল্প শুনিয়াছি,—

পূর্ব্বে বহু-বিবাহের আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করাইবার জন্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বর্দ্ধমানের রাজবাটীতে যাইতে হইয়াছিল। রাজ-দরবারের

দ্বাররক্ষক, তাঁহাকে চটি জুতা খুলিয়া রাখিয়া যাইতে বলে। বিদ্যাসাগর মহাশয়, জুতা খুলিয়াই, দরবারে প্রবেশ করেন। বলা বাহুল্য, মহারাজ, তাঁহাকে সাদর-সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। রাজার নিকট বিদ্যাসাগরের এত সাদরসম্মান দেখিয়া, দ্বার-রক্ষক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। সে অন্যান্য কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারে, যাঁহার এত সম্মান, তিনি স্বয়ং বিদ্যাসাগর। কার্য্যান্তে বর্দ্ধমানরাজ, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিদায় দিবার জন্য দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। রাজা বাহাদুর, বিদায় দিয়া যেমন ফিরিলেন, অমনই দ্বার-রক্ষক করযোড়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিল,—"আমি চিনিতে পারি নাই, ক্ষমা করুন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"তোমার দোষ কি? তোমার মনিবের যেমন হুকুম, তেমনই করিয়াছ।" রাজা এ কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় চলিয়া আসিলে পর, তিনি দ্বার-রক্ষককে ভৎসনা করিয়া, তাড়াইয়া দেন। দ্বার-রক্ষক অন্যান্য কর্ম্মচারীর পরামর্শমতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হয়। বিদ্যাসাগার মহাশয়, ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি তখনই দ্বার-রক্ষকে পুনরায় কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া, রাজা-বাহাদুরকে একখানি নরম-গরম পত্র লিখেন। রাজা-বাহাদুর পত্র পাইয়া, দ্বার-রক্ষককে পুনরায় কার্য্যে নিযুক্ত করেন।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

কলেজ-প্রতিষ্ঠা, মসীযুদ্ধ, দৈনিকের মত, আয়-হ্রাস, সাঁওতালের সহানুভূতি, রহস্য-রস ও অনারেবল দ্বারকানাথ।

১২৭১ সালের ১১ই বৈশাখ বা ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রেল মেট্রপলিটন ইনষ্টিটিউসনে বি,এ ক্লাস পর্য্যন্ত খুলিবার জন্য, তাৎকালিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার এইচ, স্মিথ সাহেবকে আবেদন করা হইয়াছিল। সে আবেদনে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, হরচন্দ্র ঘোষ ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বাক্ষর ছিল। ইঁহারা তখন ম্যানেজার ছিলেন। ফাষ্ট আর্ট ক্লাস খুলিবার কোন ক্রটি ছিল না। এই ক্লাসে ৩৯টী ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ বসু, হিড়ম্বলাল গোস্বামী, বি,এ ও মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এ আবেদনে ফল হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষেরা কলেজ খুলিতে অনুমতি দেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছাড়িবার পাত্র নহেন। কলেজ খুলিবার জন্য তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন। ১২৭৮ সালের ১২ই মাঘ বা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি কলেজ খুলিবার জন্য বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ মিত্র ও কৃষ্ণদাস পাল একত্র নাম স্বাক্ষর করিয়া তাৎকালিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রেজিষ্টার সার্টক্লিফ সাহেবকে আবেদন করিয়াছিলেন। ১২৭৮ সালের ১৪ই মাঘ

বা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি বিদ্যাসাগর মহাশয়, ভাইস চ্যান্সালারকে স্বয়ং স্বতন্ত্র এক আবেদন করেন। এ আবেদনর মর্ম্ম এই,—

"আমরা মেট্রপলিটন বিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত করিতে অদ্যকার সিণ্ডিকেটের নিকট আবেদন পাঠাইলাম। আপনাদিগের সহায়তার আশা না করিলে আমি এ কর্ম্ম করিতাম না। গত বৎসর আপনার সহিত দেখা করিতে পারি নাই বলিয়া আমার দরখাস্ত করা হয় নাই। আমি জানি না, সিণ্ডিকেটের অন্যান্য সভ্যগণ এ সম্বন্ধে কি মতামত প্রকাশ করিবেন; কিন্তু এই ইনষ্টিটিউসনের এক জন কার্য্যনির্ব্বাহক, সটক্লিফ ও আটকিন্‌সন সাহেবের সহিত দেখা করিয়াছিলেন। শেষোক্ত মহোদয় বলিয়াছিলেন, যদিও এ সম্বন্ধে তাঁহার অনেক আপত্তি আছে, তথাপি তিনি আবেদনে সম্মতি প্রদান সম্বন্ধে বাধা দিবেন না। যদি সিণ্ডিকেটে সভ্য মহোদয়গণের মধ্যে এমন কথা উঠে যে, দেশীয় অধ্যাপকগণ কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ে পাঠকার্য্য তেমন সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইবে না, তাহা হইলে আমি বলিতে পারি, সংস্কৃত কলেজে, বি,এ পর্য্যন্ত পড়ান হইয়া থাকে এবং তাহা শুদ্ধ এ দেশীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত। এ কলেজেও সেই প্রকার শিক্ষককে শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে। আমাদিগের বিশ্বাস, যত্ন ও বিবেচনাপূর্ব্বক দেশীয় অধ্যাপক লইতে পারিলে, তাঁহাদিগের দ্বারা সুচারুরূপে কার্য্য চলিতে পারে। কিন্তু যদি কার্য্য করিতে করিতে ইংরেজী শিক্ষায় ইংরেজী অধ্যাপকের প্রয়োজন বোধ হয়, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই এক জন ইংরেজী অধ্যাপক নিযুক্ত করিব। এ কথা বলা বাহুল্য, বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনই আমাদিগের উদ্দেশ্য। সে জন্য আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করিব। বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগের বেতন কিরূপ হওয়া উচিত, বোধ করি কেহ

কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন। সেটা আমার বিবেচনায় নিযুক্ত নিয়োজকের ভিতরে মীমাংসার কথা। আমাদের উদ্দেশ্য, যতদূর সম্ভব, স্বল্পব্যয়ে ভাল ভাল লোক নিযুক্ত করা। আমি অনেক কাল হইতে বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়া আসিতেছি। আশা করি, অধ্যাপকনির্ব্বাচন ও বেতননির্দ্ধারণ সম্বন্ধে আমার নিজের বিবেচনা মত কার্য্য করিতে দিবেন।

অধিক আর কি বলিব, আমাদের বিদ্যালয়টীতে উচ্চ শিক্ষা দিবার উপযোগী করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। মধ্যবিত্ত লোকের, অধিক বেতন দিয়া, পুত্রদিগকে প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠ করিতে দেওয়া অসম্ভব। এদিকে তাঁহারা পুত্রদিগকে মিসনরী স্কুলে পড়িতে দিতে ইচ্ছা করেন না। কাজেই প্রবেশিকা পড়াইয়াই, তাহাদিগকে পুত্রের শিক্ষা দেওয়া বন্ধ করিতে হয়। তাহাদিগের পক্ষে এই বিদ্যালয় অনেক উপকারে আসিবে।

আমি, জষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্র ও বাবু কৃষ্ণ পাল—এই তিন জনে এই বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক। আমাদিগের হাতে বিদ্যালয় পরিচালনের উপযোগী অর্থ আছে। যদি কোন সময়ে অর্থের অনাটন ঘটে, তাহা হইলে আমরা নিজের হইতে সে অভাব পুরণ করিতে পশ্চাৎপদ হইব না।"

আবেদন মঞ্জুর হইয়াছিল। এই বৎসর ফাষ্ট আর্ট ক্লাস প্রতিষ্ঠিত হয়। আবেদন করিবার পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাৎকালিক সেক্রেটারী ই, সি, বেলী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সাক্ষাতে তিনি বলেন—"আপনাদের মহিমা বুঝা ভার। আপনারা বলেন, বাঙ্গালী সকল কার্য্যেই গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী। কিন্তু আমি আমার স্কুলে কলেজ খুলিয়া বাঙ্গালী অধ্যাপক প্রতিপালিত করিতে চাহি। ইহাতে গবর্ণ-

মেণ্টের মুখাপেক্ষিতা কিছুই নাই। আপনারা কিন্তু তাহাতে বাদ সাধিলেন। পাছে মিশনরীদের কার্য্যে ব্যাঘাত পড়ে, এই উদ্দেশ্যে আমার কার্য্যে ব্যাঘাত। মিশনরীরা উচ্চ শিক্ষার ভার লইয়া, হিন্দু সন্তানকে আয়ত্ত করিয়াছেন। আমার কলেজ হইলে, তাহাতে একটা ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা। তাই তাঁহারা আমার কলেজ-স্থাপন প্রস্তাবের ঘোর প্রতিবাদী।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা শুনিয়া, সাহেব বলিলেন,—"আপনি আবার আবেদন করুন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন,—"আপনি যদি আমার পক্ষসমর্থন করেন, তাহা হইলে আমি আবেদন করিতে পারি।" সাহেব বলেন,—"আমি একা সমর্থন করিলে কি হইবে?" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন,—"তাহা হইলেই হইবে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সকল সরকারী সভ্য তো আপনার অধীন। আপনি যে পথে যাইবেন, তাঁহারাও সেই পথে যাইবেন। তাঁহাদের সকলকেই অনেক বিষয়ে আপনার উপর নির্ভর করিতে হয়।" সাহেব পক্ষ সমর্থনে রাজি হন।

মেট্রপলিটনে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, শিক্ষা-বিভাগের এক জন উচ্চতম সাহেব কর্ম্মচারী বলিয়াছিলেন,—"এইবার উচ্চশিক্ষার সমাধি হইল।" *

বলা বাহুল্য, মেট্রপলিটনের এম, এ পর্য্যন্ত শিক্ষিতের নিত্য

* এই কথাটী হাইকোর্টের অন্যতম উকীল শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি।

কীর্ত্তিকুশলতা এই গর্ব্বিত কর্ম্মচারীর গর্ব্বখর্ব্বকারিতার কৃপাণ-নিশান স্বরূপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

কলিকাতার সুকিয়া ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন রায়ের বাড়ীর নিকট প্রথম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্ব্বে শঙ্কর ঘোষের ষ্ট্রীট হইতে, সুকিয়াষ্ট্রীটের এক স্বতন্ত্র বাড়ীতে স্কুল উঠিয়া আসিয়াছিল।

কলেজের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনেক অর্থ-ব্যয় করিতে হইয়াছিল। ছাত্রদিগের বেতন তিন টাকার উর্দ্ধ হইল না; অথচ অধিক বেতনের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে হইল; সুতরাং ঘরের অর্থব্যয় ভিন্ন আর উপায় কি? যেরূপেই হউক, কলেজের শিক্ষা সুচারুরূপে চলিতে লাগিল। এ দেশীয় ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিরাই অধ্যাপনার ভার লইয়াছিলেন।

এই সময় সংস্কৃত কলেজের "স্মৃতি-বিভাগ" লইয়া, তদানীন্তন ছোট লাট বাহাদুরের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মসীযুদ্ধ চলিয়াছিল। ছোট লাট বাহাদুর, ব্যয়সংক্ষেপ-সঙ্কল্পে স্মৃতি-শাস্ত্রাধ্যাপকের পদ উঠাইয়া দিবার ইচ্ছা করেন। এতদ্ব্যতীত সাহিত্যের দুইটী ইংরেজী অধ্যাপক পদ উঠাইয়া এবং অন্যান্য দুই একটী কার্য্য তুলিয়া দিয়া, মাসিক প্রায় ৬৫০ টাকার ব্যয়-সংক্ষেপ করিবার সঙ্কল্প হয়। চারি দিকে একটা হুলস্থুল কাণ্ড বাধিল। তুমুল আন্দোলন উঠিল। যাহাই হউক, পরে ধার্য্য হয়, স্মৃতির অধ্যাপনা, অলঙ্কারের অধ্যাপক দ্বারা সম্পাদিত হইবে। সাধারণ্যে রব উঠিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে

পরামর্শ করিয়াই, এই স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু তাহা স্বীকার করেন নাই। এই সূত্রেই মসীযুদ্ধ। এতৎসম্বন্ধে যে পত্র লেখা-লেখি হইয়াছিল, তাহার ভাবার্থ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, ছোট লাটের প্রাইবেট সেক্রেটরি লট-সন জনসন সাহেবকে প্রতিবাদ করিয়া যে পত্র লেখেন, তাহার মর্ম্ম এই ;—

"স্মৃতি শাস্ত্র এত প্রকাণ্ড যে, এক জন মনুষ্য সমস্ত জীবনে তাহা পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারে না। সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন, অথচ স্মৃতি ভাল জানেন, এমত লোক থাকা কিছু অসম্ভব নহে ; কিন্তু নিতান্ত বিরল। প্রেসিডেন্সি কলেজের এক জন সাহিত্যে অথবা গণিতের অধ্যাপককে নিজের কাজ করিয়া আইনের অধ্যাপকতা করিতে বলিলে যেরূপ ফল হয়, ইহাতেও সেইরূপ ফল হইবার সম্ভাবনা। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের উপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে ; তবে এক জনের উপর এত অধিক ভার দিলে আইন-শিক্ষাও ভাল হইবে না ; অন্যান্য শিক্ষাও ভাল হইবে না। হিন্দু-সমাজের ইচ্ছা, স্মৃতির এক জন স্বতন্ত্র অধ্যাপক থাকেন। ছোট লাট যে মতামত জানিয়া কার্য্য করিয়াছেন, ইহা তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ, সন্দেহ নাই। লোকের ইচ্ছা যেরূপ, তাহা আমি জানি ; তথাপি গেজেটে যখন আমার মত লওয়া হইয়াছে বলিয়া লেখা হইয়াছে, তখন দেশের লোকে মনে করিবে, আমার বুঝি ঐরূপ

অভিপ্রায়; কিন্তু আমার মত ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী; ইহা প্রকাশ থাকা আবশ্যক।"

২৫শে মে তারিখে জনসন সাহেব, এই পত্রের যে উত্তর দেন, তাহার মর্ম্ম এই,—

"আপনার নিজের মত ঐরূপ নহে, তাহা ঠিক কথা। তবে অধ্যাপনা সম্বন্ধে ছোট লাটের মত এই, অধ্যাপকের স্মৃতি-অধ্যাপনাই প্রধান কার্য্য হইবে; অন্যান্য অধ্যাপনা নিম্নস্থান অধিকার করিবে। পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এই কার্য্য উত্তম-রূপে সম্পন্ন করিতেছেন। উপস্থিত বন্দোবস্ত আপাততঃ চলিতেছে; পরে যদি ভাল না চলে, তবে নূতন বন্দোবস্ত করা যাইবে।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়, ১০ই জুনের হিন্দুপেটরিয়টে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া, আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এইরূপ তেজস্বিতার কথা স্মরণ করিয়াই, বোধ হয়, দৈনিকসম্পাদক লিখিয়াছিলেন,—

"যে সকল উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের কাছে অন্যে মাথা হেট করিয়া থাকেন, বিদ্যাসাগর তাহাদিগকে আপনার সমান বলিয়া মনে করিতেন। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদিগের সহিত বন্ধুত্বসুলভ সদ্ভাবসম্বন্ধ ছিল; তিনি কোন কালেই কাহারও তোষামোদ করেন নাই। গবর্ণর ও কাউন্সিলের সভ্যদিগকে বিদ্যাসাগর নিজের বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন; বড় আদালতের জজদিগ-কেও সেই ভাবে দেখিতেন। উচ্চপদে এমন ইংরেজ ছিলেন না,

যাঁহার কাছে বিদ্যাসাগরকে ভয়ে ভয়ে মাথা হেঁট করিয়া কথা কহিতে হইত।”

ইহার পর শিক্ষা বিভাগে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকের বিক্রয় কমিয়া যাওয়ায় আয়ের হ্রাস হইয়াছিল। বিদ্যারত্ন মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে নিম্নলিখিত কথা শুনিয়াছিলেন,—

“বর্ত্তমান ছোট লাট কাম্বেল সাহেবের সহিত আমার মনান্তরের কারণ এই যে, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপকের পদ পাইবার সময় আমার সহ পরামর্শ করিয়া, আমার উপদেশের বিরুদ্ধে ঐ পদ পাইবার আজ্ঞা দেন এবং প্রকাশ করেন যে, এ বিষয় তিনি আমাদের সহ পরামর্শ করিয়া, কার্য্য করিয়াছেন; কিন্তু আমি ইহা দ্বারা সাধারণের ক্ষতি ও নিজের অপবাদ দেখিয়া, ঐ বিষয় প্রকাশ করায়, তাঁহার সহ মনান্তর হয়। এই কারণে শিক্ষা বিভাগে আমার পুস্তকের বিক্রয় কমিরা যাওয়ায় আয়ের অনেক হ্রাস হইয়াছে।”

এই কারণে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কাহারও কাহারও মাসিক বন্দোবস্ত কমাইতে হয়। পরে আয় বৃদ্ধি হইলে, সকলেরই বন্দোবস্ত পূর্ব্ববৎ হইয়াছিল।

কলেজ-প্রতিষ্ঠার পর, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কলেজের জন্য যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিতে হইত। ইহাতে তাঁহার ভগ্নশরীর আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল; সুতরাং ক্রমেই অতি স্বাস্থ্যপ্রদ নিভৃত স্থানে বাস করিবার প্রয়োজন হইল। এই সময়

দিওঘরে একটী বাঙ্গালা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্রথমত তাহা ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার মূল্য অত্যধিক বিবেচনা করিয়া, তিনি তাহাতে ক্ষান্ত হন। পরে তিনি অতি সুন্দর স্বাস্থ্যপ্রদ বনজঙ্গলে পরিবৃত কর্ম্মটাঁরের এক অতি নিভৃত স্থানে একটী বাঙ্গালা প্রস্তুত করেন। কর্ম্মটাঁ সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত। সাঁওতালগণ তাঁহার প্রতিবেশী হইল। অসভ্য সাঁওতালগণ ক্রমে তাঁহার আত্মীয় অপেক্ষা আত্মীয় হইয়া দাঁড়াইল। বিদ্যাসাগরের করুণা-মর্ম্ম তাহারা বুঝিয়া লইল। কেহ দাদা, কেহ বাবা, কেহ জেঠা, ইত্যাদিরূপে সম্পর্ক পাতাইল। জীর্ণ পর্ণ-কুটীর ময় মলিন সাঁওতাল-মণ্ডপ, বিদ্যাসাগরের করুণস্রোতে প্লাবিত হইল। বিদ্যাসাগর শীতের সময় সাঁওতালদিগকে চাদর ও কম্বল বিতরণ করিতেন। যে সময়ের যে ফল, সর্ব্ব-সুরস-বঞ্চিত দরিদ্র সাঁওতাল, বিদ্যাসাগরের প্রসাদে তাহার রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইত। বস্ত্র নাই, বিদ্যাসাগর বস্ত্র দিতেন; অন্ন নাই, অন্ন দিতেন; যা নাই, তাই দিতেন। সাঁওতাল প্রবল পীড়ায় শয্যাগত; বিদ্যাসাগর তাহার শিয়রে বসিয়া মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিতেন; হাঁ করাইয়া পথ্য দিতেন; উঠাইয়া বসাইয়া মলমূত্র ত্যাগ করাইতেন; সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিতেন। বিদ্যাসাগর যেখানে, সেই খানেই প্রেম ও করুণা। তিনি প্রাতঃকালে ভ্রমণে বাহির হইতেন; প্রত্যেক সাঁওতাল-বন্ধুর গৃহে গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতেন; কাহারও নিকট কুমড়া,

কাহারও নিকট বেগুন, কাহারও নিকট শশা ইত্যাদি উপহার লইয়া, প্রফুল্লবদনে বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিতেন। বাঙ্গালার প্রাঙ্গণ-ভূমি পরিচ্ছন্ন-পরিষ্কৃত এবং স্বহস্ত-রোপিত নানা ফল-ফুলের বৃক্ষে পরিশোভিত; যেন একখানি ক্ষুদ্র নন্দন-কানন। যখনই তিনি কর্ম্মটাঁড়ে যাইতেন, তখনই হয় কন্যা, না হয় দৌহিত্র, না হয় অন্য কোন আত্মীয় তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। ইচ্ছা হইলে বিদ্যাসাগর, সাঁওতালদিগকে নাচাইতেন। সরল-হৃদয় সাঁওতালদের সেই বর্ব্বর-নর্ত্তনে সারল্যের অনুপম মাধুর্য্য অনুভব করিয়া, বিদ্যাসাগরের করুণ-হৃদয়খানি বিপুল পুলকে প্লাবিত হইয়া যাইত। সত্য সত্যই কর্ম্মটাঁড়ে যাইয়া, তিনি স্বর্গীয় শান্তি উপভোগ করিতেন। সাঁওতালদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়, একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধু-বান্ধব পরিচিত ব্যক্তিগণ স্বাস্থ্য-সম্পাদন মানসে অনেক সময় কর্ম্মটাঁড়ে যাইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, সকলকেই সাদর সম্ভাষণায় ও আতিথ্য-অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত করিতেন। একবার সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়, অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া, কর্ম্মটাঁড়ে গিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্বহস্তে তাঁহার মল-মূত্রাদি পরিষ্কারের ভার লইয়াছিলেন। ইহাতে নীলমণি বাবু লজ্জিত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন,—"ইহার জন্য লজ্জা কি? বায়না দিয়া রাখিলাম।"

বলিয়াছি ত, বিদ্যাসাগর সময় বুঝিয়া, পাত্র বিবেচনায় সকল সময় যথাযোগ্য রহস্য করিতেন। একবার তিনি চারিটী পণ্ডিতকে লইয়া লাট-দরবারে গিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ দেখেন, বাঙ্গালী ব্যতীত সকলের মস্তকে উষ্ণীষ। তাঁহারা বলেন, ইহার কারণ কি? বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া বলেন,—"বাঙ্গালী মাতৃভূমির আর কোন কাজ করিতে পারেন নাই; মাথার উষ্ণীষ ত্যাগ করিয়া মাতৃভূমির ভার কমাইয়াছে।" ইহা রহস্য বটে; কিন্তু মর্ম্মান্তিক।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, সাঁওতালদিগের সরলতা ও সত্য-প্রিয়তার প্রথম পরিচয় এইরূপে প্রাপ্ত হন,—"পূর্ব্বে কর্ম্মটাঁড়ে জমী-জমার আঁটা-আঁটী সরহদ্দ ছিল না। অনেকে অনেক সময় জমা কিনিয়া, অপরের জমী টানিয়া লইতেন। এক জন বাঙ্গালী বাবু একবার এইরূপ একটু জমী টানিয়া লইয়া বেড়া দেন। অভিযোগ হইয়াছিল। অভিযোগে হাকিমের তদন্তে আসিবার কথা ছিল। যে দিন হাকিমের আসিবার কথা, সেই দিন কতকগুলি সাঁওতাল বাবুটীর জমীতে কাজ করিতেছিল। বাবুটী তাহাদিগকে বলেন,—"হাকিম আসিলে তোরা বলিস্,—বেড়ার ভিতরের জমী সব বাবুর।" হাকিম আসিলে, সাঁওতালগণ উক্তরূপ কথা বলিল। কিন্তু হাকিম দুই একবার ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করাতে, তাঁহারা কাঁদিয়া ফেলিল। তাহারা আর সত্য না বলিয়া থাকিতে পারিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়, এই ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। সেই দিন

হইতেই সাঁওতালদের প্রতি তাঁহার অটল প্রীতি।* তিনি এক দিন কবি হরিশ্চন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—"পূর্ব্বে বড় মানুষদের সহিত আলাপ হইলে, বড় আনন্দ হইত; কিন্তু এখন তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সাঁওতালদের সহিত আলাপে আমার প্রীতি। তাহারা গালি দিলেও আমার তৃপ্তি। তাহারা অসভ্য বটে; কিন্তু সরল ও সত্যবাদী।" †

১২৮০ সালের ১৪ই ফাল্গুন বা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি, হাইকোর্টের অন্যতম জজ দ্বারকানাথ মিত্র ইহলোক পরিত্যাগ করেন। দ্বারকানাথের মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর মহাশয় শোকে অভিভূত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর বহু কার্য্যেই দ্বারকানাথের পরামর্শ লইতেন; দ্বারকানাথও বিদ্যাসাগরের মত না লইয়া, কোন কঠিন বিষয়ের সহসা মীমাংসা করিতেন না। উভয়েই উভয়েরই সহায় ও পৃষ্ঠপোষক। পতিতা রমণীর বিষয়াধিকারের মোকদ্দমা সম্বন্ধে উভয়ের মতভেদমাত্র লক্ষিত হইয়াছিল; নতুবা অন্য কোন বিষয়ে কোন মতভেদ দেখা যায় নাই। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পূর্ব্বে হাইকোর্টে উক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। মোকদ্দমার পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এবং ৺ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের মত গৃহীত হয়। বিচার্য্য

* শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে এ কথা শুনিয়াছিলেন।

† হরিশ্চন্দ্রের আত্মীয় রাধাকৃষ্ণ বাবু একথা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।



অনারেবল জষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্র।

এই,—হিন্দু-রমণী স্বামি-বিয়োগান্তে, স্বামি-পরিত্যক্ত বিষয়ের একবার উত্তরাধিকারিণী হইলে পর, যদ্যপি তাহার চরিত্র কলঙ্কিত হয়, তাহা হইলে হিন্দুশাস্ত্রমতে পুনরায় সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে কি না? বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যতীত, অপর দুই জন পণ্ডিত উপস্থিত হইয়া বলেন, হিন্দুশাস্ত্রমতে কলঙ্কিত বিধবা, বিষয়চ্যুত হইতে পারে। দ্বারকানাথের এই মত ছিল; কিন্তু তাঁহার এই মত টিকে নাই। দশ জন বিচারক এই মোকদ্দমার বিচারভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুই জন ব্যতীত কেহই, দ্বারকানাথের পক্ষ সমর্থন করেন নাই। পরম বন্ধু রাজকৃষ্ণ বাবু কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, বিদ্যাসাগর বলিয়াছিলেন,—"আমি অন্যায় কিরূপে বলিব? অন্যায়ই বা শুনিবে কে? আমি অবশ্য ভ্রষ্টাচারের পক্ষপাতী নহি; কিন্তু এক জন বিষয়ের অধিকারিণী হইলে, কেমন করিয়া বলিব, আবার সে বিষয়চ্যুত হইবে; তাহা হইলে তো নানা কারণে পদে পদে বিষয়চ্যুতির মোকদ্দমা সংঘটিত হইবে।" এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের দূরদর্শিতার পরিচয় নাই সত্য; সমগ্র হিন্দুসমাজ ইহাতে সংক্ষোভিত; কিন্তু বিদ্যাসাগরের দৃঢ় ধারণা ও প্রতীত ছিল যে, এরূপ অবস্থায় কেহ বিষয়চ্যুত হইতে পারে না। অনেকে বলেন, পতিতা-রমণীর বিষয়চ্যুতি আইনসিদ্ধ হইলে, বিদ্যাসাগরের প্রিয় বিধবাবিবাহ-ব্রতে কতকটা ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা; দূরদর্শী বিদ্যাসাগর ইহা বুঝিয়াই দ্বারকানাথের বিরুদ্ধবাদী হইয়াছিলেন। কিন্তু এ কথায় বিশ্বাস করিতে

সহজে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। আমরা প্রতিনিয়তই দেখিয়া আসিতেছি, শত্রুর ভ্রুকুটীভঙ্গে মিত্রের সস্নেহ সম্ভাষণে বা আপনার স্বার্থসাধন উদ্দেশে, বিদ্যাসাগরের কখন কোনরূপ পদস্খলন হয় নাই।

দ্বারকানাথ প্রায়ই বলিতেন,—"বিদ্যাসাগরই আমার উন্নতির মূল। বিদ্যাসাগরের পরামর্শে আমি ওকালতী পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হই। তিনি সে পরামর্শ না দিলে, হয়ত আমার সে প্রবৃত্তি আদৌ হইত না।"

দ্বারকানাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ্ ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। পানদোষ জন্য পাছে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরক্তিভাজন হইতে হয় বলিয়া, তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অতি সাবধানে থাকিতেন। যখন উকীল, তখন উকীলের বেশে, যখন জজ তখন জজের পরিচ্ছদে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় যাইয়া উপস্থিত হইতেন। যখন-তখন তিনি বিদ্যাসাগরের বাসায় রাত্রি যাপন করিতেন। পীড়িত-পরিত্রাণে যেমন ডাক্তার দুর্গাচরণ, জমীদার-পীড়িত প্রজা-উদ্ধারে তেমনই দ্বারকানাথ, বিদ্যাসাগরের অকৃত্রিম সহায় ছিলেন। এক সময় উত্তরপাড়ার জমীদার ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, ব্রহ্মোত্তর কাড়িয়া লইতেছেন বলিয়া, অনেক ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। বিদ্যাসাগর তাঁহাদের মোকদ্দমায় সাহায্য করিতেন। দ্বারকানাথ তাঁহার অনুরোধে বিনা পয়সায় অনেকের

মোকদ্দমা চালাইতেন। এক দিন দ্বারকানাথ বলেন,—"পাছে আপনি মনে করেন, টাকা পাইব না বলিয়া ইহাঁদের মোকদ্দমা ফেরত দিলাম, তাই আপনায় নিকট বুঝাইয়া বলিতে আসিয়াছি, ইহাদের কোন সত্বই নাই; যদি তিলমাত্র প্রমাণ পাইতাম, তবে প্রাণপণে লড়িতাম।" দ্বারকানাথের কথায় বিদ্যাসাগর মহাশয়, সিদ্ধান্ত করেন, জয়কৃষ্ণ দোষী নহে? যাহার স্বত্ব নাই, সে কেন জমী ভোগ করিবে? বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে বলিয়াছিলেন,—"যিনি স্বত্ব প্রমাণ করিতে পারিতেন, জয়কৃষ্ণ বাবু তাঁহাকে জমী ফেরৎ দিতেন, এ তত্ত্ব আমি পরে জানিতে পারিয়াছিলাম।" প্রশ্নোত্তর ব্যাপারে জয়কৃষ্ণ বাবুর উপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্রদ্ধা একটু কমিয়া গিয়াছিল; কিন্তু দ্বারকানাথের কথায় পূর্ব্ব শ্রদ্ধা সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। তিনি সততই জয়কৃষ্ণ বাবুর দাতৃত্ব ও অসাধারণ পুস্তকাগারের প্রশংসা করিতেন। জয়কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি রাজনীতির কোন সভার সহিত সংস্রব রাখিতেন না; কেবল জয়কৃষ্ণ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রায় ব্রিটিন্ ইণ্ডিয়ান সভায় যাতায়াত করিতেন।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

কন্যার বিবাহ, উইল ও সাক্ষ্য-বাক্য।

১২৮২ সালের ৩০শে আষাঢ় বা ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় কন্যার বিবাহ হয়। পাত্র শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অধিকারী। ইনি বি, এ, উপাধিধারী। পুত্র-বর্জ্জনের পর বিদ্যাসাগর মহাশয়, জামাতা সূর্য্যকুমারে পুত্রপ্রেম ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

১৮৭৫ সালে এক উইল হয়। এই উইলে পুত্র নারায়ণ বিষয় বর্জ্জিত হন।* শাস্ত্রানুসারে অন্য কোন উত্তরাধিকারী বিষয় পাইবেন বলিয়া, স্থির হয়।

উইলের ভাষা বিশুদ্ধ মার্জ্জিত বাঙ্গালা। রেজিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, উইলের ভাষা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। উইলের লিপি-প্রণালীতেও নূতনত্ব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উইলে তাঁহার দানশীলতা ও মুক্তপ্রাণতার পরিচয়। উইল খানি এই,—

---

* এই উইল অনুসারে নারায়ণ বাবু প্রকৃতপক্ষে বিষয়বর্জ্জিত হইতে পারেন কি না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পর, তন্মিমাংসার্থ হাইকোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। বিচারে সিদ্ধান্ত হয়, নারায়ণ বাবু বিষয়-বঞ্চিত হইতে পারেন না। তিনি এখন বিষয়াধিকারী।

শ্রীশ্রীহরি—
শরণম্।

১। আমি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে আমার সম্পত্তির অন্তিম বিনিয়োগ করিতেছি। এই বিনিয়োগ দ্বারা আমার কৃত পূর্ব্বাপর সমস্ত বিনিয়োগ নিরস্ত হইল।

২। চৌগাছানিবাসী শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ পাথরানিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদনাথ সিংহ আমার ভাগিনেয় পসপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় এই তিনি জনকে আমার এই অন্তিম বিনিয়োগপত্রের কার্য্যদর্শী নিযুক্ত করিলাম তাঁহারা এই বিনিয়োগপত্রের অনুযায়ী যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

৩। আমি অবিদ্যমান হইলে আমার সমস্ত সম্পত্তি নিযুক্ত কার্য্যদর্শীদিগের হস্তে যাইবেক।

৪। এক্ষণে আমার যে সকল সম্পত্তি আছে কার্য্যদর্শীদিগের অবগতি নিমিত্ত তৎসমুদয়ের বিবৃতি এই বিনিয়োগপত্রের সহিত গ্রথিত হইল।

৫। কার্য্যদর্শীরা আমার ঋণ পরিশোধ ও আমার প্রাপ্য আদায় করিবেন।

৬। আমার সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে আমার পোষ্যবর্গ ও কতকগুলি নিরুপায় জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় প্রভৃতির ভরণপোষণ ও কতিপয় অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে এই সমস্ত ব্যয় একবারে রহিত করিয়া আপন আপন প্রাপ্য আদায়ে প্রবৃত্ত হইবেন আমার উত্তমর্ণেরা সেরূপ প্রকৃতির লোক নহেন কার্য্যদর্শীরা তাঁহাদের সম্মতি লইয়া এরূপ ব্যবস্থা করিবেন যে এই বিনিয়োগপত্রের লিখিত বৃত্তি প্রভৃতি প্রচলিত থাকিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য ক্রমে আদায় হইয়া যায়।

৭। এক্ষণে যে সকল ব্যক্তি আমার নিকট মাসিক বৃত্তি পাইয়া

থাকেন আমি অবিদ্যমান হইলে তাঁহাদের সকলের সেরূপ বৃত্তি পাওয়া সম্ভব নহে। তন্মধ্যে যাঁহারা আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যেরূপ মাসিক বৃত্তি পাইবেন তাহা নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।—

প্রথম শ্রেণী।

পিতৃদেব শ্রীযুত ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা। মধ্যম সহোদর শ্রীযুত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ৪০৲ চল্লিশ টাকা। তৃতীয় সহোদর শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ৪০৲ চল্লিশ টাকা। কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০৲ ত্রিশ টাকা। জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী ১০৲ দশ টাকা। মধ্যমা ভগিনী শ্রীমতী দিগম্বরী দেবী ১০৲ দশ টাকা। কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী মন্দাকিনী দেবী ১০৲ দশ টাকা। বনিতা শ্রীমতী দীনময়ী দেবী ৩০৲ ত্রিশ টাকা। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবী ১৫৲ পনর টাকা। মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনী দেবী ১৫৲ পনর টাকা। তৃতীয় কন্যা শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী ১৫৲ পনর টাকা। কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী ১৫৲ পনর টাকা। পুত্রবধূ শ্রীমতী ভবসুন্দরী দেবী ১৫৲ পনর টাকা। পৌত্রী শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী ১৫৲ পনর টাকা। জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ১৫৲ পনর টাকা। কনিষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ সমাজপতি ১৫৲ পনর টাকা। দৌহিত্রী শ্রীমতী রাজরাণী দেবী ১৫৲ পনর টাকা। কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ শ্রীমতী এলোকাশী দেবী ১০৲ দশ টাকা। শাশুড়ী শ্রীমতী তারাসুন্দরী দেবী ১০৲ দশ টাকা। জ্যেষ্ঠা কন্যার শাশুড়ী শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দেবী ১০৲ দশ টাকা। জ্যেষ্ঠা কন্যার ননদ শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি দেবী ১০৲ দশ টাকা। মাতৃদেবীর মাতুলকন্যা শ্রীমতী উমাসুন্দরী দেবী ৩৲ তিন টাকা। মাতৃদেবীর মাতুলদৌহিত্র গোপালচন্দ্র চট্টোর বনিতা ৩৲ তিন টাকা। পিতৃস্বসৃপুত্র ত্রিলোচন মুখোপাধ্যায়ের বনিতা ৩৲ তিন টাকা। পিতৃদেবের পিতৃস্বসৃকন্যা শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী ৩৲ তিন টাকা। বৈবাহিকী

শ্রীমতী সারদা দেবী ৫৲ পাঁচ টাকা। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মাতা ৮৲ আট টাকা। শ্রীযুক্ত মদনমোহন বসুর বনিতা শ্রীমতী নৃত্যকালীদাসী ১০৲ দশ টাকা। শ্রীযুক্ত মধুসূদন ঘোষের বনিতা শ্রীমতী থাকমণি দাসী ১০৲ দশ টাকা। বারাশতনিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ মিত্র ৩০৲ ত্রিশ টাকা। কালীকৃষ্ণ মরিয়া গেলে তাহার বনিতা শ্রীমতী উমেশ-মোহিনী দাসী ১০৲ দশ টাকা। শ্রীরাম প্রামাণিকের বনিতা শ্রীমতী ভগবতী দাসী ২৲ টাকা।

দ্বিতীয় শ্রেণী।

মাতৃস্বসৃপুত্র শ্রীযুত সর্ব্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৲ দশ টাকা। ভাগিনেয়ী শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী ৫৲ পাঁচ টাকা। জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ননদ শ্রীমতী তারামণি দেবী ৫৲ পাঁচ টাকা। পিতৃস্বসৃকন্যা শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী ২৲ দুই টাকা। মাতৃদেবীর মাতৃস্বসৃপুত্র শ্রীযুত শ্যামাচরণ ঘোষাল ৫৲ পাঁচ টাকা। মাতৃদেবীর মাতুলপুত্র তারাচরণ মুখোর পরিবার ৮৲ আট টাকা। মাতৃদেবীর মাতৃস্বসৃপুত্র শ্রীযুত কালিদাস মুখো ৫৲ পাঁচ টাকা। মাতৃদেবীর পিতৃস্বসৃপুত্র রামেশ্বর মুখোর পরিবার ৫৲ পাঁচ টাকা। মাতৃদেবীর মাতুলকন্যা শ্রীমতী বরদা দেবী ২৲ দুই টাকা। বারাশতনিবাসী নবীনকৃষ্ণ মিত্রের বনিতা শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দাসী ১০৲ দশ টাকা। মদন-মোহন তর্কালঙ্কারের কন্যা শ্রীমতী কুন্দমালা দেবী ১০৲ দশ টাকা। মদন-মোহন তর্কালঙ্কারের ভগিনী শ্রীমতী বামাসুন্দরী দেবী ৩৲ তিন টাকা। বর্দ্ধমানের প্যারীচাঁদ মিত্রের বনিতা শ্রীমতী কামিনী দাসী ১০৲ দশ টাকা।

৮। যদি কার্য্যদর্শীরা দ্বিতীয় শ্রেণীনিবিষ্ট কোন ব্যক্তিকে মাসিক বৃত্তি দেওয়া অনাবশ্যক বোধ করেন অর্থাৎ আমার দত্ত বৃত্তি না হইলেও তাঁহার চলিতে পারে এরূপ দেখেন তাহা হইলে তাঁহার বৃত্তি রহিত করিতে পারিবেন।

৯। আমার দেহান্ত সময়ে আমার মধ্যম তৃতীয়া ও কনিষ্ঠা কন্যার যে

সকল পুত্র ও কন্যা বিদ্যমান থাকিবেক কোনও কারণে তাহাদের ভরণ-পোষণ বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহের অসুবিধা ঘটিলে তাহারা প্রত্যেকে দ্বাবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত মাসিক ১৫৲ পনর টাকা বৃত্তি পাইবেক।

১০। আমার দেহান্ত সময়ে আমার যে সকল পৌত্র ও দৌহিত্র অথবা পৌত্রী দৌহিত্রী বিদ্যমান থাকিবেক তাহাদের মধ্যে কেহ অন্ধত্ব পঙ্গুত্ব প্রভৃতি দোষাক্রান্ত অথবা অচিকিৎস্য রোগগ্রস্ত হইলে আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যাবজ্জীবন মাসিক ১০৲ দশ টাকা বৃত্তি পাইবেক।

১১। যদি আমার মধ্যমা অথবা কনিষ্ঠা ভগিনীর কোনও পুত্র উপার্জ্জনক্ষম হইবার পূর্ব্বে তাঁহার বৈধব্য ঘটে তাহা হইলে যাবৎ তাঁহার কোনও পুত্র উপার্জ্জনক্ষম না হয় তাবৎ তিনি আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে সপ্তম ধারা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ব্যতিরিক্ত মাসিক আর ২০৲ কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইবেন।

১২। যদি শ্রীমতী নৃত্যকালী দাসীর কোনও পুত্র উপার্জ্জনক্ষম হইবার পূর্ব্বে তাঁহার বৈধব্য ঘটে তাহা হইলে যাবৎ তাঁহার কোনও পুত্র উপার্জ্জনক্ষম না হয় তাবৎ তিনি আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে সপ্তম ধারা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ব্যতিরিক্ত মাসিক আর ১০৲ দশ টাকা বৃত্তি পাইবেন।

১৩। কার্য্যদর্শীরা আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে নীলমাধব ভট্টাচার্য্যের বনিতা শ্রীমতী সারদা দেবীকে তাঁহার নিজের ও পুত্রত্রয়ের ভরণ-পোষণার্থে মাস মাস ৩০৲ ত্রিশ টাকা আর তাঁহার পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যাবজ্জীবন কাল মাস মাস ১০৲ দশ টাকা দিবেন। তিনি বিবাহ করিলে অথবা উৎপথবর্ত্তিনী হইলে তাঁহাকে উক্ত উভয় বিধের মধ্যে কোনও প্রকার বৃত্তি দিবার আবশ্যকতা নাই।

১৩। আমি অবিদ্যমান হইলে আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যে অনুষ্ঠানে যেরূপ মাসিক ব্যয় হইবেক তাহা নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে আমার স্থাপিত বিদ্যালয় ১০০৲ এক শত টাকা।
ঐ ঐ গ্রামে আমার স্থাপিত চিকিৎসালয় ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা।
ঐ ঐ গ্রামের অনাথ ও নিরুপায় লোক ৩০৲ ত্রিশ টাকা।
বিধবা-বিবাহ ... ... ১০০৲ এক শত টাকা।

১৫। যদি শ্রীযুক্ত জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ পালিত শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র ভড় এই তিনজন আমার দেহান্ত সময় পর্য্যন্ত আমার পরিচারক নিযুক্ত থাকে তাহা হইলে কার্য্যদর্শীরা তাহাদের প্রত্যেককে এককালীন ৩০০৲ তিন শত টাকা দিবেন।

১৬। কার্য্যদর্শীরা বিষয় রক্ষা লৌকিক রক্ষা কন্যা দান প্রভৃতির আবশ্যক ব্যয় স্বীয় বিবেচনা অনুসারে করিবেন।

১৭। এই বিনিয়োগপত্রে যাঁহার পক্ষে অথবা যে বিষয়ে যেরূপ নির্ব্বন্ধ করিলাম যদি তাহাতে তাঁহার পক্ষে সুবিধা অথবা সে বিষয়ের সুশৃঙ্খলা না হয় তাহা হইলে কার্য্যদর্শীরা সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া যাঁহার পক্ষে অথবা যে বিষয়ে যেরূপ নির্ব্বন্ধ করিবেন তাহা আমার স্বকৃতের ন্যায় গণনীয় ও মাননীয় হইবেক।

১৮। এক্ষণে আমার সম্পত্তির যেরূপ উপস্বত্ব আছে যদি উত্তরকালে তাহার খর্ব্বতা হয় তাহা হইলে যাঁহাকে বা যে বিষয়ে যাহা দিবার নির্ব্বন্ধ করিলাম কার্য্যদর্শীরা স্বীয় বিবেচনা অনুসারে তাহার ন্যূনতা করিতে পারিবেন।

১৯। আবশ্যক বোধ হইলে কার্য্যদর্শীরা আমার সম্পত্তির কোন অংশ বিক্রয় করিতে পারিবেন।

২০। আমার রচিত ও প্রচারিত পুস্তক সকল শম্ভুচন্দ্রের (সংস্কৃত যন্ত্রের) পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে আমার একান্ত অভিলাষ শ্রীযুত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় যাবৎ জীবিত ও উক্ত পুস্তকালয়ের অধিকারী থাকিবেন তাবৎকাল পর্য্যন্ত আমার পুস্তক সকল ঐ স্থানেই বিক্রীত হয় তবে

একণে যেরূপ সুপ্রণালীতে পুস্তকালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে ও তন্নিবন্ধন ক্ষতি বা অসুবিধা বোধ হইলে কার্য্যদর্শীরা স্থানান্তরে বা প্রকারান্তরে পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

২১। কার্য্যদর্শীরা একমত হইয়া কার্য্য করিবেন মতভেদস্থলে অধিকাংশের মতে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক।

২২। নিযুক্ত কার্য্যদর্শীদিগের মধ্যে কেহ অবিদ্যমান অথবা এই বিনিয়োগপত্রের অনুযায়ী কার্য্য করিতে অসম্মত হইলে অবশিষ্ট দুই জনে তাঁহার স্থলে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন। এইরূপে নিযুক্ত ব্যক্তি আমার নিজের নিয়োজিত ব্যক্তির ন্যায় ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

২৩। যদি নিযুক্ত কার্য্যদর্শীরা এই বিনিয়োগপত্রের অনুযায়ী কার্য্যভার গ্রহণে অসম্মত বা অসমর্থ হয় তাহা হইলে যাঁহারা এই বিনিয়োগ পত্র অনুসারে বৃত্তি পাইবার অধিকারী তাঁহারা বিচারালয়ে আবেদন করিয়া উপযুক্ত কার্য্যদর্শী নিযুক্ত করাইয়া লইবেন। তিনি এই বিনিয়োগপত্রের অনুযায়ী সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

২৪। যাবৎ আমার ঋণ পরিশোধ না হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত এই বিনিয়োগপত্রের নিয়ম অনুসারে নিযুক্ত কার্য্যদর্শীদিগের হস্তে সমস্ত ভার থাকিবেক। ঋণ পরিশোধ হইলে ঐ সময়ে যাহারা শাস্ত্রানুসারে আমার উত্তরাধিকারী থাকিবেন তাঁহারা আমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবেন এবং সপ্তম নবম দশম একাদশ দ্বাদশ ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ ধারার নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি প্রভৃতি প্রদানপূর্ব্বক উপস্বত্ব ভোগ করিবেন। ঐ উত্তরাধিকারীরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কার্য্যদর্শীরা তাঁহাদিগকে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া অবসৃত হইবেন।

২৫। আমার পুত্র * * * শ্রীযুক্ত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের * * * * * * * * * * * * * সংস্রব ও সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছি। এই হেতু বশতঃ বৃত্তি

নির্ব্বন্ধস্থলে তাঁহার নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং এই হেতু বশতঃ তিনি চতুর্ব্বিংশ ধারা নির্দ্দিষ্ট ঋণ পরিশোধকালে বিদ্যমান থাকিলেও আমার উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত অথবা দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ ধারা অনুসারে এই বিনিয়োগ পত্রের কার্য্যদর্শী নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। তিনি চতুর্ব্বিংশ ধারা নির্দ্দিষ্ট ঋণ পরিশোধ কালে বিদ্যমান না থাকিলে যাঁহাদের অধিকার ঘটিত তিনি তৎকালে বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহারা চতুর্ব্বিংশ ধারার লিখিত মত আমার সম্পত্তির অধিকারী হইবেন। ইতি তাং ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ সাল ইং ৩১ মে ১৮৭৫ সাল।

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মোকাম কলিকাতা।

ইসাদী।

শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্যামাচরণ দে শ্রীবিহারীলাল ভাদুড়ী
শ্রীরাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় শ্রীনীলমাধব সেন শ্রীকালিচরণ ঘোষ
শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন শ্রীযোগেশচন্দ্র দে

সর্ব্ব সাকিম কলিকাতা।

চতুর্থ ধারার উল্লিখিত সম্পত্তির বিবৃতি—

(ক) সংস্কৃতযন্ত্রের তৃতীয় অংশ—

(খ) আমার রচিত ও প্রচারিত পুস্তক—

বাঙ্গালা—

(১) বর্ণপরিচয় দুই ভাগ (২) কথামালা (৩) বোধোদয় (৪) চরিতাবলী (৫) আখ্যানমঞ্জরী দুই ভাগ (৬) বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় ভাগ (৭) জীবনচরিত (৮) বেতালপঞ্চবিংশতি (৯) শকুন্তলা (১০) সীতার বনবাস (১১) ভ্রান্তিবিলাস (১২) মহাভারত (১৩) সংস্কৃতভাষা প্রস্তাব (১৪) বিধবাবিবাহ বিচার (১৫) বহুবিবাহ বিচার।

সংস্কৃত—

(১) উপক্রমণিকা (২) ব্যাকরণকৌমুদী (৩) ঋজুপাঠ ৩য় ভাগ (৪) মেঘদূত (৫) শকুন্তলা (৬) উত্তরচরিত।

ইঙ্গরেজী—

(1) Poetical Selection. (2) Selection from Goldsmith.

(গ) যে সকল পুস্তকের সত্ত্বাধিকার ক্রয় করা হইয়াছে।

(১) মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত শিশুশিক্ষা তিন ভাগ।

(২) রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত কুলীনকুলসর্ব্বস্ব।

(ঘ) কাদম্বরী সটীক বাল্মীকি রামায়ণ প্রভৃতি মুদ্রিত সংস্কৃত পুস্তক।

(ঙ) নিজ ব্যবহারার্থ সংগৃহীত সংস্কৃত বাঙ্গালা হিন্দী পার্শী ইংরেজী প্রভৃতি পুস্তকের লাইব্রারী।

(চ) কর্ম্মটাঁড়ের বাঙ্গালা ও বাগান।

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

উইলে নগদ টাকার কোন উল্লেখ নাই। নগদ ছিল না ও থাকিত না। মৃত্যুর পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাসিক আয় প্রায় চারি হাজার টাকা ছিল। দান ও সংসার-খরচে প্রায় সবই ব্যয়িত হইত। শুনিতে পাই, মৃত্যুকালে তিনি ১৫। ১৬ হাজার টাকা মাত্র নগদ রাখিয়া গিয়াছিলেন। অবারিত দান না থাকিলে, তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা নগদ রাখিয়া যাইতে পারিতেন। উইলে একাধারে উল্লিখিত পুস্তকাবলীর তালিকায় পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে, বাঙ্গালীর উপর বিদ্যাসাগরের সাহিত্য কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করিত। উইলে

দেব-সেবাদির কোন উল্লেখ নাই। ইহাতেও বিদ্যাসাগরের মতিগতির পরিচয়।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান-চকৃদিঘীর জমীদার সারদাপ্রসাদ রায়ের উইল-সংক্রান্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। ১২৮৩ সালের ১৮ই ও ১৯শে শ্রাবণ বা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১লা এবং ২রা আগষ্ট বিদ্যাসাগর মহাশয়, এই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেন। উইল প্রকৃত নহে বলিয়া, সারদা বাবুর বিধবা স্ত্রী রাজেশ্বরী এই মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, বাদিনীর পক্ষে সাক্ষ্য ছিলেন। তাঁহাকে দুই দিন অসুস্থাবস্থায় সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল। চকৃদিঘীর জমিদার পরিবারের সহিত তাঁহার কিরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল, এই সাক্ষ্যবাক্য তাঁহার প্রমাণ। সাক্ষ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেক প্রাণের কথা বাহির হইয়াছিল। আত্মবাক্যে প্রাণের কথা প্রকাশ পায়। এই সাক্ষ্য-বাক্যে ব্যক্তিগত অনেক ঐতিহাসিক ও সামাজিক তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। সাক্ষ্য-বাক্য ইংরেজীতে লিখিত। আমরা তাহার অনুবাদ দিলাম,—

নং ৮৮৫ হইতে ৮৭০—৪র্থ সাক্ষী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা বিদ্যাসাগরের এজাহার। তারিখ ১৮৭৬ সালের ১লা এবং ২রা আগষ্ট।

বর্দ্ধমানের—পূর্ব্ববিভাগের দেওয়ানি আদালত।

উপস্থিত

বাবু নবীনচন্দ্র গাঙ্গুলী দ্বিতীয় সবর্ডিনেট্ জজ।

মকদ্দমার নং ১৮৭৫ সালের ৭৯ নং।

১৮৭৬ সালের ১লা আগষ্ট।

বাদীর পক্ষে ৪নং সাক্ষী উপস্থিত হইয়া বিধি অনুসারে শপথ গ্রহণ

পূর্ব্বক বলিতেছেন,—আমার নাম ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা বিদ্যাসাগর। আমি ৺ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। নিবাস কলিকাতা, বয়স ৫৬ বৎসর। লেখক ব্যবসায়ী।

সাক্ষী বলিতেছেন,—আমি কিছুদিন পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলাম। আমি বহুসংখ্যক সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা পুস্তক লিখিয়াছি। আমি চকদিঘীর সারদাপ্রসাদ রায়কে চিনিতাম। আমার বিবেচনায় তাঁহার সহিত আমার ২০ বৎসরের অধিক কালের আলাপ। তাঁহার মৃত্যুর ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে হইতে তাঁহাকে চিনিতাম। তাঁহার সহিত আমার বিশেষ আলাপ ও বন্ধুত্বভাব ছিল। তিনি বিষয়সম্বন্ধে আমার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। আমি নাবালক ললিতমোহন রায়কে চিনি। সারদা বাবু, তাঁহার মৃত্যুর পর কিরূপে তাঁহার বিষয়ের বন্দোবস্ত হইবে, সে বিষয়ে আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে তাঁহার উইলের একখানি খসড়া দেখাইয়াছিলেন। আমার বিবেচনায় ইহা তাঁহার মৃত্যুর ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে; কিন্তু আমার ঠিক মনে নাই। সেই খসড়া আমার হস্তে আসিয়াছিল। উহা পাঠ করিবার নিমিত্ত উনি আমাকে দিয়াছিলেন। এই প্রকারেই উহা আমার হাতে আসে। উহা ভাল কি মন্দ ইহা দেখিবার জন্য তিনি আমাকে দিয়াছিলেন। ঐ খসড়া আমার কাছে অনেক দিন ছিল। আমার বোধ হয়, উহা এক বৎসর কি দেড় বৎসর আমার নিকটে ছিল। কিন্তু এক্ষণে আমার ঠিক মনে নাই। ঐ খসড়া আমি সারদা বাবুকে প্রত্যর্পণ করি। উইলের ঐ নকলের কোন্ অংশ আপত্তিজনক, তাহা আমি তাঁহাকে দেখাইয়া দিই এবং ঐ খসড়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিই। ঐ আপত্তিজনক অংশগুলির বিষয় তাঁহাকে আমি মুখেই বলি। তাঁহাকে ঐ খসড়া ফিরিয়া দিবার পর সারদা বাবুর সহিত আমার একবার কি দুইবার কথা হয়। আমার স্মরণ আছে, তিনি পশ্চিমে যান। যখন তিনি পশ্চিমে যাইবার ইচ্ছা করেন, তাহার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমার

সাক্ষাৎ হয় নাই। এক সময়ে তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, উইলের বিষয় কি হইল? তাহাতে তিনি উত্তর দেন যে, আমার একবার পশ্চিমে যাইবার ইচ্ছা আছে এবং আমি মনে মনে এই স্থির করিয়াছি যে, তথায় যাইবার পূর্ব্বে আমি যাহা হউক একটা স্থির করিয়া যাইব। তাঁহার সহিত আমার অন্য কিছু কথা হইয়াছিল কি না তাহা আমার স্মরণ নাই এবং ইহাও আমার ঠিক স্মরণ নাই, পশ্চিমে যাইবার কত দিন পূর্ব্বে তাঁহার সহিত ঐ কথা হইয়াছিল। কিন্তু আমার বিবেচনা হয়, তথায় যাইবার ৬।৭ মাস পূর্ব্বে তাঁহার সহিত ঐ কথা হইয়াছিল।

(প্রঃ—উইলে স্বাক্ষরকারী সাক্ষী কে হইবে, তাহার সম্বন্ধে আপনাদের কোন কথাবার্ত্তা কিম্বা ঐ সম্বন্ধীয় কোন কথাবার্ত্তা হইয়াছিল কি না?) আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, উইল সম্বন্ধে প্রায়ই গোলযোগ উপস্থিত হয়, তজ্জন্য আমার বিবেচনায় এইরূপ লোকের সমক্ষে উইল লেখা উচিত যে, পরে কেহ কোন গোলযোগ উপস্থিত করিতে না পারে। তাহার পরে বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা হয় এবং ইহা সিদ্ধান্ত হয় যে, তিনি তাঁহার উইল হবহাউস্ সাহেব, হগ্ সাহেব, লফোর্ড সাহেব, হিরালাল শীল, শ্রীরাম চাটুর্য্যে ও আমার সমক্ষে উইল লিখিবেন এবং স্বাক্ষর করিবেন এবং লিখিবার পর রেজেষ্টারি করাইয়া লইবেন। পশ্চিম অঞ্চলে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমার এই কথা-বার্ত্তা হয়। পূর্ব্বে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার বিষয় আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি; কিন্তু এই কথাবার্ত্তা তাহারও পূর্ব্বে হইয়াছিল। যখন উইলের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখনই ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, মাননীয় ব্যক্তিসমূহ এই উইলের স্বাক্ষরকারী সাক্ষী হইবেন এবং ঐ উইল নিয়-মিতরূপে রেজেষ্টারী করা হইবেক। হবহাউস্ সাহেব বর্দ্ধমান বিভাগের এক জন বিচারক ছিলেন এবং পরে তিনি হাইকোর্টের বিচারক হন। যখন আমি সারদা বাবুকে মাননীয় সাক্ষীসমূহের কথা বলি, তখন তিনি নিজেই

ঐ তিন জন ভদ্র লোকের নাম করিয়াছিলেন। হগ্ সাহেব এক্ষণে কলিকাতা পুলিষের কমিসনর। লফোর্ড সাহেব তখন বর্দ্ধমান বিভাগের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি এক্ষণে কোথায় আছেন, তাহা আমি জানি না। পূর্ব্বোক্ত শ্রীরাম চাটুর্য্যের নিবাস বর্দ্ধমান জেলার সাঁকোনাড়া গ্রাম। তিনি ঐ সময়ে পাকপাড়া রাজবাটীর এক জন কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। সারদা বাবুর সহিত তাঁহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা এবং বন্ধুত্ব ছিল। সারদা বাবু পূর্ব্বোক্ত হিরালাল শীলের বাটীতে মারা যান। আমার যত দূর স্মরণ আছে, তাহাতে আমি বিবেচনা করি যে, উইলের ঐ খসড়া শ্রীরাম চাটুর্য্যের স্বহস্তের লেখা। তিনি এখনও জীবিত আছেন। সারদা বাবু পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসিলে পর অন্য আর একটী বিষয়ের সহিত তাঁহার সঙ্গে উইলেরও কথা হয়। সে কথাবার্ত্তা এই—তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং আমাকে স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "যে কতকগুলি লোক ললিতমোহনকে পোষ্যপুত্র লইবার জন্য এই পরামর্শ দিতেছে, আপনার এ বিষয়ে মত কি?" আমি এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিয়াছিলাম যে, ক্ষত্রবংশের একজন পুত্রকে শাস্ত্রমতে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না, সম্পর্কে আবার ভাগিনেয় হয় এবং যদি তিনি ঐ ভাগিনেয়কে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ইহা আইনবিরুদ্ধ কার্য্য হইবেক। আমি ঐ কথা বলিলে তিনি ওবিষয়ে আর কোন কথা উত্থাপন করেন নাই। তৎপরে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, ললিতমোহনকে যদি বিষয় দেওয়াই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে উইল করিয়াই ঐ বিষয় দেওয়াই শ্রেয়স্কর, আর কোন প্রকারে নহে। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, যখন আমি পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিব, তখন উইলের একটী খসড়া আনিব এবং কলিকাতায় পুনরাগমনে এ বিষয়ের শেষ করিব। সারদা বাবুর উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর এই কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। আমার ঠিক মনে নাই যে, এই কথাবার্ত্তা তাঁহার প্রত্যাগমনের কত দিন

পরে হইয়াছিল। সারদা বাবু কখন আমাকে বলেন নাই যে, তিনি তাঁহার উইল প্রস্তুত করিয়াছেন। আমার বোধ হইতেছে যে, তিনি আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করেন যে, পুনরায় বিবাহ করা উচিত কি না। কিন্তু আমার মনে নাই যে, কখন্ তিনি আমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ছয় মাস কিম্বা এক বৎসর অধিক হইতে পারে যে, আমার সহিত সারদা বাবুর মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার শেষ সাক্ষাৎ হয়। আমি উইলের ঐ খসড়াটী প্রত্যর্পণ করিবার পর অন্য কোন খসড়া কিম্বা ঐ প্রত্যর্পিত খসড়া পুনশ্চ দেখি নাই।

জেরা করাতে সাক্ষী বলেন,—আমার বোধ হয়, উইলের ঐ খসড়া সারদা বাবু স্বহস্তে আমাকে দিয়াছিলেন। আমি খসড়ার কোন অংশের পরিবর্ত্তন করি নাই; কিন্তু আমি খসড়ার ঐ আপত্তিজনক অংশগুলি তাঁহাকে বাছিয়া দিয়াছিলাম। তবুও আমার মনে নাই যে, উহার কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছিলাম কি না। আমি এই বলিয়া আপত্তি করিয়াছিলাম যে, এক ভাগিনেয়কে সমস্ত বিষয় দেওয়া এবং অপরকে একেবারে বঞ্চিত করা নিতান্ত অন্যায়। আমি বলিয়াছিলাম, অপর ভাগিনেয়ের কিছু পাওয়া উচিত। ঐ ভাগীনেয়ের নাম প্রিয়বাবু। ভগ্নীরা অপেক্ষাকৃত অল্প অংশ প্রাপ্ত হন। আমি তাঁহাদের আরও কিছু বেশী করিয়া দিতে বলি। আমি আরও তাঁহার স্ত্রীকে কিছু বেশী করিয়া দিতে বলিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি উত্তর দেন, আচ্ছা আমি এই বিষয়ে বিবেচনা করিব। আমার বোধ হয়, উইলের ঐ খসড়াতে তাঁহার স্ত্রীকে মাসিক এক শত টাকার মাসহারা দেওয়া ছিল। যখন আমি ঐ উইলের খসড়াটী পাই, তখন আমি ইহা কলিকাতার কাহাকেও দেখাই নাই। ললিতমোহন কোন স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা আমি জানি না। কিন্তু বাল্যকাল হইতে তিনি সারদা বাবুর বাটীতে মানুষ হইতেছিলেন। সারদা বাবু তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত যত্ন

করিতেন। রাজেশ্বরী তাঁহাকে যত্ন করিতেন কি না, তাহা আমি জানি না। কারণ তখন আমি তাঁহাদের অন্দরমহলে যাইতাম না। আমি ঐ সময়ে রাজেশ্বরীকে দেখি নাই। আমার সহিত সারদা বাবুর যে কয়েকবার দেখা হয়, তাহাতে তিনি আমাকে তিন চারি বার বলেন যে, আমি আমার সমস্ত বিষয় ললিতমোহনকে দিয়া যাইব। তিনি যে এ সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এমন কথা কখন শুনি নাই। কিন্তু এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু কবে তাহা আমার মনে নাই যে, ললিতমোহনের দ্বারা তিনি বড় জ্বালাতন হইতেছেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ললিতমোহন বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু কবে তিনি বলিয়াছিলেন, তাহা মনে নাই। সারদা বাবু যখন পশ্চিমে যান, তখন আমি কলিকাতায়। পশ্চিমে যাইবার পূর্ব্বে তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার যত্ন করিয়াছিলেন কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। ১২৭২ সালের ভাদ্র মাসের শেষে তিনি আমাকে চকদিঘী যাইবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন কি না, তাহা আমার মনে নাই। সারদাপ্রসাদ রায়ের সহি আমি চিনি। আমি অনেক বার তাঁহার সহি দেখিয়াছি। আমার বিবেচনায়, আমাকে তাঁহার সহি দেখাইলে, তাহা আমি চিনিতে পারি। আমার মনে নাই, পশ্চিমে যাইবার কত দিন পূর্ব্বাবধি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। ইহা ছয় মাস কিম্বা এক বৎসরও হইতে পারে। পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসিবার কত দিন পরে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তাহা আমার মনে নাই। তাঁহার প্রত্যাগমনের পর আমার বোধ হয়, তাঁহার সহিত আমার দুইবার দেখা হয়। যখন ললিতমোহনকে পোষ্যপুত্র লইবার কথা হয়, তখন আর কেহ উপস্থিত ছিল কি না, তাহা আমার মনে নাই। সারদা বাবুর পশ্চিম যাইবার পর তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি চকদিঘী যাই নাই। সারদা বাবুর জীবিতাবস্থায় আমি রাজেশ্বরীকে কখন দেখি নাই। ললিতের জন্মাইবার পূর্ব্ব হইতে আমি সারদা বাবুকে জানি। সারদা বাবু যখন

মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন আমি কলিকাতায়। সারদা বাবুর মৃত্যুর পর দিবস শ্রীরাম চাটুর্য্যে আমার নিকট আসিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, বৃন্দাবনচন্দ্র রায় অত্যন্ত শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে বাটী চলিয়া গিয়াছেন এবং আমাকে আপনার নিকট "সারদা বাবু তাঁহার উইল লিখিয়া গিয়াছেন," ইহা বলিয়া পাঠাইয়াছেন এবং "আপনি তাঁহার সমস্ত কীর্ত্তি বজায় রাখিতে যত্নবান হইবেন; আপনি উইলের বিষয় সমস্তই অবগত আছেন"। এই কথা শুনিবার পর আমি ভাবিয়াছিলাম যে, তিনি মুখে যে উইলের কথা তাঁহার জীবদ্দশায় বলিয়াছিলেন, সেইরূপই উইল করিয়া গিয়াছেন। উইলের ক্রোড়-পত্রের বিষয় আমি শ্রীরাম বাবুর নিকট হইতে কিছুই শুনি নাই। আমি শ্রীরাম বাবুকে উইলের একটী নকল পাঠাইয়া দিতে বলিয়াছিলাম। আমি ঐ নকল পাঠ করিয়া যদি কোন আপত্তিজনক বিষয় না দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমি আমার সাধ্যমত সাহায্য করিব বলিয়াছিলাম। অল্প দিন পরেই ঐ উইল এবং উহার একটী ক্রোড়পত্রের নকল আমাকে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আমার বোধ হয়, বৃন্দাবনচন্দ্র রায়ই ইহা পাঠাইয়া দেন। ঐ উইল এবং উহার ক্রোড়পত্র পাঠে আমি কতকটা বিস্মিত হই। কারণ আমি ভাবিয়াছিলাম, ঐ উইল যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়াছে। আমার বোধ হয়, আমি শ্রীরাম বাবুর নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম যে, এই উইলের বিষয়ই তিনি বলিয়াছিলেন। আমি তখন বুঝিতে পারি নাই যে, প্রথমে কেন উইল এবং তাহার পরে ক্রোড়পত্র লিখিত হয়। শ্রীরাম চাটুর্য্যে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে আমি বুঝিয়াছিলাম যে, সারদা বাবু মৃত্যুর সময় ঐ উইল করেন। শ্রীরাম চাটুর্য্যের সহিত কথা হইবার আনুমানিক এক সপ্তাহের মধ্যে আমি উইল এবং ক্রোড়পত্রের নকল প্রাপ্ত হই। আমি ঐ নকল পাঠ করি। দুই একটী কথা ছাড়া পূর্ব্বোল্লিখিত খসড়ার সহিত উইলের মিল ছিল। আমি ঐ খসড়ার কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন করিবার পরামর্শ দিয়াছিলাম, যথা তাঁহার পরিবার; স্ত্রী

এবং ভাগিনেয়ের মাসহারা বৃদ্ধি। আমি ইহাতে বর্দ্ধিত মাসহারার উল্লেখ দেখিয়াছিলাম। খসড়ার সহিত ইহার এই কেবলমাত্র প্রভেদ। খসড়ার প্রথম অংশেই ইহা লিখিত ছিল, "আমি উইলে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছি।" আমি আসল উইল কিম্বা তাহার ক্রোড়পত্র কখন দেখি নাই। সারদা বাবুর মৃত্যুর পর ছক্কনলাল রায়কে কখন কলিকাতায় দেখি নাই। আমার বোধ হয়, তাঁহার সঙ্গে আমার একবার চন্দননগরে দেখা হয় এবং আমার বোধ হয়, সেই সময় তাঁহার সহিত আমার কথাবার্ত্তা হয়। ছক্কনলালের নিবাস চকৃদিঘী। তিনি স্বয়ং আমাকে উইলের বিষয় কিছু বলেন নাই। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা করিবার পর তিনি বলেন, শ্রীরাম চাটুর্য্যে সে সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন না। (প্রশ্ন,—আপনি কি ছক্কনলাল রায়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, শেষ উইল যখন স্বাক্ষরিত হয়, তখন তিনি কোথায় ছিলেন?) বাদিনীর কৌন্সিল এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতে আপত্তি করেন। উত্তর,—আমি তাঁহাকে এ রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি নাই। কারণ আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, তিনি সেই সময় হিরালাল বাবুর বাগানে ছিলেন। সারদার মৃত্যুর পর বাদিনী আমাকে একখানি পত্র লিখেন। সে চিঠি আমার নিকট নাই, তাহা আমি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। তিনি আমাকে চকদিঘীতে যাইবার কথা লিখেন। আমি চকৃদিঘীতে যাই। কিন্তু আষাঢ় মাসে কিম্বা অন্য কোন মাসে এবং কোন্ তারিখে গিয়াছিলাম, তাহা আমার স্মরণ নাই। আমি ঠাকুরপ্রসাদ নামধারী কোন লোককে জানি না। একটী লোক আমাকে চকদিঘী লইয়া যাইবার জন্য এক খানি চিঠি লইয়া আসে। ঐ চিটি দিবার দুই তিন দিবস পরে আমি চকদিঘী যাই।

ইহার পরের ৩ এ, নম্বর কাগজ দেখিয়া সাক্ষী বলেন,—আমি জানি না, এই কাগজের উপর লেখা কাহার হস্তের। আমি সারদা বাবুর বাঙ্গালা হস্তাক্ষর দেখি নাই। যখন আমি চকদিঘীতে

গিয়াছিলাম, তখন ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২৭ ধারা মতে এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৪০ ধারা মতে সার্টফিকেট লওয়া হয় নাই। যখন আমি চকৃদিঘীতে গিয়াছিলাম, তখন আমি রাজেশ্বরীকে প্রথমে কিছু বলি নাই। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আপনি প্রথমে উইলের খসড়া দেখিয়াছিলেন এবং এক্ষণে উইলের নকল দেখিয়াছেন। এই হাল উইল আমার স্বামীর ইচ্ছামত হইয়াছে কি না? তাহাতে আমি উত্তর দিয়াছিলাম, দুটো একটা বিষয়ে একটু তফাৎ আছে। তদ্ভিন্ন আর সমস্ত বিষয়ই তাঁহার ইচ্ছামত হইয়াছে। ইহার পরে তিনি পুনর্ব্বার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, নানা লোকে এ বিষয়ে নানা কথা কহিতেছে। এখন আমার কি করা উচিত। তাহাতে আমি উত্তর দিয়াছিলাম, আপনার স্বামী যেরূপ বলিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ করাই উচিত। লোকে যাহা বলে, সেরূপ করা উচিত নয়।

উপরে যাহা বলা হইল, ইহা তাঁহার সহিত কথা কহিবার ফল। আমার ঠিক স্মরণ নাই, আমি চকৃদিঘীতে কত দিন ছিলাম, আমার বোধ হয়, দুই তিন দিবস। সাক্ষীকে একখানি পত্র দেখান হইয়াছিল। তিনি ইহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন,—আমি বলিতে পারি না, ইহা কাহার হস্তাক্ষর। ইহা রাজেশ্বরীর হস্তাক্ষর হইতে পারে। ইহার সহির প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাক্ষী বলেন,—আমি শ্রীরাম চাটুর্য্যের হস্তাক্ষর যতদূর চিনি, তাহাতে বলিতে পারি, ইহা শ্রীরাম চাটুর্য্যের হস্তাক্ষর নহে। এই চিঠি কাহার হস্তাক্ষর, তাহা আমি বলিতে পারি না। ইহার পর সাক্ষী ৪নং কাগজ দৃষ্টি করিয়া বলেন,—ইহা আমার হস্তাক্ষর। ইহা আমি রাজেশ্বরী এবং যোগেন্দ্র বাবুকে লিখিয়াছিলাম। সারদা বাবুর ভগ্নী কুলদা দেবীর কোন বন্দোবস্ত না হইবার দরুণ, তিনি আমাকে ইহা জানাইলে, আমি এই পত্র লিখি। সারদা বাবুর বাঙ্গালা সহি আমি জানি না।

প্রশ্ন। আপনি কি বলিতে পারেন, আপনি কি বিশ্বাস করিয়াছিলে,

আপনি যখন ৪ নং চিঠি লেখেন, তখন সারদা বাবু তাঁহার উইল করিয়াছেন?

উত্তর। আমি তাহা বিশ্বাস করি নাই।

প্রঃ। আপনি কি সেই সময় বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, সারদা বাবু, তাঁহার উইল করেন নাই?

উঃ। আমার তাহাতে সন্দেহ ছিল।

প্রঃ। আপনার কি বিশ্বাস হইয়াছিল?

উঃ। আমি বিশ্বাস করি নাই যে, তিনি কখন উইল করিয়াছিলেন।

প্রঃ। আপনি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহার ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে তোমরা সকলে চেষ্টা করিবে। এই বিশ্বাসে এবং এই বিবেচনাতে মৃত সারদাপ্রসাদ বাবু আপনাদের দুই জনের হস্তে কার্য্যভার অর্পণ করিয়া যান। আপনি যখন ঐ পত্র লিখিয়াছিলেন, তখন আপনার কি সন্দেহ হইয়াছিল যে, সারদা বাবু আপনাদের দুই জনের হস্তে কার্য্যের ভার দিয়া গিয়াছেন? যখন আপনি ঐ পত্র লিখেন, তখন আপনার কি সন্দেহ হইয়াছিল যে, সারদা বাবু, রাজেশ্বরী এবং যোগেন্দ্রের হস্তে সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধারণের ভার দিয়াছেন?

উঃ। আমি এই প্রশ্ন সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলাম না। (এই প্রশ্নটী পুনরায় আদালত দ্বারায় বাঙ্গালায় বলা হয়।) সারদা বাবুর উইলের বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল। আদালতে যে উইল ফাইল করা হয়, তাহাতেই দুই জনের দ্বারা বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণের কথা উল্লেখ আছে এবং তজ্জন্য আদালতে যে উইল ফাইল হয়, তাহার অনুযায়িক রাজেশ্বরী এবং যোগেন্দ্র বিষয়ের তত্ত্বাবধারণের জন্য আদালত "হইতে" অনুমতি পাইয়াছিলেন এবং এরূপ অবস্থাতে কোন বিষয়ের বন্দোবস্তের জন্য তাঁহাদিগকে পত্র লিখিতে হইলে, তাঁহারা উইল দ্বারা যে ক্ষমতাপন্ন, তাহা উল্লেখ করিতে হয়। সেই কারণেই আমি তাঁহাদিগকে ঐ ভাবে পত্র

লিখি। সে যাহা হউক, উইল যথার্থ, তাহা আমার বিশ্বাস ছিল না এবং সারদা বাবু যে উইল দ্বারা কার্য্য করিতে তাঁহাদিগকে ক্ষমতা দিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করি নাই।

নবীনচন্দ্র গাঙ্গুলি সব্ জজ।

২রা আগষ্ট, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

যে তিন খানি পত্র আমি পাইয়াছি, তাহার মধ্যে এক খানি বৃন্দাবনচন্দ্র রায়, এক খানি ছক্কনলাল এবং এক খানি রাজেশ্বরী দেবী লিখিয়াছিলেন। ঐ তিন খানি পত্র উইল সম্বন্ধীয়। আমার স্মরণ নাই, আমি কাহার নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম যে, সারদা বাবুর যখন মৃত্যু হয়, তখন ছক্কনলাল রায় হিরালাল বাবুর বাগানে ছিলেন কি না। আমি পত্র খানি ছক্কনলাল বাবুর নিকট হইতে পাইয়াছিলাম। তাঁহার সহিত আমার চন্দননগরে সাক্ষাৎ হয়। আমার বোধ হয়, ইহা সারদা বাবুর মৃত্যুর এক মাস কিম্বা দেড় মাস পরে। সারদা বাবুর মৃত্যুর পূর্ব্বে কিম্বা পরে ছক্কনলাল বাবুর সহিত আমার আর সাক্ষাৎ হয় নাই। সারদা বাবুর মৃত্যুর পরেই চকদিঘীতে যোগেন্দ্র বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। যোগেন্দ্র বাবু সারদা বাবুর মৃত্যুর পর আমার সহিত দেখা করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, সারদা বাবুর মৃত্যুর পর যখন আমি চকদিঘীতে যাই, তখন রাজেশ্বরী এবং বৃন্দাবন রায়ের সহিত আমার কথাবার্ত্তা হয়; কিন্তু যোগেন্দ্রের সহিত আমার কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। বৃন্দাবন রায়ের সহিত যখন আমার কথাবার্ত্তা হয়, তখন যোগেন্দ্র বাবু কোথায় ছিলেন, আমি তাহা জানি না। আমি তাঁহাকে মণিরাম বাবুর বাটীতে দেখি নাই। তাঁহাকে চকদিঘীতে দেখিয়া থাকিতে পারি। আমি বৃন্দাবনচন্দ্রের সহিত চকদিঘীতে যাই। আমি তাঁহার সহিত কথা কহিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন,—এখানে বহুপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে ; সারদা বাবুর কীর্ত্তি বজায়রাখিবার জন্য আপনাকে

এখানে আনাইবার উদ্দেশ্য। তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম, আমাকে কি করিতে হইবে। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন,—আপনাকে এমন করিতে হইবে, যাহাতে রাজেশ্বরী বিপক্ষতাচরণ না করেন। তাহার মানে, উইলের বিপক্ষতাচরণ না করেন। এই খানেই তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তার শেষ হয়। তৎপরে আমি বাটীর ভিতরে যাই এবং রাজেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ করি। তাহাতে তিনি সর্ব্বপ্রথমে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি উইলের খসড়াটী দেখেন এবং আপনি উইল দেখিয়াছেন, এই দুইটী উইলের বিষয় এক কি না। তাহাতে আমি উত্তর দিয়াছিলাম যে, উহাতে আপনার স্বামীর অভিপ্রায় ব্যক্ত আছে। তাহাতে তিনি বলেন, আমার এক্ষণে কি করা উচিত। আমি বলিয়াছিলাম, আপনার মৃত স্বামীর ইচ্ছামত কার্য্য করা উচিত। আমার এই কথাবার্ত্তার বিষয় মনে আছে। আর কোন কথাবার্ত্তা হইয়াছিল কি না, মনে নাই। আমি ললিতমোহনের লেখা-পড়ার সম্বন্ধে কথা কহিয়াও থাকিতে পারি; কিন্তু আমার ঠিক স্মরণ নাই। আমার আরও মনে নাই, আমি বলিয়াছিলাম কি না যে, ললিতমোহনকে যদি রীতিমত লেখা-পড়া শিখান, তাহা হইলে কোন বিষয়ে আর গোলযোগ হইবে না। আমি তখন উইলের মর্ম্মে জানিতাম যে, ললিতমোহনকে সারদা বাবু উইলের দ্বারা উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছেন। আমার স্মরণ নাই, আমি ললিতমোহনের রীতিমত লেখা-পড়া সম্বন্ধে রাজেশ্বরীকে কিছু বলিয়াছিলাম কি না; কিন্তু আমি বৃন্দাবনচন্দ্র রায়কে বলিয়াছিলাম যে, যাহাতে এই না-বালক ভালরূপ শিক্ষা পায়, আপনার তাহা করা উচিত। আমার স্মরণ নাই, রাজেশ্বরীকে আমি বলিয়াছিলাম কি না যে, ললিতমোহন ইহার পর তাঁহার কাছে কোন প্রকার কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবে না। যোগেন্দ্র বাবুর সেই সময় কত বয়স ছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। তাঁহার চেহারা দেখিয়া এক জন অনুমান করিতে পারে, তাহার বয়স ১৬।১৭ কিম্বা ১৮। আমার

বোধ হয় যোগেন্দ্র বাবু সেই সময় আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার বয়স অতি কম এবং এরূপ বৃহৎ বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য। আমি তাঁহাকে কি বলিয়াছিলাম, তাহা আমার স্মরণ নাই। কালিপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলাম কি না আমার স্মরণ নাই। কোন বিষয়ের তত্ত্বাবধারণার জন্য আমি কোন স্ত্রীলোকের সহিত কখন তত্ত্বাবধায়ক ছিলাম না। আমি কখন কাহারও বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক ছিলাম না। যখন যোগেন্দ্র অল্প বয়স হেতু এত বড় বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ বিষয়ে অপারকতা জানাইয়াছিলেন, তখন আমি তাঁহাকে সারদা বাবুর ইচ্ছানুযায়িক কার্য্য করিতে বলিয়াছিলাম কি না, তাহা আমার স্মরণ নাই; হয় ত ওরূপ বলিয়া থাকিতে পারি, তাহা আমি এখন ভুলিয়া গিয়াছি। যখন রাজেশ্বরীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তখন আমি তাঁহাকে বলি নাই যে, উইলের নকল আমি দেখিয়াছি। তিনি উইল সম্বন্ধে যেরূপ বলেন, তাহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমি প্রথমে উইলের কথা উত্থাপন করি নাই। তিনি প্রথমে আমাকে উইলের কথা বলেন। ইহার পর রাজেশ্বরীর সহিত দুইবার চকৃদিঘীতে আমার সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাতের পর আমি চকৃদিঘী হইতে চলিয়া আসিলে, রাজেশ্বরী আমাকে আর পত্র লিখেন নাই। বৃন্দাবনচন্দ্র আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন কি না আমার স্মরণ নাই। বৃন্দাবনচন্দ্রকে স্কুল সম্বন্ধে কোন পত্র লিখিয়াছিলাম কি না তাহা আমার স্মরণ নাই। আমি বিষয় সম্বন্ধে তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলাম কি না, তাহাও আমার মনে নাই। আমি চকৃদিঘীতে রাজেশ্বরীর পিতাকে দেখিয়াছি। আমি আরও চকৃদিঘীতে তাঁহার ভ্রাতা ব্রজকৃষ্ণকে দেখিয়াছি। গুরুদয়াল রাজেশ্বরীর পিতা ওরফে বিরজা আমাকে পত্র লিখেন নাই। গুরুদয়াল একবার কলিকাতায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন; কিন্তু আমার মনে নাই, চকৃদিঘী হইতে ফিরে আসিবার কত দিন পরে আসিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ

২।৩ বৎসরের পরে হইতে পারে। তিনি আমার বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার কন্যার বিষয় সম্বন্ধে কথা কহিতে আসিয়াছেন। তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম, আমি ওকথা শুনিব না। আমি শুনিয়াছিলাম যে, বিষয়তত্ত্বাবধায়কদিগের মধ্যে গোলযোগ চলিতেছে এবং বিষয়ের ভাল রকম ব্যবস্থা হইতেছে না; তজ্জন্য আমি তাড়াতাড়ি বলিয়াছিলাম যে আমি ওকথা শুনিব না। সারদা বাবুর মৃত্যুর অল্পদিন পরে কোন ব্যক্তি তাঁহার বিষয়ে বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়াছে কি না, তাহা আমি শুনি নাই। কিন্তু আমার বোধ হয়, দুই মাস পরে যখন আমি বাটীতে ছিলাম, তখন আমি বৃন্দাবন রায়ের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়াছিলাম, তাহাতে ঐ গোলমালের কথা লেখা ছিল। তাহা হইতে বুঝিয়াছিলাম যে, রাজেশ্বরী অন্য লোকের পরামর্শ লইয়াছে এবং উইল সম্বন্ধে গোলযোগ করিতেছে। ৬নং কাগজে সাক্ষী দৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন,— আমি এই পত্র লিখি। আমার বোধ হয়, বৃন্দাবনচন্দ্র যে পত্র লিখেন এবং যাহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই পত্রে তাহার জবাব লেখা হইয়াছিল। এই পত্রের শিরোনামা আমার হস্তে লেখা। চিঠি দেখিয়া বলিতে পারি না, বৃন্দাবনচন্দ্রের পত্রের উত্তরে এইরূপ লিখিয়াছিলাম কি না। চিঠিখানি সাক্ষীকে শুনাইয়া পড়া হইলে সাক্ষী বলেন,—আমি খবর জানিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলাম। আমি ঐ খবর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম কি না, আমার স্মরণ নাই। আমার স্মরণ নাই, ঐ চিঠি লিখিবার আগে কি পরে ছকনলালের সহিত চন্দননগরে সাক্ষাৎ হয়। আমি ছকনলাল বাবুর নিকট হইতে উইল সম্বন্ধে খবর পাই। আমি কলিকাতা হইতে ঐ পত্র লিখি। আমি কলিকাতা হইতে চন্দননগরে গিয়াছিলাম; কিন্তু কোন্ মাসে, তাহা আমার স্মরণ নাই। আমার বোধ হয়, জ্যৈষ্ঠ মাসে হইবে। ছকনলালের সহিত আমার চন্দননগরে সাক্ষাৎ হয়। আমি আমার ঐ পত্রে লিখি, তাঁহার উপকারের জন্যই তাঁহাকে আমি পরামর্শ দিব; কিন্তু সেই

উপকার করিয়াছিলাম কি না, তাহা আমার স্মরণ নাই। ঐ চিঠি লিখিবার পর আমি চক্দিঘীতে আসিবার পর কিছু করিয়াছিলাম কি না, তাহা আমার স্মরণ নাই। আমি বলিয়াছিলাম যে, আমি ছক্কনলালের নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, তিনি উইল লিখিবার সময়ে উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু আমার স্মরণ নাই, আমি এই কথা চক্দিঘীতে বলিয়াছিলাম কি না। ইহার পর সাক্ষী বলেন,—ছক্কনলাল বলিয়াছিলেন যে, তিনি হিরালাল বাবুর বাগানে ছিলেন। ইহার পর সাক্ষী ৭ এবং ৭এ নং কাগজে দৃষ্টি করিয়া বলেন, এই চিঠি এবং খাম আমার হস্তের লেখা। সারদা বাবুর মৃত্যুর পূর্ব্বে চক্দিঘীর স্কুল গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছিল। সারদা বাবুর মৃত্যুর পর হইতে উহা ফ্রিস্কুল হয়। উইলের ক্রোড়পত্রের অনুযায়িক। স্কুল কি প্রকারে চলিবে তাহার বন্দোবস্ত আমি করি। সাক্ষী চিঠিখানি পড়িয়াছিলেন। যে নূতন ব্যবহার কথা পত্রে উল্লিখিত আছে, তাহা উইলের উল্লিখিত নিয়ম সকলের অনুমত। আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারি না, উইলের দ্বারা উইল বুঝাইতেছে কি উইলের ক্রোড়পত্র বুঝাইতেছে। ঐ পত্রেতে দ্বিতীয় শিক্ষকের কথা উল্লিখিত আছে; কিন্তু তাঁহার নাম জানি না। আমি প্রথম শিক্ষকের নামও জানি না। ঐ পত্র অনুযায়িক আমি চক্দিঘীতে আসি এবং স্কুলের বন্দোবস্ত করিয়া যাই। সাক্ষী ৮নং কাগজে দৃষ্টি করিয়া বলেন যে, আমি এই পত্র লিখিয়াছি। প্রশ্ন,—"এ কি রকম, আপনি চক্দিঘীতে যান নাই বলিয়া, গোলযোগ উপস্থিত হইল!" উঃ,—আমি তখন ইহা জানিতাম না। আমি ইহা বিশদ-রূপে বলিতে চাহি। আমার বোধ হয়, বৃন্দাবনচন্দ্র রায় আমাকে এক খানি পত্র লিখেন। তাহাতে তিনি উল্লেখ করেন যে, আপনার এখানে না আসাতে বড় গোলযোগ হইতেছে। আমি ঐ পত্র ইহার প্রত্যুত্তরে লিখি। ঐ পত্রে যাহা লেখা আছে, আমি তাহা লিখি। আমি এই ভাবিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম যে, তাঁহারা আমার পরামর্শ গ্রহণ করিবেন এবং এরূপ ভাবে

কার্য্য করিবেন যে, তাহাতে গোলযোগ ঘটিয়া যাইবে। ৯ চিহ্নিত কাগজ দেখিয়া সাক্ষী বলেন,—এই পত্র রাজেশ্বরীর লেখা। গবর্ণমেণ্টের উকিল মতিলাল চৌধুরীকে আমি চিনি। কুলদা সুন্দরীর দাবীর বিষয় বলিয়াছিলাম কি না, তাহা আমার স্মরণ নাই। আমি যথার্থই বলিতেছি, আমার স্মরণ নাই। আমি বেণীমাধব রায়কে চিনি। তিনি তাঁহার ছেলের পক্ষে রাজেশ্বরী এবং যোগেন্দ্রের বিপক্ষে এক মোকদ্দমা করেন। আমার স্মরণ আছে, আমি মতিলাল চৌধুরীকে ঐ মোকদ্দমার কথা বলি। আমার বোধ হয়, আমি বলিয়াছিলাম, আপনি বেণীমাধব রায়ের পুত্র প্রিয়মুর উইল অনুযায়িক মাসহারা পাইবার চেষ্টা করিবেন। সাক্ষী ১০ এবং ১০ এ নং কাগজে সহির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলেন,—কাগজের তলায় রাজেশ্বরীর যে স্বাক্ষর আছে, তাহা রাজেশ্বরীর স্বাক্ষর বলিয়া আমার বোধ হয়। আমি যোগেন্দ্রের বাঙ্গালা হস্তাক্ষর দেখি নাই। (প্রমাণের সহি)। একটা কাগজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাক্ষী বলেন,—কাগজের শেষ রাজেশ্বরীর যে সহি আছে, তাহা রাজেশ্বরীর বলিয়া আমার বোধ হয়। সাক্ষী এক খানি চিঠি লক্ষ্য করিয়া বলেন,—ইহা কাহার হস্তের লেখা, আমি বলিতে পারি না। রাজেশ্বরী আমার বাটীতে আসিয়াছিলেন। তিনি ১৪। ১৫ দিন পূর্ব্বে আমার বাটীতে আসেন এবং প্রায় এক সপ্তাহ আমার বাটীতে থাকেন। সুবিধামত বাটী না পাওয়া যাওয়াতে আমি তাঁহাকে আমার বাটীতে রাখি। না-বালক ললিতমোহন এবং রাজেশ্বরীর যাহাতে মঙ্গল হয়, আমি তাহার চেষ্টা করিয়াছি। এই সম্বন্ধে আমি ককরেল সাহেবের সহিত দেখা করি। তিনি বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর। আমি আরও উমেশচন্দ্র মিত্রের পরামর্শ লই। মধ্যস্থ দ্বারা মোকদ্দমা মিটাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করি। উমেশচন্দ্র যেরূপ পরামর্শ দেন, সেই পরামর্শ অনুযায়িক মোকদ্দমার মীমাংসা হয়, ইহাই আমার ইচ্ছা ছিল। আমি শপথপূর্ব্বক বলিতেছি যে, সর্ব্বপ্রথমে মধ্যস্থ দ্বারা মিটাইবার

কথা আমি উল্লেখ করি নাই। আমাকে এক জন মধ্যস্থ বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হয়। আরও অন্যান্য যাঁহারা মধ্যস্থ হইবেন, তাঁহাদিগের নাম আমি উল্লেখ করি। ঐ মধ্যস্থদিগের নাম প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী এবং রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসন্ন বাবু সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল এবং অপর ব্যক্তি প্রেসিডেন্সী কলেজের এক জন অধ্যাপক। উভয়েই আমার বন্ধু। ককরেল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর তিনি আমাকে বলেন যে, বহু বিলম্বে এই মোকদ্দমা মধ্যস্থ দ্বারা মিটাইবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। আমার বোধ হয় যে, বাদিনী ভয়ে এইরূপ বলিয়াছেন। যখন আমি কলিকাতায় ছিলাম, তখন আমি উমেশচন্দ্র বাবুকে উইলের একখানি নকল দেখাই এবং তাঁহার সহিত আর কতকগুলি স্মারক-পত্র দেখাই। এই স্মারক-পত্রগুলি আমি চকদিঘীতে লিখি। সারদা বাবুর মৃত্যুর পর যখন আমি চকদিঘীতে ছিলাম, তখন আমি ঐ স্মারক-লিপি-গুলি লিখি। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, উইল এবং উইলের নকল বৃন্দাবনচন্দ্র রায় আমাকে পাঠাইয়া দেন। আমি ঐ গুলি উমেশ বাবুকে দেখাই। আমি এমন কথা বলি নাই যে, আমাকে মধ্যস্থ করা হইয়াছে বলিয়া উইল বজায় রাখিব। আমি শপথগ্রহণপূর্ব্বক এই কথা বলিতেছি। ককরেল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিয়া আসিবার পর আমি এ সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই। আমি ম্যানেজার উমেশচন্দ্র মিত্রকে রাজেশ্বরীর এ পত্রখানি দিই। আমি ম্যানেজারকে বলি যে, সারদা বাবুর প্রেতাত্মা যদি এখনও বর্ত্তমান থাকে, ললিতমোহন বিষয় না পাইলে, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন। আমি আরও বলিয়াছিলাম যে, ললিতমোহন বিষয় যদি না পান, তাহা হইলে আমিও দুঃখিত হইব। আমার স্মরণ নাই, আমি বলিয়াছিলাম কি না, না-বালককে উইল অনুযায়িক যে বিষয় দেওয়া হইয়াছে, উহা তাহাকে ভোগ করিতে দেওয়া হউক, ইহা আমার ইচ্ছা। আমি বলিয়াছিলাম যে, যদি ললিত-

মোহন বিষয় পান এবং রাজেশ্বরী মনের সুখে থাকেন, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব। যখন আমি উহা বলিয়াছিলাম, তখন আমার ধারণা ছিল না, সারদা বাবু কোন উইল করেন নাই। যখন আমি মন্তি বাবুকে বেণিমাধবের পুত্রের পক্ষে উইল অনুযায়িক মোকদ্দমা আনিতে বলি, তখনও আমার ধারণা ছিল যে, সারদা বাবু কোন উইল করেন নাই। যখন আমি রাজেশ্বরীকে বলি যে, আপনি আপনার স্বামীর ইচ্ছানুযায়িক কার্য্য করিতে বাধ্য, তখন আমার ধারণা ছিল যে, সারদা বাবু উইল করেন নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমি রাজেশ্বরীকে কখন বলি নাই যে, আপনার স্বামী উইল করেন নাই। আমি এ কথা যোগেন্দ্রকেও বলি নাই। যখন আমি মন্তি বাবুকে বেণিমাধবের পক্ষে মোকদ্দমা আনিতে বলি, তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, উইলটী জাল এবং কাল্পনিক। এই ৮ বৎসর ধরিয়া আমি এই বিষয় মনে রাখিয়াছি। আমি বৃন্দাবনচন্দ্র রায়কে ঈশ্বরসিংহের স্বাক্ষর সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলাম কি না, তাহা স্মরণ নাই। আমি পাকপাড়ার রাজাদিগের নিকট টাকা ধারি না; কিন্তু আমি ঐ বাটীর এক স্ত্রীলোকের নিকট হইতে ২০০০ টাকা ধার করিয়াছি। প্রশ্ন,—তোমার এক্ষণে দেনা আছে কি না? উঃ—আমি এ প্রশ্নের জবাব দিব না। আদালত এই প্রশ্ন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে দেন এবং তাহার জবাব চান। সাক্ষী বলেন,—আমার দেনা আছে। আমি কোন বইর কপিরাইট ত বেনামেতে রাখি নাই। সারদা বাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার বিষয় হইতে আমি টাকা ধার চাহিয়াছিলাম কি না, তাহা আমার মনে নাই। বোধ হয়, আমি চাহি নাই। আমি ঋণ চাহিতে সক্ষম নই। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলে সাক্ষী বলেন,—আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন সদস্য। কিন্তু আমি সিণ্ডিকেটের এক জন মেম্বার নহি। আমি মেট্রোপোলিটন ইনিষ্টিটিউসনের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। মেট্রপলিটন স্কুল এবং কলেজের নাম।

প্রশ্ন.—আপনি কি হিন্দু-বিধবা বিবাহের উত্তেজক? এই প্রশ্নে আপত্তি করা হইল। উঃ,—এই হিসাবে আমার দ্বারা অনেক টাকা খরচ করা হইয়াছে। আমাকে অনেককে মাসহারা দিতে হয়। যাহারা বিধবা-বিবাহ করিয়াছে, তাহাদের অনেককে টাকা দিতে হয়, আমি এই দান বদান্যতা জন্য করিয়াছি। কারণ আমার বিবেচনায় বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ দেওয়া সৎ কার্য্য। বিধবাদিগের বিবাহ দিবার জন্য কিম্বা ঐ হিসাবে আমার দেনা। আমি অনেক দিন পূর্ব্বে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছি। আমি ইহার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করি না। প্রশ্ন,—সারদা বাবু যে খসড়া দিয়াছিলেন, তাহাতে তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করিবার কোন বন্দোবস্ত ছিল? কিম্বা কাহাকেও তত্ত্বাবধারক বলিয়া উল্লিখিত ছিল? এই বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করা হয়। প্রশ্ন,—আপনি বলিলেন, সারদাপ্রসাদ যখন উইল করেন, তখন ছক্কনলাল সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এ কথা তিনিই আপনাকে বলিয়াছেন; সারদাপ্রসাদের উইল করিবার সময় সত্য সত্যই কি ছক্কনলাল সেখানে উপস্থিত ছিলেন? অপর পক্ষ হইতে এ প্রশ্নে আপত্তি উঠিল। কিন্তু উত্তর হইল,—আমি জানিয়াছি যে, উইল করিবার সময় তিনি সারদা বাবুর নিকট উপস্থিত ছিলেন। প্রশ্ন,—আপনি ছক্কনলালের নিকট কোন্ সময়ে এই উইল করা হয়, শুনিয়াছেন? উত্তর,—মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এই উইল করেন। তখন তিনি হীরালাল বাবুর বাগানে ছিলেন। ছক্কনলাল এই উইল করিবার সময় সারদা বাবুর কাছে ছিলেন।

প্রশ্ন। আপনি যদি বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, সারদা বাবু উইল করেন নাই, তবে আপনি কেমন করিয়া তাঁহার বিধবা স্ত্রীকে উইল অনুযায়ী কার্য্য করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন?

সাক্ষী বলেন,—"আমি অত্যন্ত পীড়িত এবং দুর্ব্বল; বিশেষতঃ সকাল বেলা আহার করি নাই; কাল বুঝিয়াছিলাম যে, ১১টার ভিতরেই তাঁহার এজাহার শেষ হইয়া যাইবে; আর বুঝিতেও পারি না এবং কথা

কহিতেও পারি না।” বাদিনীর পক্ষে কৌন্সিল বলেন,—তাঁহার এজাহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। তাঁহাকে আর দুইটী মাত্র প্রশ্ন করা হইবে। এখন দুইটা বাজিয়াছে।

উঃ। আমি তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর ইচ্ছা অনুযায়ী কার্য্য করিতে বলিয়াছিলাম, এই বিবেচনায় যে, তাহা হইলে দেশের উপকার হইবে ও সারদা বাবুরও কথা বজায় থাকিবে। যদি রাজেশ্বরী আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, উইল ভাল কি না, তাহা হইলে আমার মনের যাহা বিশ্বাস, তাহা আমি নিশ্চয় তাঁহাকে বলিতাম। তিনি আমায় সে বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই এবং আমিও কোন কথায় উল্লেখ করি নাই। আমি বলিয়াছি যে, আমি রাজেশ্বরীর পত্র উমেশ মিত্রকে দিই। উমেশ মিত্র সে পত্রখানি পাইয়া খুব চাপ দেয় অর্থাৎ তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি যদি এইরূপ পত্র পান, তাহা হইলে তিনি কালেক্টার আফিসে যাইবেন; আর সমস্ত বিষয় দাবি করিবেন। তিনি এই কথা বলিলে, আমি রাজেশ্বরীকে সেইমত কার্য্য করিতে বলি। ইহার পরে কোন লোক ইংরেজিতে একখানি খসড়া করে। আমি তাহা সর্ব্বপ্রথমে রাজেশ্বরীকে দেখাই। পরে উমেশ বাবু সেই পত্রের কতক অংশে আপত্তি উত্থাপন করিলে, রাজেশ্বরীকে উহার বিষয় জানান হয় এবং এই পত্রখানি বদলাইয়া আবার একখানি খসড়া তইয়ার করা হয়। পরে ইহা আবার পরিষ্কার করিয়া নকল করা হয়। রাজেশ্বরী তাহাতে স্বাক্ষর করেন।

প্রশ্ন। ইহা কেমন করিয়া হইল যে, রাজেশ্বরী কলিকাতায় আপনার বাটীতে আসিলেন?

উঃ। উমেশচন্দ্র আমাকে কোন কথা বলেন। আমি তজ্জন্য রাজেশ্বরীকে একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহাকে আমি শীঘ্রই কলিকাতা আসিতে বলি।

উড্ সাহেবের অনুরোধে সাক্ষী বলেন,—যখন সারদা বাবু মারা যান, তখন আমি এমন পীড়িত যে, বাটী ছাড়িতে অক্ষম। বিধবা-বিবাহের খরচ যোগাইতে আমি কখনও চাঁদা তুলি নাই; কিন্তু লোকে যাহা স্বেচ্ছায় দিত, তাহা আমি গ্রহণ করিতাম।

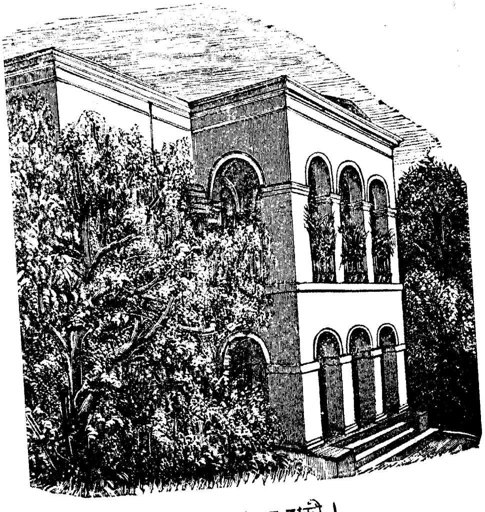
বিচারে উইল প্রকৃত বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। হাইকোর্টের আপীলেও ঐরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। উইলে সারদা বাবুর ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহকে বিষয় দেওয়া হইয়াছিল। বর্দ্ধমানে সাক্ষ্য দিবার পর, বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহার কোন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন,—"জেরার জবরদস্তীতে কৌন্সিলেরা সত্যবাদী সাক্ষীকেও সত্য বলিতে দেয় না।" যে দিক দিয়া হউক, যে ভাবে হউক, আধুনিক আদালত-সমূহ অনেকটা মিথ্যার প্রশ্রয় দিয়া থাকে, এরূপ একটা কলঙ্ক জগৎরাষ্ট্র।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

কলেজে জামাতা, পিতৃ-বিয়োগ, কন্যার বিবাহ, বসত-বাড়ী, অসুখে প্রবাস, উপাধি, বি,এ ক্লাস, নিয়মে নিষ্ঠা, বি,এর ফল, কানপুরে প্রবাস, ছাপাখানার-শেষ, ঋণ শোধে সাধুতা, ঠাকুর বাড়ীর বিবাদ, মনান্তরের ফল, সিবিলিয়ন রমেশচন্দ্র, কলেজ-বাড়ী, পত্নী-বিয়োগ, পত্নী-চরিত্র, জামাতার পদচ্যুতি, কলেজের ভার, গুরুদাস বাবু, বীরসিংহের পত্র ও ভগবতী বিদ্যালয়।

১২৮২ সালে বা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের জামাতা সূর্য্য বাবু, মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনের সেক্রেটরী পদে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বে তিনি হেয়ার স্কুলের শিক্ষক ছিলেন।

১২৮২ সালের ৩০শে চৈত্র বা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ১১ই এপ্রেল পিতা ঠাকুরদাস কাশীপ্রাপ্ত হন। পিতার মৃত্যুকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় কাশীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পিতৃবিয়োগে পঞ্চম বৎসরের শিশুর মত উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। মা গেলেন; পিতা গেলেন; ইহ-সংসারে বিদ্যাসাগরের সকল সুখ অপহৃত হইল। ১লা বৈশাখ বা ১২ই এপ্রেল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভেদ-বমি হইয়াছিল। তাঁহাকে তদবস্থায় কলিকাতায় আনা হয়। সুস্থ হইয়া তিনি বারান্তরে কাশী গিয়া-



বিদ্যাসাগরের বাড়ী।

ছিলেন। তথায় তিনি পিতার শ্রাদ্ধাদি করেন। ইহাই তাঁহার পিতার আদেশ ছিল।

১২৮৪ সালে বা ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারীর বিবাহ হয়। কন্যা ও জামাতা বাড়ীতেই থাকিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় জামাতা, কন্যা এবং তাঁহাদের পুত্রকন্যাদিগকে বড় ভাল বাসিতেন।

এই বৎসর কলিকাতার বাদুড়বাগানের বাড়ী সম্পূর্ণ হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুব্যয়ে এই বাড়ী প্রস্তত করেন। শীত কালে তিনি এই বাড়ীতে প্রবিষ্ট হন। প্রথম তিনি স্বয়ং লাইব্রেরী লইয়া এই বাড়ীতে একাকী থাকিবারই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু অন্য বাড়ী প্রাপ্ত হইবার সুবিধা না হওয়ায়, সপরিবারে বাস করিতে বাধ্য হন।

আর দেহ বহে না! রোগে শরীর জীর্ণ! ইহার উপর মাতৃশোক ও পিতৃশোক! আর কত সহে! তেজস্বী পুরুষ, তাই এত দিন দেহ বহিয়াছিল। আর কত দিন! প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে দেবতা হারে। মানুষ কোন ছার! দুর্জ্জয় বীর বিদ্যাসাগর ক্রমে শোণিতশূন্য ও শক্তিহীন হইয়া আসিতে লাগিলেন। তিনি সংসারের সকল কঠোর কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। কলিকাতায় আর তিনি বেশী দিন থাকিতে পারিতেন না। ক্রমে সংসার-কোলাহল ভয়ঙ্কর কষ্টকর হইতে লাগিল। তাই তিনি কখন বা কর্ম্মটাঁয়, কখন বা ফরাসডাঙ্গায়

থাকিতেন। কর্ম্মটাঁড়েই তিনি বেশী দিন থাকিতেন। কর্ম্মটাঁড়ে সরল সাঁওতালগণ তাঁহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি তাহা-দিগকে সহজে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। প্রত্যহ সাঁওতালগণের কেহ না কেহ যথাসাধ্য উপহার লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। একবার একটী সাঁওতাল একটী মোরগ উপহার আনিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, মোরগ উপহার দেখিয়া, হাসিয়া বলেন—"আমি ব্রাহ্মণ, মোরগ লই কি করিয়া?" সাঁওতাল কাঁদিয়া ফেলিল। অগত্যা বিদ্যাসাগরকে মোরগটী হাতে করিয়া লইতে হইল। সাঁও-তালের আনন্দের সীমা রহিল না। সাঁওতাল চলিয়া আসিলে পর মোরগটীকে অবশ্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সাঁওতালদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ঘটিয়াছিল। এক দিন একটী সাঁওতাল তাহার আত্মীয় স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়। সে সাক্ষাৎ করিয়া বলে,—"একে একখানা কাপড় দিতে হ'বে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু কৌতুক করিবার অভিপ্রায়ে বলেন,—"কাপড় নাই। আর ওকে দিব কেন?" সাঁওতাল বলিল,—"তা হবে না, কাপড় দিতেই হ'বে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"কাপড় নাই।" তখন সাঁওতাল বলিল,—"দে তোর চাবি। চাবি খুলে সিন্ধুক দেখ্‌বো।" বিদ্যাসাগর মহাশয়, হাসিয়া সাঁওতালকে সিন্দুকের চাবিটী দেন। সাঁওতাল চাবি দিয়া সিন্দুক খুলিয়া দেখে প্রচুর কাপড়। সে বলিল,—"এই যে

কাপড়।" এই বলিয়া, সে একখানি ভাল কাপড় বাহির করিয়া আনিয়া, স্ত্রীলোকটীকে প্রদান করিল। ইহাতেই বিদ্যাসাগরের অপার আনন্দ।

সুযোগ্য কৃতবিদ্য জামাতাকে স্কুলের ভার দিয়া তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্কুলের ভাবনা সদাই মস্তিষ্কে ঘুরিয়া বেড়াইত। ১২৮৬ সালে বা ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কলেজে বি,এ ক্লাস খোলা হয়। ইহারও চরমোন্নতি হইয়াছিল।

পরে বি, এল, ক্লাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে কলেজের পরীক্ষার্থীদিগকে শত করা হিসাবে নির্দ্ধারিত দিন উপস্থিত থাকিতে হয়। না থাকিলে পরীক্ষা দিবার অধিকার থাকে না। এ নিয়মপালনের প্রতি বিদ্যাসাগরের দৃঢ় দৃষ্টি ছিল। এ নিয়মভঙ্গে প্রত্যবায় আছে, এই ধারণায়, কলেজের অধ্যাপক মাত্রকেই তিনি এ সম্বন্ধে সাবধান থাকিতে উপদেশ দিতেন। কাহারও ত্রুটি বোধ হইলে ভর্ৎসনা করিতেন। একবার রীপণ কলেজ হইতে, এক জন বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার উপস্থিতি-নিয়মে ত্রুটি ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে ও কথা বিদিত করেন। তাহা লইয়া হুলস্থুল বাধিয়াছিল। রীপণ কলেজের কর্ত্তা সুরেন্দ্র বাবু বেশ অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন। অতঃপর সকল কলেজকে এ সম্বন্ধে সাবধান হইতে হইয়াছিল।

১২৮৭ সালে বা ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়, গবর্ণমেণ্টের

নিকট হইতে সি, আই, ই, উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি প্রথমতঃ উপাধি-গ্রহণে অসম্মত হন। পরে উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া উপাধি গ্রহণ করেন; সনন্দ লইতে কিন্তু দরবারে যান নাই।

ইহার পর তিনি কলেজের বাড়ী নির্ম্মাণের ভাবনায় বিব্রত হইয়াছিলেন। তিনি বৎসর প্রায় আর কোন বিশিষ্ট সাধারণ জ্ঞাতব্য কার্য্য করেন নাই।

১২৮৯ সালে বা ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষা হইতে ঋজুপাঠ তৃতীয় ভাগ উঠিয়া যায়। ষোল বৎসর কাল এই পুস্তক পাঠ্যান্তর্ভূত ছিল। ঋজুপাঠ উঠিয়া যাওয়ায়, অনেকটা আয়হ্রাস হইয়াছিল। এই সময় বিদ্যাসাগর একটু বিব্রত হইয়াছিলেন; কিন্তু বিচলিত কিছুই হন নাই। ইহার পূর্ব্বে স্কুলের অনেক শিক্ষকের বেতন বাড়াইয়া দিবার আশা দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা আয়হ্রাস জন্য কতকটা নিরাশ হইয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়, কাহাকেও নিরাশ করেন নাই। যেরূপেই হউক, তিনি অর্থ সংকুলান করিয়া লইয়াছিলেন। সাধুসঙ্কল্প অসম্পূর্ণ রহে না।

১২৯১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর অসুস্থ হইয়া কানপুরে যান।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বি,এ পরীক্ষায় মেট্রপলিটন সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বড়বাজারের শাখা ও ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বহুবাজারের শাখা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১২৯১ সালের ১৮ই পৌষ বা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি

বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজকৃষ্ণ বাবুকে, তাঁহার সংস্কৃত প্রেসের অবশিষ্ট অংশ ৫ সহস্র টাকায় বিক্রয় করেন। প্রেসের কার্য্যে তাঁহার প্রবৃত্তি-হীনতা, এ বিক্রয়ের কারণ; অধিকন্তু ইহাতে তাঁহার অনেক টাকার ঋণ শোধ হইয়াছিল। পুস্তকের আয় মাসিক প্রায় ৩।৪ সহস্র টাকা দাঁড়াইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে দেনা তিনি এক পয়সাও রাখিয়া যান নাই। বিদ্যাসাগর দেনা করিয়াছিলেন অনেকেরই; দেনা রাখেন নাই কাহারও। পাওনাদার পাওনার কথা ভুলিতেন, বিদ্যাসাগর দেনার কথা ভুলিতেন না। যাচিয়া ঋণ পরিশোধের শত-পরিচয় বিদ্যাসাগরের জীবনে পাইবে। একবার তাঁহার নিকট গবর্ণমেণ্টের প্রায় পাঁচ হাজার টাকার পাওনা ছিল। গবর্ণমেণ্ট পাওনার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। হিসাব-নিকাশেও ইহার উল্লেখ ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং পত্র লিখিয়া, এই কথা তুলিয়া, টাকা পরিশোধ করেন। শুনা যায়, বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, তখন পাটীগণিত, ইতিহাস প্রভৃতি ছাপিয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে এই টাকা দিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। এই টাকা খরচ হইয়া গিয়াছিল।

এই সময় পাথুরিয়াঘাটার মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তদীয় ভ্রাতা রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মধ্যে বিষয় লইয়া মনান্তর হয়। বিষয়ের গোল মিটাইবার জন্য ১২৯২ সালের ২৫শে বৈশাখ বা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে উভয় ভ্রাতা নিম্নলিখিত

সালিসীনামা লিখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সালিসী হইবার জন্য অনুরোধ করেন।

মাননীয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদনমৃ—

স্বাঃ শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

স্বাঃ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

আমরা দুই সহোদর একাল পর্য্যন্ত একান্নবর্ত্তী থাকিয়া কালযাপন করিতেছিলাম এক্ষণে সেরূপ কালযাপন করার নানা অসুবিধা বোধ করিয়া পরস্পর পৃথক অন্ন হওয়া আবশ্যক হইয়াছে এবং তদুপলক্ষে বিষয়-বিভাগও অপরিহার্য্য আপোশে সকল বিষয়ে সুশৃঙ্খলরূপে নিষ্পত্তি হওয়া অসম্ভাবনীয় বোধ করিয়া আমরা উভয়ে একমত হইয়া আপনাকে সালিশ নিযুক্ত করিয়া এই ভার দিতেছি আপনি আমাদের উভয় পক্ষের নিকট হইতে সকল বিষয় অবগত হইয়া ও সবিশেষ তদন্ত করিয়া আমাদের স্থাবরাস্থাবর সমুদায় সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিবেন আমরা উভয়ে অঙ্গিকার করিতেছি আপনার কৃত বিভাগ মান্য করিয়া লইব সে বিষয়ে কোন ওজর আপত্ত করিব না যদি করি তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে এতদর্থে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই সালিশনামা লিখিয়া দিলাম। অদ্যকার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে এই বিষয় নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন ইতি সন ১২৯২ বারশত বিরানব্বই সাল তারিখ ২৫ বৈশাখ।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, গোলযোগ মিটাইবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত কাগজ-পত্র আনিয়া, তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে, পর্য্যালোচনা

করিতেন। নানা কারণে গোলযোগ মিটান দুঃসাধ্য ভাবিয়া, তিনি ১২৯২ সালের ১৫ই আষাঢ় বা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন উভয় ভ্রাতাকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া, সালিসীর ভার পরিত্যাগ করেন।

বিনয়নমস্কার বহুমানপুরঃসর আবেদনমিদম্—

আপনাদের বিষয়বিভাগ সংক্রান্ত বিবাদনিষ্পত্তির ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু নানা কারণে এত বিরক্ত হইয়াছি যে আর আমার ঐ বিষয়ে পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। এ জন্য নিরতিশয় দুঃখিত অন্তঃকরণে আপনাদের গোচর করিতেছি, আমি এ বিষয়ে ক্ষান্ত হইলাম। আপনাদের বিবাদনিষ্পত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হওয়া ও আন্তরিক সুখলাভ করা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। কিমধিকমিতি ১৫ই আষাঢ়, ১২৯২।

১২৯২ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ বা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর, বিদ্যাসাগর মহাশয়, মনান্তরবশতঃ সংস্কৃত ডিপজিটরি হইতে আপনার সমুদায় পুস্তক তুলিয়া লইয়া আনিয়া, স্বপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতা লাইব্রেরীতে রাখিয়া দেন। কলিকাতা লাইব্রেরী এখন কলিকাতা-সুকিয়া-ষ্ট্রীটে অবস্থিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যাবতীয় পুস্তক এইখান হইতে বিক্রীত হইয়া থাকে।

এই সময় বিলাতফেরৎ সিবিলিয়ান ঋগ্বেদপ্রকাশক বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আলাপ-পরিচয় হয়। রমেশ বাবু, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ী যাইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় অসুস্থ ছিলেন। তিনি রমেশ বাবুকে

বলেন,—"ভাই, উত্তম কাজে হাত দিয়াছ, কাজটী সম্পন্ন কর। যদি আমার শরীর একটু ভাল থাকে, যদি আমি কোনরূপে পারি, তোমার সাহায্য করিব।"

স্বয়ং রমেশ বাবু এই সব কথা নব্য-ভারতে লিখিয়াছিলেন। বিলাতফেরৎ শূদ্র সিবিলিয়ানকে বেদ-প্রকাশে প্রশ্রয় দিয়া, ব্রাহ্মণ-সন্তান বিদ্যাসাগর, এ যুগোচিত কার্য্য করিয়াছেন। অধিকার-অনধিকারের সূক্ষ্ম তত্ত্ব মর্ম্মে বিদ্যাসাগর দৃষ্টিহীন, এ ঘটনায় তাহারই অন্যতম প্রমাণ। তিনি যে সে মর্ম্ম বুঝিয়াও আত্মগোপন করিয়াছিলেন, এ কথা বলিতে কাহারও সাহস হইবে না। তিনি যে সত্য-পরায়ণ।

১২৯৩ সালের মাঘ মাসে বা ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে শঙ্কর ঘোষের লেনে নূতন বাড়ীতে কলেজ ও স্কুল প্রবেশ করে। জমী ক্রয় করিতে ও বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল; প্রায় লক্ষ টাকা ধার হইয়াছিল।

১২৯৫ সালের ৩০শে শ্রাবণ বা ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্নী রক্তামাশয় পীড়ায় লোকান্তরিত হন। মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ইনি কপালে করাঘাত করিতে আরম্ভ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতাকে ডাকিয়া বলেন,—"বাবা মা কি বলিতেছেন শুনুন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"বুঝিয়াছি, তাই হইবে; তার জন্য আর ভাবিতে হইবে না।" কপালে করাঘাত,—পুত্রের জন্য করুণা-ভিক্ষা। আশ্বাস পাইয়া সতী সুখে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

পত্নী দীনময়ী প্রকৃত গৃহিণী ছিলেন। তিনি শ্বশ্রূঠাকুরাণীর ন্যায় স্বহস্তে রন্ধন করিয়া লোকজনকে খাওয়াইতে বড় ভাল বাসিতেন। দানধ্যানেও তাঁহার পূর্ণ প্রবৃত্তি ছিল। বর্জ্জিত পুত্র নারায়ণের জন্য পতির সহিত তাঁহার অনেক সময় বাদবিসম্বাদ ঘটিত। এই বাদবিসম্বাদই সদ্ভাবক্রটীর মূল কারণ হইয়াছিল। অনেক সময় তিনি গোপনে পুত্রকে অর্থসাহায্য করিতেন; এমন কি, নিজের অলঙ্কার পর্য্যন্ত বন্ধক দিতেন। এজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়, বিরক্ত হইয়া টাকা কড়ি দেওয়া বন্ধ করিতেন। পিতা শত্রুঘ্ন যেমন তেজস্বী ছিলেন, কন্যা দীনময়ীও তেমনি তেজস্বিনী ছিলেন। স্বামীর নিকট একবার কোন জিনিষ চাহিয়া না পাইলে, তিনি দুর্জ্জয় অভিমানে অভিভূত হইতেন। তেজস্বী বিদ্যাসাগর তাহার জন্য বিচলিত হইতেন না। এইরূপে মনান্তর ঘটিত। দীনময়ী তেজস্বিনী ছিলেন; কিন্তু পিতার ন্যায় তাঁহার যথেষ্ট উদারতা ছিল।

পত্নী-বিয়োগের পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়ে দাম্পত্য-সুখাভাবের সুদারুণ স্মৃতি জাগরিত হইয়াছিল। সেই স্মৃতি-তাড়নায় সহসা অনুতাপ-দাবানল প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই অন্তর্নিহিত দাব-দাহের যন্ত্রণায় রোগও বাড়িয়া গিয়াছিল।

এত আধি-ব্যাধির জ্বালাময়ী যন্ত্রণায়ও বিদ্যাসাগর, এক মুহূর্ত্তের জন্য আপন কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই। স্কুল-কলেজ সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক থাকিত। জামাতা সূর্য্য

বাবুর উপর ভার দিয়া, তিনি গুরু কার্য্যভার হইতে অবসর লইয়াছিলেন বটে; কিন্তু ভাবনা প্রাণের ভিতর অবিরাম। বিধাতা বিমুখ! পত্নীবিয়োগের দিন কতক পরেই, বিদ্যাসাগর মহাশয়, জামাতা সূর্য্য বাবুর কোন কার্য্যের কর্ত্তব্যক্রুটি-বিবেচনায় বিরক্ত হইয়া, তঁাহাকে পদচ্যুত করেন। পুত্রবর্জ্জ-নান্তে যাঁহাকে পুত্ররূপে কোল দিয়াছিলেন, যাঁহার কার্য্যপটু-তায় স্কুল-কলেজের সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়াছিল, এবং যাঁহার উপর স্কুলের ভার দিয়া, গুরুতর কার্য্যভার হইতে অব-কাশ পাইয়াছিলেন, তাঁহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়, পদচ্যুত করিলেন। নিশ্চিতই সে কর্ত্তব্যক্রুটীকে তিনি ক্ষমাতীত মনে করিয়াছিলেন।

জামাতার পদচ্যুতির পর, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রায়ই স্কুল-কলেজের পরিদর্শন করিতে হইত। তিনি পাল্কী করিয়া যাইতেন এবং পাল্কী করিয়া আসিতেন। উত্তরপাড়ায় পড়িয়া যাইবার পর, তিনি প্রায় গাড়ী চড়িতেন না। নিজের গাড়ী-ঘোড়া রাখিবার অর্থ-সামর্থ্য ছিল; কিন্তু প্রবৃত্তি ছিল না। বহু পূর্ব্বে তিনি গাড়ী-ঘোড়া রাখিয়াছিলেন বটে; কিন্তু নানা কারণে তাহা তুলিয়া দেন।

এই সময়, তিনি মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে স্কুলের ভার দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। গুরুদাস বাবু এ গুরু ভার-বহনে সম্মত হন নাই। এ অসম্মতির কারণ অবশ্য অক্ষমতা। গুরুদাস বাবু, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পিতৃবৎ

ভক্তি করিতেন। যখন কলিকাতা-রাধাবাজারে কলিকাতা প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলাম, তখন সেই প্রেসে গুরুদাস বাবুর প্রণীত ইংরেজি অঙ্ক পুস্তক মুদ্রিত হইত। সেই সময় তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার মুখে প্রায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুন কীর্ত্তন শুনিতাম। তিনি স্ব-প্রণীত অঙ্ক-পুস্তক বিদ্যালয়ে প্রচলিত করিবার জন্য একমাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অন্য কাহাকেও বলিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না। এ কথা, তখন তাঁহারই মুখে শুনিয়াছিলাম। এক গুরুদাস বাবু স্কুল-কলেজের ভার লইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয়, নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন। এমন অটল বিশ্বাসতো আর কাহারও উপর ছিল না। উভয়ের হৃদয়ে নিত্য-তরঙ্গায়িত ঘাত-প্রতিঘাতে ভক্তি-বাৎসল্যের অবিচ্ছিন্ন স্রোত প্রবাহিত হইত। বিদায়-হিসাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়, কোন দ্রব্য লইবেন না বুঝিয়া, গুরুদাস বাবু, মাতৃ-শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একটী রৌপ্য-নির্ম্মিত গ্লাস উপহার দিয়াছিলেন। গত বৎসর নারায়ণ বাবুর নিকট এই সুন্দর সুগঠিত গ্লাসটী দেখিয়াছিলাম। গ্লাসে এইরূপ কথা খোদিত আছে,—

"পানপাত্রমিদং দত্তং বিদ্যাসাগর শর্ম্মণে।
স্বর্গ কামনায় মাতুর্গুরুদাসেন শ্রদ্ধয়া॥"

রোগ-শীর্ণ-দেহে স্কুল-কলেজের চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়াও, বিদ্যাসাগর এক দিনের জন্য জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রাম বিস্মৃত

হন নাই। ১৮।১৯ বৎসর তিনি বীরসিংহ গ্রামে গমন করেন নাই বটে; কিন্তু বীরসিংহের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এক দিন তিনি কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, উপরে উঠিতেছিলেন, সেই সময় বীরসিংহ গ্রাম হইতে প্রেরিত এক-খানি মুদ্রিত ক্ষুদ্র পুস্তক তাঁহার হস্তগত হয়। স্বয়ং বীরসিংহ-জননী যেন কাতর-কণ্ঠে বিদ্যাসাগরকে উদ্দেশ করিয়া সেই পুস্তক লিখিয়াছিলেন। সে পুস্তক পাঠ করিতে করিতে বিদ্যাসাগর অজস্র ধারে অশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে ম্যালেরিয়ার তাড়নায় বীরসিংহ গ্রামের স্কুলটী উঠিয়া গিয়াছিল। ১২৯৭ সালের ২রা বৈশাখ বা ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল তিনি এই বিদ্যালয়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। স্বর্গীয় জননীর নামে এই বিদ্যালয়ের নাম হইল, বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়। এখনও এই স্কুল চলিতেছে।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

পীড়া-বৃদ্ধি, ফরাসডাঙ্গায় প্রবাস, দয়া, সহৃদয়তা, সহবাস-সম্মতি আইন, মত, রাজনীতি, আলোচনা, পীড়ার অবস্থা ও দেহান্তর।

আর কত সয়! শোকতাপপরীত, ব্যাধিজর্জ্জরিত ও সুদারুণ শ্রমভারাক্রান্ত জীর্ণ দেহে আর কত সয়! এ কঙ্করিত সংসার-ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর বাল্যকাল হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত কঠোরতার দুর্ব্বার সংগ্রামে আজন্ম জয়ী। কিন্তু এ জগতে কে কালজয়ী! ইতিপূর্ব্বে প্রাণপ্রতিম বন্ধু প্যারীচরণ সরকার, শ্যামাচরণ বিশ্বাস, মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু ও প্রিয় ভক্ত কৃষ্ণদাস পাল, বিদ্যাসাগরকে শোকের অনন্ত শর-শয্যায় শয়ন করাইয়া, একে একে ইহসংসার হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। সুতরাং আর কত সয়!

১২৯৭ সালের প্রারম্ভে বা ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে উদরাময় পীড়া বলবতী হইয়া উঠে। ইহার পূর্ব্বে ছয় বৎসর কাল তিনি উদরাময়ে ভুগিতেছিলেন। এই ছয় বৎসর কাল আহারে অন্নাদির গুরুপাক কতকটা সহ্য হইত। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে অন্নাহার একবারে বন্ধ হইয়াছিল। সিদ্ধকরা বার্লি, পালো প্রভৃতি মাত্র আহার ছিল। অগ্রহায়ণ মাসে ডাক্তার শ্রীযুক্ত

হিরালাল ঘোষ, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নির্জ্জনে থাকিবার পরামর্শ দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন,—"কলিকাতায় থাকিলে তাহা চলিবে না; লোকে সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, বলিতে পারিব না, সাক্ষাৎ করিব না; আর দরজায় দরোয়ানও বসাইতে পারিব না।" অবশেষে স্থানান্তরে যাওয়াই সিদ্ধান্ত হইল। অগ্রহায়ণ মাসে তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া ফরাসডাঙ্গায় যান। সেখানে ভাগিরথীতটে একটি সুন্দর-সুগঠিত স্বাস্থ্যপ্রদ দ্বিতল বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। এই বাড়ীতে থাকিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অপেক্ষাকৃত ভাল ছিলেন।

ফরাসডাঙ্গার স্বাস্থ্য-প্রবাসেও দান ও দয়া অবিরাম। সহৃদয়তার অবাধ স্রোত। এক দিন একটী অন্ধ মুসলমান ভিক্ষুক, স্ত্রীর হাত ধরিয়া ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিল। সমস্ত সহর ঘুরিয়া একমুষ্টি ভিক্ষা মিলে নাই। শেষে সে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট যাইয়া উপস্থিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাহার অবস্থা অবগত হইয়া, দয়র্দ্রচিত্তে তাহাকে গোটাকতক পয়সা দিয়া, জিজ্ঞাসা করেন,—"তোর কি খাইতে ইচ্ছা হয়?"

ভিক্ষুক বলিল,—"আমি লুচি ও দই অনেক দিন খাই নাই। আমার এখন তাই খাইতে ইচ্ছা হয়।"

বিদ্যাসাগর তখনই আপনার কন্যাকে দিয়া লুচি প্রস্তুত করাইয়া, ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকের স্ত্রীকে পেটভরিয়া খাওয়াইয়া দেন। অধিকন্তু তিনি তাহাদিগকে দুইটী টাকা দিয়া বলেন,—

"প্রত্যেক রবিবার আসিয়া লুচি খাইয়া যাস্।" কেবল ইহাই নহে, তাহাদের ঘর-ভাড়া স্বরূপ তিনি প্রত্যেক মাসে ॥০ আনা করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

ফরাসডাঙ্গায় থাকিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্রায়ই নিকটবর্ত্তী স্থানে বেড়াইতে যাইতেন। এক বার তিনি ভদ্রেশ্বরের একটী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, তাঁহার বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র ছিলেন। ব্রাহ্মণের কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত পুত্র তামাক সাজিয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, অম্লান বদনে নির্ব্বিকার চিত্তে তামাক খাইয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময়, পথে ভ্রাতা বলিলেন,—"আপনি কেমন করিয়া, কুষ্ঠের হাতের সাজা তামাক খাইলেন।" বিদ্যাসাগর মহাশয়, গম্ভীর ভাবে উত্তর দেন,—"যদি তোমার বা আমার কুষ্ঠ হইত, তাহা হইলে কি করিতাম।"

ফরাসডাঙ্গায় অবস্থিতিকালে গবর্ণমেণ্ট, সহবাসসম্মতি আইন সম্বন্ধে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত জানিতে চাহিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি দিন পাঁচ ছয়ের জন্য কলিকাতায় আসেন। বহু পরিশ্রম সহকারে, নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া, তিনি আইনের বিরুদ্ধেই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন।* এতৎ-

* রাজকুলের অনুরোধে মধ্যে মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নূতন আইন-কানুন সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে হইত। কখন তিনি কোন রাজনীতি-আন্দোলনে বা রাজনীতি-সভায় সংস্রব রাখিতেন না। একবার তিনি একটী রাজনীতি-সভা-সংগঠনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন মাত্র।
নব বার্ষিকী, ১৫৩ পৃষ্ঠা।

সম্বন্ধে তিনি যে মত লিখিয়া গবর্ণমেণ্টকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

"এই বিলের সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করিতে আমি সমর্থ নহি। যে স্থলে স্ত্রী দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে ঋতুবতী হয়, সে স্থলে উক্ত বিল আইনে পরিণত হইলে, সর্ব্ববিষয়ে গর্ভাধান-সংস্কারানুষ্ঠানের প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইবে। গর্ভাধান, সংস্কার শাস্ত্রবিহিত; সকলের পক্ষে অনুষ্ঠেয় ও সাধারণতঃ বঙ্গদেশে প্রচলিত। স্ত্রীর প্রথমে রজোদর্শন হইলে স্বামীকে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হয়। এই অনুষ্ঠানের অনুকূলে অনেক শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। এস্থলে কলিযুগের সর্ব্বপ্রধান প্রামাণ্য একটী পরাশরবচন উদ্ধৃত করিলে যথেষ্ট হইবে,—

'ঋতুস্নানান্তু যো ভার্য্যাং সন্নিধৌ নোপগচ্ছতি।
ঘোরায়াং ভ্রূণহত্যায়াং যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৪।১৪।"

"প্রথম রজোদর্শনকালীন ঋতুস্নাতা ভার্য্যাসমীপে যে স্বামী গমন না করেন, তিনি ভ্রূণহত্যারূপ মহাপাতক সঞ্চয় করেন।"

যে হেতু কতকগুলি বালিকা দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই প্রথম রজোদর্শন করে, বিল আইনে পরিণত হইলে, তাহাদিগের সম্বন্ধে উক্ত বিধির অনুষ্ঠান আদৌ হইতে পারিবে না; সুতরাং রাজবিধি দ্বারা বৈধ ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতিরোধ করিলে, জন-সমাজে ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

বালিকা স্ত্রীগণের রক্ষার জন্য উক্ত বিল যে আশ্রয় প্রদানে উদ্যত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বহুসংখ্যক ঘটনায় দৃষ্ট হয় যে, সচরাচর দ্বাদশ বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ বয়সের মধ্যে প্রথম রজোদর্শন ঘটিয়া থাকে। দ্বাদশ বর্ষে সম্মতিবিধি নির্দ্ধারিত হইলে, ইহার ফল

এই হইবে যে, উক্ত বর্ষ-অতিক্রমকারিণী বালিকাগণ নিতান্তই আশ্রয়-শূন্য হইবে। অধিকন্তু স্ত্রী দ্বাদশ বর্ষে পদক্ষেপ করিলেই স্বামী স্ত্রী-সহবাসে উত্তেজনা ও প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইবে। যে বিধি, স্ত্রী দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেই, তাহার প্রতি নৃশংস আচরণের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে উদ্যত, সে বিধির সমর্থন আমি কোন প্রকারেই করিতে প্রস্তুত নহি।

যদিও এই সকল কারণে আমি বিলের সমর্থন করিতে অপারগ, তথাপি প্রচলিত কোন ধর্ম্মসংস্কারের প্রতিকূলাচরণ না করিয়া, এমন কোন আইন হউক, যাহাতে বালিকা স্ত্রীগণ সমুচিত আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। তাহাতে আমি সম্পূর্ণ অভিলাষী। আমার প্রস্তাব এই যে, স্ত্রী রজঃস্বলা হইবার পূর্ব্বে তৎসহবাস দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হউক। অধিকাংশ বালিকা ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ অথবা পঞ্চদশ বর্ষের পূর্ব্বে প্রায় রজঃস্বলা হয় না। সুতরাং আমার প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইলে তাহাদিগকে প্রস্তাবিত আইন, অপেক্ষাকৃত বাস্তবিক ও অধিকতর প্রশস্ত আশ্রয়প্রদানে সমর্থ হইবে। তৎসঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিরোধী বলিয়া উক্ত বিধির বিরুদ্ধে কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হওয়া সম্ভবপর নহে। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে রজঃস্বলার পূর্ব্বে স্ত্রী-সহবাস স্বামীর পক্ষে নিতান্তই ধর্ম্মবহির্ভূত কার্য্য। এ সম্বন্ধে তিনটী শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিলেই হইবে। প্রথম বচনটী বাচস্পতি মিশ্রকৃত "স্মৃতিসার সংগ্রহ" হইতে উদ্ধৃত করা হইতেছে—

"গর্ভাধানং পত্ন্যা যোনৌ ঋতুকালীন আদ্যো রেতঃসিক্তঃ।"

"প্রথম রজোদর্শন হইলে, স্ত্রীর জননেন্দ্রিয়ে প্রথম বীর্য্যনিষেকের নাম গর্ভাধান সংস্কার।" উক্ত বচনে "প্রথম" এই শব্দের নির্দ্দেশে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, রজোদর্শনের পূর্ব্বে স্বামীর স্ত্রীর নিকটে অভিগমন শাস্ত্রের অনভিপ্রেত। দ্বিতীয় বচন মনুসংহিতার টীকাকার মেধাতীথিপ্রণীত টীকা হইতে উদ্ধৃত হইল,—

"ऋतुकालाभिगामी स्यात्। ३। ४५।"

"ঋতুকালে (চতুর্থ দিবসে) স্ত্রীসহবাস কর্ত্তব্য।"

"उक्तो विवाहः। तस्मिन् निर्वृत्ते समुपजाते हारले तदहरेवेच्छयोपगमे प्राप्ते तन्निवृत्त्यर्थमिदमारभ्यते। न विवाहसमनन्तरं तदहरेव गच्छेत् किं तर्हि ऋतुकालं प्रतीक्षेत॥

"বিবাহের বিষয় উক্ত হইল। বিবাহানুষ্ঠানের পর বালিকার পত্নীত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইচ্ছা থাকিলে সেই দিনেই স্ত্রী-সহবাস সম্ভব। বিবাহের অব্যবহিত পরেই স্ত্রী গমন নিষিদ্ধ। তবে কি করা কর্ত্তব্য? ঋতুকাল পর্য্যন্ত তাহার (অর্থাৎ স্বামীর) অপেক্ষা করা উচিত।"

কমলাকর ভট্টপ্রণীত "নির্ণয়সিন্ধু" হইতে তৃতীয় বচনটী গৃহীত হইল।

"प्रथमर्त्तोः पूर्व्वं स्त्रीगमनं न कार्य्यम्
प्रागरजोदर्शनात् पत्नीं नेयाद्‌ गत्वा पतत्यधः।
व्यर्थीकारेण शुक्रस्य ब्रह्महत्यामवाप्नुयात्॥
इति आश्वलायनोक्तेः।" तृतीयः परिच्छेदः॥

প্রথম রজোদর্শনের পূর্ব্বে স্ত্রী গমন সর্ব্বথা অনুচিত। আশ্বলায়ন বলেন যে, ঋতুদর্শনের পূর্ব্বে কাহারও স্ত্রীগমন উচিত নহে। এরূপ কার্য্যে মহা প্রত্যবায় সঞ্চার হয়। অকারণ বীর্য্যত্যাগে মনুষ্য ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়।"

এইরূপ সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় যে, রজঃস্বলার পূর্ব্বে স্ত্রী-সহবাস দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণনীয়

হইবে। ইদৃশ আইন বিধিবদ্ধ হইলে যে, কেবল জন-সমাজের উপকার ও বালিকা পত্নীগণের সমুচিত রক্ষা হইবে, তাহা নহে। বরং শাস্ত্রানুমোদিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিরোধী না হইয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধির সমর্থন বাড়িবে। উক্ত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিলে শাস্ত্রে যে দণ্ডবিধির উল্লেখ আছে, তাহা আধ্যাত্মিক; সুতরাং অধিকাংশের অগ্রাহ্য। আইনানুসারে ইহা দণ্ডের দ্বারা নিবিদ্ধ হইলে, শাস্ত্রীয় বিধি অধিকতর কার্য্যকারী হইবে। গবর্ণমেণ্টের মনযোগ আকর্ষণ করিয়া এ বিষয়ে বিচারার্থ অনুরোধ করিতেছি।

আমার প্রস্তাবিত আইনের কার্য্যকালে যাহাতে কোন প্রকার অনিষ্ট না ঘটে, সেই উদ্দেশ্যে নির্দ্দেশ করিতেছি যে, উক্ত অপরাধে পুলিষ কোনরূপ হস্তক্ষেপও করিতে পারিবেন না; পরন্তু স্ত্রী অথবা স্ত্রীর অনূঢ়াবস্থায় তাহার আইনানুমোদিত অভিভাবক ব্যতীত অপর কেহ স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর বলাৎকার সংক্রান্ত অভিযোগ আদালতে আনয়ন করিতে পারিবে না।

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯১।

এ মত অবশ্য ইংরেজীতে লিখিত হইয়াছিল। এখানে অনুবাদমাত্র প্রদত্ত হইল। বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে কার্য্য হয় নাই। ইংরেজী-রাজনীতিতত্ত্বের গূঢ়মর্ম্মানুভব করিবার ইহা অন্যতম সুযোগ। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত আইনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সে প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছিল। বিধবা-বিবাহ ইংরেজ রাজের প্রকৃতি ও নীতির অনুমোদিত। সহবাস-সম্মতি আইন সম্বন্ধে বিদ্যা-

সাগরের মত গ্রাহ্য হইল না। ইহাও ত ইংরেজ রাজের প্রকৃতি ও নীতির অননুমোদিত নহে। বিধবা-বিবাহে যে বিদ্যাসাগর, সহবাস-সম্মতি আইনেও সেই বিদ্যাসাগর। বুঝিলে, ইংরেজ-রাজনীতির সূক্ষ্ম-তত্ত্ব?

বিধবা-বিবাহ-বিচারে যে ভ্রম হইয়াছিল, সম্মতি আইনের বিচারে সে ভ্রম ঘটে নাই দেখিয়া, সমগ্র হিন্দু-সমাজ সুখী হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়, বিধবা-বিবাহের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে অনেকটা নির্লিপ্ত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে আবার সহবাস-সম্মতি আইনের বিপক্ষে মত দিতে দেখিয়া, অনেকেই জল্পনা-কল্পনা করিয়া থাকেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়, বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে আপনার ভ্রম অনুভব করিতে পারিয়াছেন। বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতীরা বলেন, শরীরের অসুস্থতা ও স্বদেশবাসীর দুর্ব্ব্যবহার, এই নির্লিপ্ততার কারণ। আমাদের ধারণা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সে ভ্রমানুভব হয় নাই। হইলে, তিনি এমন কপটাচারী নহেন যে, তাহা সাধারণ্যে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। অধিকন্তু আমরা জানি, জীবনের শেষাবস্থাতেও তিনি নিজ দৌহিত্রের বিধবা-বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। সমাজে বিধবা-বিবাহ-প্রচলনে কৃতকার্য্য না হইয়া তিনি নিরাশ-হৃদয়ে সমাজের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। নৈরাশ্য জন্যই বোধ হয়, তিনি বাবু দুর্গা-মোহন দাসের সসন্তান-বিধবা-বিবাহে আহ্লাদ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।

সহবাস-সম্মতি আইন সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়া তিনি ফরাসডাঙ্গায় ফিরিয়া যান। সেখানে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ভাল ছিলেন। চৈত্র মাসে দুই দিন অন্নাহার করিয়াছিলেন। বৈশাখ মাসে আবার পীড়া বৃদ্ধি পায়। এই সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যা কলিকাতায় আসিয়া ৭০০।৮০০ টাকা ব্যয়ে স্বস্ত্যয়নাদি করিয়াছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে হঠাৎ তাহার পার্শ্বদেশে একটা বেদনা উপস্থিত হয়। কিছুতেই বেদনার উপশম হয় নাই। তখন তিনি কনিষ্ঠ দৌহিত্র যতীশচন্দ্রের সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। কলিকাতায় ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা হইল। তাহাতে বিশেষ ফল হইল না। এই সময় তিনি অহিফেন পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করেন। তিনি বলেন,—"অহিফেন খাইলে দুধ খাইতে হয়। দুধ ত আমার সয় না। কাজেই খাই না। দুধ না খাওয়ায় ফল হইতেছে না। অতএব অহিফেন পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। এমন একটা ঔষধ খাওয়া উচিত, যাহাতে অহিফেন ত্যাগ করিলেও কষ্ট হইবে না।" ডাক্তার শ্রীযুক্ত হিরালাল ঘোষ ও শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বসু অহিফেনত্যাগে বিপদের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। কয়েক জনের সহিত পরামর্শ করিয়া কিন্তু অহিফেনত্যাগই সিদ্ধান্ত হয়। কলিকাতা-কলুটোলার হাকিম আবদুল লতিফ অহিফেনত্যাগ করিবার ঔষধ দেন। সেই ঔষধ দুই দিন সেবন করিবামাত্র পীড়ার প্রকোপ বাড়িয়া উঠে। বেদনা বাড়িল; আবল্য আসিল; হিক্কা

দেখা দিল। সকলই আশঙ্কিত হইলেন। চিকিৎসার জন্য ডাক্তার বার্চ্চ ও ম্যাকোলনকে আনান হয়। তাঁহারা বলেন,—"উদরে 'ক্যানসার' হইয়াছে।" রোগের উপশম হইল না। কখনও বেদনা বাড়ে, কখনও কোষ্ঠবদ্ধ হয়, কখনও হিক্কা বাড়ে। আবার কোন দিন একটু ভাল, কোন দিন একটু মন্দ হয়। কোন দিন আহারে আদৌ প্রবৃত্ত থাকে না, কোন দিন একটু প্রবৃত্তি হয়। ৩০শে আষাঢ় পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থায় যায়। ৩১শে আষাঢ় হোমিওপ্যাথি ডাক্তার সলজার সাহেব চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় একটু উপকার হইয়াছিল। পূর্ব্বে মলত্যাগ করাইতে পিচকারী ব্যবহার করিতে হইত, অতঃপর পিচকারী ব্যবহার করিতে হয় নাই। ডাক্তার সলজার 'অল্‌সার্‌' অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"স্যাবা কমিবার সম্ভাবনা; না কমিলে, সাত দিনের মধ্যে মৃত্যুর সম্ভাবনা। কমিলেও এক মাসের অধিক বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই।" এই সময় গর্দ্দভ-দুগ্ধের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কোন দিন গর্দ্দভ দুগ্ধ সহিত, কোন দিন সহিত না। কোন দিন একটু বল হইত, কোন দিন হইত না। কোন দিন হিক্কা কমিত, কোন দিন বাড়িত। গাড়ী-ঘোড়ার শব্দে কষ্ট হইত বলিয়া, বাড়ীর পার্শ্বে গলিতে বিচালি বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। গাড়ী-ঘোড়া যাইলে শব্দ হইত না। মিউনিসাপালিটী স্কাভেঞ্জারের গাড়ী যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ৩রা শ্রাবণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার

দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার মতে পুরাতন গ্রহিণী যত অনিষ্টের মূল।

ডাক্তারেরা আসিতেন, দেখিতেন, চলিয়া যাইতেন; কিন্তু ডাক্তার অমূল্যচরণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট দিবারাত্রি বসিয়া থাকিতেন, শুশ্রূষা করিতেন, মুহুর্মুহু রোগের গতি নিরীক্ষণ করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, অমূল্যচরণকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। অমূল্যচরণও পুত্রের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন।

৪ঠা শ্রাবণ বিদ্যাসাগার মহাশয় শয্যাশায়ী হন। ইহার পূর্ব্বে তিনি উঠিতে বসিতে পারিতেন। আর তাহা পারিলেন না। এই দিন একটু জ্বর হইয়াছিল। ইহার পর ১০ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত কোন দিন একটু ভাল, কোন দিন একটু মন্দ গিয়াছিল। ৮ই শ্রাবণ নূতন উইল করিবার কথা উঠে। শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় উইলের খস্‌ড়াও করিয়াছিলেন; কিন্তু বিদ্যা-সাগর মহাশয় তাহাতে স্বাক্ষর করিতে পারেন নাই। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্কুল ও কলেজ একটি কমিটির হস্তে সমর্পণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সে কথা উইলে লিখিত হইয়াছিল।

১১ই শ্রাবণ রবিবার প্রাতঃকাল হইতে বেলা আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত অবস্থা খুবই মন্দ হইয়াছিল। আবল্য ও মাদকতা বাড়িয়াছিল; নিশ্বাস-প্রশ্বাসেও ভাবান্তর হইয়াছিল; প্রবল তাপে জ্বর ফুটিয়াছিল। এই দিন কবিরাজ ৵ ব্রজেন্দ্রকুমার সেন আশঙ্কিত হইয়াছিলেন। কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন

সেনকে আনান হইয়াছিল। তিনি একটি বারমাত্র দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন,—“বাহিরে যত মন্দ বলিয়া বোধ হয়, ভিতরে তত মন্দ নয়।” কিন্তু হায়, বিধি বাম!

ক্রমেই রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১২ই শ্রাবণ সোমবার একরূপ অচৈতন্য অবস্থা ছিল। মুখের ভাব বিকৃত হয় নাই। ভাবে বোধ হইত, ভিতরে ভয়ানক যন্ত্রণা, বিরাট পুরুষ বিদ্যাসাগর, সে যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন।

রোগের সঙ্গে যাতনা বাড়িল। যাতনা বাড়িল; কিন্তু সাগরের ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নাই। অন্তরের যাতনানুভূতি তিনি বাহিরের লোককে বাহ্যাকারে বুঝিতে দিতেন না। যতক্ষণ না চৈতন্য-লোপ হইয়াছিল, ততক্ষণ তিনি কাহাকেও সহজে মল মূত্র বা বমনাদি পরিষ্কার করিতে দিতেন না; সে পক্ষে কেহ উদ্যোগী হইলে; বরং বিরক্ত হইতেন। কাহারও কোন কষ্ট দেখিলে, তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত; কিন্তু নিজের অসহ্য কষ্টতাপেও তিনি কখনও কাতর হইতেন না; নিরভ্র ভীম হিমগিরিবৎ অচল ও অটল থাকিতেন। একবার তিনি আপনার কনিষ্ঠ কন্যার পুত্রকে সঙ্গে করিয়া কোন পুস্তকালয়ে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার পায়ের উপর একটা ভয়ানক ভারী লৌহ-চাপ পড়িয়া যায়। অপর কেহ হইলে, হয়ত উঠিতে পারিতনা; তিনি কিন্তু অম্লান বদনে উঠিয়া, পাল্কী চাপিয়া বাড়ী আসেন। যাতনা যৎপরোনাস্তি হইয়াছিল কিন্তু সে যাতনায় বাহ্যাবয়বে বিকৃতির লেশমাত্র হয় নাই।

দৌহিত্রী যতীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যাতনা হইতেছে কি?" তিনি ঈষদ্ হাসিয়া বলিলেন,—"যাতনা যা হইতেছে, তোদের হইলে, ডাক্তারের ডাক বসাইতে হইত; আমাকেও পাগল করিতিস্।" আর একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পায়ে "কারবঙ্কল" হইয়াছিল। তিনি সদানন্দ-সহাস্য-বদনে বসিয়া ৺প্যারিচরণ সরকারের সহিত কথা কহিতেছিলেন। সেই সময় ডাক্তার আসিয়া, তাঁহার "কারবঙ্কল" কাটিয়া দেন। "কারবঙ্কল" কাটিবার সময়, তাঁহার একটুমাত্র মুখ-বিকৃতি দেখা যায় নাই। প্যারি বাবু অবাক হইয়াছিলেন। এমন সহিষ্ণুতার পরিচয় সহস্র প্রকারে পাইবে। বার্দ্ধক্যেও কষ্টকময় অন্তিম-শয্যায় সে সহিষ্ণুতার সর্ব্বোচ্চ পরিচয়। যাতনার অগ্নিকুণ্ড হইতেও যথাপাত্রে যথাযোগ্য রহস্যাভাসের সুধা-ধারা বর্ষিত হইত।

যে ঘরে জননীর চিত্র ছিল, সেই ঘরেই তিনি শুইয়াছিলেন। জননীর চিত্র ছিল পূর্ব্ব দিকে, তাঁহাকে উত্তর শিয়রে শয়ন করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনি বাক্‌শূন্য অচেতন; কিন্তু কি এক মন্ত্র-প্রভাবে, সেই মুমূর্ষু মাতৃভক্ত মুহূর্ত্তের মধ্যে, ঘুরিয়া পশ্চিম দিকে মাথা লইয়া যান। সম্মুখে পূর্ব্ব দিকে। জননীর মূর্ত্তিপানে নিস্পন্দনয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, অবিরল-ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। মঙ্গলবার আদৌ চৈতন্য ছিল না।

আর আশা নাই। পলকে পলকে প্রলয়। গভীর শোক-

চ্ছায়ায় শান্ত-নিকেতন আচ্ছন্ন হইল। আত্মীয়, স্বজন, পুত্র দৌহিত্র, ভ্রাতা, কন্যা, ভক্ত, অনুগত, সকলেই প্রতিমুহূর্ত্তে উৎকণ্ঠিত চিত্তে মুমূর্ষুর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ভিতরে হয় ত দারুণ দাবানল, বাহিরে কিন্তু অনাবিল শুভ্র শান্তি। মুখমণ্ডল অবিকৃত। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, সন্ধ্যা-সমাগমে এই একই ভাব।

রাত্রি ১১টার সময় নাভিশ্বাস আরম্ভ হইল। রাত্রি ২টা ১৮ মিনিটে সেই করুণাময়ের করুণ-কান্তি নিবন্ত জ্যোতি জন্মের মত নির্ব্বাপিত হইল!

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

শেষ।

এইবার শেষ। শূন্য-দেহের শ্মশানসৎকার। নিত্য মৃত-গ্রাসী নিমতলার ঘাটে বিদ্যাসাগরের সৎকার হইয়াছিল। দুই দিন পূর্ব্বে এই নিমতলার শ্মশান-শয্যায় বঙ্গের অন্যতন শক্তিশালী পুরুষ, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর, শেষ শয়ন করিয়াছিলেন। বঙ্গের ইতিহাসে, নিমতলার এইরূপ সৌভাগ্য-শালিতার পরিচয়, এই বুঝি প্রথম।

বিদ্যাসাগর যে সুন্দর সুশোভন খট্টাঙ্গে শয়ন করিতেন, সেই খট্টাঙ্গেই তাঁহার শবদেহ শায়িত হইয়াছিল। পুত্র, ভ্রাতা, দৌহিত্র, আত্মীয়বর্গ এবং ভক্তবৃন্দ খট্টাঙ্গ স্কন্ধে লইয়া, রাত্রি প্রায় চারি ঘটিকার সময় নিমতলাভিমুখে যাত্রা করেন।

মেট্রপলিটন ইনৃষ্টিটিউসনের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, পুত্র নারায়ণ বাবু বাষ্পাকুলিতলোচনে উচ্চ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন,— "বাবা, এই তোমার সাধের মেট্রপলিটন। আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার এই কীর্ত্তি বজায় রাখিতে পারি।" সেই শোকপরীত কাতর ক্রন্দনে উপস্থিত কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

নিশার শেষভাগে অনেকেই এই শোকময় সংবাদ শুনিয়া, শেষ দেখা দেখিবার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হইয়াছিল। অনেক ভক্ত, খট্টাঙ্গ স্পর্শ করিয়া জীবনকে সার্থক জ্ঞান করিয়াছিল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শব শ্মশানে উপস্থিত হয়। বিদ্যাসাগর

মহাশয়ের ভ্রাতৃবর্গ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সৎকার করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। দৌহিত্রগণ কিন্তু শব-দেহের শেষ ফটোগ্রাফ তুলিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাঁহারা বিখ্যাত ফটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেন মহাশয়কে ডাকাইয়া আনাইয়া, ঠিক সূর্য্যোদয়ে ফটোগ্রাফ তুলাইয়া লন।

দেখিতে দেখিতে, ক্রমে শ্মশান-ঘাট অসংখ্য জন-সমাগমে পূর্ণ হইল। সকলেই বিদ্যাসাগরকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য উৎগ্রীব। অনেক স্ত্রীলোক দেখিতে গিয়াছিল। যাঁহারা প্রত্যহ প্রাতঃস্নানে যাইয়া থাকেন, তাঁহারা সংবাদ পাইবামাত্র সর্ব্বাগ্রে শ্মশানে গিয়া উপস্থিত হন। সেই সময় প্রকৃতি প্রকৃতই একটা বিশ্বব্যাপিনী সৌম্য-গম্ভীর-শোকময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। ভাগিরথীর কলকল-নাদে সমাগত ব্যক্তিবর্গের হাহাকার-আর্ত্তনাদ এবং অশ্রুভারাবনত আত্মীয়বর্গের নীরব দীর্ঘশ্বাস মিশিয়া কি যেন এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের আবির্ভাব হইয়াছিল!

ফটোগ্রাফ তুলাইতে এবং সমাগত ব্যক্তিবর্গের দর্শনাকাঙ্ক্ষা মিটাইতে সৎকারের বিলম্ব হইয়াছিল। সূর্য্যোদয়ের পর শবদেহ চিত-শয্যায় শায়িত হয়। চিতার জন্য বড়বাজার প্রভৃতি স্থান হইতে যথাসম্ভব চন্দনকাষ্ঠ সংগৃহীত হইয়াছিল। মুহূর্ত্তে চিতা জ্বলিল! পুত্র নারায়ণ মুখাগ্নি করিলেন।* বেলা

---

* বিদ্যাসাগর মহাশয়, মুমূর্ষু পত্নীর নিকট যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন, করাসডাঙ্গার শেষ প্রবাসে তৎপালনের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। নারায়ণ বাবু পিতৃ শুশ্রূষার অধিকার পাইয়াছিলেন।

প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত চিতা জলিয়াছিল। ক্রমে সব ফুরাইল। চিতা নিবিল!

অনেক ভক্ত অস্থি এবং ভস্ম সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দৌহিত্রদ্বয় দুই কলস ভস্ম সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও দুই দিন পরে জ'হ্নবীর জলে মিশাইল। কিছুই রহিল না। রহিল কীর্ত্তি! আর রহিল স্মৃতি! কবি মানকুমারী শ্মশানে স্বচক্ষে বিদ্যাসাগরের সৎকার দেখিয়া, মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় লিখিয়াছিলেন,—"অই জাহ্নবী-বক্ষে ধূ ধূ করিয়া চিতার আগুন জ্বলিতেছে! অই আগুনে বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ হইতেছে। বাঙ্গালীর পিরামিড ভস্মসাৎ হইতেছে! ঐ ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে! ঐ আগুনে বাঙ্গালার সম্মান-গৌরব পুড়িয়া ছাই হইতেছে। ঐ জ্বলন্ত আগুনে বাঙ্গালীর প্রধান গর্ব্ব, প্রধান অহঙ্কার পুড়িয়া যাইতেছে। ঐ চিতার আগুনে আজ কত-কি ফুরাইল। কত কাঙ্গাল গরীব মাতা পিতা হারা হইল! কত হৃদয় আজি আশা-ভরসা হারা হইল। শ্রাবণের মেঘ স্তম্ভিত হইয়া দেখিতেছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত হইয়া দেখিতেছে! ঐ চিহ্ন ফুরাইয়া আসিতেছে!"

সৎকারান্তে কাঙ্গালী বিদায় করিয়া সকলেই বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় বাড়ী ফিরিয়া আসেন। প্রায় দশ বার দিন বিদ্যাসাগরের ভক্তবৃন্দ মধ্যে মধ্যে শ্মশানে চিতা-চিহ্নের পার্শ্বে সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

শোক।

ক্রমে শোকময় সংবাদ সহরময় রাষ্ট্র হইল। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহে এ শোকময় সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। যিনি যে ভাবে বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব বুঝিতেন, তিনি সেই ভাবে সেই মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

এলাহাবাদের পাইওনিয়র লিখিয়াছিলেন,—"He was a brilliant educationalist, and well-known for his labors in the promotion of Hindu Widow-remarriage." 29th July, 1891.

ইংলিসম্যান লিখিয়াছিলেন,—"A man of rare gifts and broad sympathies." 30th July, 1891.

ডেলিনিউস্ লিখিয়াছিলেন,—"Death has again this week carried away another of the brightest jewells of India." 30th July, 1891.

ষ্টেটস্‌ম্যান লিখিয়াছিলেন,—"Another of the fore-most men of Bengal has gone over to the majority." 39th July, 1891.

ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ পত্রসমূহে এতৎসম্বন্ধে স্বল্প-বিস্তর পরিমাণে লিখিতহইয়া ছিল। আমেরিকার কোন পত্র, বিদ্যাসাগরকে গ্লাডষ্টোনের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন।

ক্রমে ক্রমে ভারতের গ্রাম, পল্লী, নগর, সহর সর্ব্বত্রই এই

বিদ্যার সাগর খ্যাতি—আরো মনোহর
বিশাল উদার চিত্ত দয়ার সাগর ;—
তেমন সন্তান মাগো, কে আর তোমার!
কাঁদিছে, হের গো, তাঁরে করিয়া স্মরণ,
দরিদ্র কাঙ্গাল দুঃখী কত শত জন ;
'কেবা অন্ন দিবে আর, কে ঘুচাবে দুঃখ,
দরিদ্র কাঙ্গালে দেখে কে চাহিবে মুখ ;
কত রাজা রাণী আছে এ রাজ্য ভিতর—
কাঙ্গালে হেরিয়া কেবা করে সে আদর!'
মানব দেহেতে সেই দয়া মূর্ত্তিমান,—
প্রাতে স্মরণীয় নিত্য যাঁর গুণগান!

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"ঈশ্বর বৈকুণ্ঠে।

আমার ঈশ্বর প্রভু,
আমার প্রাণের প্রাণ,
আমার গুরুর গুরু, জ্ঞানের জ্ঞেয়ান ;
অপার দয়ার সিন্ধু,
অসংখ্য দীনের বন্ধু,
ভাষার ভাস্কর-ইন্দু, দেবতা মহান।

বিধবার কাতরতা,
অনাথের প্রাণব্যথা,
ছাত্রের জীবন গুরু ঈশ্বর আমার;
বিদ্যার সাগর ধীর,
সত্যের তেজস্বী বীর,
অন্যায়ের মহা বৈর, ন্যায়-অবতার।

গাম্ভীর্য্যের মহা মূর্ত্তি,
রহস্যের মহাস্ফূর্ত্তি,
শিষ্টের পালন প্রভু দুষ্টের দমন;
অমর ঈশ্বর মোর,
অমরগণের সনে
হৃদয়-বৈকুণ্ঠে মোর বিরাজে কেমন।

মোর মত শত শত
লক্ষ লক্ষ হৃদয়েতে
এতদিনে পূর্ণরূপে ঈশ্বর-বিকাশ;
একটি বৈকুণ্ঠ নয়,
লক্ষ লক্ষ—ততোঽধিক
হৃদয়-বৈকুণ্ঠ এবে ঈশ্বর—নিবাস।

কেন তবে কাঁদ সবে,
"জয়েশ্বর" উচ্চ রবে
তোলো সুর বহু দূর আকাশ ভেদিয়া;

পৃথিবীর যে যেথায়,
শুনুক সে উচ্চ সুর,
কোটি কোটি চক্ষু মেলি দেখুক চাহিয়া ;—
বাঙালীর ঘরে ঘরে,
লক্ষ লক্ষ—ছয় কোটি
হৃদয়-বৈকুণ্ঠ মাঝে দয়ার সাগর
ঈশ্বর—ঈশ্বর—গুরু অমর ঈশ্বর।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।"

"কে বলে ঈশ্বর নাই ?

কে বলে ঈশ্বর নাই ?
ঈশ্বর জীবনে, ঈশ্বরের কার্য্য
জ্বলিছে দেখিতে পাই।
মৃত লোকে ভরা, স্বার্থপর ধরা
ঈশ্বরে হারায়ে আজ,
মৃত শোকভরে, কাঁদিতেছে সবে
ধরিয়া শোকের সাজ।
বুঝেনা তাহারা, অমর ঈশ্বর—
মরন তাঁহার নাই ;

নিঃস্বার্থ প্রেমের, অমৃতের ছবি
সংসারে রহিল তাই।
এ ছবি দেখিয়া কত মৃত প্রাণ
নূতন জীবন পাবে।
পরবর্ত্তী কত নূতন জীবন
আদর্শে গঠিত হবে।
অমৃতের পুত্র, অমর ঈশ্বর
অমর ভবন-বাসী,
প্রেম বিলাইয়া, অনন্ত প্রেমেতে
গিয়াছেন শেষে মিশি।
অমৃতের পুত্র, অমর ঈশ্বর
তাঁহার বিরহে আজ—
কাঁদিতেছে লোক, অমৃতের ভাষায়
দেখে হৃদে পাই লাজ!
অমর বিরহে, কাঁদিবার তরে
চাই গো অমর ভাষা।
মৃত লোক তোরা, ভুলেছিস কেন
তোদের এ মৃত ভাষা?
অমৃতের পুত্র, অমর যাহারা
এসো অগ্রসর হয়ে—
অমর ভাষায় বিরহ সঙ্গীত
উঠ গে তোমরা গেয়ে।

সে সঙ্গীত গিয়ে, প্রতি মৃতপ্রাণে
ঢালুক অমৃত-ধারা
মুহূর্ত্তের তরে, সজীব হইয়া
হউক আপনাহারা।

শ্রীমতী ভুপেন্দ্রবালা দেবী ."

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে আগষ্ট বা ১২৯৮ সালের ১১ই ভাদ্র টাউনহলে, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যু জন্য শোকপ্রকাশ এবং তাঁহার স্মৃতি-চিহ্ন সঙ্কল্পে এক বিরাট সভা হইয়াছিল। বঙ্গেশ্বর স্যর চার্লস্ ইলিয়ট সভাপতি হইয়াছিলেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পেথরাম সাহেব, শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, অনারেবল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

এই সভায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্থায়ী স্মৃতি-চিহ্ন রাখিবার সংকল্পসিদ্ধান্ত হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত কিন্তু কোন স্মৃতি-চিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এরূপ ব্যাপারে আধুনিক বাঙ্গালীর এরূপই পরিণাম। আমরা বুঝি, কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তিই অনন্ত অক্ষয় স্মৃতি-স্তম্ভ। ধাতুপ্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি বা পটাঙ্কিত প্রতিকৃতি পদে পদে প্রকৃতির অধীন। দুই দিনে তাহার লয়-সম্ভাবনা। প্রলয়েও কীর্ত্তির বিলোপ নাই। কীর্ত্তি অবিনশ্বর ও অনন্ত-ভাস্বর। যাঁহারা স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপনের সংকল্প করিয়া,

সিদ্ধ করিতে পারেন না, তাঁহাদের জন্য আমাদের বাস্তবিক আন্তরিক কষ্ট হয়। সভা করিয়া বাগাড়ম্বরে শোক প্রকাশ করিবার প্রথা বাঙ্গালীর সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। এ প্রথার পরম গুরু, বিলাতী সাহেব সম্প্রদায়। তবে সাহেব সম্প্রদায়, আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীর মতন পলে পলে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গে পটু নহেন। বাঙ্গালীর এ গৌরববাদ অধুনা বিশ্ব-বিসর্পিত। সাহিত্যের রুচির চিত্রপটে ভাষার ললিত বর্ণলাবণ্যে কবি রবীন্দ্রনাথ, বাঙ্গালী-চরিত্রের এই অংশের একটী উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এমারেল্ড থিয়েটারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণ জন্য ১৩০২ সালের ১৩ই শ্রাবণ যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে রবীন্দ্র বাবুর পঠিত "বিদ্যাসাগর চরিত" প্রবন্ধের একস্থলে এই কথা লেখা ছিল,—"আমরা আরম্ভ করিয়া শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্য-রচনা করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না।"

এই সভার সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, এই স্মৃতি-চিহ্ন-প্রতিষ্ঠার অকৃতকার্য্যতা স্মরণ করিয়া, যেন আত্মচিত্ত-প্রসাদকল্পে বলিয়াছিলেন,—কীর্ত্তি-চিহ্ন প্রতিষ্ঠিত না হউক, বিদ্যাসাগর বাঙ্গালিমাত্রেরই হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত।" এ স্তোক-বাণী নিশ্চিতই বিক্ষত-বক্ষের স্নিগ্ধ-প্রলেপ।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

আত্মকথা।

কাল-স্রোতে বিদ্যাসাগর যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকটিত হইল। বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব এবং কৃতিত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। বিদ্যাসাগর প্রকৃত পক্ষে বড় লোক ছিলেন। বিদ্যাসাগর দানে বড়; বিদ্যাসাগর পরদুঃখ-কাতরতায় বড়; বিদ্যাসাগর বুদ্ধিবলে বড়; তিনি আরও কত শত বিষয়ে সাধারণ লোক হইতে অনেক বড়। সাধারণ হইতে তাঁহার এই অসাধারণত্ব-পার্থক্য ছিল বলিয়াই, তিনি সমাজে প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন; কর্ম্মক্ষেত্রে তুমুল সংগ্রাম বাধাইয়াছিলেন। ফল মন্দ বা ভালই হউক, অসাধারণত্ব তাহার মধ্যে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত।

বিদ্যাসাগরের যে কালে জন্ম, সে কালে কালধর্ম্ম সাধনের নিমিত্ত তাঁহারই মত এক জন অসাধারণ লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল। কাল-স্রোতের পরিবর্ত্তনের যখন প্রয়োজন হয়, তখন এইরূপ লোকেরই জন্ম হইয়া থাকে। ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইবে।

কালপ্রভাবে হিন্দুধর্ম্ম ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল; হিন্দুর পর মুসলমান, মুসলমানের পর খৃষ্টান আসিয়া রাজা হইলেন; হিন্দুভাব অনেক দিন হইতেই শ্লথ হইতেছিল; মুসলমানী ভাব সে স্থান অধিকার করিয়াছিল; এখন রাজা

ইংরেজ সে স্থান অধিকার করিবার অবসর পাইয়াছে। বাঙ্গালার এমনই দুর্দ্দিনে বিদ্যাসাগরের জন্ম হইল। বিদ্যাসাগর আপন অসাধারণ প্রতিভা এবং কার্য্যক্ষমতা লইয়া সেই ভাবপ্রচারের সহায় হইলেন। আর তাঁহার প্রতিষ্ঠা প্রবলবেগে প্রসারিত হইল। বিদ্যাসাগরের জন্ম এক শত বৎসর পূর্ব্বে বা এক শত বৎসর পরে হইলে, সমাজে তাঁহার এত সম্মানপ্রতিষ্ঠা হইত কি না সন্দেহ। সমাজে প্রতিষ্ঠা হয় কালোচিত ধর্ম্মপ্রতিপালনে বিদ্যাসাগর তাহাই করিয়াছিলেন। নতুবা বল দেখি, অধ্যাপকের বংশে জন্ম লইয়া, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সন্তান হইয়া, হৃদয়ে অসাধারণ দয়া, পরদুঃখকাতরতা প্রবৃত্তি পোষণ করিয়া, হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি, হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রতি তাঁহার আন্তরিক দৃষ্টি হইল না কেন? দয়াময় কৃপা করিয়া, কাল-ধর্ম্ম-সিদ্ধির মানসে তাঁহার হৃদয়ে পরদুঃখকাতরতার স্রোত এতই প্রবল করিয়া দিয়াছিলেন যে, বংশপরম্পরাগত ধর্ম্মভাব শাস্ত্রজ্ঞান, কোথায় ভাসিয়া গেল। বিধবার দুঃখ দেখিয়া বিদ্যাসাগর গলিয়া গেলেন। বহু বিবাহে কুলীন কামিনীর ক্লেশ দেখিয়া তদ্বিমোচনে বিদেশী রাজার আশ্রয় লইলেন। কিন্তু কি হইতে কি হইল? হিন্দুর বিবাহে কি পবিত্র সম্বন্ধ, ব্রহ্মচর্য্যের চরম উদ্দেশ্য কি, কোথা হইতে কোন্ মুখ্যধর্ম্মসিদ্ধির জন্য ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছে, কিরূপে ব্রহ্মচর্য্যে ব্যাঘাত পড়িল, কিরূপ ব্যাঘাতে সমাজের কি অনিষ্টের সূত্রপাত হইয়াছে, বিদ্যাসাগর তাহা বুঝিলেন না,

তাঁহার অপার দয়াপ্রবৃত্তি তাঁহাকে তাহা বুঝিতে অবসর দিল না। তাঁহার সেই দয়াগুণে তাঁহার পৈত্রিক ধর্ম্ম, তাঁহার শাস্ত্রশ্রদ্ধা সবই ভাসিয়া গেল। এইরূপ বিদ্যাসাগরের চরিত্রে দেখিবে, দয়াগুণেই,—আত্মনির্ভরতাগুণেই তাঁহার নিকট আর কিছুই তিষ্ঠিতে পারে নাই। বিদ্যাসাগর কালের লোক। কালধর্ম্মই তিনি পালন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে হিন্দুর অনিষ্ট হইয়াছে; হিন্দুধর্ম্মে আঘাত লাগিয়াছে; হিন্দু সমাজ বিশৃঙ্খলতার স্রোতে ভাসিয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের অপরাধ কি? যিনি তাঁহার হৃদয়ে এত দয়া-পরদুঃখ-কাতরতা দিয়াছিলেন, তিনিই জানেন, কেন এমন হইয়াছিল। নতুবা বড় কথা কহিতে চাহি না, বিদ্যাসাগরের যখন জন্ম হয়, সে সময় ব্রাহ্মণের ঘরে নিত্য সন্ধ্যা-আহ্নিক করিত না, এমন লোক প্রায় দেখা যাইত না। কিন্তু নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের বংশধর বিদ্যাসাগর, উপনয়নের পর অভ্যাস করিয়াও ব্রাহ্মণের জীবন সর্ব্বস্ব গায়ত্রী পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মভাব কোন্ স্রোতে বহিবে, করুণাময় বাল্যকালেই ইঙ্গিতে তাহার আভাস দিয়াছিলেন।

ইহাই বিদ্যাসাগর-চরিত্রনির্য্যাস। আন্তরিকতা ও একাগ্রতা সে চরিত্রভিত্তির মূল উপকরণ। হিন্দুসন্তান বিদ্যাসাগরের এই আন্তরিকতা ও একাগ্রতা লইয়া, শাস্ত্রনিশ্চিত স্বধর্ম্মের পথানুবর্ত্তী হইয়া, স্বকার্য্য-সাধনে তৎপর হয়, ইহাই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা। এই প্রার্থনা লইয়াই, "বিদ্যাসাগরে"র প্রকাশ।

প্রথম বৎসরের নবজীবনে, কবিবর হেমচন্দ্র যে সরল ও সরস ভাষায় এবং সম্যক্ উপযোগী গ্রাম্য-উপমায়, বিদ্যাসাগর-চরিত্রের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া, চরিত-চর্চ্চার উপসংহার করিলাম। কবি সংক্ষেপে কয়েকটী কথা লিখিয়াছেন;—

"আসচে দেখ সবার আগে বুদ্ধি সুগভীর,
বিদ্যার সাগর খ্যাতি, জ্ঞানের মিহির।
বঙ্গের সাহিত্য-গুরু শিষ্ট-সদালাপী,
দীক্ষা-পথে বুদ্ধঠাকুর স্নেহে জ্ঞানব্যাপী।
উৎসাহে গ্যাসের শিখা, দার্ঢ্যে শালকড়ি,
কাঙ্গাল বিধবা-বন্ধু অনাথের নড়ি।
প্রতিজ্ঞায় পরশুরাম দাতাকর্ণ দানে,
স্বাতন্ত্র্যে সেঁকুল কাঁটা, পারিজাত ঘ্রাণে।
ইংরেজীর ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত 'ডিস,'
টোল, স্কুলের অধ্যাপক দুয়েরই ফিনিস্।"

সমাপ্ত ॥